দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য

(১৯৩৯—১৯৪৫)

ডঃ মীরা ঘোষ

: পরিবেশক :

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০০৭৩

Dwitiya Biswajuddha-Samakaleen

Bangla Kathasahitya (1939-1945)

Written by Dr. Mira Ghosh

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬১

প্রকাশক ঃ

শ্রীকালিদাস মিত্র

৩৪/কে সিমলা রোড

কলকাতা ৭০০০০৬

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীমদন মোহন কুমার

মদন প্রেস

১/১এ গোয়াবাগান স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০০০৬

উৎসর্গ

আমাব পরমতম শ্রদ্ধেয় স্বর্গত পিতা

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ স্মরণে

এবং

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত মা

শ্রীমতী বেলারাণী ঘোষের করকমলে

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

সূচীপত্র

নিবেদন

বাংলাদেশের রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি সহ বিশ শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অতি জটিলতম সময়। এমন ছ'টি বছরের মধ্যে রচিত বাংলা-কথাসাহিত্য অর্থাৎ গল্প ও উপন্যাস এক গুরুত্বপূর্ণ সময়-পরিধির ফসল-বিশেষ। এই সময়ের বাংলা-কথাসাহিত্য নিয়ে, আমি যতটা জানি, বাংলা ভাষায় কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। দু'একটি একেবারেই ছোট-খাটো প্রবন্ধ রচিত হলেও তা অনুল্লেখ্য। সুতরাং আমার এই গ্রন্থটিই সেই প্রয়াসে প্রথম পদক্ষেপ।

বর্তমান গ্রন্থটি আমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ-ডি. পরীক্ষায় প্রদত্ত গবেষণা-গ্রন্থ। একালের একজন খ্যাতকীর্তি মননশীল প্রবন্ধকার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ও রিডার, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের অধীনে আমি এই কাজটি করি। কাজটি করার সময় তিনি যে-সব মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশ দেন, যেভাবে-এক-একটি অধ্যায় লেখা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুত আমার পাণ্ডুলিপি দেখে সংশোধন করে দেন, তা যদি না করতেন, বিশ্ববিদ্যালয়-নির্দিষ্ট সময়-সীমায় এই গ্রন্থটি জমা দেওয়া আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হত না। তাঁর মত শিক্ষকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক মামুলি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁর অনুগত ও স্নেহধন্য ছাত্রী হিসেবে আমার এই গ্রন্থটিই তাঁর প্রতি আমার আজীবন সশ্রদ্ধ প্রণাম হয়ে রইল। গ্রন্থটির অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত পি. এইচ.-ডি., ডি. লিট। তাঁকেও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

আংশিক হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক অনুদানটুকু না পেলে এই গ্রন্থটি প্রকাশে আমি সাহসই পেতাম না, ভবিষ্যতে কোনদিন প্রকাশিত হত কিনা সন্দেহ।

গ্রন্থটি ছাপার কাজে মদন প্রেসের পক্ষে তরুণ কুমার এবং ছাপাখানার কর্মীরা আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। তাঁদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রন্থে যে বেশ কিছু ছাপার ভুল থেকে গেছে তার মূলে আমি এবং আমার অসতর্কতা ও প্রুফ দেখার অনভিজ্ঞতাই দায়ী। পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ কোনদিন হলে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ নির্ভুল করার চেষ্টা করব। তবু দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রণ-প্রমাদের উল্লেখ প্রয়োজন, না হলে গ্রন্থের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা ভুল বুঝবেন। ২৮ পৃষ্ঠায় ২৯ লাইনে 'মনীন্দ্রলাল বসুর' বদলে পড়তে হবে 'নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের', ১৬১ পৃষ্ঠা থেকে ১৬২ পৃষ্ঠার মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্পের নাম একাধিকবার ছাপা হয়েছে 'বিলাসমন', পড়তে হবে 'বিলাসমন'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য

(১৯৩৯-১৯৪৫)

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

এক

বাংলা সাহিত্য-ধারায় কথাসাহিত্য শাখাটি অর্বাচীন কালের সৃষ্টি। উনিশ শতক—যে কাল পাশ্চাত্য রেনেসাঁয় উচ্চকিত, তারই দ্বিতীয়ার্ধের একেবারে প্রথম দিকে এর আবির্ভাব ঘটে। আবির্ভাবের মুহূর্তে কথাকারদের পক্ষে রচনার মূল প্রেরণা ছিল সমাজ-সংস্কার-প্রয়াস[১], সমাজের শুভাশুভবোধ, আর এর পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল পশ্চিমী সাহিত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতিব নতুন অভিজ্ঞতা থেকেই। কিন্তু সেই আবির্ভাব সময়েব সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ বিচারে এটাই সহজবোধ্য হয় যে, কথাসাহিত্য অর্থাৎ গল্প-উপন্যাস রচনার উপযোগী সমাজরূপ তখন ছিল না বাংলাদেশে। সে সময়ের বাংলাদেশের ফিউডাল-প্রথাবদ্ধ সমাজ ছিল একেবারেই অনগ্রসর, অথচ সুগঠিত নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজ না হলে কথাসাহিত্যের, তার যথার্থ প্রকাশের উপযোগী সবল ভিত্তি রচিত হয় না। এ বিষয়ে সমালোচকেব মন্তব্য গ্রহণযোগ্য,—'The novel is the epic art form of our modern bourgeois society, it reached its full stature in the youth of the society.'[২] এই সময়ের অপটু বাংলা গদ্যও তাব শৈশব-অবস্থা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারে নি বলে কথাসাহিত্য রচনায় সে সবল সুস্থ প্রেরণা যোগাতে অক্ষম হয়।

তবু উনিশ শতকের এই দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে ক্রমশ প্যারীচাঁদ মিত্র, মধুসূদন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বংকিমচন্দ্র প্রমুখ তীক্ষ্ণধী পুরুষদের হাতে যেভাবে গদ্য যৌবন-স্বভাবে চিহ্নিত হয় ত্বরিত, যেভাবে রেনেসাঁর প্রেরণায় দেশজ আত্মামুক্তির উল্লাসে নেচে ওঠে, নবজাগরণের আন্তর প্রেরণায় নরনারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ স্পষ্ট হয়, তাতে অভাবনীয়ভাবে অন্তত উপন্যাস একটা স্থায়ী মর্যাদা পাবার মত রূপ

পেতে শুরু করে। প্যারীচাঁদ মিত্র টেকচাঁদ ঠাকুরের ছদ্মনামে যে 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস রচনা করেন, তা বাংলা কথাসাহিত্য-ধারায় প্রথম উপন্যাস নিশ্চয়ই, কিন্তু লেখক স্বয়ং সে সম্পর্কে যে অসচেতন ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর গ্রন্থটির ভূমিকার মত মন্তব্যেই,—'The work has been written in a simple style and to foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge of the Bengali language and acquaintance with Hindu domestic life, it will perhaps be found useful.'[৩]

১৮৫৫ সালে প্যারীচাঁদের পক্ষে সার্থক উপন্যাস রচনা নিশ্চয়ই দুরূহ ছিল. কারণ যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও সমাজে নারীর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা উপন্যাসের অন্যতম মূল প্রেরণা, তা তখনও লেখকের সামনে দেশজভাবে প্রত্যক্ষ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র আপন প্রখর মনীষায়, অভিজ্ঞতায় ও পূর্ণ ব্যক্তিত্বের অপ্রতিহত ক্ষমতায় নবাগত রেনেসাঁকে শিবের সমুদ্র-মন্থনজাত বিষ আকণ্ঠ গ্রহণ করার মত আত্মস্থ করে যে কথাসাহিত্য রচনা করেন, সেখানেই সার্থক বাংলা উপন্যাসের প্রথম 'মাইলস্টোন' চিহ্নিত হল। তা হল 'দুর্গেশনন্দিনী'।

এইভাবেই উনিশ শতকের উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকে এক একজন অসম্ভব ক্ষমতাবান মানুষের ব্যক্তিত্বের বেগে কথাসাহিত্য-ধারার অগ্রগমন ঘটে। প্যারীচাঁদ মিত্রের হাতে যার শুভ জন্মের শঙ্খধ্বনি, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে তারই রক্তিম প্রাণময় যৌবনকালের প্রবল ঝংকার। বাংলা কথাসাহিত্য-ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং একটি যুগ বা বোধহয় মহাকাল-নির্দিষ্ট একটি সময়। প্রধানত উচ্চকিত রেনেসাঁয় এবং গৌণত প্যারীচাঁদ মিত্রের উপন্যাস রচনার সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে উপন্যাস রচনার প্রতিক্রিয়া জাগে। এই প্রতিক্রিয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র নিজ কালচেতনায় নবজাত কথাসাহিত্যে যে বেগের সৃষ্টি করেন, রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে আনেন আর এক নতুন প্রতিবেগ। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশে উনিশ শতকের একজন পূর্ণ মানুষ। রবীন্দ্রনাথ উনিশ ও বিশ এই দুই বিশাল ও জটিল শতকের যোজক এক পূর্ণ ব্যক্তিত্ব। এই দুই ব্যক্তিত্বের কথাসাহিত্য-সৃষ্টির বেগ-প্রতিবেগে বাংলা কথা-সাহিত্য-ধারা এসে দাঁড়ায় বিশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পরে, 'কল্লোলে'র কালে।

বিশ শতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে দেশজ রাজনৈতিক চেতনা, সমাজভাবনা, অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা নতুন নতুন ভাবনা-চিন্তায় দীপিত হয়। নিশ্চয়ই উনিশ শতকের মত নয়, বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) আগে পর্যন্ত যে বিদেশী চেতনা-ভাবনা লেখক-বুদ্ধিজীবীদের প্লাবিত করে,

তা অনেক জটিল হয়ে ওঠে। তখন গড়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজ জীবন। সমাজনিহিত এই জীবনকে গ্রহণ ও গ্রাস করে যে সমস্ত অসম্ভব ক্ষমতাবান লেখক 'কল্লোলে'র কালে কথাসাহিত্য রচনায ব্যস্ত হন, তাঁরা বাংলা কথাসাহিত্য-ধারায় আবার এক বেগের সৃষ্টি করেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে কথাকারের সর্বোচ্চ স্ব-মহিমায় রেখে রবীন্দ্রনাথ সরে এসেছিলেন আর এক নতুন দিকের অন্বেষণে। সেই অন্বেষণের শেষ ধাপে কল্লোলের লেখকরা কথাসাহিত্য ধাবায নতুন বেগের সঞ্চার ঘটালেন। বাংলা উপন্যাস যুগ ও কালের প্রেক্ষাপটে আবাব লক্ষনীয়ভাবে ধারা বদল করে। নতুন বেগে দেখা দেয় কথা সাহিত্যের নতুন রূপ, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেই ধারায় আবার এক জটিল আঘাত দিতে শুরু কবে। নতুন নতুন উপকবণে বাংলা কথাসাহিত্যেব ধাবা-মুখ উজ্জ্বল হতে থাকে। জটিলতায়, বিশ শতকের বিক্ষত স্বভাবে, দ্বন্দ্বে বাংলা কথাসাহিত্যেব নতুন নতুন মুখবিম্ব ভেসে ওঠে। আমাদের কথা হল, বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পেব ধারা সেই প্যারীচাঁদ মিত্রের হাত থেকে বঙ্কিমচন্দ্র-ববীন্দ্রনাথ-কল্লোলের কাল ধবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌-কাল ও সমকালে বার বার নতুন হয়ে উঠেছে। প্রতিবাবেই বেগ ও প্রতিবেগ thesis, antithesis ও synthesis—এই যুক্তি-তর্কের ন্যায়ে তার প্রেরণা, বিকাশ ও বিবৃদ্ধি ঘটেছে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় বিশেষ একটি সময়-ভাগের (১৯৩৯-১৯৪৫) বাংলা কথাসাহিত্য। এই সময সম্পূর্ণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন প্রেক্ষাপটটি নির্দিষ্ট করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব পর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের বাঙালী মানুষ ও মন অনেক বেশী জটিল। সাধারণ উপনিবেশ-লালিত জীবনে ভয়াবহ সংকট তখন প্রত্যক্ষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে সেই সংকট ভযঙ্কব, বীভৎস হয়ে দেখা দেয়। এই অবস্থার প্রতিচিত্রণে সমকালের উপন্যাসে ও গল্পে কথাকাবরা যে জীবন গ্রহণ করেন তা জটিল হতে বাধ্য। কারণ, 'Novelists deliberately use their art for life, carefully analyzing the complexities and conflicts of life's sake and suggesting solutions even though they do not offer complete remedies.'[৪]

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত সমাজ বিশ শতকের গোড়া থেকেই অনেক বেশী সুগঠিত হতে দেখা যায। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব প্রবল ধাক্কা পবোক্ষভাবে ভারতবর্ষে লাগে এবং সেই মধ্যবিত্ত সমাজে তার প্রতিক্রিয়া মন্থর বিষক্রিয়ার মত কাজ করে চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে সেই বিষক্রিয়া নানাভাবে নানাদিকে দ্রুত গভীর-নিবিষ্ট হতে থাকে মধ্যবিত্ত-সমাজে ও জীবনে। যেহেতু উপন্যাস হল 'Product of a strong, developing middle class society...the history of person regarded as

moral beings, treated in relation to each other and to society.[৫]" তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে এই নতুন জটিলতম সমাজ ও নীতিশুদ্ধ মানুষকে তাঁদের বক্তব্যের একমাত্র আশ্রয় করেন একালের কথাকারেরা। আমাদের ধারণা ও বিশ্বাস, বাংলা কথাসাহিত্য ধারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে যেভাবে যে জটিল রূপাবয়বে সামনে আসে, তা ধারাটিকে আরও তীব্র জটিল অথচ প্রবল প্রতিবেগের সম্মুখীন কবে তোলে। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষ প্রতিক্রিয়ায় যে কথা-সাহিত্যেব জন্ম বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে, তার বিবিধ বিচিত্র রূপ, প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য এবং অব্যবহিত পরবর্তীকালে সেই নতুন বেগের পরিণামী Synthesis-এব স্বরূপ কি, তা-ই আমাদের আলোচ্য।

দুই

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য আমাদেব আলোচ্য বিষয় বলেই সাধারণ অর্থে বিশ শতকীয় যুদ্ধ এবং সেই সূত্রেই দু'টি চিহ্নিত মহাপবাক্রমশালী যুদ্ধের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, আমাদেব মনে হয়, এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ বিশ শতকের বিগত প্রায় তিরিশ বছবের (১৯১৪—১৯৪৫) দুই প্রান্ত থেকে এমন দুই বিশ্বযুদ্ধেব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র যে ভারত তথা বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে জটিল-যৌগিক নিয়ন্ত্রণে রেখেছে তাই নয়, সেই সঙ্গে বাংলাদেশেব বঙ্কিমচন্দ্র-ববীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-পুষ্ট-কথা-সাহিত্য শাখার সবল ধারাকে করেছে গভীরভাবে প্রভাবিত। আধুনিক যুদ্ধ আধুনিক বুদ্ধিজীবী মানুষের জীবনেরই গভীব-প্রোথিত বুদ্ধি-সংকটজাত মানসিকতার এক চরম প্রক্রিয়া ও প্রকাশ। আবাব, সমালোচকের ভাষায়, 'জীবনই হলো সমস্ত শিল্প-সৃষ্টির মৌলিক উপকবণ এবং ঔপন্যাসিক ছাডা আব কেউই বোধ হয় অতটা জীবনের মৌলিক উপকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নন।'[৬] তাই যে কোন দেশের কথাসাহিত্য-শাখায় দুই ধারাই—ছোটগল্প ও উপন্যাস—সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন, সমাজ-ভাবনাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেই তার পূর্ণতা পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চিহ্নিত ছয়টি বছরের মধ্যে রচিত কথাসাহিত্য-শাখা যুদ্ধ ও যুদ্ধের গভীরতম তাৎপর্যকে ভিত্তি করেই বিকাশ ও বিবৃদ্ধির সূত্রে এগিয়েছে বলে মনে করি।

লক্ষ্য করার বিষয়, বিশ শতকের দুই বিশ্বযুদ্ধই, ঘটে যাওয়ার অব্যবহিত আগে, সমকালে ও পরে মানুষের সমাজ ও জীবনকে চতুর্দিক থেকে করেছে জটিল। প্রতিদিনের জীবন থেকে সামগ্রিক জীবনের প্রেক্ষিত ও পরিণামকে বিস্ময়করভাবে করে

তোলে সংকটজনক। এই সংকট যেমন সমাজ ও অর্থনীতির, তেমনি তা থেকে বেরিয়ে-আসা কালো ছায়ার মত আরও গভীরতম ভয়াল প্রতিবিম্ব অতি ধীরে মানুষের জীবনের সমগ্রতাকে আবৃত করে, জীবনের গভীরে মিশে যায়। মানুষের স্বভাবনিহিত নীতিবোধ, আবেগ-উচ্ছ্বাস, ভুল-ভ্রান্তি, চিত্তের শুদ্ধি-অশুদ্ধি, জীবন গঠনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত যুদ্ধের ছায়ায় এক তীব্র-তির্যক স্ব-রূপ পায় এবং স্বাভাবিকভাবেই সেই রুদ্ধশ্বাস জীবন প্রতিফলিত হয় সমকাল ও উত্তরকালের সাহিত্যে—বিশেষ করে ব্যাপকভাবে কথাসাহিত্যে। এর আর একটি কারণও ওতপ্রোত আছে কথাসাহিত্য-শাখার শিল্প আত্মার মধ্যেই। এ বিষয়ে আধুনিক সমালোচকের বিশ্লেষণই যথাযথ,—'সমস্ত মিশ্র-শিল্পের মধ্যে উপন্যাসই সবচেয়ে বেশি মিশ্র। কারণ, পরিচিত মানুষজনেরই কীর্তিকলাপ, আবেগ সংরাগ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রতিদিনের ব্যবহৃত ভাষায় ঔপন্যাসিক প্রকাশ করেন। জীবনের নৈতিক সংকট, ঘটনা ও পরিস্থিতি ঔপন্যাসিকের আলোচ্য বিষয়। কাজেই মানুষ যে নৈতিক ও আবেগগত বিক্ষোভের পরিসীমার মধ্যে থাকে এবং আচার-আচরণগত যে সমস্যা তাকে প্রতিদিন পীড়িত করে তার সঙ্গেই উপন্যাসের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। সমস্যা ছাড়া যেমন জীবন নেই তেমনি কোনো উপন্যাসও বোধ হয় নেই।'[৭]

যে কোন গঠমান ও সুগঠিত সমাজ, জীবন, সভ্যতার পক্ষে বিশ শতকের এক একটি যুদ্ধ হল আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক একটি গবেষণাগারের মত। একালের যুদ্ধ বিবিধ বিজ্ঞান-আবিষ্ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও আধার, বলা যায়, আধেয়ও। অর্থাৎ বিশ শতকের যুদ্ধ মূলত বিজ্ঞানের যুদ্ধ। বিজ্ঞান অভিশাপ, না আশীর্বাদ—এই সমাজনীতি-ভাবনার সূত্রে কোনরকম তাত্ত্বিক প্রশ্নের জটিলতায় আদৌ না গিয়ে বলা যায়, বৈজ্ঞানিক যুদ্ধে কিন্তু ব্যক্তি ও সমগ্র জীবন, সমাজ, সভ্যতার শিকড় প্রবল ভূমিকম্পের মত কেঁপে ওঠে। যুদ্ধ হয় বিজ্ঞানের অস্ত্রধারী প্রবল প্রতাপান্বিত অত্যাচারী এক বীরবেশী দিগ্বিজয়ী রাজার মত—যার জন্য জীবন, সমাজ, সভ্যতা নানা দিক থেকে তার সুস্থিত কেন্দ্রবিন্দুটি থেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, উৎকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে।

এমন দুটি যুদ্ধ ঘটেছে এই বিশ শতকের পৃথিবীতে—একটি ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে, আর একটি ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫-এর সময় সীমায়। ঔপনিবেশিক শাসন-যন্ত্রের অত্যাচারের চাপে রুদ্ধশ্বাস বাংলাদেশের আপামর মানুষ ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে দেখেছে দূরে সরে থেকে অনেক দূরের কোন কালবৈশাখীর ঘন কালো মেঘকে দেখার মত বিস্ময়ে—যে মেঘ সেই দূরেরই কোন বিশাল ভূপৃষ্ঠে ঝড় এনে দাপিয়ে দিয়ে সরে গেছে। কিন্তু সেই বাংলাদেশের

মানুষই ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে কাছে থেকে,—তার বিশ্বজনীন বীভৎস রূপ দেখে কখনো বাড়ির উঠান ছাড়িয়ে নিজেরই ঘরের মধ্যে যুদ্ধের সঙ্গে নানাভাবে মোকাবিলা করে। অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের কাছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল অপ্রত্যক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল প্রত্যক্ষ রূঢ় বাস্তবতায় দীপ্ত।

কিন্তু দুটি যুদ্ধের ফলশ্রুতি থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি-জ্ঞান ও সমাজ-সচেতন, ঔপনিবেশিক শাসনে পর্যুদস্ত মানুষের যুদ্ধ সম্পর্কে তাত্ত্বিক শিক্ষা দু'রকম হলেও যুদ্ধের তত্ত্ব দু'টি বিশ শতকের ইতিহাস-চিহ্নিত যুদ্ধের যোগসূত্রে এক ক্রমবিকাশের বিশিষ্টতায় ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত আধুনিক যুদ্ধ-অভিজ্ঞ, যুদ্ধ-শিক্ষিত মানুষের কাছে যুদ্ধের কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। সেই যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা যতই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হোক, অথবা একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব মিলিয়ে যতই জটিলতা সৃষ্টি করুক, বাংলাদেশের বুকে দুই বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যেকটির সমকালে ও উত্তর-কালে গভীর-জটিল প্রভাব বিস্তার করেছে সমাজে ও জীবনে। আর এই সূত্রে কথাসাহিত্যের বিষয়ে ও আঙ্গিকে যেমন দেখা দিয়েছে নানান গ্রন্থি, তেমনি অভাবনীয় নানান বৈচিত্র্য। আমাদের মতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অতিক্রম করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে সেই জটিলতা গ্রন্থি-উন্মুক্ত হয়ে আবার নতুন গ্রন্থিতে বাঁধা পড়েছে।

যুদ্ধ তথা বিশ্বযুদ্ধের সাধারণ লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য থেকেই বিশ শতকে সংঘটিত দু'টি বিশেষ বিশ্বযুদ্ধের পরিচয়, প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের মূল্যায়ন সহজসাধ্য হবে। সাধারণভাবে যে কোন আধুনিক যুদ্ধ মানুষের সমাজ ও জীবনে কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রথমত, সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে যে সুশৃঙ্খল, দীর্ঘ-আচরিত সমাজ-ব্যবস্থায় শান্তি ও স্থিতি থাকে, তার মহতী বিনষ্টি ঘটে, দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ তীব্র আঘাত হানে আরও গভীরে, একেবারে সুস্থ ও সুস্থিত জীবন-ধ্যানের মর্মমূলে, তা হল, সমস্ত রকম বিশুদ্ধ মানবিক মূল্যবোধ ও জীবন-ন্যায় থেকে উদ্ভূত খাঁটি নীতিবোধের মূলে কুঠারাঘাত করে, মানুষকে করে মানস-আশ্রয় থেকে উন্মূলিত, উৎকেন্দ্রিক, তৃতীয়ত, এই সূত্রেই দেখা দেয় একান্ত ব্যক্তি-সম্পর্কে ও মনে সর্বহারা নৈরাশ্য ও বেদনা, অবসাদ ও শূন্যতা। যুদ্ধ মানুষকে একই সঙ্গে 'ফ্রাস্ট্রেটেড' ও গভীরতম আঘাতে 'সিনিক' করে তোলে।

তিন

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বস্তুত তাই এসেছিল বিশ্ব তথা ভারতীয় জীবনে নিষ্ঠুর অভিশাপের মত। কিন্তু বিশ শতকের দুই বিশ্বযুদ্ধে সময়ের যেমন তিরিশ বছরের ব্যবধান, তেমনি প্রভাবে-প্রতিক্রিয়ার ব্যবধানও গুণগতভাবে অনেক বেশী। (১) প্রথম

বিশ্বযুদ্ধ ছিল ব্যাপক ও ভয়ংকর এবং এসবই এসেছিল আকস্মিকতার মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেহেতু আরও ভয়ংকর যন্ত্রের তথা বিজ্ঞানের যুদ্ধ, তাই তার আবির্ভাব তুলনায় ব্যাপকতর ও ভয়ংকরতম। (২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আকস্মিকতা কেটে গেলে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এর বিরুদ্ধে দেখা দিয়েছিল ঘৃণা ও ক্রোধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটনের আগে একটা স্থিতিকাল ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় যুদ্ধোত্তর মানুষ নিজেকে পরবর্তী যে কোন আঘাতের জন্য কিছুটা তৈরী করতে পেরেছিল। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আকস্মিকতায় আসেনি, সাধারণ ও বুদ্ধিজীবী সর্বশ্রেণীর মানুষকে এর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠে সোচ্চার হতে সাহায্য করেছিল। সমস্ত রকম নৈরাশ্য, অবিরাম সমবেত প্রতিবাদের নানান তরঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল হয়েছিল উচ্চকিত এবং ধিক্কৃত। (৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল প্রথম দেখার অবাক-বিস্ময়ে সমস্ত রকম আদর্শবোধ, নীতিবোধ, নিয়ম-শৃঙ্খলা, সুস্থতা ও শুদ্ধি থেকে বেদনাদায়ক বিচ্যুতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেই অবোধ বিস্ময় ও অসহায় বেদনা ছিল না, বিস্ময়ের বদলে হতাশা, বেদনার বদলে চরম ক্ষোভ সত্য হয়ে ওঠে। (৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্থিতিকাল বেশী হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যতটা ক্ষতি করেছিল আকস্মিক আবির্ভাবের কারণে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেই পরিমাণ সর্বগ্রাসী সমূহ ক্ষতি ও সর্বনাশের আশংকা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে নি।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, আগেও একবার উল্লেখ করেছি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে ভারতবর্ষ আদৌ প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিল না। সে যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা ইউরোপ ভূখণ্ডে দেখা দিয়ে সেখানেই সমাপ্তির রেখা টানে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষ একেবারে প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত হয়ে যায়। তার কারণ বিশ শতকীয় যুদ্ধ বিজ্ঞানের যুদ্ধ এবং বিজ্ঞান কোন বিশেষ দেশের শিক্ষা চর্চা ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বাঁধা থাকে না। তা সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্ত্রক যেহেতু, তাই যুদ্ধ যে খণ্ডেই প্রত্যক্ষ হোক, পরোক্ষ প্রভাব বিশ্বের অন্য ভূখণ্ডে কম-বেশী ফেলবেই। তা ছাড়া বিশ শতকীয় ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক ও সংকটগুলি যেহেতু সব সময়েই আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জাগতিক নিয়ন্ত্রণে দেখা দিতে বাধ্য, তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরোক্ষে ক্রমশ ভারতবাসীর মধ্যেও গভীর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আনে। আর একটি দিকও লক্ষণীয়। ভারতবর্ষ সে সময়ে একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। সেই শাসক-বৃটিশের উপনিবেশ থাকায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক-সূত্রেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ভারতবর্ষে নানা-ভাবে দেখা দেয়।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে যে যুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া ভারতবাসী অনুভব করে তা যেমন

ভয়াল, তেমনি দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন-যন্ত্রে নিষ্পিষ্ট, পর্যুদস্ত, রুদ্ধশ্বাস ভারত-বাসীর সমবেত সংগ্রামী চেতনাও অত্যদ্ভুত প্রতিরোধমূলক শৌর্যবীর্যের প্রকাশে দীপ্ত, উজ্জ্বল। অর্থাৎ একদিকে ভয় আর একদিকে ভয়হীনতা, একদিকে তীব্র ক্ষোভ আর একদিকে বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ, একদিকে উপনিবেশবাদের বন্ধন-যন্ত্রণা আর একদিকে বন্ধনমুক্তির বলিষ্ঠ আর্তি। এ কথা ঠিক, মানুষ যখন অসহায় হয়ে পড়ে, তখন অবধারিত মৃত্যুকেই চরম হতাশায় চোখের সামনে দেখে, তখন শেষ বাঁচার বাসনাকেই মৃত্যু প্রতিরোধ করার শেষতম উপায় হিসেবে অস্ত্র করে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে সেই-জাতীয় চেতনার অন্তিম ব্যাপক গভীর অভ্যুদয় বস্তুত জাতিকে মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরিয়ে এনে জীবনের গান শোনাবার শেষ প্রয়াস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে আমরা সমগ্র ভারতীয় জনজীবনকে একই ক্ষেত্রে মৃত্যু ও জীবনের সঙ্গে সমান সংঘর্ষে লিপ্ত হতে দেখি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালের ত্বরিত ঘটনাবলী থেকে যে শিক্ষা স্পষ্ট, তাতে বোঝা যায়, ভারতবাসী যেমন সবল পদক্ষেপে জাতীয় জীবনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিকে এগোয়, তেমনি জীবনের অন্তস্থলে অন্তঃশীল থাকে কর্কট রোগের বীজাণুর মত অসংখ্য অস্তিত্ব যা সুদীর্ঘ ঐতিহ্য-আশ্রিত, সুগঠিত জীবনের নীতি ও মূল্যবোধ, সমস্ত রকম শুভবুদ্ধি ও মহৎ প্রেরণা, এক কথায় বিশুদ্ধ মানবতাকে সমূলে বিনষ্ট করে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালের সমাজ ও জীবনের বহিরঙ্গে এবং অন্তরঙ্গে যে গোপন ক্ষয়, তার সমস্ত দায়িত্ব শুধুমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তঃপ্রেরণায় নিহিত নয়, তার উৎস প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই, তার বিকাশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সমাজ ও জীবনে যুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া-জাত নানা ফলশ্রুতিতে, তার সৃষ্টির যন্ত্রণা ও বেগ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমস্ত রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শেষতম সিদ্ধান্তে। এই সিদ্ধান্ত ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত বিশ্ব-রাজনীতির মঞ্চে প্রধান প্রধান নেতাদের দাবা খেলার বিবিধ বিচিত্র চালের মধ্যেই নিহিত ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর বিশ্ব-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও পরোক্ষভাবে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের যুদ্ধজনিত নানান শাসন ও নিয়ম-কানুনের চাপ একই সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক মঞ্চকে জটিল করে তোলে। সেই জটিলতায় বাংলাদেশের মানুষের অভিজ্ঞতা ক্রমশ প্রবল যুদ্ধ-অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫—১৯১২) আশা-নিরাশার উত্তাল তরঙ্গ দেখা দেয়, সেই বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময় থেকেই সেই ধরণের ছোট-বড় একাধিক জাতীয় আন্দোলন সংঘটিত হলেও আর একটি যুদ্ধের মঞ্চ ক্রমশ নির্মিত হতে থাকে

অলক্ষ্যে। বিশ্ব রাজনীতিতে দ্রুত পট-পরিবর্তন ও লক্ষণীয় ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সাত মাস পরেই জার্মানীর সঙ্গে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় (২৮ জুন, ১৯১৯)। এর পর হিটলার হন জার্মানীর প্রথম চেয়ারম্যান (২৮ জুলাই, ১৯২১)। ফ্যাসিষ্ট নেতা মুসোলিনীর আবির্ভাব (১৯২২), বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের আবির্ভাব ও বৃটেন কর্তৃক স্বীকৃতি দান (১৯২৪, ১লা ফেব্রুয়ারী), সারা পৃথিবী জুড়ে বাজার মন্দাব আরম্ভ—এমন কয়েকটি উল্লেখ্য ঘটনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময় চিহ্নিত হতে থাকে বারো বছব ধরে (১৯১৮-১৯৩০)। ১৯৩০ সালের পব থেকেই হিটলারের ক্রমশ একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতাবৃদ্ধি, কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে দমন নীতির মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টির প্রয়াস (২৭ ফেব্রুয়ারী,১৯৩৩), মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদিতা, হিটলার কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিগুলিকে অবমাননা ও অস্বীকার, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তিসঞ্চয়জনিত ভীতি, প্রতিবেশী রাষ্ট্র পোল্যাণ্ডের প্রতি হিটলারের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন মনোভঙ্গি—এই সমস্তই ক্রমশ ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভেব মহত্তম সুযোগ ঘটিয়ে দেয়।

বস্তুত প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব মূল উৎস ছিল বিশ্বের চিহ্নিত সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলিব মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ, যে চরম দ্বান্দ্বিক মনোভাব—তার মধ্যেই। তখন একদিকে ছিল নেতা জার্মানীর সঙ্গে ইতালী ও জাপান, আর একদিক ছিল নেতৃত্বে ব্রিটেন, সেই সঙ্গে ফ্রান্স ও আমেরিকা—এই ধনতান্ত্রিক তিন রাষ্ট্র। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই তখন স্পষ্টত সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারী। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে ঠিক একুশ বছর পরে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, তার বিশ্ব-প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যের মূল ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ধাবা বিচারে নতুন এবং প্রথম সমাজবাদী রাষ্ট্রের পত্তনে নিহিত। 'পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছে এক নতুন যুগ, যে যুগের মৌল বিরোধ হয়ে উঠেছে—একদিকে মুমূর্ষু ধনতন্ত্র, অপরদিকে গতিষ্ণু সমাজতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ।'[৮]

আমাদের মনে হয়, সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন বিরোধ ক্রমশ তীব্রতম হতে থাকে জার্মানীর একনায়কতন্ত্রী নেতা হিটলার ও ফ্যাসীবাদী শক্তির বিশাল উদ্ভব ও বিকাশে, তেমনি সোভিয়েট ইউনিয়নে মহান বিপ্লবের ফলে নতুন সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর বাজবেশে উদ্ভব ও প্রভূত শক্তিসঞ্চয়ের দিকটিও বিশ্বরাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তীব্র ও অবধাবিত করে তোলে। বিশ্বের মন্দা বাজার, ফাসিষ্ট শক্তির নির্বাধ গতিময়তা, সোভিয়েট ইউনিয়ন তথা সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে ভয়, কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে নির্দয় দমন-মূলক অত্যাচার, সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলির পুরনো অন্তর্বিরোধের সূত্রেই নতুন করে আরও জটিলভাবে সম্পর্ককে যুদ্ধাভিমুখী করে তোলা—এইসব বিশ্বরাজনৈতিক অন্তর-বাহির

স্রোতই ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলারী জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অবধারিত করে তোলে।

যেহেতু বিশ্বরাজনীতি সে সময়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে সমান সূত্রে জড়িত, তাই ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেখা দেয় নানান বিপরীতমুখী স্রোত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যের রাজনৈতিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি যুদ্ধ-সমকালে যুদ্ধের রূপে ও স্বরূপে এত গভীরে প্রোথিত ও সম্পৃক্ত যে, তার স্বরূপ আলোচনার আগে যুদ্ধ-আরম্ভের আগের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের পরিচিতি একান্তই প্রয়োজন। কোন সমস্যা যখন মানবতার মূল ভিত্তিকেই কাঁপিয়ে দেয়, বলা যায় সমূলে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, এবং মানবতা যেহেতু সব সময়েই বিশ্বমানবতার সঙ্গে গভীর-নিবিষ্ট, অনেকটা নাড়ীর বন্ধনের মত, তখন সেই সমস্যা আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জাগতিক ব্যাপ্তি ও বিশালতা পাবেই। যে কোন আধুনিক যুদ্ধ সেই সমস্যাকে আরম্ভেই তীক্ষ্ণ করে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে এই সমস্যাই নানাভাবে কখনো বাইরে কখনো রাজনীতি-অর্থনীতি ও সমাজনীতির ভিতরে স্থায়ীভাবে আসন গ্রহণ করতে থাকে।

বাংলা কথাসাহিত্য ধারার ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া, তার উৎস আছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ভারতবর্ষে সংঘটিত নানান রাজনৈতিক ঘটনার দলিলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের ছিল তিনটি স্বতন্ত্র মুখ,—(১) গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন, (২) সহিংস সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, এবং (৩) নবোদ্ভূত সমাজতান্ত্রিক, সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন।

সারা ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে থেকে গান্ধীজী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বেই কংগ্রেস আন্দোলনে সত্যাগ্রহের পথ গ্রহণ করে। বৃটিশ শাসক ভারতের বুকে জনগণের পক্ষে নির্মম দমননীতির স্পষ্ট প্রতীক রাওলাত আইন (১৯১৯, ৩রা মার্চ) চাপিয়ে দেয়। এরই প্রতিবাদে যে আন্দোলন, সত্যাগ্রহ, একটানা হরতাল, নানান গণ-আন্দোলন দেখা দেয়,—তার সামগ্রিক রূপই হল ভারতের মাটিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম রূপ। ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন একই সঙ্গে সংঘটিত হয়। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ণরূপ দেখা দেয়। বাংলাদেশের এই আন্দোলন রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু প্রমুখ রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের নির্দেশে প্রবলতম উৎসাহ ও উদ্দীপনায় রূপ গ্রহণ করে। সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন (১৯২৮,

৩রা ফেব্রুয়ারী), শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণ (১৯২৮-১৯২৯), গুজরাট লবণ আইন আন্দোলন (১৯৩০, ১২ই মার্চ)—এ সবের সঙ্গে বাংলাদেশ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পাশে চলে সহিংস সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও। 'এই আন্দোলনটিকে কংগ্রেস জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে কখনও স্বীকার করেনি। অবশ্য জনসাধারণের চোখে, কংগ্রেস-আন্দোলন থেকে ভিন্নধর্মী হলেও এই আন্দোলনটি ছিল জাতীয় আন্দোলনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।'[৯] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সারা দেশ জুড়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে যে বেকার সমস্যার তীব্রতার কারণে চরম অস্থিরচিত্ততা, ধৈর্যহীনতা, হতাশা, চাঞ্চল্য ক্রমশ চাপা বিক্ষোভে রূপান্তরিত হচ্ছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে। বাংলাদেশে এই আন্দোলন নানাভাবে মাটির মধ্যে শিকড় বসায়, কারণ, প্রথমত, বেকার সমস্যার আশু, সমাধানহীন ভয়াবহরূপ, দ্বিতীয়ত, বাংলা বিভাগের জন্য লর্ড কার্জনের গভীর ষড়যন্ত্র, তৃতীয়ত, বাঙালীদের উচ্চশিক্ষা থেকে ছলে-বলে-কৌশলে নিবৃত্ত করার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী প্রয়াস, চতুর্থত, বিদেশী শাসক কর্তৃক জাতীয় চরিত্রকে অপমান ও কটাক্ষ করার উদ্যোগ। এই সমস্তই বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ছাত্র ও যুবগোষ্ঠীর মধ্যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সূচনার মাটি রচনা করে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন পেশার মানুষও একত্রিত হয়।

একদিকে বৃটিশের চরম দমননীতি, আর একদিকে ক্রমাগত দেশীয় অর্থনীতিতে বিপর্যয়—এই দুয়ের মধ্যে ঔপনিবেশিক পরিবেশ থেকে রাজনৈতিক মুক্তিবাসনায় আর্ত সর্বস্তরের বাঙালীর মধ্যে থেকেই একদল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে সামিল হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের বুকে ছোট ছোট গুপ্ত সমিতি গঠন, বিভিন্ন অঞ্চলে ডাকঘরে অগ্নিসংযোগ (১৯২০-১৯২৪), বিদেশী শাসকের অস্ত্রাগার, খাজাঞ্চিখানা ইত্যাদি আক্রমণ (১৯২৪-১৯৩০)—এসবের মাধ্যমে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন একটা রূপ পায়। নির্ভীক আত্মত্যাগের উন্মাদনার মধ্যেও ক্রমশ আত্মসমালোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে এবং ১৯২৪-১৯৩০-এর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির আবির্ভাবের ফলে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যথেষ্ট ভাঁটা পড়ে। কিন্তু এ কথা ঠিক, এই আন্দোলন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন বাংলাদেশের পটভূমিতে জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতা সৃষ্টিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়।

আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন প্রেক্ষাপট আলোচনার সময় দেখাবো যে, সে সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নানা ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও কি অসামান্য অবদান রেখেছে বৃটিশের ভারত ত্যাগের পিছনে অন্যতম অবধারিত শক্তি হিসেবে। কিন্তু এই কমিউনিস্ট পার্টি—যে বিপ্লব-শক্তি নিয়ে সে সময়ে জনমনে স্থান গ্রহণ করেছিল,

তারও প্রস্তুতি ছিল প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পর্বে। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্ ও সমকালে যে সাম্যবাদী আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ক্রমশ একটি পূর্ণাবয়ব আকার ধারণ করে, তার ছবি ও প্রভাব নিশ্চয়ই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে নানাভাবে ধরা পড়ে এই বিশেষ কালে রচিত কথাসাহিত্যেই।

ভারতের মাটিতে নিজস্ব কমিউনিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্র রচনা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্তি ঘটে ১৯২৭ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যেই। ১৯২৭ সালের রাশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লবের সূত্রে লেনিনের নেতৃত্বে যে তৃতীয় কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল গঠিত হয় ১৯২৯ সালে, তারই প্রেরণায় ভারতের মজুরদের ধর্মঘটের মাধ্যমে আসে কমিউনিস্ট চেতনা। কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই পার্টি গঠনের আদি থেকেই দমনমূলক নীতির দণ্ডে কমিউনিস্টদের চিহ্নিত করতে থাকে। এই চিহ্নিতকরণ চলে ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সালের মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে। ১৯৩৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বৃটিশ শাসকদের দ্বারা বে-আইনী ঘোষিত হয়। ভারত তথা বাংলাদেশের বহু সন্ত্রাসবাদী এই পার্টিতে যোগ দেয়।

কমিউনিষ্ট পার্টি বাংলাদেশের কৃষক ও শ্রমিকদের একটি দক্ষ, মজবুত রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরী করে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এই মঞ্চের গঠন নানা আন্দোলনের মাধ্যমে রূপ পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কমিউনিষ্ট পার্টির যে আন্দোলন. তা ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের স্বাধীনতা আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায় রচনা করে। এই কমিউনিষ্ট আন্দোলন সাংগঠনিক দিক থেকে উত্তাল, উদ্দীপনাপূর্ণ শ্রমিক-মজুরদের জাতীয় আন্দোলনে একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দিকে নিয়ে যাওয়ার সহায়ক-শক্তি হয়ে ওঠে।

আমরা আগেও বলেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই সাধারণ সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে দেখা দিচ্ছিল অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে চাপা অসন্তোষ এবং রাজনৈতিক মুক্তির পথে পর্বত প্রমাণ বাধার কারণে গভীরতম অস্থিরচিত্ততা। জনগণের মনের এমন দু'দিক থেকে ব্যক্ত অভিপ্রায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জাতীয় জীবনকে যে পথে চালিত করে, সেই পথেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল উচ্চকিত হয় আরো অধিক সরবতায়। প্রথম যুদ্ধের পরবর্তী রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অস্থিরতাই নানান আন্দোলনের মাধ্যমে যে পরিবেশ ও মাটি রচনা করে ভারত তথা বাংলাদেশে, তার সঙ্গে যুক্ত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংসার-জীবনে অভ্যস্ত সামাজিক মানুষের নানান জিজ্ঞাসা। ব্যক্তি জীবন ও সমষ্টি জীবনের সূত্রে সারা বাংলা-দেশের সমাজ-জিজ্ঞাসা তখন এক ভয়াবহ উত্তরের সম্মুখে স্থিরনেত্র হয়ে থাকে। যেহেতু

জীবন, সমাজ ও সমাজ-মানুষ—এসবের যথাযথ বাস্তবসম্মত শিল্পরূপায়ণেই কথা-সাহিত্যের শক্ত এবং একমাত্র ভিত্তি, তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগের সামাজিক সমস্যা ও চাকুরী-সর্বস্ব মধ্যবিত্ত মানসিকতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা একান্ত প্রযোজন।

চার

মানুষ এবং মানুষের জীবন যেমন আদিমতম, তেমনি মানুষের গড়া সমাজও। মানুষ এবং জীবনের প্রয়োজনেই একদিন সমাজের উদ্ভব, বিকাশ ও বিবৃদ্ধি। অর্থাৎ মানুষ ও জীবনের বিকাশেব যে ঐতিহ্য, সভ্যতার ধারাবাহিকতায় যে ঐতিহ্য, সমাজের গঠনেও সেই ঐতিহ্য। একালে পুরনো ঐতিহ্যসম্মত সমাজ সমবেত মানুষের জীবন-যাপনের ও ধারণের সঙ্গে যুক্ত সর্বদিকের সমন্বয়ে একটা বিশেষ সময়ের প্রবাহে সুস্থিত থাকে। পৃথিবীর বুকে সূর্যেব ওঠা ও অস্ত যাওযার যেমন নিয়ম আছে, প্রকৃতির বুকে গাছের বীজ থেকে বৃক্ষে উপনীত হওয়ার যেমন নিযম আছে, তেমনি মানুষেব গড়া দীর্ঘ-আচরিত সমাজেরও নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। এমন নিয়মেই সমাজ থাকে সুস্থ ও সুস্থিত। সচেতন মানুষেব মানবিক বোধে গডা সমাজ এতই স্পর্শকাতর, এতই সতর্ক যে কোন আকস্মিক আঘাত বা পরিবর্তনেব ধাক্কায়, সে আঘাত সামান্য হলেও, তা কেঁপে ওঠে। তার ঐতিহ্যে ও সুস্থিত অবস্থায আঘাত লাগলেই সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন ও জীবনেব অন্তর্নিহিত রূপটি নষ্ট হয়ে যায়। একটা ভাঙা সমাজ গডতেও সময লাগে।

কিন্তু যদি সমাজের ভাঙন বাইরে স্পষ্ট না হযে মানবদেহে ক্ষযরোগের বীজাণুর মত অতি ধীরে সমাজ-দেহকে পঙ্গু প্রাণহীন করে দেয়, তা হলে তা থেকে নতুন সমাজ গড়া সময়সাপেক্ষ নিশ্চয়ই, অন্য দিকে তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল করা সম্ভব কিনা, সন্দেহ থেকেই যায়। সমাজেব সঙ্গে জড়িত থাকে মানুষ ও মানুষের জীবন, মানুষের সুস্থ চেতনা ও সবল মানবিকবোধ-বুদ্ধি। সমাজ বাদ দিযে মানুষের যেমন পায়েব নীচের মাটি রাখা যায় না, তেমনি মানুষ বাদ দিয়ে সমাজকে বাঁচিযে রাখার অর্থই হল সাপহীন খোলসটিকে লালন করা। আবার সমাজ ও মানুষ বা মানবজীবন—এদের সমন্বযে যদি মানবতা নামক বস্তুটি বলিষ্ঠ ভিত্তি না পায, যদি বিনষ্ট হয়ে যায সমাজদেহ থেকে, তবে সমাজ তথা মানবজীবন দুইই অর্থহীন, পঙ্গু, জরাগ্রস্ত, শীর্ণ-বিবর্ণ হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষের পর থেকে দীর্ঘ একুশ বছরে দেখা গেছে, বাংলা দেশের সমাজ ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষও ক্রমশ পঙ্গু, জরাগ্রস্ত, শীর্ণ, বিবর্ণ হতে থাকে। আধুনিক যুদ্ধ আধুনিক মানবসমাজের সবচেয়ে বড় শত্রু, সবচেয়ে বড় প্রতিস্পর্ধী শক্তি,

তারও প্রস্তুতি ছিল প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পর্বে। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্ ও সমকালে যে সাম্যবাদী আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ক্রমশ একটি পূর্ণাবয়ব আকার ধারণ করে, তার ছবি ও প্রভাব নিশ্চয়ই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে নানাভাবে ধরা পড়ে এই বিশেষ কালে রচিত কথাসাহিত্যেই।

ভারতের মাটিতে নিজস্ব কমিউনিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্র রচনা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্তি ঘটে ১৯২১ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যেই। ১৯২৭ সালের রাশিয়ায সর্বহারা বিপ্লবের সূত্রে লেনিনের নেতৃত্বে যে তৃতীয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গঠিত হয় ১৯২৯ সালে, তারই প্রেরণায় ভারতের মজুরদের ধর্মঘটের মাধ্যমে আসে কমিউনিস্ট চেতনা। কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই পার্টি গঠনের আদি থেকেই দমনমূলক নীতির দণ্ডে কমিউনিস্টদের চিহ্নিত করতে থাকে। এই চিহ্নিতকরণ চলে ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সালের মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে। ১৯৩৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বৃটিশ শাসকদের দ্বারা বে-আইনী ঘোষিত হয়। ভারত তথা বাংলাদেশের বহু সন্ত্রাসবাদী এই পার্টিতে যোগ দেয়।

কমিউনিষ্ট পার্টি বাংলাদেশের কৃষক ও শ্রমিকদের একটি দক্ষ, মজবুত রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরী করে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এই মঞ্চের গঠন নানা আন্দোলনের মাধ্যমে রূপ পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কমিউনিষ্ট পার্টির যে আন্দোলন, তা ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের স্বাধীনতা আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায় রচনা করে। এই কমিউনিষ্ট আন্দোলন সাংগঠনিক দিক থেকে উত্তাল, উদ্দীপনাপূর্ণ শ্রমিক-মজুরদের জাতীয় আন্দোলনে একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দিকে নিয়ে যাওয়ার সহায়ক-শক্তি হয়ে ওঠে।

আমরা আগেও বলেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই সাধারণ সবশ্রেণীর মানুষের মধ্যে দেখা দিচ্ছিল অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে চাপা অসন্তোষ এবং রাজনৈতিক মুক্তির পথে পর্বত প্রমাণ বাধার কারণে গভীরতম অস্থিরচিত্ততা। জনগণের মনের এমন দু'দিক থেকে ব্যক্ত অভিপ্রায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জাতীয় জীবনকে যে পথে চালিত করে, সেই পথেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল উচ্চকিত হয় আরো অধিক সরবতায়। প্রথম যুদ্ধের পরবর্তী রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অস্থিরতাই নানান আন্দোলনের মাধ্যমে যে পরিবেশ ও মাটি রচনা করে ভারত তথা বাংলাদেশে, তার সঙ্গে যুক্ত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংসার-জীবনে অভ্যস্ত সামাজিক মানুষের নানান জিজ্ঞাসা। ব্যক্তি জীবন ও সমষ্টি জীবনের সূত্রে সারা বাংলা-দেশের সমাজ-জিজ্ঞাসা তখন এক ভয়াবহ উত্তরের সম্মুখে স্থিরনেত্র হয়ে থাকে। যেহেতু

জীবন, সমাজ ও সমাজ-মানুষ—এসবের যথাযথ বাস্তবসম্মত শিল্পরূপায়ণেই কথা-সাহিত্যের শক্ত এবং একমাত্র ভিত্তি, তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগের সামাজিক সমস্যা ও চাকুরী-সর্বস্ব মধ্যবিত্ত মানসিকতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা একান্ত প্রয়োজন।

চার

মানুষ এবং মানুষের জীবন যেমন আদিমতম, তেমনি মানুষের গড়া সমাজও। মানুষ এবং জীবনের প্রয়োজনেই একদিন সমাজের উদ্ভব, বিকাশ ও বিবৃদ্ধি। অর্থাৎ মানুষ ও জীবনের বিকাশের যে ঐতিহ্য, সভ্যতার ধারাবাহিকতায় যে ঐতিহ্য, সমাজের গঠনেও সেই ঐতিহ্য। একালে পুরনো ঐতিহ্যসম্মত সমাজ সমবেত মানুষের জীবন-যাপনের ও ধারণের সঙ্গে যুক্ত সর্বদিকের সমন্বয়ে একটা বিশেষ সময়ের প্রবাহে সুস্থিত থাকে। পৃথিবীর বুকে সূর্যের ওঠা ও অস্ত যাওয়ার যেমন নিয়ম আছে, প্রকৃতির বুকে গাছের বীজ থেকে বৃক্ষে উপনীত হওয়ার যেমন নিয়ম আছে, তেমনি মানুষের গড়া দীর্ঘ-আচরিত সমাজেরও নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। এমন নিয়মেই সমাজ থাকে সুস্থ ও সুস্থিত। সচেতন মানুষের মানবিক বোধে গড়া সমাজ এতই স্পর্শকাতর, এতই সতর্ক যে কোন আকস্মিক আঘাত বা পরিবর্তনের ধাক্কায়, সে আঘাত সামান্য হলেও, তা কেঁপে ওঠে। তার ঐতিহ্যে ও সুস্থিত অবস্থায় আঘাত লাগলেই সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন ও জীবনের অন্তর্নিহিত রূপটি নষ্ট হয়ে যায়। একটা ভাঙা সমাজ গড়তেও সময় লাগে।

কিন্তু যদি সমাজের ভাঙন বাইরে স্পষ্ট না হয়ে মানবদেহে ক্ষয়রোগের বীজাণুর মত অতি ধীরে সমাজ-দেহকে পঙ্গু প্রাণহীন করে দেয়, তা হলে তা থেকে নতুন সমাজ গড়া সময়সাপেক্ষ নিশ্চয়ই, অন্য দিকে তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল করা সম্ভব কিনা, সন্দেহ থেকেই যায়। সমাজের সঙ্গে জড়িত থাকে মানুষ ও মানুষের জীবন, মানুষের সুস্থ চেতনা ও সবল মানবিকবোধ-বুদ্ধি। সমাজ বাদ দিয়ে মানুষের যেমন পায়ের নীচের মাটি রাখা যায় না, তেমনি মানুষ বাদ দিয়ে সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থই হল সাপহীন খোলসটিকে লালন করা। আবার সমাজ ও মানুষ বা মানবজীবন—এদের সমন্বয়ে যদি মানবতা নামক বস্তুটি বলিষ্ঠ ভিত্তি না পায়, যদি বিনষ্ট হয়ে যায় সমাজদেহ থেকে, তবে সমাজ তথা মানবজীবন দুইই অর্থহীন, পঙ্গু, জরাগ্রস্ত, শীর্ণ-বিবর্ণ হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষের পর থেকে দীর্ঘ একুশ বছরে দেখা গেছে, বাংলা দেশের সমাজ ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষও ক্রমশ পঙ্গু, জরাগ্রস্ত, শীর্ণ, বিবর্ণ হতে থাকে। আধুনিক যুদ্ধ আধুনিক মানবসমাজের সবচেয়ে বড় শত্রু, সবচেয়ে বড় প্রতিস্পর্ধী শক্তি,

নিশ্চিত মৃত্যুর লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার উপযোগী বিষাক্ত অস্ত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে সমাজের বুকে সেই করুণ পরিণামের সূচনা লক্ষ্য করা যায়।

যে কোন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলে থাকে দৃঢ়মূল জাতীয় আদর্শ-চেতনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত-পূর্ব দশটি বছরের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রে আমরা সে রকম এক আদর্শ চেতনা-চকিত রাজনৈতিক মানসিকতার প্রমাণ পাই। অর্থাৎ ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে বাঙালী সাধারণ ও বুদ্ধিজীবী মানুষ জাতীয় আদর্শ চেতনায় প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ ছিল। দেশের সমাজবদ্ধ মানুষগুলি তখন নবপ্রাণে প্রাণিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এই নবপ্রাণনা কিছুটা স্তিমিত হয় এবং ক্রমশ সন্ত্রাসবাদের দিকে তা মুখ ফেরায়। তবু স্বীকার করতেই হবে, দেশের ছাত্র ও যুবসমাজ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় যে ক্রমশ রুদ্ধশ্বাস হয়ে পড়ছে, এমন একটি ঐক্যবদ্ধ ভাবনা জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের আকারে রূপ পেতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতের বাইরে সুদূর ইউরোপ ভূখণ্ডে ঘটলেও পরোক্ষে আমাদের দেশের জনমানসে, গূঢ়চারী সেই চেতনায় আঘাত হানে। কারণ বৃটিশ উপনিবেশ ছিল ভারতবর্ষ। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বৃটিশের কাছ থেকে যুদ্ধের কারণে কিছু স্বায়ত্ত-শাসনের সুযোগ লাভ করা যাবে—এমন ভেবেছিলেন সে সময়ের জাতীয় নেতৃবৃন্দ। কিন্তু যুদ্ধশেষে দেখা যায় নৈরাশ্য। জাতীয় নেতাদের যেমন এই নৈরাশ্য আসে, তেমনি হতাশা ও বেদনায় বিধ্বস্ত হয় যুবসমাজ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের আগে পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় সমাজও দারুণ সংকটের মধ্যে পড়ে।

সমাজ-সংকটের সম্ভাব্য কারণগুলি হল,—(১) সারা দেশব্যাপী অসহনীয় আর্থিক সংকট ও বেকারত্ব, (২) রাজনৈতিক জাতীয় আন্দোলনগুলির একের পর এক ব্যর্থতায় পরিণতি, (৩) যে সমস্ত মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন ছিল চাকুরী-নির্ভর, তাদের জীবন-যাপনে নিরাপত্তার অভাব-সৃষ্টি, (৪) নগর জীবনের সাজানো ব্যবস্থায় অসহায় বিফলতা। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-শেষের অব্যবহিত পরবর্তীকালে রচিত একটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গত মন্তব্য করেছেন,—'পোলিটিকাল যোগ বা ইকনমিক যোগ পূর্ণ যোগ নয়, সর্বশক্তির যোগ চাই।'[১০] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক-সামাজিক পটভূমি, তাতে সবদিকের 'সর্বশক্তির যোগ' ঘটেনি বলেই সমাজ ও সমাজ-মানুষের প্রকৃত পরিবর্তন ঘটেনি। সমাজকে ও ব্যক্তিকে এক অসহায় অধঃপতনের দিকে নিক্ষেপ করেছে। 'দেশের কল্যাণের একটা বিশ্বরূপ মনের সম্মুখে উজ্জ্বল করে রাখলে দেশের লোকের শক্তির বিচিত্রধারা সেই অভিমুখে চলবার পথ হৃদয় ও বুদ্ধিশক্তির

দ্বারা খনন করতে পারে।'[১১] দেশের কল্যাণের এমন 'বিশ্বরূপ' ভারতের মানুষ রাখতে পারছিল না, কারণ ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে দেশীয় রাজনীতির নানান জটিল স্রোত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমশ অসহায় রূপ এবং সর্বদিকে হতাশা।

দেশের মধ্যেই জাতীয় নেতাদের বার বার রাজনৈতিক মতাদর্শের বিভেদজনিত সংঘর্ষে জাতীয় আন্দোলনগুলি যুব মনের সমস্ত রকম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, উপনিবেশ-বিরোধী আশা-প্রত্যাশাকে বিক্ষুব্ধ, বিমূঢ় করে দেয়। যে কোন দেশের সমাজ তরুণ ও যুবকদের সুস্থ মানস গঠনেই মজবুত হয়। তাদের প্রাণের উন্মাদনা যত বেশী সার্থক নেতৃত্বে সবল স্বতঃস্ফূর্ততায় বাস্তবভিত্তি পাবে, ততই সেই সমাজ হবে গতিশীল। প্রাণের আবেগে সমাজের অন্তর্নিহিত অবসাদ, জড়ত্ব, ভয়, বিভেদ, আত্মিক পচনশীলতাকে নির্মূল করতে পারবে। কিন্তু সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সংঘটিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকেই একাধিক ছোটবড় আন্দোলন যেভাবে প্রশমিত-উত্তেজনা থেকে অন্তিম নিষ্ফল ফল দেয়, তাতে দেশীয় যুবসমাজ ক্রমশ•হতাশাকেই নিজেদের শরীরের ছায়ার মত সঙ্গী করতে থাকে।

এই হতাশার সঙ্গে সমন্বিত হয় বিশ্ব-বাজার-মন্দার সঙ্গে সম্পৃক্ত দেশীয় অর্থনৈতিক মন্দা-অবস্থা। যুবসমাজের মধ্যে বেকারত্ব প্রবল হয়। দেশের অর্থনৈতিক সু-অবস্থা একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে থেকেই, উৎপাদন সামগ্রীর কেন্দ্রে লক্ষ্য রেখেই বজায় থাকে। এবং এর থেকে যে উন্নতি, তা উৎপাদন ব্যবস্থার প্রভূত সমৃদ্ধির সঙ্গে গভীর-ঘনিষ্ঠ। অর্থনৈতিক সু-অবস্থার এই বিশ্বনীতিতেই যখন মন্দা এবং সে মন্দা যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ১৯৩০ সালের বাজার-মন্দার সঙ্গে ভারত তথা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মন্দায় জড়িত হয়, তখন সারা দেশের বেকারত্ব, জীবনযাপন সম্পর্কে আশাহীনতা, নিরাপত্তাহীনতা ক্রমশ অমা-রাত্রির কঠিন অন্ধকারের মত চেপে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ও সমকালে যারা ছিল কিশোর, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে তারা অস্থিরচিত্ততায়, নৈরাশ্যে, হতোদ্যমে নিস্তেজ, নির্বীর্য হতে বাধ্য। কারণ যৌবনের দৃপ্ত লগ্নেই তারা চতুষ্পার্শ্বের সমাজের কাছে প্রাপ্য চেয়ে বিফল মনোরথ হচ্ছে বারবার।

অন্যদিকে যারা ছিল চাকুরী-নির্ভর জীবনযাপনে অভ্যস্ত, সংসারকে সেইভাবে একটা কেন্দ্রে দৃঢ় রাখতে তৎপর, সেই মধ্যবিত্ত চাকুরীপ্রাণ মানুষরা কেন্দ্রচ্যুতির আশংকায় দোদুল্যমান হয়ে ওঠে। তার মূলেও সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ক্রমশ উঠে-আসা বিশ্ববাজার-মন্দার আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া! বাংলাদেশের এমন অর্থনৈতিক সংকটের সামনে সংসারী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষ আত্মরক্ষার পথ ও সূত্র অনুসন্ধানে দিশেহারা হয়ে যায়। পিতা-মাতা-পুত্র-কন্যা-স্ত্রী এঁদের সমবেত মানবিক আশ্রয়ে যে

সংসার, তাকে কেন্দ্রচ্যুত না হতে দেওয়ার জন্য সেই শ্রেণীর মানুষের মনে ক্রমশ জাগে জটিল প্রতিক্রিয়া। একদিকে জটিল সমাজ, অন্যদিকে সংসারকে নিজেদের চেনা কেন্দ্রে স্থিত রাখার প্রবল প্রয়াস ও আত্মসংগ্রাম—এমন প্রতিকূল সংগ্রামে নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন আসে, মানবতাবোধ বড় হয়, সেই সঙ্গে নীতিগত আদর্শকে আপ্রাণ বাঁচানোর প্রয়াস—আর এসবকে ধ্বংস করার জন্য তখন সমাজের প্রথাবদ্ধ সামগ্রিকতায় শৈথিল্য—এ সব থেকে মধ্যবিত্ত সংসারজীবন ক্রমশ এক দ্বন্দ্ব-সংকটের ভিত্তির ওপব এসে দাঁড়ায়।

এসবের সঙ্গে আরও একটি দিক লক্ষণীয়। সর্বকালেই দেখা গেছে, ভারতবর্ষে নবগঠিত বা পুরনো শহর যত দ্রুত এগিয়েছে, গ্রাম তত পিছিয়ে পড়েছে। অবশ্যই বৃটিশ শাসিত উপনিবেশ ভারতবর্ষের প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের ভারতের গ্রাম ও শহর সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। বৃটিশ শাসনে, তাদের ঔপনিবেশিক বুদ্ধি ও সাম্রাজ্যবাদী লোভ-লিপ্সায় সুদূর ইংলণ্ড থেকে নির্দেশিত রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতায় ভারতেব উন্নতি অর্থাৎ একান্তভাবে ভারতীয়দের উন্নতি সম্ভব হয় নি। খাদ্যব্যবস্থার উন্নতি, শিল্পের প্রসার—বৃটিশদের নিজেদের প্রযোজনে ছাডা সারা ভারতে দেখা দেয় নি। এই সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিক স্বার্থপরতায ও ধ্যানধারণায় পুষ্ট বৃটিশ শাসনে থাকাব কালে বাংলাদেশে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র কবে জীবন-মন গঠিত হয সে সময়েব শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে। যারা শহরবাসী, তারা সেই মনে লালিত ও পুষ্ট এবং ক্রমশ তৃপ্ত হতে থাকে। এটা তাদের মধ্যে যেন জাতিগত বংশগত ঐতিহ্য হযে যায়। আব সেই সঙ্গে যুক্ত হয় একটি শহরের চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত হাজাব হাজার গ্রাম থেকে শহব আগমনেচ্ছু গ্রামীণ মানুষের বাসনা ও প্রযাস। বাঁচাব তাগিদে গ্রামের মানুষ বংশগত ব্যবসা ত্যাগ করে শহরে আসার বাসনা লালন করে, শিক্ষিত ও অল্প-শিক্ষিতরা চাকুরীর জন্য কলকাতামুখী হতে থাকে। হাজার হাজার গ্রাম তখন কলকাতার দিকে তাকিয়ে থাকে। যেখানে শহরে অগনন বেকার, মধ্যবিত্ত সংসারে অর্থ-নৈতিক দুববস্থা ও নিরাপত্তাব অভাব সেই সূত্রে নৈতিকমূল্যবোধে সংশয়, যেখানে যুবমনে নানাদিকের হতাশায় অসহায় ক্ষোভেব স্তূপ, সেখানে গ্রামেব কিছু সচেতন মানুষের কলকাতামুখী হওয়ার মধ্যে শহর জীবনও নানাভাবে পর্যুদস্ত হবার অবস্থায় আসে ক্রমশ।

অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-শেষের পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের আগে—বিশেষ করে ১৯৩০ সালের পর থেকে দেশের সামাজিক অবস্থা এক জটিল রূপ নিতে থাকে। এবং এই জটিলতার মূল কাবণ যেমন ভারতের বুকে কঠিন পাথরের মত বৃটিশ উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ, তেমনি অর্থনৈতিক বাজার মন্দা এবং দেশীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের নানান সমস্যাসংকুল দিক। এসবের প্রত্যেকটি দিকে যুক্ত হয়েছে

চাকুরী-নির্ভর মধ্যবিত্ত মানুষের মানসিকতা। আমাদের আলোচ্য বিষয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাসের বিভিন্ন প্রবণতা। এই প্রবণতাগুলির আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব পর্বে বাংলা কথাসাহিত্যের যে কয়েকটি জটিল দিক, তার সঙ্গেই সূত্রবদ্ধ হয়ে দেখা দেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন কথাসাহিত্য ধারা।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী কালের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্রম-ঘনায়মান প্রকাশ্য ও অন্তঃশীল সংকটের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের উত্তাল পরিবেশ রচনার উপযোগী জাতীয় জীবনের সামগ্রিক মানসশক্তির বীজটিও ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দেশের মানুষের একটি শিক্ষা ও মানস-প্রস্তুতি ছিল পরবর্তী কোন বিশ্বযুদ্ধ সংঘটনের স্বরূপ বোঝার, তার সম্মুখীন হওয়ার। তারা যেমন একদিকে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চাপে রুদ্ধশ্বাস হচ্ছিল, অসহায়তাকে অনিচ্ছায় গ্রহণ করছিল জাতীয় চরিত্রে, তেমনি পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, জাতিকে প্রবল প্রতিরোধের সামনে ঐক্য-বদ্ধ থাকার শিক্ষাও গ্রহণ করছিল। এর পরিচয় পাই তিরিশের দশকের একেবারে শেষ দিকে, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগের তিন-চার বছরের মধ্যেই, যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যেও নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং গঠন করে কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলি। এ সময়ে বুর্জোয়া নেতৃত্বের মধ্যে যেমন আসে কিছুটা শুভ দিক, তেমনি অন্যদিকে সমস্ত আন্দোলনের শক্ত ভিত্তি যে ট্রেড ইউনিয়ন-সক্রিয়তা—তার তীব্রতা। ‘a new up-surge of trade union activity resulting in the strike wave of 1937-38, part of the world strike wave consequent on the temporary capitalist revival due to the armament race.[১২]-দেখা দিয়েছিল—এ মন্তব্য করেছেন ইতিহাসকার। ঠিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সারা ভারতবর্ষে এমন নতুন ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন সক্রিয়তা, সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক-সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এমন বিশাল জাগরণের দিক নিশ্চয়ই পরবর্তীকালের জাতীয় বুদ্ধি-বিবেচনার ও প্রতিরোধ গঠনের শক্তিকে যেমন ত্বরান্বিত করে, তেমনি একটি শক্ত ভিত্তিও দান করে। তা বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের সঙ্গে এই ভারতের সামাজিক শক্তি ও সুস্থতাকে কতটা রূপদানে সহায়ক হয়েছে, আমরা সেই প্রসঙ্গই একটু আলোচনা করতে চাই।

এই ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে ইতিহাসকারের ব্যাখ্যা,—‘The trade union movement spread leading to the formation of several new unions and powerfully influencing even the workers in seasonal

factories and unorganised industries.'[১৩] স্মরণীয়, সে সময়ের কর্মী ও শ্রমিকশ্রেণীর মানুষের মধ্যে মধ্যবিত্ত মানুষ ছিল অনেক। ট্রেড ইউনিয়নের এই যে এমন ব্যাপক বিস্তার, তার আন্দোলনে এই যে সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস, এর মধ্য দিয়ে সামাজিক জীবনের আর একটি দিক গড়ে ওঠে। সে দিকটি হল, পূর্বকথিত সমস্ত অন্তঃশীল হতাশা, অপচয়, অবক্ষয় ও মূল্যবোধহীনতা, অসহায়তাব পাশাপাশি উপনিবেশবাদকে ও সাম্রাজ্যবাদকে ধাক্কা দেওয়ার উপযোগী একটি মানস-গঠন চলছিল। অর্থাৎ সে সময়ের সমাজ-মানসে সমকালের কালচেতনা থেকে গৃহীত ঐক্যভাবনা তাদের এক বিশাল কর্মী ও শ্রমিক-মানুষকে সংঘবদ্ধ হবার প্রেরণা ও রসদের যোগান দিচ্ছিল। এই যোগানের যে প্রতিক্রিয়া তা হচ্ছিল শুধু মানসিক নয়, তা মন-প্রাণের গভীরে আত্মিক। আমাদেব কথা হল, এমন আত্মিক শক্তির সঞ্চয় ছিল বলেই সেই সামাজিক মানুষই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের প্রবল অত্যাচার ও ভয়ের সামনে নির্ভীক হতে পেরেছিল, উপনিবেশবাদের বিষক্রিয়াকে নিশ্চিহ্ন করার শপথ নিতে পেরেছিল, পেবেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম-কালের সমস্ত রকম প্রতিরোধকে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-নৈতিকভাবে ঠেকিয়ে রাখতে।

সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের সমাজের যাবতীয় বাহ্যিক-মানসিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া নানা মানুষ, ঘটনা ও সিদ্ধান্তের 'ক্রশ-কারেণ্ট'-এ এমন একটা রূপাবয়ব গ্রহণ করেছিল, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে পূর্ণতা পায়। এমন পূর্ণতার প্রতিফলন আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের কথাসাহিত্যে—ছোটগল্প ও উপন্যাসে, এমন রূপাবয়বের স্বীকৃতি আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব বাংলা কথাসাহিত্যে। এক কথায়, আমাদেব আলোচনার ন্যায় এই কথাই প্রমাণ করে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী দীর্ঘ একুশ বছরের অর্থনৈতক-রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশ-প্রতিক্রিয়ায় যে বাংলা কথাসাহিত্যের জন্ম, বিশেষ করে একই অর্থে তিরিশের দশকের শেষ নয়টি বছরে সেই কথাসাহিত্য ধারাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর নতুন নতুন বিষয়ে ও প্রবণতায় দীপিত হয়ে ওঠে। যুদ্ধের আগে যে সমস্ত প্রবণতা ছিল কথাসাহিত্য-ধারায়, যুদ্ধের সমকালে সেগুলি এক জটিলতম অবস্থায় আসে। বাংলা কথাসাহিত্যের ধাবায আসে বৈচিত্র্য, আসে অন্তঃশীল জটিলতা, আসে অন্তর্মুখীনতা।

আমাদের বিশ্বাস, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বাংলা কথাসাহিত্য-ধারার দিগন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের প্রতিক্রিয়ায় ও প্রভাবে যেভাবে বিস্তৃত হয়, সেই বিস্তার-মুখ চিহ্নিত কবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের কথাসাহিত্য-ধারার উৎসমুখকে।

কথাসাহিত্য ধারার একটি ধারাচিহ্নিত পর্বের যেখানে শেষ হওয়ার অধ্যায়, সেখানেই আবার পরবর্তী ধারার শুরুর সোপান। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কথাসাহিত্যধারার প্রবণতাগুলির সাধারণ সামগ্রিক একটি পরিচয় দানের চেষ্টা আছে।

পাঁচ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯১৮ সালে। শেষ হওয়ার অব্যবহিত পববর্তী কালগুলি নানান নতুন নতুন সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে থাকে ধীরে ধীরে। সারা বিশ্বের ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত এক কালো ছায়ার আবরণে স্থির হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রধানত ছিল দুই বিবদমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত। এই যুদ্ধ আগ্রাসন সাম্রাজ্যবাদের নিজেরই বীভৎস আত্মার এক দ্বিখণ্ডিত রূপের দ্বন্দ্ব থেকে জাত জটিল ঘটনা। সেই ঘটনাগত সমস্যা কঠিনভাবে আঘাত হানে বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপেই। এমন আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপীয় সাহিত্যধারা সম্পর্কে ইলিয়া এরেনবুর্গের মন্তব্যই যথার্থ,—'The twilight of the west has passed. It was filled with vague shadows that aroused fearfulness and depression. Now the darkness of night has fallen there.'[১৪]

ভারতবর্ষ তখন এক উজ্জ্বল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, তাই যুদ্ধ থেকে দূরে থেকেও যুদ্ধের বীজাণুমুক্ত থাকতে পারেনি। সেই 'fearfulness and depression' এবং 'darkness of night' ভারতীয় সমাজ ও জীবন এবং সমগ্রভাবে মানুষ ও তার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত কববেই। যেহেতু কোন দেশের বিশেষ সময়ের উপযুক্ত বাণীরূপ হল তার সাহিত্য, বিশেষভাবে জীবননিষ্ঠ কথাসাহিত্য, তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সমাজ ও সময়ে রচিত কথাসাহিত্যে যুদ্ধের লক্ষণীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে। কোন দেশেরই লেখকরা সমাজ-বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক থাকতে পারেন না এবং সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে নিছক আত্মকেন্দ্রিকতা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির প্রধানতম অন্তরায়ও বটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারত তথা বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকদের যে অভিজ্ঞতা, তা তাঁদের পরিপার্শ্ব ও পায়ের নীচের মাটি দিয়ে রচিত সমাজ-ভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়েই দেখা দেয়। তাতে সাহিত্য হয় জীবনানুগ, মৃত্তিকাস্পর্শী। সে সাহিত্য লেখকের জীবনবোধের গভীরতায় যত বেশী শিকড় বসাতে পারে, ততই তার মহীরুহের মর্যাদা আকাশমুখী বিশাল হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয়,—'The work of a

novelist is determined by the society in which he lives··· ·what a writer produces is also determined by his biography, his experience, his character.'[১৫]

লেখকের সমাজ-পরিবেশ, জীবনযাপন পদ্ধতি যে প্রেরণা ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকদের মনোভূমিতে, তার প্রকাশ তখন জরুরী ছিল যুবক বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে। ১৯২৪-.৯২৫ সাল থেকে ভারতের মত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন-দমন যেমন তীব্র রূপ পায়, সমাজদেহে তখন হতাশা বাসা নির্মাণের জন্য পাখিদের এক এক করে খড়কুটো আনার মত জমতে থাকে। বারবার হতাশাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ এমন প্রতিকূল অবস্থার প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি-মানুষের আশা-প্রত্যাশার একটি আশ্রয় খুঁজতে থাকে। সেই আশার আশ্রয়স্থলকে যদি পাখির তৈরী একটি পরিণত বাসার সঙ্গে তুলনা করা যায়, দেখা যায়, সে সময়ের বুদ্ধিজীবী মানুষের সে বাসা আর রচিত হয় নি। ব্যক্তি-মানুষের স্বপ্ন ভাঙতে থাকে, বিশ্বাস নড়ে ওঠে, সমস্ত শুভবোধ সংশয়ে মূল্য-নির্ণয়ে কেঁপে ওঠে। শোচনীয় অর্থনৈতিক দুরবস্থার চাপে দারিদ্র্য প্রকট হয়। যে কোন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও সমাজে দারিদ্র্য আসে অর্থনৈতিক বণ্টন-বৈষম্যে ও বিশ্ববাজার মন্দা থেকে। এই দারিদ্র্য যেমন আঘাত হানে সুস্থিত জীবন-ব্যবস্থার মূলে, তেমনি যারা জীবনকে স্বপ্ন দিয়ে গতিপ্রাণ করতে আগ্রহী, যারা আবেগ-উচ্ছ্বাস দিয়ে জীবনের বৃহৎ মূল্যায়ণের জন্য উৎসুক, স্বপ্নকে সত্যে রূপান্তরিত করতে অন্তরে বাহিরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, শপথ গ্রহণে দুর্জয় সাহসী সেইসব যুবপ্রাণে হতোদ্যমের পাথর বসিয়ে দেয়। বাংলাদেশের যুবকরা সে সময়ে এমন অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী নিয়তির মত স্থির ললাটের লিখনেই বেকার জীবনকে তাদের ভাগ্যলিপি ভেবে নেয়। ১৯২৪ সালেই বাংলাদেশে যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব যে পাষাণভার হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ আছে ওই সালেই তদানীন্তন সরকার কর্তৃক 'বেঙ্গল এমপ্লয়মেন্ট এনকয়ারি কমিটি' গঠনের মত সংবাদের মধ্যেই। এর ফলে বাঙালী যুবক-প্রাণের জীবনবোধের সুস্থিত কেন্দ্র থেকে ক্রমাগত সরে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে থাকে।

এমন উৎকেন্দ্রিক জীবন ও মনকে সাহিত্যে-শিল্পে ধরে রাখার জন্যই সে সময়ের কথাসাহিত্যিকরা মিলিত হয়েছিলেন 'কল্লোল' পত্রিকায়। মৌচাকের মধ্যেই কিছু মৌমাছি যেমন বসে যায় স্থিরভাবে, কিছু তার চারপাশে মধুগন্ধে ওড়ে, আবার বেশ কিছু তাকেই কেন্দ্র করে দূরে সরে গিয়ে মৌচাককে প্রদক্ষিণ না করে থাকতে পারে না, তেমনি 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একমাত্র কল্লোলেরই লেখক, আবার

'কল্লোলে'র নীতি-অনুপ্রাণিত লেখক এবং কল্লোলকেই লক্ষ্যে রেখে 'সংহতি', 'প্রগতি', 'কালি কলম,' 'ধূমকেতু' পত্রিকার লেখকরাও দেখা দেন সে সময়ে।

পৃথিবীর সব দেশের মত আমাদের দেশেও সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন আন্দোলন শুরু হয়েছে পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই। রেনেসাঁ-উচ্চকিত উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে বাঙালী মন, মনন ও মনীষার একমাত্র আধার হযেছিল পত্র-পত্রিকাই। দিগ্‌দর্শন (১৮১৮, এপ্রিল)-এর প্রকাশে এর প্রথম পদক্ষেপ। তারপর থেকে মনীষার যে বিপুল বিকাশ, তারই পথরেখা চিহ্নিত হয়ে গেছে সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, সাধনা, সবুজপত্র, সাহিত্য, ভারতী ইত্যাদি পত্রিকাকে একমাত্র ভিত্তি করেই। সুতরাং এক একটি সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজ-শিল্প সংক্রান্ত পত্রিকা সে সময়ে শুধু পত্রিকা মাত্র ছিল না, ছিল গোষ্ঠী, ছিল স্থূল বৃহত্তর তাৎপর্যে এক একটি দেশের এক এক সময়ের সর্বাবয়ব সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক সৌরবলয়—বিবিধ বিচিত্র বোধ বুদ্ধি অনুভূতির এক একটি স্বর্ণময় পাত্র। আর এই সব আধারে আধেয় ছিল সমকালের অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ, হতাশাগ্রস্ত জীবন, যাবতীয় নৈতিক আদর্শে অবিশ্বাসী, সংশয়ক্লিষ্ট বেকার মধ্যবিত্ত মানুষ, আগামী দিনের বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর যুবক মনেব গতিশীল সত্তা। ১৩৩০, বৈশাখ সালে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯২৪ সালে 'কল্লোলে' যে নতুন প্রাণের সমবেত কলধ্বনি, তা প্রতিধ্বনিত হয় সংহতি (১৩৩০, বৈশাখ)[১৬], কালি কলম (১৩৩৩), প্রগতি (১৩৩৪), বিচিত্রা, ধূমকেতু ইত্যাদি একাধিক পত্রিকায। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের এক স্মৃতিচারণে 'কল্লোল' পত্রিকাটি প্রচণ্ড আবেগে দীপ্তিময় ও স্বপ্নময় হযে উঠলেও তাঁর ব্যাখ্যাই আমাদেব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী নয বছরের (১৯২৪-১৯৩৩) কথাসাহিত্যের মূল ভাবনার গতি প্রকৃতি এবং স্বাতন্ত্র্য ও প্রবণতা বোঝার সহায়ক হবে। তাঁর ভাষায়,—'কল্লোল বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।'[১৭]

বর্তমান অধ্যায়ের এই শেষ অংশে আমাদের আলোচনার মূল লক্ষ্য হল, ১৯২৪ সালে 'কল্লোল'-এর প্রকাশকে কেন্দ্র করে দেশের সমকালের বুদ্ধিজীবী-প্রাণের যে বিপ্লব চোখে পড়ে কথাসাহিত্যে, তার মধ্যবর্তী সমস্ত প্রবণতা বা লক্ষণগুলিকে স্পষ্ট করা। কারণ, আমাদের মতে, বংকিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রভাবিত কথাসাহিত্য-ধারায় সেই লক্ষণ বা প্রবণতাগুলির অভিনবত্ব ও স্বাতন্ত্র্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে নতুন এক রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধের করাল মুখব্যাদানে আবার এক জটিলতম অধ্যায়ে অভিনব অভিঘাতের সম্মুখীন হয়। বাংলা কথাসাহিত্যধারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রবল তাড়না ও

অন্তঃশীল তিরস্কারকে সহনশীল করতে না করতেই আবার এক প্রবল ধাক্কার সম্মুখীন হয়। প্রবণতাগুলির স্থিতাবস্থা আসেনি, নতুন অস্থিত অবস্থায় আরও বৈচিত্র্য আনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে। বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকাল অর্থাৎ সমকালের যুদ্ধ-ব্যস্ত চতুর্দিকের চরম আক্রমণে এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাংলা কথাসাহিত্য এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধবিরতির চিহ্নিত সীমাটি পর্যন্ত সেই পরীক্ষার আগুন এক নিয়তি-নির্দিষ্ট ধূলিঝড়ে, রহস্যময় রুদ্ধশ্বাস উত্তাপে স্তম্ভিত করে আমাদের।

'কল্লোল' পত্রিকা এবং তার প্রকাশের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত লেখক সমবেত হয়েছিলেন কথাসাহিত্যের পসরা নিয়ে, তাঁরা মূলত কথাসাহিত্যের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পথরেখাকে কখনো চিহ্নিত, কখনো নির্দিষ্ট, কখনো বা স্পষ্ট ঋজুপথে আলোয় আলোকিত করে গেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল' পত্রিকা সম্পর্কে একটু আগের মন্তব্যের সূত্রকে ধরে তিনটি বিশিষ্ট মনোভঙ্গির প্রসঙ্গ রাখতে পারি এখানে। কল্লোলের লক্ষ্যের মূলে ছিল (১) যৌবনের দৃপ্ত আবেগ, (২) বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য বিদ্রোহ, (৩) পচনশীল সমাজকে উচ্ছেদ। আমাদের বিশ্বাস, এই তিনটি মৌল প্রতিক্রিয়ার শক্ত-ভিত্তিতেই কথাসাহিত্যের অর্থাৎ বাংলা গল্প ও উপন্যাসের বিষয়-বিচিত্রতা ও রীতির স্বাতন্ত্র্য এবং অভিনবত্ব দেখা দিয়েছিল ১৯২৪ সাল থেকেই। মানব চরিত্রের নিয়ম হল, তার হতাশা ও অবসাদ গভীর আলস্য ও লঘু রোমান্টিকতা আনে, তার যাবতীয় অতৃপ্তি-আর্তি অসহায় বেদনা-দুঃখ জাগায়, তার আগামী দিনের স্বপ্ন ও স্বপ্নের মোহ সেই সঙ্গে আবেগ ও সাধনার দিকে তাকে আকর্ষণ করে। এসব থেকে জীবন যদি ছেঁকে আনে নৈরাশ্যকে, তা-ও ক্রমশ শিকড় গাড়তে গাড়তে সমস্ত প্রতিকূলতায় বিদ্রোহ ও বিপ্লবকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এমন সব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা দেয় 'কল্লোল'।

যে প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, নৈরাশ্য, দারিদ্র্য, শূন্যতা থেকে 'কল্লোল' ও তার লেখকরা দেখা দেন, তা-ই জন্ম দেয় বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিকতার। বাংলা কাব্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল প্রমুখ যে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন তথাকথিত রবীন্দ্র-বিরোধিতাকে সম্বল করে, বাংলা কথাসাহিত্যেও কল্লোলের খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে সমকালের যুবক-লেখকরা দুহাতে সেই নব আধুনিকতার পতাকা আন্দোলিত করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রায় একই সময়ে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রেও 'রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছেটা জেগে উঠেছে।'[১৮] 'কল্লোল'-অন্তর্ভুক্ত ও সমসাময়িক কিশোর-যুবক-

কবি-সাহিত্যিকদের 'অগ্রজ সমসাময়িক' মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং নজরুলের ঠিক সেই সময়ের পরিচয় দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন,—'যেন একটা আলো-আঁধারি সময়, যখন নতুনের ঝিলিক দিচ্ছে জানলায়, অথচ ঘরের মধ্যে জড়ো হয়ে আছে পুরানো আসবাবপত্র, ভারি, অনড়, মমতাময় অভ্যাস।'[১৯] কল্লোল পত্রিকার উদ্যোগী লেখককুলের প্রয়াসও বস্তুত এরকম একটা অবস্থাকে সামনে রেখেই যে তৎপর ছিল, এ কথা বললে মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বস্তুত 'কল্লোল' ছিল একটা আন্দোলন—আধুনিকতার আন্দোলন। 'আধুনিকতা' কথাটি আপেক্ষিক। কোন বিশেষ যুগের ও সময়ের চাহিদা, আবেগ, অধিকারকে সর্বাংশে গ্রহণ করে অতীত ও ঐতিহ্যকে সামনে রেখে আগামী দিনে সবল পদবিক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া ও পরবর্তী আরও একাধিক নব আধুনিকতার জন্ম-বীজ রেখে যাওয়ার প্রচ্ছন্ন প্রস্তুতি যেখানে থাকে, তারই সাধারণ তাত্ত্বিক অর্থ হল 'আধুনিকতা'। তাই আধুনিকতা 'আপেক্ষিক' হতে বাধ্য। যে লেখকের দল নিয়ে 'কল্লোল', তাঁদের প্রাথমিক কথা,—'তখন আমরা যারা ও-পত্রিকায় লিখত আমরা সকলেই 'কল্লোলের দল' নামে পরিচিত ছিলুম, এবং আমাদের নিন্দুকরা যতই সংখ্যায় ও তেজে বর্ধিষ্ণু হতে লাগলো, আমাদের আনন্দও ততই যেন উচ্ছল হলো—।'[২০] সে সময়ের কিশোর ও যুবক কবি-সাহিত্যিকদের সব কিছু অবহেলায় অস্বীকার ও উপেক্ষা করার সাহস ও উৎসাহ থেকেই জন্ম নেয় সময়োপযোগী ঝক-ঝকে আধুনিকতা—যে আধুনিকতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই বাংলা কথাসাহিত্যে একটা নিজস্ব আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

যদিও মন্তব্যটি কল্লোলের সময় থেকে শুরু-হওয়া বাংলা ছোটগল্পের আলোচনা প্রসঙ্গেই, তবু এক সমালোচকের এই মন্তব্য সামগ্রিকভাবে 'কল্লোলে'র আধুনিকতার বিশিষ্টতাকেই তুলে ধরে,—'বাংলা ছোটগল্পের যে বিচিত্র দুর্বার স্রোত আধুনিকতার শতমুখী কাটাখালে বইতে শুরু করল, তার যাত্রা ঠিক কল্লোল থেকে আরম্ভ না হলেও, কল্লোল তার গতি খরতর করে দিল। দিল ভৌগোলিক পরিধির বিস্তৃতি ঘটিয়ে। দিল বাহ্যলোক আর অন্তর-মানসের সীমানা বাড়িয়ে।'[২১] কল্লোল পত্রিকার আধুনিকতার অধিকাংশ লক্ষণকে আত্মসাৎ করে কল্লোলের অন্যতম লেখক-প্রতিনিধি প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি পত্রের আংশিক উদ্ধৃতি, আমাদের মনে হয়, কল্লোল-সমসাময়িক লেখকদের মানসিক অবস্থার একটি স্বচ্ছ দর্পণেরই দৃষ্টান্ত দেয়। 'মনে হয়, গাছের যে ডালপালা একদিন দুবাহু মেলে আকাশ আর আলোর জন্য তপস্যা করত, যার লোভ ছিল আকাশের নক্ষত্র, সে ডালপালা আজ যেন কে কেটেকুটে ছারখার করে দিয়েছে। শুধু অন্ধকার।

মাটির জীবন্মৃত গাছের মূলগুলো হাতড়ে-হাতড়ে অন্বেষণ করছে শুধু খাবার মাটি আর কাদা, শুধু বেঁচে থাকা—কেঁচোর মত বেঁচে থাকা।'[২২]

এমন নাভিশ্বাস অবস্থার, পরিবেশের, অস্তিত্বের চরম সংকটের বিরুদ্ধে সবল বিদ্রোহ থেকেই কল্লোলের আধুনিকতা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের সুকোমল সূক্ষ্ম মানবধর্মী আধুনিকতা এবং ইতিপূর্বে আবির্ভূত জগদীশ গুপ্তের রচনার তির্যক আধুনিকতা সমসাময়িককালে ব্যাপক থাকা সত্ত্বেও স্বাদে ও স্বাতন্ত্র্যে কল্লোলের নিজস্ব হয়ে দাঁড়ায়। কল্লোলের আধুনিকতা এক ধরণের 'এক্সপেরিমেণ্ট',—বিষয় ও রীতিকে নতুনভাবে গ্রহণ করে, নতুন নিরীখে একই সঙ্গে আবেগ ও বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেচনার গবেষণাগারের মাধ্যমে উপস্থাপিত করার এক অকপট প্রয়াস। 'কল্লোল'-এর এই প্রয়াস বস্তুত তার রোমাণ্টিক বিদ্রোহিতা। রোমাণ্টিসিজম-এর মূল কথাই হল বদল, বিদ্রোহ। কল্লোল-এর লেখকরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অন্তঃশীল অভিঘাতে জর্জরিত অবস্থায় হয়ে উঠেছেন মনে প্রাণে রোমাণ্টিক—যুদ্ধ-পরবর্তী সমাজ-ন্যায়ে যুবক-মনের নিরীক্ষায় তা-ই সত্য। এই রোমাণ্টিকতা আনে বিদ্রোহ—তা-ও সমাজ-ন্যায়ে যেমন এসেছিল কল্লোল, তেমনি এসেছিল প্রবল রবীন্দ্র-বিরোধিতার কারণে। 'যাকে 'কল্লোল' যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই হল বিদ্রোহ আর সে-বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ। …এই বিদ্রোহে আতিশয্য ছিলো সন্দেহ নেই, কিছু আবিলতাও ছিলো, কিন্তু এর মধ্যে সত্য যেটুকু ছিলো তা উত্তরকালের অঙ্গীকরণের দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেছে।'[২৩]

এমন সব মন্তব্য স্পষ্ট করে 'কল্লোলে'র যৌবনধর্ম, 'কল্লোলে'র স্বভাব-লক্ষণ, এবং যুক্তিসঙ্গতভাবেই প্রমাণ করে, কল্লোলের পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সম্যক সমন্বয়ের পূর্ণতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সমাজ-সমস্যার মূল হিসেবে অর্থনৈতিক মহা-সংকটজাত দারিদ্র্য, বেকারত্ব, সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক মনোবিকাশে স্পষ্ট রবীন্দ্র-বিরোধিতা, 'শুধু অন্ধকার' 'শুধু বেঁচে থাকা—কেঁচোর মত বেঁচে থাকা' থেকে মুক্তির আর্তি, সমসাময়িক কালের পাশ্চাত্য ভাবনা ও দর্শনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া, এক পূর্ণ মানুষ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট সাহিত্যের বিশুদ্ধ হৃদয় ও মনন, কল্পনা, বিশ্ববিস্তারকে সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝে উঠতে না পাবায় অস্বস্তি, অবহেলা থেকে জাত পাঠক মনের 'ভ্যাকুয়াম' সৃষ্টি—এ সবের মধ্যে থেকেই একদা 'কল্লোল' জন্ম নেয় বিশাল বৃক্ষের বিশ্বাস ও বিস্তারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

কল্লোলের এই প্রতিশ্রুতি সাহিত্যে এক নব আধুনিকতা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি। এই 'আধুনিকতা' নবীনতার নামান্তর। কল্লোল ছিল নবীন, আধুনিক। 'কল্লোলে' এবং 'কল্লোল'-প্রাণিত অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় ও লেখক-প্রয়াসে যে সমস্ত গল্প ও

উপন্যাসের জন্ম ঘটে, তাদের মধ্যেকার বেশ কিছু সমান লক্ষণ মিলিয়েই 'কল্লোলে'র আধুনিকতা-লক্ষণ নির্দিষ্ট করা যায়। এ সময়ের ছোটগল্প ও উপন্যাসগুলিতে এমনি চিন্তা-ভাবনার প্রবল 'ক্রস্‌কারেণ্ট' ছিল যে, ঠিক নিখুঁতভাবে ভাগ করে লক্ষণ উল্লেখ অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে আধুনিকতার পক্ষে প্রধান প্রবণতাগুলিকে লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করায় সম্ভবত অসুবিধে হবে না। এবং এই প্রসঙ্গে আবার স্মরণ করি, সে সমস্ত প্রবণতা বা লক্ষণই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে উদ্ভূত পর্বে আলোচিত ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক প্রকাশ্য ও অন্তঃশীল পবিবর্তনকে মেনে নিয়েই দেখা দিয়েছে। 'কল্লোল'-এব লেখা ও লেখকদের মানস প্রবণতা, লক্ষণ ও প্রতায বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন বাংলা কথা সাহিত্যেব পক্ষে উদ্দীপন বিভাবের মত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল' সম্পর্কিত একটি মন্তব্যেব সারমর্ম কবছি কল্লোলীয়দেব আবেগধর্ম, বিদ্রোহ ও গলিত-সমাজ-বিবোধিতা—এই তিনটি প্রতীকী শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে। এবং আমাদের বিশ্বাস, এই তিনটি শব্দসূত্র থেকেই, এদেব প্রতীক-প্রতিম ব্যঞ্জনা থেকেই কল্লোলের সব লক্ষণ সুবোধ্য হবে।

কল্লোলের প্রথম লক্ষণ হল তীব্র রোমান্টিকতা—যা সে সময়ের বাংলা দেশের 'নবীন,' 'কাঁচা,' 'সবুজ.' 'অবুঝ,' 'অশান্ত,' 'প্রমত্ত'[২৪] তরুণ বুদ্ধিজীবীদের স্বভাবেব পক্ষে রক্ত-মাংস-মজ্জা-প্রাণ-আত্মার মত হযে দেখা দিযেছিল। এমন রোমান্টিসিজম-এর জন্ম পরম রমণীয় আলস্যে-বিলাসে নয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী যুবকদের পোড-খাওয়া, ভেঙে-পড়া, হতাশাগ্রস্ত মনের গভীর প্রয়োজনের তাগিদের মধ্যেই নিহিত ছিল। এমন রোমান্টিসিজ্‌ম্‌-এর নাম দেওয়া যায় 'দুঃসাহস'।

কল্লোলের লেখকদের বয়স অল্প। সব কিছু প্রচলিত, বাঁধাবাঁধি নিয়ম শৃঙ্খলাকে তুচ্ছজ্ঞান করার, অস্বীকার করার দুঃসাহস এই বয়সেই থাকে। এই বয়সেই থাকে তীব্র অভিমানবোধ, জীবনের অস্তিত্বে সহজ স্পর্শকাতরতা। 'কল্লোল'-এর লেখকদের এমন মানসিকতা থেকে প্রমাণ হয়ে যায় তাঁরা সবল রোমান্টিক বিদ্রোহিতায় স্থির-বিশ্বাসী ছিলেন। তরুণদের—বিশেষ করে যাঁরা রোমান্টিক, তাঁদের থাকে অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অনন্ত জিজ্ঞাসা। আর এইসব দিয়েই বাংলা কথাসাহিত্যে কল্লোলের লেখকরা পদচারণা করেছিলেন।

কল্লোলের রোমান্টিক লেখকদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং-সম্পাদক গোকুল নাগ, মনীন্দ্রলাল বসু, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। কিন্তু কল্লোলীয়রা স্বভাবে রোমান্টিক হলেও সাহিত্যে

রোমান্টিসিজ্‌ম-এর প্রতিষ্ঠায়, তার মধ্যে অভিনবত্ব সৃষ্টিতে তেমন সফল হন নি। এর স্বপক্ষে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য স্মরণীয়,—'মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসেনি, দেহ বড হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবাস্তব রোমান্টিক প্রেম বাতিল হয় নি, ওই একই রোমান্স শুধু দেহকে আশ্রয় করে খানিকটা অন্যায়ভাবে রূপায়িত হয়েছে।'[২৫] মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি 'মধ্যবিত্তের অবাস্তব রোমান্টিক প্রেম' সম্পর্কে হলেও 'কল্লোল'-এর লেখকদের রোমান্টিক মনের একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা ধরা পড়ে। 'কল্লোল'-এর লেখকদের রোমান্টিকতা রূপ পেয়েছিল নায়ককে ভবঘুরে করে তোলার মধ্যে—যেমন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে' ও 'ইন্দ্রাণী' উপন্যাসের নায়ক, প্রবোধকুমার সান্যালের 'যাযাবর', 'আঁকাবাঁকা', 'প্রিয়বান্ধবী'র নায়ক, গোকুলচন্দ্র নাগের 'পথিক'-এর নায়ক। রোমান্টিসিজ্‌ম-এর আর এক স্বাক্ষর ছিল তীব্র, কৌতূহলী আবেগ-ধর্মিতায়। ভাষার আবেগ ব্যক্ত হয়েছে কাব্যধর্মিতায়, গদ্যের অদ্ভুত গঠনে। রোমান্টিসিজম-এর তৃতীয় সূত্র আছে নর-নারীর দেহ-সম্পর্কের বর্ণনায়, যৌনচিত্রের জীবন্ত রূপায়নে। এমন যৌন সম্পর্ক উপস্থাপনে ও বর্ণনায় দুঃসাহসিকতার পরিচয় নিঃসন্দেহে রোমান্টিক। অচিন্ত্যকুমারের 'প্রাচীর ও প্রান্তরে'-র নায়ক-নায়িকার সম্পর্কচিত্র, প্রবোধকুমার সান্যালের 'আঁকাবাঁকা'র নগ্নদেহ নায়ক-নায়িকা মীনাক্ষী-কংকরের রূপচিত্রণ ইত্যাদিতে তার প্রমাণ মেলে।

'কল্লোল'-এর লেখককুলের দ্বিতীয় লক্ষণ নিঃসন্দেহে রোমান্টিসিজ্‌ম-এর পরিপূরক—রবীন্দ্রবিরোধিতা। এমন চিন্তা-ভাবনার পক্ষে উদ্দীপন বিভাবের কাজ করেছে যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী দেশজ সর্বাবয়ব সমস্যা, তেমনি আছে বিদেশী সাহিত্য ও তার বিপুল পাঠের[২৬] প্রতিক্রিয়া। রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশ্বজনীন মনন কল্পনা সমকালের যুবকদের যেমন একদিক থেকে শিক্ষিত করছিল, অন্যদিকে তেমনি রবীন্দ্র ভাবনায় লালিত ছায়াচ্ছন্নতা থেকে পলায়নে ইন্ধন যুগিয়ে ছিল। এরই প্রবল আকার রবীন্দ্রবিরোধিতা, বিদ্রোহ।

তৃতীয় লক্ষণ, প্রাক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বের উপন্যাস ও ছোটগল্পের কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র ও মূল লক্ষ্যের ব্যাপারে সমাজের নীচের তলার মানুষদের মনুষ্যত্বকে শিল্পের মূল্য দিতে গিয়ে যে স্বাদের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেন কল্লোলের লেখকরা, তা হল বাস্তবতা। কল্লোলের আগে রবীন্দ্রনাথ আদর্শকে সমানভাবে বজায় রেখে যে মননধর্মী বাস্তবতার স্বাদ দিয়েছিলেন সেকালের স্বভাবী পাঠকদের, কল্লোলের লেখককুল এক ধরণের বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তচিত্ততায় উপন্যাস-ছোটগল্পে বাস্তবতাকে শিল্পীত করতে বসে কিন্তু নতুন বাস্তবতার স্বাদ দিতে সক্ষম হন। বিষয় নির্বাচনের বাস্তবতা, বক্তব্যের রূঢ়-

আঘাত, পচনশীল সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাস্তবতা তাঁদের একই সঙ্গে রবীন্দ্র-বিরোধিতা ও স্ব-কাল বিদ্রোহিতাকে স্পষ্ট করে। একসময়ে রবীন্দ্রনাথ এঁদের বাস্তবতাকে কিছুটা ভর্ৎসনা করলেও বস্তুত 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকরা রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতা ও শরৎচন্দ্রীয় সমাজ ও বাস্তব ভাবনা থেকে বেশ কিছুটা অভিনবত্ব দেখিয়েছেন গল্প ও উপন্যাসের বিষয়, পরিবেশ ও প্রতিপাদ্য উপস্থাপনে। এ বিষয়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস-ছোটগল্প সার্থক দৃষ্টান্ত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,—'মাণিকই একমাত্র আধুনিক লেখক যে, কল্লোল 'ডিঙিয়ে' 'বিচিত্রা'য় চলে এসেছে—পটুয়াটোলা ডিঙিয়ে পটলডাঙায়। আসলে সে 'কল্লোলে'রই কুলবর্ধন।'[২৭] বস্তুত সেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁর নিজের সাহিত্য সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন,—'ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল। কোন সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শ দিতে পারি নি কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব খানিকটা মিটিয়েছি নিশ্চয়।'[২৮] প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মিছিল', 'মহানগর', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ' ইত্যাদি গল্প-উপন্যাসে আমাদের মন্তব্যের প্রমাণ মেলে।

চতুর্থ লক্ষণ, সমাজে ও জীবন-যাপনে যা কিছু প্রচলিত, প্রথাসিদ্ধ, প্রাচীন ধারানুগ থেকে এতকাল একটা আদর্শে সুস্থিত হয়েছে, সে সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাবের প্রকাশ। এই প্রকাশের ভিত্তিতে ছিল সমকালীন যুবক বুদ্ধিজীবীদের নাস্তিকতা এবং সন্দেহ-সংশয়ে গড়া মন। যেহেতু এই দুয়ের মিলনরূপই শিল্পে-সাহিত্যে জীবন্ত হয়, তাই কল্লোল-ভাবনার সম্যক প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ বোঝাই যায়, কল্লোল-প্রাণিত লেখকরা বাঁধা-ধরা 'আরাম রমণীয় পথ' থেকে সরে এসেছিলেন। 'কল্লোলের পথ সহজের নয়, স্বকীয়তার পথ। কেন না তার সাধনাই ছিল নবীনতার, অনন্যতার সাধনা। যেমনটি আছে তেমনটিই ঠিক আছে এর প্রচণ্ড অস্বীকৃতি।'[২৯]

পঞ্চম লক্ষণ, বাস্তব সমাজের প্রচলিত ন্যায়-নীতি, ধর্ম, প্রেম-বিশ্বাসের কাঠামোর মূলে আঘাত হানার প্রয়াস সাহিত্যের দিকেও মুখ ফেরায়। এর ফলে সাহিত্যের বিষয়ে বিচিত্রতা সৃষ্টি হয়। বিষয় নির্বাচনে কল্লোলের লেখকরা একেবারে নিম্ন মধ্যবিত্তের মধ্যে নেমে আসেন। শুধু বিত্তে নিম্ন নয়, শ্রেণী ও পেশায় যারা ছিল সাধারণের পক্ষে শিল্প-রসাস্বাদের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের বাইরে, শ্রমিক-কৃষক যাদের সাহিত্যে স্থান অত্যন্ত সীমিত ও নিছক তত্ত্বগত অর্থে ছিল, তারা এল সর্বহারা জনতার প্রতিনিধি হয়ে। কৌলীন্যের মর্যাদা পেলো তারা। কল্লোলের আগে তাদের এমন

দরবারী মর্যাদা শিল্প-সাহিত্যে ছিল না, সামান্য ছিটে-ফোঁটা থাকলেও নগণ্য। এ বিষয়ে কল্লোলের অন্যতম লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মন্তব্যই অকাট্য,—'রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।'৩০ আমরা এর স্বপক্ষের প্রকৃষ্ট উদাহরণ কল্লোল ও কল্লোল-প্রাণিত পত্রিকার লেখকদের অনেকের রচনাতেই পাই। যেমন, 'নিম্নগত মধ্যবিত্তের সংসারে'র অতি রূঢ় বাস্তব অথচ 'নিস্ফল মাথা কোটার' দুঃসহ যন্ত্রণার চিত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরাণী' গল্পটি কল্লোলীয় লেখকদের মানসিকতার এক সার্থক প্রতিনিধি স্থানীয় রচনা। 'মার্চেন্ট অফিসের কেরাণী ছেলেটির বিয়ে হল। সে নীড় বাঁধল যাকে নিয়ে সে মেয়েটি শুধু একটি শ্যামবর্ণ সাধারণ নারীর গৃহস্থের মেয়ে। তারা বাংলার নগণ্য একটি কেরাণী আর কেরাণীর কিশোরী এক বধূ।' এমন বর্ণনার পর লেখক একসময় তাদের সন্তান হওয়ার খবর দেন, সেই সঙ্গে দেন সন্তান জন্মের পর স্ত্রীর দুরারোগ্য স্থতিকারোগের খবর। এই অবস্থায়—'তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার জন্য প্রাণ আকুল হয়ে উঠলেও ছেলেটি হেঁটে আসে—ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে ফুলের মালা কেনবার জন্য নয়,—অসুখের খরচ যোগাতে।' তার সেই অভিযোগহীন, মূক দারিদ্র্যের শেষ চিত্রটি—'সেদিন জ্ঞান হারাবার আগে মেয়েটি একটিবারের জন্যে এতদিনকার মিথ্যা করুণ ছলনা ভেঙে কেঁদে ফেলে বলল, 'আমি মরতে চাইনি—ভগবানের কাছে যতদিন কেঁদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি, কিন্তু——'।

অর্থের বণ্টন বৈষম্য মধ্যবিত্ত জীবনকে কেমন অসহায় করে, কয়লাকুঠির শ্রমিকদের জীবনযাপনে কত কষ্ট ও সহিষ্ণুতা, বাস্তব জীবনে কি দুঃসহ যন্ত্রণা, প্রতিদিনের সংসারে স্বামীর পাশে স্ত্রীর প্রথাবদ্ধ সংস্কারকে মেনে নিয়ে বাস করার বদলে প্রতিবাদী কণ্ঠ—এ সবের পরিচয় আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের সাহিত্যে। লেখকদের মধ্যে কেউ সমস্যা এনেছেন বড় সমাজের প্রেক্ষিতে—যেমন, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', শৈলজানন্দের কয়লা কুঠির গল্প' তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামন্ততন্ত্রের ভাঙনের প্রতিরূপ আঁকা উপন্যাস 'কালিন্দী', গল্প 'জলসাঘর' ইত্যাদি। সমাজকে বাদ দিয়ে একান্তভাবে ব্যক্তিক সমস্যার প্রতিচিত্রণেও কল্লোলের লেখকরা বেশী তৎপর হতে সচেষ্ট হয়েছেন। এমন ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন ও প্রতিক্রিয়া সমাজকেই অস্বীকার করেছে, সমাজের বাঁধা নিয়মের প্রতিস্পর্ধী হয়েছে। যেমন, প্রবোধ কুমার সান্যালের 'স্বর্ণ' গল্পের স্বর্ণ চরিত্র, মনীন্দ্রলাল বসুর 'শুভা' উপন্যাসের 'শুভা'। 'স্বর্ণ' গল্পে লেখক লিখেছেন :

'আমি বললুম, তবে তুমি এ বৈধব্যের সাজা নিয়েছ কেন ?

স্বর্ণ হাসলো। বললে, আমার শরীরের উপর দিয়ে একজন পুরুষের অস্তিত্ব দিনরাত ঘোষণা করতে থাকবে—এ দাসীত্বই বা কেন ?'
গল্পের অন্যত্র স্বর্ণ গাঙাবৌকে বলেছে: 'অভ্যস্ত নীতি-বুদ্ধির সংস্কার ত্যাগ করো, দেখবে কোথাও আর বিরোধ নেই।'[৩১]

উপন্যাস-শিল্পের বিচারে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'শুভা' নিশ্চয়ই সার্থক উপন্যাস নয়, কিন্তু উপন্যাসের বিষয়ে শুভা চরিত্রের মাধ্যমে যে কথা লেখক বলেছেন, তা এক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার কথা এবং তা প্রচলিত সমাজের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেই। ঘরের বধূ শুভা স্বামীর সংসার ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে এসে এক সময়ে ফিরে যাওয়াব বিরুদ্ধে বলে, 'বেশ্যাবৃত্তিতে এত ভয়ের কথা কি? অন্য উপায়ে যদি জীবিকা অর্জন না হয় তবে শরীর বেচিয়া থাইলে এমন কি অপরাধ। তবু তো স্বাধীন হইব।'[৩২] এই সমস্ত চিন্তার মূলে বিদেশী সাহিত্য পাঠের যে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট তা মানতেই হয়। কিন্তু কেবল বিদেশী সাহিত্য পাঠেই এমন সব প্রথাবদ্ধ ন্যায়-নীতি-বিধ্বংসী চিন্তা-ভাবনা দেখা দিয়েছে, তা বলা ঠিক হবে না। এ সবের মূলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সমাজের অন্তঃশীল ভাঙন, সংসার জীবনের উৎকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা, একটি বিশৃঙ্খল মানসিকতা—যা ক্রমাগত হতাশা, দারিদ্র্য, অসহায়তা, নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য, অনিশ্চয়তারই জন্ম দেয়—কতকাংশে তা-ও ক্রমশ সক্রিয় থেকেছে। দেশীয় সার্বিক অব্যবস্থার মধ্যে বিদেশী সাহিত্য-পঠনজাত ভাবধারা ইন্ধন দিয়ে এমন সব সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের তথা সামগ্রিক আদর্শহীনতাকে লালন করেছে।

বিষয়ের সঙ্গে সমন্বিত পরিবেশ গ্রহণেও কল্লোলের লেখকরা কথাসাহিত্যের চলাচলকে ব্যাপক রূপ দিয়েছেন। এই ব্যাপকতা নগরজীবন-অংকনে ও নগর ভাবনাকে নিখুঁত অংকনের মাধ্যমে যেমন ধরা পড়ে, তেমনি পল্লীকেন্দ্রিক বাংলাদেশের গ্রাম্য ও গ্রামীণ জীবন-রূপায়নেও প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র (পাঁক, উপনয়ন, মিছিল), বুদ্ধদেব বসু (সাড়া, যেদিন ফুটলো কমল), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (কাক জ্যোৎস্না), গোকুল চন্দ্র নাগ (পথিক), প্রবোধ কুমার সান্যাল (প্রিয়বান্ধবী, যাযাবর, নবীন যুবক) প্রমুখ যেমন বিশাল বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা কম থাকায় বহু ক্ষেত্রে নগর জীবনকেই কথাসাহিত্যের অন্যতম পটভূমি করেছেন, সেই সঙ্গে কলকাতা-কেন্দ্রিক জীবন চিত্রণে একেবারে নাগরিক বৈশিষ্ট্যে চরিত্র ও বক্তব্যকে ওতপ্রোত করেছেন। তেমনি বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (পথের পাঁচালী, অপরাজিত, দৃষ্টিপ্রদীপ, আরণ্যক), তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (রাইকমল, ধাত্রীদেবতা) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নানাভাবে পল্লীজীবন ও শহর-বিচ্ছিন্ন বিচিত্র অরণ্য ইত্যাদির জীবনকে কথাসাহিত্যের

পরিবেশে ব্যাপক রূপ দিয়েছেন। বিভিন্ন পেশা-নেশার মানুষজন, নতুন নতুন পরিবেশ, শহরে জীবনের নানান উপসর্গ ও উপজাত দিককে উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিষয়ে গ্রহণ করে কল্লোলের সময়কালের লেখকরা বাংলা কথাসাহিত্যের অনেক মুখ খুলে দিয়েছেন— এটা কম গৌরবের কথা নয়।

ষষ্ঠ লক্ষণ, সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং জটিল অতি আধুনিক মনস্তত্ত্ব-সম্মত ব্যক্তিমনের গভীর গহন লোকের রহস্য উন্মোচন-প্রয়াস কল্লোল-সমসাময়িক লেখকদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। আগেই বলেছি, প্রথম মহাযুদ্ধ শুরুর আগের 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' থেকে যে সমবেত চেতনার উৎসাহ আবেগ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, আন্দোলন শেষ হয় সেই উৎসাহে ভাঁটা পড়ার মধ্য দিয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও অব্যবহিত পরবর্তী-কালের কয়েকটি আন্দোলনও এমনভাবে যুবকপ্রাণে হতাশা, অনিশ্চয়তা এনে দেয়। আমাদের বিশ্বাস, এমন গণ-আন্দোলনের গভীর হতাশা থেকেই সচেতন বুদ্ধিজীবী যুবকপ্রাণ অন্তত সেই সময়ে ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হতে থাকে। আত্মকেন্দ্রিকতার প্রতিষ্ঠা ঘটে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে, নির্বিশেষ গণচেতনা তার প্রতিস্পর্ধী। কল্লোলের লেখকদের চিন্তা চেতনায় ও কথাসাহিত্যে যে ব্যক্তির সম্বর্ধনা, যে ব্যক্তিত্বের শিল্পবেদী রচনাব প্রয়াস, তার মূল এই যুগের স্বভাবেই নিহিত ছিল। যেহেতু এক ধবণেব ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা লালিত হয় যুবক প্রাণের স্বভাবে, তাই আত্মলীন হতাশা, নিঃসঙ্গতা থেকেই আত্মরোমন্থনের মত মনের গভীরে ডুব দেবার চেষ্টা দেখা যায় সমকালের কথাসাহিত্যেব চরিত্রগুলির মধ্যে--বিশেষ করে নায়ক নায়িকার মনে। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন 'আঁতের কথা বের করে দেখানো।'[৩৩] বংকিমচন্দ্রের রোহিনী, রজনী ইত্যাদি চরিত্রে যার সূচনা, রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীর চবিত্রে যার দীপ্ত-আধুনিকতায় বোধন ও বিস্তার, কল্লোলের লেখকরা তাকেই আরো জটিলতায় বাঁধেন। তাই সঙ্গত কারণেই টানা লম্বা কাহিনীর বদলে এক একটি ঘটনায় উচ্চকিত পরিবেশে কথাসাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নিয়েই উঠে এসেছে স্বভাবী পাঠকদের সামনে। প্লটের ক্ষেত্রে গল্প বলার বল্গা টেনে ধরার গূঢ় কারণের মধ্যে কিশোর তরুণ সাহিত্যিকদের নিজেকে নিয়ে নিঃসঙ্গ থাকার প্রয়াস অস্বীকার করা যায় না। কল্লোলের লেখকরা ছিলেন প্রায়শই শহরকেন্দ্রিক। যদিও বিষয়ে বৈচিত্র্য এনেছেন তাঁরা, কিন্তু যতটা না প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রে, তার থেকেও বেশী বিদেশী সাহিত্য পঠন ও দেশীয় নিজ পরিবেশের বিচিত্রতায় তা স্পষ্ট হয়েছে। এ ক্ষেত্রে চরিত্রের মনের গভীরে ডুব দেওয়ার ব্যাপারটি কল্লোলের লেখকদের নিজ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিচরণ করে চরিত্র অংকন প্রয়াস কিনা সে সংশয় থেকেই যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে রচিত ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'রিয়ালিস্ট', 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' উপন্যাসগুলিতে যে চেতনা

প্রবাহের (sream of consciousness) পরিচয়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখের নায়কদের কাব্যিক সুষমামণ্ডিত চিন্তা-ভাবনার মধ্যে যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মানসভূমির উন্মোচন—তা যেমন যুগের উপহার, তেমনি বাংলা কথা-সাহিত্য ধারায় নতুন একটি প্রবণতা সৃষ্টির পরিচায়কও বটে ।

শেষ লক্ষণটি হল, কল্লোলের লেখকদের রচনারীতি ও গদ্য এবং ভাষা বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও বিরোধী মনোভঙ্গির স্বাক্ষর রাখার সার্থক প্রয়াস। নিঃসন্দেহে কল্লোলের লেখকরা বংকিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র অনুসৃত কথাসাহিত্য শাখার রচনাভঙ্গি, গদ্যরীতি ও ভাষাদর্শে স্বাতন্ত্র্য আনতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, পুরনো পাত্রে নতুন মদ পরিবেশন ও পান বাস্তবিকই বেমানান। তাই কল্লোল-সমসাময়িক-কালের লেখকদের স্বকাল-বিরোধিতা হয়ে উঠেছিল অবধারিত, এবং তা-ও ভঙ্গিতে স্পষ্ট বিরোধিতার মত।' "কল্লোল"-কে নিয়ে যে প্রবল প্রণোচ্ছাস এসেছিল তা শুধু ভাবের ঢেউলে নয়, ভাষারও নাচ মন্দিরে। অর্থাৎ "কল্লোলের" বিরুদ্ধতা শুধু বিষযের ক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রে। ভঙ্গি ও আঙ্গিকের চেহারায়। রীতি ও পদ্ধতির প্রকৃতিতে। ভাষাকে গতি ও ভাবকে দ্যুতি দেবাব জন্যে ছিল শব্দ সৃজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রচনাশৈলীর বিচিত্রতা। এমন কি, বানানের সংস্করণ।'[৩৪] এই সময়ের লেখকরা নায়িকাব বর্ণনায় গতানুগতিকতা বর্জন করেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'ইন্দ্রাণী' উপন্যাসে তার প্রমাণ আছে। নরনারীর দেহ-সম্পর্ক বর্ণনায়, যৌনতাকে বাস্তবতা দেওয়ার বাসনায় এঁরা নতুন শব্দ ও গদ্যভঙ্গি অবলম্বন কবেছেন। প্রবোধ কুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের একাধিক উপন্যাস ও গল্প এই বক্তব্যের প্রমাণ বহন করে। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য—উপন্যাস ও ছোটগল্পে কাব্যময়তার প্রয়োগ ছিল নানাভাবে, কল্লোলের লেখকদের উপন্যাস ও গল্পে যে কাব্যময়তা, তা বিদেশী গদ্যরীতির যেমন অনুবর্তন, তেমনি রোমান্টিক বিলাসের ঔজ্জ্বল্যে নয়, প্রতিস্পর্ধী নব কাব্যস্রোতের স্বাদ দানের জন্যই কল্লোলের লেখকরা রীতিতে কাব্য-ময়তাকে গ্রহণ করেছেন। এমন কাব্যময়তা কিন্তু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যাযের রচনায় ছিল না। পাশাপাশি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিক নিরাসক্ত রীতি-সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে কল্লোলের নব-আঙ্গিক প্রচারের প্রবণতায় একাধিক 'ক্রস্‌কারেন্ট' সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ কল্লোল-অনুবর্তী লেখকদের মধ্যেই যেমন ভাবে ছিল স্ব-বিরোধিতা, তেমনি ভঙ্গিতেও তা গাঢ়প্রোথিত। এই লক্ষণও প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের ফল। যেভাবে হোক প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে মুক্তি, তার বিরোধিতা—এই রকম বেপরোয়া মনোভাব ছিল কল্লোল গোষ্ঠির লেখকদের। যেখানে চারপাশে অনড় পাথর, তাকে সরাবার জন্যে এমন

মনোভঙ্গিই যে অনেক সময় অত্যন্ত জরুরী ও কার্যকরী হয়ে ওঠে, কল্লোলের লেখকরা তার প্রমাণ রেখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে রচিত তাঁদের কথাসাহিত্যে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে 'কল্লোল'-এর আবির্ভাবকাল থেকে পরবর্তী পনেরো-ষোলো বছর, অর্থাৎ ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৩৯ এর সময়-সীমায় কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরা কখনো বিক্ষিপ্তভাবে, কখনো সবল সচেতনায়, আবার কখনো বা অচেতন স্বতঃস্ফূর্ততায় যে নতুন কথাসাহিত্যধারা প্রবর্তন করেছেন, তার বিস্তারিত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আমাদের আদৌ উদ্দেশ্য নয়, পরবর্তী আলোচনায় প্রসঙ্গত এসেছে মাত্র। আমাদের লক্ষ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) হওয়ার প্রথম দিকে প্রথম দু'-বছর (১৯৩৯-১৯৪১) এবং যুদ্ধের মধ্যাহ্নকাল (১৯৪১, নভেম্বর) থেকে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সময়সীমা—এই দুইভাগে যথাক্রমে পরোক্ষভাবে ও প্রত্যক্ষত বাংলা কথাসাহিত্য-ধারায় যুদ্ধের আঘাত-অভিঘাতে যে অত্যদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে, যে সমাজ জীবন ও নৈতিক আদর্শের বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে সেই বিপর্যস্ত রূপের অগ্নিপরীক্ষা শুরু হয়ে যায়, তার আলোচনায় কল্লোল গোষ্ঠীর নতুন ধারা প্রবর্তনার স্বরূপ ব্যখ্যার প্রয়োজন নিঃসন্দেহে।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

১ 'Novel writing in Bengali must have received an impetus from social reformers, or rather from the impulse of social reform'. (Western Influence in Bengali Literature Priyaranjan sen Ch-VII, p 220-221)

২ The Novel and The People (1954) Ralph Fox Ch IV. 'The Novel and Reality', p 80

৩ Preface 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৫) by Tek Chand Thackoor.

৪ Modern World Fiction (1951) Brewster and Burrel p 10

৫ Ibid p 15

৬ উপন্যাসে জীবন ও শিল্প (১৩৮৪) ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার পৃ ৩

৭ ঐ পৃ ৩-৪

৮ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নরহরি কবিরাজ চতুর্থ অধ্যায় 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের জাতীয় আন্দোলন পৃ ২১৫

৯ ঐ দ্বাদশ অধ্যায় 'সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন' পৃ ১৯৩

১০ 'কালান্তর' গ্রন্থ (১৩৪৪) 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধ (কার্তিক, ১৩২৮) পৃ ১৯৮

১১ ঐ 'স্বরাজ সাধন' প্রবন্ধ (আশ্বিন, ১৩৩২) পৃ ২৮৫

১২ India Today (June, 1979) R. Palme Dutt Ch XII.7. 'Pre-war Upsurge.' p 427

১৩ Ibid p 427

১৪ The Writer and His Craft (1954, April) Iscus Quaterly Publication p 5.

১৫ Ibid Ilia Eherenburg p 10

১৬ 'আজকের দিনে অনেকেই হয়ত জানেন না, সেই সংহতি-ই বাংলাদেশে শ্রমজীবীদের অন্যতম মুখপত্র, প্রথমতম মাসিক পত্রিকা। এই ক্ষীণকায় স্বল্পায়ু কাগজটিই গণ-জয়যাত্রায় প্রথম মশালদার।' কল্লোল যুগ (আষাঢ়, ১৩৫৮) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত চতুর্থ পরিচ্ছেদ পৃ ৩১

১৭ ঐ পৃ ৩০

১৮ কালের পুতুল (জানুয়ারী, ১৯৫৯) প্রবন্ধ : 'যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত' বুদ্ধদেব বসু পৃ ১৩২

১৯ ঐ পৃ ১৩২

২০ ঐ প্রবন্ধ : 'কল্লোল ও দীনেশরঞ্জন দাশ' পৃ ২২

২১ প্রবন্ধ : 'বাংলা ছোটগল্প (১৯২৬—৫০)' গৌরকিশোর ঘোষ দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬৪ পৃ ১৯৭

২২ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লিখিত পত্র কল্লোল যুগ' পৃ ২২

২৩ সাহিত্যচর্চা (১৩৬১ বৈশাখ) প্রবন্ধ : 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক' বুদ্ধদেব বসু পৃ ১৪৭

২৪ 'সবুজের অভিযান' কবিতা বলাকা কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ১

২৫ লেখকের কথা (১৯৫৭) প্রবন্ধ : 'সাহিত্য করার আগে' পৃ ৩০

২৬ 'জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি শ্যামসুন গোর্কির পাঠশালায় গিয়ে থাকি তাতে দোষ কি' প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কালি কলম' পত্রিকা, ১৩৩৩ (লেখকের প্রেরিত চিঠির অংশ)

২৭ কল্লোল যুগ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত পৃ ৫২

২৮ লেখকের কথা (১৯৫৭) প্রবন্ধ : 'সাহিত্য করার আগে' মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ৩১

২৯ কল্লোলযুগ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অষ্টম পরিচ্ছেদ পৃ ৮২

৩০ ঐ পৃ ৮৩

৩১ 'স্বর্ণ' (গল্প) প্রবোধ কুমার সান্যাল পৃ ৭২

৩২ শুভা (উপন্যাস) নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত পৃ ২৭

৩৩ 'চোখের বালি'র ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ ৩

৩৪ কল্লোলযুগ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অষ্টম পরিচ্ছেদ পৃ ৮২

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন পশ্চাৎপট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯। আমরা আগের অধ্যায়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে তার গতি-প্রকৃতি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত ওই ধারাটির একটি অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বলেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা তারই আর একটি জটিলতম ক্রম-সূত্র। বর্তমান অধ্যায়ের প্রথমেই সংক্ষিপ্তভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভের রূপ এবং বিস্তারের বিশ্বজনীন স্বভাব-বৈশিষ্ট্য আলোচনায় রাখছি। কারণ, আমরা দেখবো, এই যুদ্ধের ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক বিশ্বজনীন গতি-প্রকৃতির মধ্যেই ভারতের যুদ্ধ-সমকালীন অবস্থার একটি 'ক্লাইম্যাক্স' রূপ তৈরী হয়েছে এবং তা পরিণত রূপেই ইতিহাসের দলিল হয়েছে। মূল আলোচ্য নির্দিষ্ট ছয়টি বছর কেবল যুদ্ধ-ইতিহাসের ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক পৃষ্ঠাগুলিকেই সমৃদ্ধ করেনি, ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক, সেই সঙ্গে অবধারিতভাবে সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক জগতকেও এক ভয়াবহ অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে টেনে এনেছে, যার ফল পরবর্তী দশকগুলিতেও ভারতের জনগণ সর্বদিক থেকে নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ। কিন্তু তুলনায় তা অনেক বেশী ভয়াবহ। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আকস্মিক আরম্ভ হয়নি, এর পিছনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী একুশ বছরের নানান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে বিধৃত রাজনৈতিক ঘটনা, সন্ধি, মীমাংসা ইত্যাদির তথ্য ও তত্ত্ব নিহিত আছে। বিশ্বরাজনীতির প্রধান কেন্দ্রবিন্দুটি ছিল প্রধানত এবং একমাত্র ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় লালিত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠীগুলির সম্পর্কের মধ্যে। এই সম্পর্ক ক্রমশ স্ব-স্ব-স্বার্থে সংঘর্ষে নামে। প্রথমে তৈরী হয় দুই বিবদমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভব এই সংঘর্ষ থেকেই। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে পরিবেশ তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যের কারণ সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের সুবিশাল উদ্ভব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন বিবদমান দুই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এবং তৃতীয় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন—এই তিন প্রবল শক্তি বিশ্বের মানুষের সামনে

বিরাজ করলেও এদের ভিত্তিতে সমস্ত রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের একটি বড অংশ যুদ্ধ-লিপ্ত হতে উদ্যোগী হয়ে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের শিক্ষা এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের নতুন সমাজতন্ত্রের ভাষ্যই একত্র সমন্বিত তখন। এর ফলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রমিক সচেতনতা সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে কিছু ঐক্যবদ্ধ হবার শিক্ষা দিতে শুরু করেছে। এবং, যেমন সর্বশ্রেণীর শ্রমিকদের শ্রমের দানেই দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে একটি গঠমান ও সভ্য সমাজেব পরিপুষ্টি ঘটে, তেমনি শ্রমিকদেব শ্রমেই যুদ্ধের রসদের ভাণ্ডাব পূর্ণ করা হয়। তাই এর যুদ্ধের রসদের ভাণ্ডারই নিয়ন্ত্রণ কবে যুদ্ধকে।

সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথম মহাযুদ্ধে কিছুটা শিক্ষিত মানুষ যেমন সচেতন হয়, তেমনি সচেতন হয় শ্রমিক সংগঠনগুলিও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে পরিবেশ, তা শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে ওতপ্রোত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব সময় (১) সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠীগুলির মধ্যে আত্মদ্বন্দ্ব প্রবলতম, (২) সমাজতান্ত্রিক বাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রভাব সারা বিশ্বের রাজনীতিতে নানাভাবে অভিনন্দিত, অথচ এ বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী শংকিতও, এবং (৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিশেষভাবে আহত বিশ্বঅর্থনীতিব সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষগুলির অনেকাংশে ঐক্যবদ্ধ হবার গোপন বাসনা তীব্র।

আমরা লক্ষ্য করেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় ও পরেও বিশ্ব-রাজনীতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর কেন্দ্রে আর নেই। না থাকলেও তাদের মধ্যেকার বিবাদ সমানভাবে বর্তমান এবং তা তাদের প্রত্যেককেই ক্রমশ হীনবল ও হতবল করে তুলেছে। এরই সঙ্গে প্রবল আঘাত করার মত ঘটনা ঘটেছে সমাজতান্ত্রিক বাষ্ট্রের উদ্ভবে। একদিকে ধনতন্ত্রের বিশাল প্রাসাদে ঘুণ ধরতে শুরু করেছে—যা দুরারোগ্য, অন্যদিকে এমন ধনতন্ত্রকে যথোচিত আঘাত হানার ক্ষমতা নিয়ে দেখা দিয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নের শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। সমগ্র বিশ্বের ভূমিতে ·যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রনায়কদের মূঢ়তা, অবিবেকী চিন্তা-চেতনা, স্বার্থপরতা ও অহংসর্বস্বতার ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দেবার মত দেখা দিয়েছে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ আত্মসচেতনতা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশ অত্যন্ত জটিল, কিন্তু বিশ্ব-রাজনীতিকে সামগ্রিকভাবে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সহায়ক। ১৯১৯ সালের ২৮শে জুলাই তারিখের ভার্সাই চুক্তি এবং পরবর্তী একাধিক চুক্তি ও মীমাংসার সূত্রগুলি যে স্বতঃস্ফূর্ত নয়, একধরণের হুকুমনামা (dictation) ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত একটি বিশাল দায়িত্বজ্ঞানহীন ঘটনার মধ্যে বিশ্বকে নিয়ে আসায় তা

প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মূলত ক্ষমতালোভী, অহমিকাসর্বস্ব অবিবেকী বিশ্ব-রাষ্ট্রনায়কদের মুখোশ উন্মোচিত করে আসল রূপটি যে স্পষ্ট করেছে, তা-ও প্রমাণ করে। ক্রমাগত একাধিক চুক্তি যে ছলনা, প্রহসন, স্বার্থান্বেষী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলির আরও বড় ক্ষমতা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবার মত সুনির্দিষ্ট কৌশলমাত্র—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবতারণায় সেদিকটিও প্রমাণিত হয়ে যায়।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রায় দু'বছর পরে, মৃত্যুর কিছু আগে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাষায় ইউরোপীয় যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রনায়কদের চরিত্রকে ইঙ্গিত করে বলে ওঠেন,—'সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কি রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানব পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।'[১] তথনকার 'পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর' ছিল কঠিন মদগর্বী ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অসুস্থ, অস্বাভাবিক উপাদান। এইভাবে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সূত্রে বিবাদ ও পরস্পরের মধ্যে অস্ত্র-সংঘাত, আর একদিকে নব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবে সংশয়, সন্দেহ এবং ভীতি—এই দোটানায় আরম্ভ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

হিটলারের নেতৃত্বাধীন ফ্যাসীবাদী জার্মানী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। বিখ্যাত ঐতিহাসিকের মতে,—'যদিও ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে জার্মানী হাতে-কলমে যুদ্ধ আরম্ভ করিল, প্রকৃতপক্ষে উহার আয়োজন চলিতেছিল অনেকদিন আগে হইতেই। ইউরোপে জার্মান 'মিলিটারিজম' বা সামরিকবাদ দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছিল।'[২] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বস্তুত দীর্ঘ-আচরিত জার্মান 'সামরিকবাদে'র তথা জার্মান ফ্যাসিবাদের উৎকট আত্মপ্রকাশ। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভোরে হিটলারের সেনাবাহিনী স্বাধীন পোলাণ্ডের সীমা অতিক্রম করে, পোলাণ্ড আক্রমণ করে অকস্মাৎ। ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে যুদ্ধ শুরু করে। 'ইউরোপে নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল।'[৩]

জার্মান আক্রমণ করার কথা ব্রিটেনের ছিল না। 'ভার্সাই ব্যবস্থা ও উদীয়মান ফ্যাসিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে বিরোধ চরমে উঠল। প্রথম দিকে মৌল বিরোধের দিকে নজর রেখে, সোভিয়েত-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলি (ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা) জার্মানীকে তোষণ করার নীতি (মিউনিক চুক্তি যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ) অনুসরণ করে।'[৪] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলোচনায়, টীকা-ভাষ্যে একথাই প্রমাণ হয়, ১৯৩৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর যে মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বৃটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ও জার্মানীর হের হিটলারের সঙ্গে—তার মধ্যে বিরাট ফাঁক ও

ফাঁকি ছিল। তা ছিল প্রহসনের মত। যাঁরা মিউনিক চুক্তির মধ্যে গভীর শান্তির ললিত বাণী শুনে উৎসুক ও উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন, 'সেই উৎসুক জনতা জানিত না যে, সেই স্বাক্ষরিত কাগজের টুকরা শীঘ্রই ঝটিকাঘাতে দিগন্তে উড়িয়া যাইবে। ইউরোপের বিগত ১০০ বছরের ইতিহাসে মিউনিক চুক্তির মত এত বড় কলংকিত চুক্তি আর কখনও স্বাক্ষরিত হয় নাই। কারণ, এই চুক্তির দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়ার মত একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রকেই শুধু হিটলারী জার্মানীর নিকট বলি দেওয়া হইল না, চেক গভর্ণমেণ্ট ও জনগণের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করা হইল।'[৫]

মিউনিক চুক্তির বিশ্বাস ভাঙে প্রথম জার্মানী, আর তাকে বাধা দিতে এগিয়ে আসে প্রথম বৃটেন, কারণ জার্মানী ও বৃটেন—দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যেকার সংঘর্ষ তখন তুঙ্গে উপনীত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু তাই হয়েছে অবারিত, স্বতঃস্ফূর্ত। একদল আক্রমণকারী, আর একদল আক্রান্ত—এই দুই গোষ্ঠী থেকে রচিত হল দুই শিবির। একদিকে ফ্যাসিবাদের নোংরা থাবা, আর একদিকে সবল উত্তোলিত সমবেত হাতে মুক্তি-যোদ্ধার পতাকা। লক্ষণীয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদ যত বেশী আগ্রাসী শক্তি নিয়ে এগিয়েছে, বিভিন্ন আক্রান্ত দেশের মুক্তিপিপাসা ততই তীব্র হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শিক্ষা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শোষিত রাষ্ট্র ও জনগণকে কিছুটা সচেতনতা ও শক্তি দিয়েছে নিঃসন্দেহে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু থেকে পরবর্তী ছ'বৎসরের প্রবাহও অত্যন্ত জটিল। এই জটিলতার অন্যতম কারণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব। ২২শে জুন, ১৯৪১ সালে হের হিটলার কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণের ঘটনায় সেই যুদ্ধ-প্রবাহের জটিলতা জনগণকে যেমন বিস্মিত করে, তেমনি বিশ্বযুদ্ধের শোষিত জনগণের মুক্তিযুদ্ধ আখ্যা-উপযোগী পরিবেশও তৈরী হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ২৩শে আগষ্ট ১৯৩৯ সালে দশ বছরের জন্য রাশিয়া হিটলারের সঙ্গে এক অনাক্রমণ চুক্তি করে বসে অকস্মাৎ। এই চুক্তির রহস্য বিহ্বল, স্তম্ভিত জনগণ বুঝতে পারে নি। কারণ ফ্যাসিবাদ যেখানে কমিউনিজ্‌ম-এর জন্ম থেকেই চরমতম শত্রু সেখানে এমন চুক্তি বাস্তবিকই গভীর-জটিল রহস্যকেই তুলে ধরে। এই অনাক্রমণ চুক্তি বজায় থাকে ২২শে জুন, ১৯৪১-এর পূর্ব পর্যন্ত।

জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণ যুদ্ধের স্রোতকে লক্ষণীয়ভাবে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে ওঠে ফ্যাসিবিরোধী ন্যায়যুদ্ধ। একদিকে বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হল, অন্যদিকে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র জার্মানী ইতালী ও তার সঙ্গীরা। রাশিয়ার সঙ্গে বৃটেন ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর একজোট হওয়ার কারণ ফ্যাসিবাদের দুর্বার

দুর্মদ আক্রমণের কাছে নিজেদের আত্মরক্ষার প্রয়াস। এবং এই আত্মরক্ষার প্রয়াসে তারা তাদের দ্বিমুখী উদ্দেশ্যকে গভীরে-গোপনে সিদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়। একদিকে জার্মানীকে সম্পূর্ণ দমন, অন্যদিকে, যদিও সোভিয়েট রাশিয়া তাদের মিত্রগোষ্ঠী, তবু তার নবোদ্ভূত সমাজতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার প্রচার-প্রসারকে দমিত করে তাকে দুর্বল করা। এই সূত্রেই বৃটেন-ফ্রান্স-আমেরিকা গোষ্ঠীর মত সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে তৃতীয় উদ্দেশ্য হিসেবে ধনতন্ত্রকে মজবুত করার বাসনা উপেক্ষা করা যায় না। সমস্ত পৃথিবীকে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার যাঁতাকলে খর্ব করে ঔপনিবেশিক আধিপত্য অটুট রাখার দিকেই এই গোষ্ঠীর ছিল অন্তিম লক্ষ্য ও তৎপরতা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মৌল প্রবণতার ব্যাখ্যায় ও সূত্র-নির্দেশে ব্যাখ্যাকার বলেছেন,—'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যারা পরিচালনা করছিল, তারা দুটি প্রবণতার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। একটি প্রবণতার পৃষ্ঠপোষক ছিল উপরোক্ত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার শাসকচক্র। অপর প্রবণতাটি পরিপুষ্ট হচ্ছিল সোভিযেট রাশিয়ার নেতৃত্বে, যার লক্ষ্য ছিল এই যুদ্ধকে মুক্তিযুদ্ধে পরিণত করা।'[৬] যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন জনগণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই কিছুটা যুদ্ধ-শিক্ষিত হয়, যুদ্ধ সম্পর্কে সচেতন থাকে, এবং যেহেতু সোভিয়েট সামন্ততন্ত্রের আদর্শ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামনে ছিল অন্তর-গত তাৎপর্যে প্রধানতম প্রতিপক্ষ, তাই শ্রমজীবী মানুষও যুদ্ধের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সম-সচেতনা ও সতর্কতা দিযে যুদ্ধের ধারাকে যথার্থভাবে চিহ্নিত করতে থাকে। অবশ্যই এই চিহ্নিতকরণ নানান জটিল 'ক্রসকারেণ্ট' এর মধ্য দিয়েই সম্ভব হয়। তবু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে এক অর্থে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের মুক্তিযুদ্ধ, সেই দিকেই পৃথিবীর রাজনীতিতে যুদ্ধ ঘটনা ও স্রোত তাৎপর্য পেতে থাকে।

১৯৪১ সালের মধ্যভাগে সোভিয়েট রাশিয়া প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসারিত মুখ পথ বদল করে। লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্নিহিত স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের। এই যুদ্ধ—সারা পৃথিবীতে নানান জটিল স্রোতের মধ্যেও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ,—'মুক্তিযুদ্ধ' এই অভিধায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ১৯৪৫ সালের শেষতম যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির দিন ২রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সীমা—তার মধ্যে একাধিক ঘটনা যেমন বিশ্ব-রাজনীতিকে নদীর বুকে শক্ত হাতে ধরা হালের আন্দোলনের মত নানামুখী করেছে, তেমনি আবার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে বিশ্বরাষ্ট্রগোষ্ঠীর দুই মহান শক্তিকে—একদিকে সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদে বিশ্বাসী ধনতান্ত্রিক শক্তি, আর একদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাম্যবাদী শক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক কাহিনী, ঘটনা ও প্রবাহ-পরিণতির সঙ্গে যুদ্ধে

লিপ্ত প্রতিটি রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রশাসিত উপনিবেশগুলিও ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ত। ভারত ছিল সে সময়ে বৃটিশদের পক্ষে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ। 'গ্রেট ব্রিটেনের চোখ দিয়ে দেখলে এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থানের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ব্রিটেন ও আমেরিকা তখন বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধে পরাজয় বহন করতে বাধ্য হচ্ছে।…যুদ্ধের এই সংকটময় মুহূর্তে ভারতের লোকবল, অর্থ নৈতিক সম্পদ, ভারতের সামরিক সাহায্য ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধজয়ের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।'[৭] সুতরাং এমন বিশাল একটি যুদ্ধেব ভয়াবহ ভার, যন্ত্রণা. শোষণ-অভিশাপ নির্বিচারে বহন ও ভোগ করতে হয়েছে ভারতকেই। তাই ভারতের বুকে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ রূপ এবং রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থায় তাব প্রভাব-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য কবাব মত।

দুই

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে বিশ্বরাজনীতিব পটভূমিকায় ভারতেব ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমশ অত্যন্ত জটিল হযে ওঠে। এবং এটাই স্বাভাবিক, কারণ, প্রথমত, ভারত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রধান অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র বৃটেনের একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, দ্বিতীয়ত, তার অভ্যন্তবে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই জাতীয় আন্দোলনেব জটিলতা গুরুতব রূপ পেতে থাকে এবং তা-ই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে তীব্রতম হয়ে ওঠে, তৃতীয়ত, যে সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের সূচনা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পবেই সোভিয়েট রাশিয়ায় এবং সেই সূত্রে ভাবতে ১৯২৯ সালে গঠিত হয় কমিউনিষ্ট পার্টি, সেই পার্টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে একটি অন্যতম অস্তিত্ব হয়ে দাঁড়ায়, চতুর্থত, যুদ্ধের কারণে ভারতেব খাদ্যকে ন্যায়নীতিহীনভাবে, অমানবিকভাবে সৈন্যদের রসদ হিসেবে শাসক বৃটিশ কর্তৃক গ্রহণ করায় খাদ্যাভাব তীব্রতম হয়ে ওঠে এবং তার যা ফল, তা যুদ্ধ-সমকালীন ভারতীয় প্রেক্ষাপটকে কালো-করাল ছায়ায় ঢেকে দেয়।

১৯৩৯ সালেব ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানীর হের হিটলারের নির্দেশে যখন জার্মান স্বাধীন পোলরাজ্য আক্রমণ করে এবং তার বিরুদ্ধে ৩রা সেপ্টেম্বর বৃটেন করে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা, তখন কিন্তু ভারতীয়রা সেই যুদ্ধের প্রকৃতি কি হতে পারে প্রত্যক্ষত, তার কোন স্পষ্ট ধারণা রাখতে পারে নি। তবে বংলাদেশের সে সময়ের একটি মাসিক পত্রিকা পরোক্ষভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যৎ রূপ সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন,—'অবশেষে মহাযুদ্ধ বাধিল। একদিকে জার্মানী. অন্যদিকে বৃটেন, ফ্রান্স ও পোলাণ্ড মহাসমারোহে সমরানলে ঝাঁপ দিয়াছে। ……শেষ পর্যন্ত একটা আপোসের কথা চলিতেছিল। হের হিটলার এবং মিঃ চেম্বারলেনের মধ্যে নেভিল হেণ্ডারসন তাঁতের মাকুর মত

ছুটাছুটি করিলেন। কিন্তু তাহাতে যে শান্তির সকল সম্ভাবনাই ব্যর্থ হইল।... যে যুদ্ধ এবারে বাধিল নৃশংসতায়, ধ্বংসলীলার ব্যাপকতায় ও ভীষণতায় গত মহাযুদ্ধ ইহার তুলনায় ছেলেখেলায় পরিণত হইবে। সেই আশংকায় বিশ্বাসী এস্ত।'[৮]

ভারতে একটানা ছ'বছরের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ভযাবহ। এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে ভারতের আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও জনগণের মানসিকতাগুলিকে সামনে বেখে আলোচনা প্রয়োজন। বস্তুত এই মানসিকতা-গুলি আমাদের এই পর্যায়েব আলোচনায় একান্তভাবে দেশের ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা একান্ত প্রয়োজন—যদিও সেই ভাগ আপেক্ষিক। ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যাহ্নকাল শুরু হয ১৯৪২ সালের মধ্যবর্ত্তী সময় থেকে। কিন্তু এই যুদ্ধ-প্রতিক্রিযার চরম সময় হঠাৎ আসে নি, এর মূল আছে হিটলার বাহিনী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করার মধ্যে। এই আক্রমণ ঘটে অতি-আকস্মিকতায় এবং ১৯৪১ সালের ২২শে জুন। '১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত সর্বত্র কমিউনিস্টরা একা নিদারুণ কুজ্ঝটিকার মধ্যে পড়িলেন।'[৯] নব গঠিত এবং পার্টির আন্তর্জাতিক আদর্শে স্থির-বিশ্বাসী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন চরম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে। প্রথমে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলির পরস্পরের মধ্যেকার যুদ্ধ, কিন্তু পরে স্ট্যালিনের রাশিয়ার সঙ্গে হের হিটলারের জার্মানীর অনাক্রমণ চুক্তি, হিটলারী যুদ্ধের প্রকৃতির সাম্রাজ্যবাদ থেকে ফ্যাসিবাদে ক্রমরূপান্তর, শেষে হিটলার কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ—এই সমস্ত পরস্পর বিরোধী ঘটনা ত্বরিত ঘটায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এক জটিলতম পরিস্থিতি রচনা করে ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে—আমাদের নির্দিষ্ট প্রথম ভাগে।

ঠিক এই সময় কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী অন্যান্য দলগুলির শাসক-বিরোধী আন্দোলন যেমন তীব্রতা পায়, তেমনি দলগুলির মতাদর্শগত এবং তৎকালীন শাসক যুদ্ধরত বৃটেনকে যুদ্ধে সাহায্য করা নিয়ে মতদ্বৈধতা আরো এক জটিল অবস্থা এনে দেয়। ৩রা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ভারতকে যুদ্ধরত বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু এই ঘোষণার সঙ্গে ভারতের জনগণ ও জননেতাদের মতামতের কোন যোগ ছিল না। অর্থাৎ যুদ্ধের শুরু থেকেই ভারতের জনগণকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার একটি বেপরোয়া মনোভঙ্গি একমাত্র সত্য হয়ে উঠেছিল বিদেশী শাসকদের মধ্যে, আর এই সূত্রেই ঔপনিবেশিক ভারতবাসীর উৎপীড়িত মানসিকতা আরও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে শাসকের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহে ইন্ধন যোগায় শাসক-চক্রের অনমনীয় মনোভাব

যেমন, তেমনি 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতি—যার ফলে একদিকে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অন্যদিকে যথেচ্ছ শাসন, দমন, পীড়ন অবাধে চলতে থাকে। এরই মধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে আমলাতন্ত্র পায় সর্বাধিক প্রাধান্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম ভাগের প্রথমদিকে ভারত জাপানের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত হয় নি, অথচ শাসক বৃটিশ যুদ্ধকে তাদের যুদ্ধ বলে ভারতীয়দের কাছে বার বার রাখতে চায়। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদের যে যুদ্ধ তার ফ্যাসীবাদী চরিত্র সম্পর্কে ইউরোপ ফ্রণ্টে তার বাধাহীন অগ্রাসনকে বুঝতে অক্ষম ছিল ভারতবাসী। কারণ প্রথম মহাযুদ্ধ যেমন সুদূর ইউরোপ খণ্ডেই আবদ্ধ হয়ে শেষ হয়ে যায়, ভারতবাসীর ধারণা ছিল, এই যুদ্ধও সেখানেই শেষ হবে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটার সুযোগ আসছে না। অর্থাৎ ভারতের বুকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তার চরিত্র তখনো বোঝার কোনো উপায় না থাকায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাদের সেই ফ্যাসিষ্ট চরিত্র বোঝা সহজসাধ্য হল না।

আর এই সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাস্তব গতিপ্রকৃতি ভারতের প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশ, মালয়, কাছাকাছি চীন, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রে—অর্থাৎ প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে বিশিষ্টতা আনে, তাতে তারা ফ্যাসীবাদী আগ্রাসনের জটিল ও মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা পায়। তাই তাদের আন্দোলন যখন একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের যৌথ রূপেরই বিরুদ্ধে, তখন ভারত এক জটিল যুদ্ধ-ব্যবস্থার সম্মুখীন—যার হাল ধরে আছে শাসক বৃটিশ। ভারতবাসীর বৃহত্তর মানবিকতাবোধ ও অভিজ্ঞতায় প্রাচ্য খণ্ডের সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিচালিত 'মুক্তিযুদ্ধ' (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যা ১৯৪২ সালে তাৎপর্য পায়) যথেষ্ট মূল্য পেলেও ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত, শোষিত মানুষ বৃটিশকেই একমাত্র শত্রু হিসেবে ধরে রাখে। এর আর একটি কারণ, বৃটিশ শাসকরা তখন বার বার নেতাদের বহু আবেদন-নিবেদনকে নস্যাৎ করে সামান্যতম সুস্থ সবল পূর্ণ স্বাধীনতা দানে অস্বীকৃতি জানায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বিচার করতে বসে একজন ভাষ্যকার বলেছেন,—'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের ফলে ভারতে ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম—এই গঙ্গা-যমুনার মিলন প্রক্রিয়াটি দানা বাঁধতে পারল না। ভারতে সৃষ্টি হল এক জটিল পরিস্থিতি।'[১০]

এই পরিস্থিতির মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট ভারতের জাতীয় নেতাদের মানসিকতা ও যুদ্ধে অসহযোগের বাসনা থেকে বোঝেন যে, ভারতকে এই যুদ্ধে যদি সম্যকভাবে না জড়ানো যায়, তবে যুদ্ধের রসদ সংগ্রহ সহজসাধ্য হবে না। তাই তার চাপে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ ক্রিপ্‌সকে দূত হিসেবে পাঠান

ভারতে। প্রস্তাব ছিল, যুদ্ধশেষের পরেই উপনিবেশের মত স্বাধীনতা পাবে ভারত। নতুন শাসন না প্রবর্তিত হওয়া পর্যন্ত ভারতের প্রতিনিধিরা বড়লাটের সঙ্গে সক্রিয় অংশ নিয়ে শাসন কাজ চালাবেন। যুদ্ধ থামলেই ভারতীয় নতুন সংবিধান গঠনের জন্য মিলিত হবেন। যদি কোন প্রদেশ সে সংবিধান মানতে রাজি না হয়, তবে আলাদা সংবিধানে তারা ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। ভারতের বিখ্যাত ইতিহাসকার ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন,—'পরবর্তীকালের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন প্রস্তাব তখন সম্ভবপব ছিল না।'[১১] তখনকার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ—দুপক্ষই নিজ নিজ মতাদর্শের দিক থেকে এতে আপত্তি করে।

এবং এব পরেই আসে, গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনেব আহ্বান ১৯৪২ সালেব আগষ্ট মাসে। এই আন্দোলন ঐতিহাসিক 'আগষ্ট বিপ্লব' নামে পরিচিত। কিন্তু এই বিপ্লবের আগে থেকেই জাতীয় কংগ্রেসে ছিল মতবিরোধ। গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব, সুভাষচন্দ্র গঠিত ফবওয়ার্ড ব্লকেব মত ও পথ, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখের সোস্যালিষ্ট পার্টির পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, অতিবাম আর এস পি-ব ব্যাখ্যা—এই সবই যুদ্ধ-সমকালীন দেশীয় পবিস্থিতিকে বিভ্রান্তিকব কবে তোলে। এর-মধ্যে ঘটে সুভাষচন্দ্রেব ভাবত থেকে পলায়নেব ঘটনা ১৯৪১ সালের জানুযারী মাসে। লক্ষণীয, এই ঘটনাই বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতিকে ভারতের সঙ্গে যোগসূত্র বচনাব অন্যতম সহায়ক। কারণ, এই পলায়নের পর আজাদ হিন্দ সরকাব গঠন, ভাবতের সীমান্তে জাপানেব সহযোগিতায় পববর্তী কালে আজাদ হিন্দেব দেশ-মুক্তির জন্য প্রচণ্ড লড়াই ইত্যাদি ঘটনায ভারতের নিজস্ব জাতীয় আন্দোলন ও কমিউনিষ্ট পার্টিব ভূমিকায আর এক অভিনব জটিলতার সৃষ্টি হয়।

এমন জটিলতার মধ্যেই আগষ্ট আন্দোলন সংঘটিত হলেও যা মূলে গান্ধীজী নির্দেশিত অহিংস ছিল, তা হয় সহিংস। এবং যেহেতু সে সময়ে দেশীয় নেতাদের মধ্যে একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ নিয়ে আলোচনা, মতাদর্শগত ব্যাখ্যা ও বিভেদ চলে, তবু মূলত শত্রু বৃটিশ শাসক, এবং তারাই ভারতীয়দের সামনে তখন একমাত্র প্রতিপক্ষ, তাই আগষ্ট আন্দোলন একই সঙ্গে অহিংস ও সহিংস পন্থায সারা ভারতে এক উত্তাল গণজাগরণের রূপ নেয়। এমন সর্বভারতীয় কঠিন স্বতঃস্ফূর্ত গণজাগরণেব রাজনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যায় একালের বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বের চট্টগ্রামের বিদ্রোহের সঙ্গে তুলনা করে সিদ্ধান্ত নেন,—'আগষ্টের এই আন্দোলনই ইংরেজের শাসনকালে বঙ্গদেশের সর্বপ্রধান হিংসাত্মক বিদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।'[১২] এই আন্দোলনের প্রাক্কালে ও সমকালে বহুনেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হন, বহু হতাহত হন

বৃটিশ নিযুক্ত পুলিশ বাহিনীর অত্যাচারে। সে সম্পর্কে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্যই যথার্থ,— 'গভর্নমেন্টের যে নির্মম পাশবিক অত্যাচার চলিয়াছিল সভ্য জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা দুর্লভ।'[১৩]

এই আগষ্ট বিপ্লব—যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ভারতের বুকে যুদ্ধ-প্রতিক্রিয়ার একেবারে মধ্যাহ্নকালকে চিহ্নিত করে, তা বাংলা কথাসাহিত্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। ছোটগল্প ও উপন্যাসে এই আন্দোলনের ছবি জীবন্ত হয়ে আছে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ননী ভৌমিক প্রমুখের রচনায়।

১৯৩৯-এ যুদ্ধ আরম্ভের পর থেকে ১৯৪২ এর আগষ্ট আন্দোলন এবং ডিসেম্বরে বাংলাদেশের কলকাতা শহরে জাপানী সৈন্যদের বোমা বর্ষণের ঘটনা পর্যন্ত ভারতের যুদ্ধ সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাগুলির পাশাপাশি চলতে থাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—হিন্দু-মুসলমানের অমানবিক সম্পর্কের জঘন্যতম রূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে নতুন সংবিধান অনুযায়ী প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করে বৃটিশ শাসক-গোষ্ঠী। এর পরের কয়েক বছর হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রায় বন্ধ থাকার পর আবার আরম্ভ হয় ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে। আগষ্ট মাসের ঢাকার হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, সেপ্টেম্বর মাসের বর্ধমানের দাঙ্গা, ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মহরমের শোভাযাত্রায় হিন্দু-মুসলমানের প্রবল সংঘর্ষ, ফেব্রুয়ারী মাসেরই শেষদিকে লোক গণনার সময় সাম্প্রদায়িক লোক সংখ্যার হিসেবকে কেন্দ্র করে নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক বিরোধ, মার্চ মাসের ব্যক্তিগত কলহে খুলনা জেলায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের তাণ্ডব যুদ্ধ সমকালীন ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের প্রথম পর্বের সামাজিক-সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে জটিল করে। ১৭ই মার্চ ১৯৪১ সালে দাঙ্গার এক বিরাট রূপ স্পষ্ট হয় ঢাকা শহরে। ২১শে মার্চ শান্ত হওয়ার পর ১০ই এপ্রিল আবার সেই দাঙ্গার লেলিহান অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে। দাঙ্গা ক্রমশ দাবানলের মত পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। ১০ই মার্চ এবং এপ্রিলের শেষ দিকে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য 'শুভেচ্ছা সমিতি' গঠন ও শান্তির ঘোষণাপত্র প্রচারিত হলেও ২৬শে জুন আবার দাঙ্গা বাধে ঢাকা শহরে। চলে ৭ই জুলাই পর্যন্ত এবং কয়েকমাস বন্ধ থাকার পর আবার অক্টোবর মাসে।

লক্ষণীয়, এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতা ইংরেজ শাসকের কাছে লিখিত প্রতিবাদ জানিয়েও কোন ফল পান নি। তৎকালীন ফজলুল হক মন্ত্রীসভা ও মুসলিম লীগের সদস্যরা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন নিজেদের সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গিকে

সংযত ও সুস্থ না করার ফলে। ভারতবর্ষে যখন এমনি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের উৎকট রূপ, বহির্বিশ্বে তখন যুদ্ধের রথচক্র উচ্চরবে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজা উড়িয়ে অগ্রসরমান।

এমন অবস্থায় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সক্রিয়তা ছিল সর্বাধিক। সেই সময়ের ব্যাখ্যায় ইতিহাসকার বলেছেন,—'বঙ্গদেশে কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রভাব খুব বেশী না হইলেও গভর্ণমেণ্ট বিচলিত হইয়া উঠিল।'[১৪] অবশ্যই 'কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ন্যায় শ্রমিক আন্দোলনও অন্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গদেশে খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করে নাই।'[১৫] কিন্তু সংগঠনের ব্যাপ্তি না থাকলেও অন্তর্নিহিত শক্তির বলিষ্ঠতায় কমিউনিষ্ট পার্টি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। কমিউনিষ্টদের পক্ষে '১৯৪১ সালে ২২শে জুন হিটলারী জার্মানী কর্তৃক অকস্মাৎ সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর সমগ্র পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘোলাটে'[১৬] হয়ে ওঠায় কমিউনিষ্টরা, আগষ্ট আন্দোলনে বৃটিশের বিরুদ্ধে যখন সারা দেশব্যাপী প্রচণ্ড বিক্ষোভ এবং সে বিক্ষোভ কংগ্রেসের পক্ষে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে এবং সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের স্বপক্ষে থাকার মতকে মেনে নিয়েই, তখন তারা বৃটিশকে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য মত দেয়। কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত ও জাতীয় নেতারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় আন্দোলনের পূর্ব মুহূর্তেই। আর অন্যদিকে হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ায় যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ না থেকে হয়ে ওঠে 'ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী মানুষের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধ। সুতরাং নীতি ও আদর্শ হিসাবে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি এই যুদ্ধে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত ছিলেন।'[১৭] কমিউনিষ্টদের এই সিদ্ধান্তের ফলে ২২শে জুলাই, ১৯৪২-এ নিষিদ্ধ কমিউনিষ্ট পার্টির নিষেধাজ্ঞা বাতিল হয় এবং তাদের নেতারা যখন পেলেন মুক্তি, তখন জাতীয় নেতারা কারাগারে বন্দী। বৃটিশের চরম অত্যাচারের সামনে আগষ্ট বিপ্লব তখন সহিংস ও অহিংস দুই রূপেই এক বিশাল গণ অভ্যুত্থান। এই প্রেক্ষিতে কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকায় প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া ও বিক্ষোভ দেখা দেয় দেশের মানুষের মনে। কমিউনিষ্টরা তখনকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে আখ্যা দেয় 'জনযুদ্ধ', আর জাতীয় নেতারা কমিউনিষ্টদের বলে 'দেশদ্রোহী।'

এ এক জটিল পরিস্থিতি তৈরী হয় দেশীয় আন্দোলনের অভ্যন্তরে। অবশ্যই কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কুৎসা অভূতপূর্বভাবে বর্ষিত হলেও কমিউনিষ্ট পার্টি দুর্বল না হয়ে বরং উত্তরোত্তর শক্তিশালী হতে থাকে। কারণ কমিউনিষ্ট পার্টি নানা সংগঠনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যক্ষ অব্যবস্থার মোকাবিলা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যায়। জনগণের সঙ্গে তাদের নিবিড় যোগের কারণেই একটি পার্টি নানারকম প্রতিবাদী বিরুদ্ধ তরঙ্গে এমন শক্তি অর্জন করতে পেরেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসকার বলেছেন,—

'কমিউনিষ্টদের দেশপ্রেম, ভারতীয় স্বাধীনতার প্রতি দরদ এবং ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ভারতের মুক্তিকামী কোন পার্টির চেয়েই কম ছিল না।'[১৮] সেই বিশ্বযুদ্ধের আকস্মিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টাকেও 'ফ্যাসিজম'-এর সহায়ক আখ্যা দেওয়ায় নিশ্চয়ই কমিউনিষ্ট পার্টি ভুল যে করেছিল, তা পরে স্বীকার করে। এই সময়কার কমিউনিষ্ট পার্টির মত, পথ ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আর এক টীকাকার বলেছেন, কমিউনিষ্ট পার্টির 'সঠিক পথ ছিল : দেশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রাম যাতে পরস্পর বিরোধী অবস্থানের দিকে চলে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্যে সেতু বন্ধন রচনা করা।·· ···কমিউনিষ্ট পার্টি সঠিকভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। কমিউনিষ্ট পার্টি আন্তর্জাতিক বিরোধের উপর সঠিকভাবেই গুরুত্ব আরোপ করেছিল, কিন্তু তা করতে গিয়ে জাতীয় বিরোধটিকে ছোট করে দেখেছিল।'[১৯] 'Communist Party and India's Path' গ্রন্থে ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী এই 'ছোট করে দেখা'-কেই 'মারাত্মক ভুল' বলে স্বীকার করেছেন।

দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রেক্ষিতে রক্তক্ষয়ী সুবিশাল গণঅভ্যুত্থানে দীপ্ত আগষ্ট আন্দোলন এবং বিশ্বযুদ্ধের বিশাল প্রেক্ষিতে ভারত তথা বাংলাদেশের উপর জাপানী ফ্যাসিবাদের যথেচ্ছ বোমা বর্ষণ—এই ঘটনার সঙ্গে ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কমিউনিষ্টদের জটিলতম অবস্থা ও বৃটিশ শাসকের অকথ্য অত্যাচার, শাসন-শোষণ মিলিয়েই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা চিহ্নিত। এই রাজনৈতিক অবস্থা ভারতের পক্ষে মধ্যাহ্নকাল। যুদ্ধের দ্বিতীয় ভাগে আছে যেমন যুদ্ধের দুর্মদ গতির সঙ্গে, ফ্যাসিবাদের যথেচ্ছ রূপের প্রসারের সঙ্গে তার বিরোধী পক্ষের প্রবলতম প্রতিরোধ ও যুদ্ধের অবসানের দিগন্তরেখার ইঙ্গিত, তেমনি ভারতের বুকে আছে অসহনীয় খাদ্যাভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানব-সৃষ্ট বিখ্যাত পঞ্চাশের মন্বন্তর। এর সঙ্গে যুক্ত হয় দুষ্ট ক্ষতের মত, বা অবধারিত উপসর্গ বা 'উপজাত' (By Product) বিষয়ের মত কালোবাজারী-মুনাফাখোর-মজুতদারের উদ্ভব, আমলাতন্ত্রের যথেচ্ছাচার, শহরমুখী বাস্তুহারার স্রোত ইত্যাদির মত ঘটনা। জাগ্রত জাতীয় চেতনার বলিষ্ঠ প্রসার, গণ-অভ্যুত্থান, শ্রমিকশ্রেণীর সংঘবদ্ধ আন্দোলন, বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষার শুভ প্রয়াস, জাতীয় চেতনা-চিহ্নিত সন্ত্রাসবাদ, সহিংস ও অহিংস প্রতিরোধ ইত্যাদির সমান্তরাল ওই সব দুষ্ট ক্ষত বাংলাদেশে একের পর এক দেখা দিতে থাকে। এই সমস্তই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্য, মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে জড়িত ধনী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর ঘৃণ্য পাপকর্ম ও স্বার্থপরতা,

লোভ-লিপ্সা সমাজের অভ্যন্তরে নৈতিক পতন, দুর্নীতি, সমস্ত রকম মূল্যবোধকে বিনষ্ট করতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে 'কল্লোল' পত্রিকার কালে সমাজ পরিবেশে যুদ্ধের ছিল শ্লথ-মন্থর আবির্ভাব-গতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালটিতে তা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট গতিতে বিশাল ও ভয়াবহ রূপ নেয়।

তিন

বাংলাদেশের পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকাল কুৎসিৎ দারিদ্র্যের কাল। আর একথাই যথার্থ, যে কোন দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে অর্থের বণ্টন-বৈষম্যজাত দারিদ্র্য এবং সামগ্রিকভাবে দেশের উৎপাদন-নির্ভর অর্থনৈতিক দুরবস্থা বস্তুত দেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষমতাকেই করে শৃংখলিত। যখনি অর্থনীতি শৃঙ্খলিত হয়, তখনি তার প্রভাব সমাজদেহে পড়বেই। সমাজ এবং অর্থনীতি একেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটির বিবর্তন অপরটির হাত ধরে চলে। বাংলাদেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুধাবন করলে বোঝা যায়, এই পর্বের রাজনৈতিক সচেতনতা ও উত্তালতার সঙ্গে ঠিক বিপরীত-ধর্মী সম-শক্তিতে সমাজ ও অর্থনীতির অধঃপতন ঘটে।

১৯২৯ সালে সারা বিশ্বের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনৈতিক অবস্থার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সে সময়ের বিশ্ব-বাজার মন্দা যাওয়ার প্রসঙ্গ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি। তার জের এনেছিল বেকারত্ব। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সংকটের মাধ্যমে সেই ধারার অনুবর্তন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক অব্যবস্থায় চরম আঘাত হানে। আঘাতের কারণ, নিশ্চিতই বিশ্বযুদ্ধের আকস্মিক আবির্ভাব। দ্বিতীয় কারণটি বাংলাদেশের ভাগ্যে উপনিবেশবাদের নির্মম ভার, যা রূপ নেয় প্রবল নির্যাতনে ও উপেক্ষায়—এ সবের মধ্যে নিহিত। একদিকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ বিশাল জনতা, অন্যদিকে সেই জনতার অভ্যন্তরে স্থবির বৃদ্ধের মত স্থির অর্থনৈতিক দুরবস্থার শোচনীয় রূপ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে যখন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মানুষ হিসেবে আমরা চরম শোষিত, নানাভাবে আন্দোলনের মধ্যে বার বার মার খাচ্ছি, তখনি দৈব অভিশাপের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে মেদিনীপুরে দেখা দেয় প্রবল ঝড়, বন্যা। এই সূত্রে অর্থনীতিতে আরও আঘাত পড়ে। কিন্তু এহ বাহ্য। এরই মধ্যে যুদ্ধরত মিত্রশক্তি বৃটেন শাসক-রূপে চরম অপদার্থতার স্বাক্ষর রাখে সারা বাংলাদেশে। যুদ্ধের সৈন্যদের জন্য রসদ সংগ্রহে তারা তৎপর থাকে ভারতেই—যদিও ভারতের তথা বাংলাদেশের মানুষের প্রজা হিসেবে ন্যায্য খাদ্য-

অর্থ-গ্রাসাচ্ছাদনটুকু তারা পাচ্ছে না। তার ওপর শত্রুপক্ষের কয়েকটি রাষ্ট্রে তখন রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় কাঁচা মালের দেশ ভারতবর্ষ এক সংকটজনক অবস্থার সম্মুখীন। এই সঙ্গে বৃটিশ শাসকের পোষ্য ব্যবসায়ীদের চরম বল্গাহীন অর্থগৃধ্নুতা, নব সৃষ্ট মুনাফাখোর-মজুতদারদের আবির্ভাব সে সময়ে ধনীকে আরও ধনী, গরীবকে আরও গরীব করে তোলে।

যারা এ সবের মধ্যে বিত্তে ও মানসিকতায়, সামাজিক আভিজাত্যে মধ্যবর্তী অবস্থায় স্থিত—সেই মধ্যবিত্ত জনসাধারণ জীবনযাপনে সম্পূর্ণ দুর্বল হয়ে পড়ে। ঠিক এমন অবস্থা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের অবধারিত ললাট-লিখন ছিল এমনই করুণ সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত। এই সময়ে যে উৎকট খাদ্য সমস্যা দেখা দেয়, ধীরে ধীরে সেই ১৯৪৩-এর মন্বন্তর—যা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে ইতিহাস-খ্যাত হয়ে গেছে—তার অশুভ ছায়া নামে। তার ফল শুধু অগনন মানুষের অমানবিক মৃত্যুকেই একমাত্র দৃষ্টান্ত করে না, সেই সঙ্গে সমাজদেহে গভীর ক্ষতমুখ ও ক্ষতের বিস্তার স্পষ্ট করে।

মূলত সে সময়ে দেশের খাদ্যের অবস্থা এবং অব্যবস্থা ও সাধারণ মানুষেব অমানবিক দুর্গতির সংবাদ দিতে গিয়ে একটি বিখ্যাত পত্রিকার 'সংবাদ সাহিত্য' বিভাগে লেখা হল,—'বাংলাদেশের সর্বত্র খাদ্যাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে। প্রত্যেক জিলার প্রত্যেক মহকুমার প্রত্যেক শহরের এবং প্রত্যেক গ্রামের সংবাদে এই অন্ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবই মুখ্য বিষয়। চুরি ও ডাকাতিব হিড়িকও প্রতিদিন বাড়িয়া চলিযাছে—এবং এগুলিও যে খাদ্যাভাবের ফল, তাহাতে সংশয় নাই। মন্বন্তরের ঠিক পূর্বাহ্নে যেরূপ ঘটা উচিত, ঠিক সেরূপই ঘটিতেছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা কোলাহল উঠিযাছে আহার্য ও অপর প্রয়োজনীয় বস্তুর বিক্রয় এবং বণ্টনের অব্যবস্থায়। এই অব্যবস্থার জন্য প্রথমত দায়ী—যাঁহাদের হাতে দেশের শাসনভার আছে তাঁহারা।...তাঁহারা এ দেশীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের হাতে এ দেশীয়দের অন্নবস্ত্র সমস্যা সমাধানের ভার দিয়া ভগবানের ও বিবেকের কাছে দোষমুক্ত আছেন।'[২০] কিছুটা শ্লেষের সুরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে প্রকাশিত এই পত্রিকায় পরিবেশিত সংবাদ সেকালের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্রকেই জীবন্ত করে তোলে। আর একটি পত্রিকায় লেখক কালীচরণ ঘোষ তাঁর 'বর্তমান জীবন ধারণ সমস্যা' প্রবন্ধে লিখেছেন,—'ক্রমে কোন দ্রব্যই পাওয়া যায় না। যে দামে যাহা পাওয়া যায়, তাহা গৃহস্থের বাঁধা আয়ের শক্তির বাহিরে।......কত লোক এই দুর্দিনে অন্নবস্ত্র চিকিৎসা ও গমনাগমন উপলক্ষে নিঃস্ব হইতেছে, ভিটা মাটি বিক্রয় করিয়া পরমুখাপেক্ষী পরনির্ভর হইয়া ভিক্ষান্নে জীবনাতিপাত করিতে প্রস্তুত হইতেছে তাহা আমেরী সাহেবের সংবাদ রাখার কথা নহে।'[২১]

এই সমস্ত সংবাদ প্রমাণ করে যুদ্ধসমকালীন বাংলাদেশের যুদ্ধ-প্রতিক্রিয়াজাত শোচনীয় অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও শৃংখলিত অবস্থার কথা। সাধারণ মানুষের স্থিত জীবন উন্মূলিত, বর্তমান জীবনযাপন পদ্ধতি বিপর্যস্ত, ভবিষ্যৎ জীবন ব্যক্তিমানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ আশা-ভরসাহীন। ভারতের বাইরে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে তথা বাংলাদেশে যে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থার প্রতিচিত্রণ লক্ষিত হয়, তা যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থারই ক্রমপ্রসারিত রূপ। ১৯৪১ সালের শেষ দিকে যুদ্ধের গতিমুখ পরিবর্তিত হলে, ১৯৪২ সালের স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল রূপ দেখা দিলে (যার কথা আগেই আলোচনা করেছি) দেশীয় অর্থনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া তীব্র হয়। মেদিনীপুরের ঝড় (অক্টোবর, ১৯৪২), ১৯৪৩-এর দামোদরে বন্যা ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্য-হানি, সরকারপুষ্ট-মজুতদার-চোরাকারবারির রাতের অন্ধকারের অসাধু তৎপরতা, যুক্তিহীন মুদ্রাস্ফীতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে।

বাংলাদেশের সমাজ মধ্যবিত্তনির্ভর ছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একভাগ ভূমি নির্ভর জীবনযাপনে অভ্যস্ত, আর একদল চাকুরীপ্রাণ। চাকুরীপ্রাণ মানুষগুলি ছিল শহরমুখী। যে সব মধ্যবিত্ত ছিল ভূমির আয়ের ওপর নির্ভরশীল, একান্নবর্তী পরিবারে সদস্য বৃদ্ধি, শহরজীবনের আকর্ষণ, অভাবে জমি বিক্রয়ের অমোঘ প্রবণতা—এসব কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই তাদের যেমন লোপ পাওয়ার মত অবস্থা ছিল, যুদ্ধ-সমকালে প্রায় লুপ্ত হওয়ার দিকেই তারা এগোয়। শিক্ষিত চাকুরীপ্রাণ মধ্যবিত্তরা স্বল্প পরিমাণ নির্দিষ্ট মাহিনায়, যুদ্ধকালীন দুর্মূল্য ভাতায় মানাতে চেষ্টা করলেও ক্রমাগত অসম্ভব দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও দ্রব্যের যোগান হ্রাস হওয়ার ফলে তাদের অবস্থা উর্ধ্বশ্বাস হয়ে ওঠে। একদিকে তারা শিক্ষিত অন্যদিকে বিত্তে মধ্য-ক্ষমতার অধিকারী—ফলে সামাজিক ও ব্যক্তিক মানসিকতায় তাদের জীবনধারণে যেমন জটিলতা দেখা দেয়, তেমনি সামাজিক মান-মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে চরম ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে পড়ে।

শহরকেন্দ্রিক এই মধ্যবিত্তজীবন ক্রমশ নিজ নিজ মান ও আভিজাত্য রক্ষা করতে গিয়ে অসুস্থ হতে থাকে। শহরে ভিড় হয় গ্রাম-মানুষের। চাষীরা চাষ ছেড়ে শহরে ভিড় করে, কারণ খরা, শস্যহানি, বন্যা, ঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে চাষ সম্ভব নয়। শহরের মিল কারখানায় শ্রমিকশ্রেণী ফুলতে থাকে জন-সংখ্যার চাপে, শ্রমনিয়োগ সমস্যা দেখা দেয়। শহরে ছিল রেশনিং ব্যবস্থা। তাই শহরের তুলনায় গ্রামের মানুষের কাছে খাদ্য সমস্যা প্রকট ছিল।

অন্যদিকে মধ্যবিত্ত সমাজে অবসাদ, অবক্ষয় আরও গভীরে শিকড় বসায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে দুর্বল, অসুস্থ আর্থিক অবস্থার চাপে যে মধ্যবিত্ত মানুষ শংকিত ছিল,

বেকার জীবনের হতাশা, বেদনা, ক্ষোভে-অবসাদে ছিল শৃংখলিত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে সেই মধ্যবিত্ত সমাজে ধরে ক্ষয়রোগ—গভীরে-গোপনে তার শামুকের মত গতি। মধ্যবিত্ত জীবনের শোচনীয় অবক্ষয়, অবনতি সম্ভবত একটি পূর্ণরূপ পেতে চায় মন্বন্তর, অভাব, অসহায়তা, অবসাদ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার মধ্যে থেকেই। তাই যুদ্ধ-সমকালীন বাংলাদেশের যেটা সবচেয়ে লক্ষণীয়, তা হল দারিদ্র্য, বেকারত্বের কারণে অতি সংগোপনে মধ্যবিত্ত সমাজদেহে নৈতিক অধঃপতনের লক্ষণীয় সিঁড়িগুলি।

এরই পাশাপাশি ছিল বৃটিশ রাজশক্তি-লালিত অথচ নিষ্ক্রিয় জমিদারশ্রেণীর অস্তিত্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তারা বুঝেছিল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। তবু বৃটিশ লালনে-পোষণে তাদেরই গোষ্ঠী মজুতদার, মুনাফাখোরের মধ্যে ভিড়তে থাকে। বিদেশী ক্যাপিটালিস্টদের সূত্রে তারা হয়ে ওঠে ব্যবসায়ী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকাল এদের কাছে ছিল এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়।

বাংলাদেশে এমন যুদ্ধ সমকালের ছয়টি বছরের প্রায় সমগ্র সময়সীমাই অস্থিত থেকেছে, অন্তত যুদ্ধের মধ্যাহ্নকাল থেকে পরবর্তী সাড়ে তিন বছর নিশ্চয়ই। আর, এই অস্থিত অবস্থা দুঃসহ শৃংখলিত অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে উৎকেন্দ্রিক করেছে মধ্যবিত্ত জীবনকে। একদিকে জাতীয় জাগরণ আন্দোলন, গণবিক্ষোভের বিস্ময়কর রূপ, অন্যদিকে অকল্পনীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, একদিকে পথের ঘৃণ্য পশুর মত সর্বহারা বুভুক্ষু মানুষগুলির অমানবিক চীৎকার. কাতরতা, অসহায় মৃত্যুবরণ, আর একদিকে সরকার-পুষ্ট এবং দেশীয় স্বার্থপর অর্থলোভী মানুষের হঠাৎ-বড়লোক-হওয়ার ঘৃণ্য মানসিকতা, একদিকে সরকারের 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযানের আহ্বান ও রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যের বণ্টন ব্যবস্থায় ভারসাম্য আনার প্রয়াস, অন্যদিকে সেই ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে মুনাফাখোর, মজুতদার ও কালোবাজারীদের লোকচক্ষুর অন্তরালে লোলুপ শকুনি-গৃধিনীদের মত বিচরণ—এমন বৈপরীত্যের মধ্যেই আসে চরমতম সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপর্যস্ত রূপ —মন্বন্তর।

এই মন্বন্তর সম্পর্কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের গবেষক বলেছেন,—'বৃটিশ ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের হাতে সরকারী খাদ্য ব্যবস্থার ও বণ্টনের ভার ছিল এবং তারা ইচ্ছামত দাম চড়াইয়া মুনাফাবাজির চরম করিয়াছিল। অধিকন্তু মিলিটারি কণ্ট্রাকটারদের হাতে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত ছিল। এরাও মজুতদারি ও মুনাফাবাজির দিকে ঝুঁকিয়াছিল। সরকারী অক্ষমতা, হৃদয়হীনতা, দুর্নীতি ও অপরিমিত লোভের কারসাজির জন্য পঞ্চাশের মন্বন্তর এত ব্যাপক ও ভয়াবহ হইয়াছিল।'[২২] যুদ্ধ-সমকালের অর্থনৈতিক দুরবস্থার পিছনকার ইতিহাস বাস্তবিকই এই। স্পষ্টই বোঝা যায়, এমন ভঙ্গুর অর্থনীতি

স্বার্থান্বেষী তদানীন্তন সরকার ও উপনিবেশে বসবাসকারী সুযোগ-সন্ধানী দেশীয় মানুষই নিজেদের ভাগ্য হিসেবে রচনা করতে পারে। মানবতা-বিধ্বংসী এইসব দেশীয় অস্তিত্বই তো যুদ্ধে বিশাল আকারে মুখব্যাদান করে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের দোসর হয়।

পাশাপাশি সমাজচিত্রের একটি ছবি ও তার ব্যাখ্যা ওই গবেষক উপস্থাপিত করেছেন। দেখা যায়, যখনি দেশে রাজশক্তির কর্তৃত্ব দুর্বল ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, রাজশক্তি অক্ষম হয় সার্বিক শৃংখলা বজায় রাখতে, অর্থাৎ নানা দিকের বিশৃংখলায় মানুষে মানুষে মানসিক ও মানবিক ঐক্যসূত্রগুলি হয় বিচ্ছিন্ন, তখন সুবিধাভোগী সম্প্রদায় প্রকাশ্যে দেখা দেয়। নীতি নিয়ম হয় অবহেলিত, সুযোগ সন্ধানীদের তৎপরতা হয় তীব্র। যুদ্ধ-সমকালে তা-ই ঘটেছিল বলে শুধু পুরুষ নয়, নারী সম্প্রদায়কে সুবিধামত কাজে লাগানোর চেষ্টা হয়। অর্থাৎ নারীরা ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় সুবিধা আনয়নের অন্যতম সহায়ক হয়। নারীরা পুরুষদের পরিচালিত সংসারের দারিদ্র্য ঢাকতে বাইরের কাজে ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনে প্রয়াসী হয়। এই প্রয়াস যুদ্ধের আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। যুদ্ধ সমকালে তা যেমন ব্যাপক আকার ধারণ করে, তেমনি নেয় বীভৎস রূপ। এই রূপের পরিচয় দিতে গিয়ে গবেষক বলেছেন,—'গণিকাবৃত্তি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে এমন কি তথাকথিত 'ভদ্রমহলে' পর্যন্ত এই পাপ গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। বিদেশী সৈন্য ও অফিসারদের মনোরঞ্জন ও অবসর বিনোদনের নাম করিয়া 'সরকারী' ও 'বেসরকারী' পৃষ্ঠপোষকতায় গণিকাবৃত্তির বহুল প্রচলন হইয়াছিল। মিলিটারির নানা শাখায় মেয়েদের চাকুরী এই দুর্নীতিকে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছিল।'[২৩]

বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার এইগুলিই ছিল বিশেষত্ব, এই গুলিই ক্রমশ স্থায়ীভাবে সমাজের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেয়। যেহেতু কালের প্রেক্ষিতে সব দেশের বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষই যুগকে মেনে নিয়েও, সচেতন থেকেও অসহায়তার অমোঘ শিকার হয় এবং তা-ই তার কালের ললাটলিপি হয়ে দেখা দেয়, তাই এই যুদ্ধ-সমকালের বাঙালী মানস এমন প্রতিক্রিয়ায় অবধারিত শিকারমাত্র হয়েছিল। এর সম্যক প্রতিচিত্রণেই নিবদ্ধ থেকেছেন যুদ্ধ সমকালীন বাঙালী লেখককুল।

চার

যুদ্ধ সমকালে জটিল রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক জলন্ত পটভূমিতেই ঘটে বাংলা কথাসাহিত্যের উজ্জ্বল অগ্নিপরীক্ষা। আমরা মনে করি, যুদ্ধ সমকালকে যথাযথ রূপ দিতে সমকালের লেখকরা যে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা তুলনারহিত।

এইসব কথাসাহিত্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ দর্পণ। অথবা বলা যায়, সমকালের কথাসাহিত্য দ্বিতীয় যুদ্ধের সর্বাবয়ব দলিল। এমন মন্তব্য করার কারণ, যুদ্ধ-সমকালের প্রায় সব লেখকই ভারতের বুকে সংঘটিত এবং যুধ্যমান বিশ্ব-পরিস্থিতির অন্তর্গত পরিপার্শ্বের প্রাচ্যখণ্ড থেকে সংক্রামিত যুদ্ধের সমস্ত রকম সংকটের কার্য-কারণ সম্পর্কে ছিলেন সচেতন। এই সচেতনতার সূত্র যেমন ছিল সমকালের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তেমনি ছিল গভীর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপরও নিবিড়-গ্রথিত। এই সমস্ত' চেতনায় সামগ্রিকভাবে লেখকের মানসিক স্বচ্ছতা, নির্ভীকতা ও বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর আছে। যুদ্ধ-সমকালে রচিত কথাসাহিত্যে তার পরিচয় মেলে।

অর্থাৎ কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি—এই পত্রিকা গোষ্ঠী-উত্থিত এবং এই সব পত্রিকার লেখকরা যে নতুন কিছু করার উদ্দামতার আবেগে কথাসাহিত্যে চমক এনেছিলেন, যার ধারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব সময় পর্যন্ত নানাভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছিল, যুদ্ধ আরম্ভে তা তার আবেগদীপ্ত কিছু বাস্তব, কিছু অবাস্তব স্বপ্নময়তা থেকে সরে এসে আরও কঠিন বাস্তবভিত্তি পায়। কারণ যুদ্ধের সর্ববিনাশী মারণাস্ত্র তখন বাংলাদেশের বুকের গভীরে নানাদিক থেকে আঘাত হানছে। এমন প্রচণ্ড অভিজ্ঞতার মধ্যে কল্লোলীয় চেতনা যে আরও পরিষ্কার হবে এ সময়ে, আরও ঘনিষ্ঠ কার্য-কারণ সম্পর্কে স্থিত হবে, তা-ই স্বাভাবিক।

আমরা আগের অধ্যায়ে বলেছি, এমন যুদ্ধের ভিত্তি রাজনীতি-ভাবনার দিক থেকে এক জটিল অবস্থার ওপর নির্ভরশীল ছিল। একদিকে পুরনো সাম্রাজ্যবাদ ও তার নব প্রকাশিত রূপ ফ্যাসিবাদ, অন্যদিকে উদার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা, এ সবের মধ্যে নব শিশুর মত আবির্ভূত সাম্যবাদ—এই তিনটি তাত্ত্বিক মতাদর্শের সংঘাত-সংঘর্ষ তখন যুদ্ধকে গতিপ্রাণ করে। আর আমাদের দেশের লেখক-বুদ্ধিজীবী মানুষ এই রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে কথাসাহিত্যের উপযোগী বিষয়গুলি ছেঁকে গ্রহণ করতে গিয়ে নিঃসন্দেহে যুদ্ধ-চিন্তা, কার্য-কারণ সম্পর্ক-ভাবনাকে বড় করে তুলেছে। কল্লোলের লেখকদের আবেগ-উদ্দীপনা এই সময়ের রাজনীতি সচেতনায় একটা অন্য রূপ পেতে আগ্রহী। অর্থাৎ যুদ্ধ-সমকালের লেখকরা সচেতনভাবে রাজনীতিকে কথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

যুদ্ধ সমকালের রাজনীতির দুই প্রধান রূপ—আবেগমথিত বৃটিশ-বিরোধী জাতীয়রূপ, আর সোভিয়েট রাশিয়া থেকে আগত মার্কসীয় ব্যাখ্যার রূপ। ধনতন্ত্র ও দেশীয় সামন্ততন্ত্রের বিরোধ, সেইসঙ্গে সামন্ততন্ত্রের ক্রম-অবলোপ ও সাধারণ মানুষের

মধ্যে তার আত্মগোপন ঘটে যুদ্ধ সমকালে। সেই রূপে অর্থাৎ জনগণের চেতনায় তা সম্পৃক্ত থেকে একসময়ে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধেই তা আবার জেহাদ ঘোষণা করে। তখন তার নাম হয় সর্বহারাতন্ত্র। ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সর্বহারাতন্ত্র—এ সবের একটি যুক্তি-নিষ্ঠ ব্যাখ্যা ও বিকাশের রূপ তুলে ধরেন মার্কস। সেই নবীন ব্যাখ্যার অনুসারী হন কেবল যুদ্ধ সমকালেই বাংলা কথাসাহিত্য ধারায় আবির্ভূত একাধিক লেখক।

কল্লোল যুগের লেখকদের যৌনতা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা, নর-নারীর দেহগত সম্পর্ক-ভাবনার ঐতিহ্যসম্মত রূপের বিরোধিতা করার প্রয়াস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নতুন তাৎপর্য পেতে থাকে। তা-ই স্বাভাবিক, কারণ খাদ্যসংকট, মন্বন্তর, শহরকেন্দ্রিক মধ্য-বিত্ত-মনস্কতায় নরনারীর সম্পর্ক ও মূল্যবোধে বিরাট ফাটল ধরেছে প্রত্যক্ষভাবেই। ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্মাধর্ম চেতনার মূলে আঘাত পড়েছে সবচেয়ে বেশী। তাই প্রেমের সম্পূর্ণ নগ্ন দেহভিত্তিক ব্যাখ্যা, রক্তমাংসের সম্পর্কিত উপস্থাপনারীতি সমর্থন পেয়েছে যুদ্ধ সমকালীন মন্বন্তর, অবক্ষয়ে পর্যুদস্ত বাংলাদেশের পরিবেশে। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রূপ, রাজনীতি, যৌনতা, প্রেম, মধ্যবিত্তের অবক্ষয়, মন্বন্তর, গণবিক্ষোভ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মুনাফাখোর-মজুতদারদের নবরূপে আত্মপ্রকাশ, বিদায়ী সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রে বিরোধ, অসহায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, লক্ষ লক্ষ মানুষের অমানবিক মৃত্যুর মিছিল, ক্ষুধিত মানুষের গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় আসায় নবসৃষ্ট বাস্তহারা সম্প্রদায়—এদের একের পর এক পরিচয়ের মধ্য দিয়েই বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে ছয় বছরের ব্যবধানে শেষ হয়ে যায়।

তাই বাংলা কথাসাহিত্যে এ সবেরই যথাযথ রূপচিত্রণে তৎপর থেকেছেন লেখকরা। আমরা এর ফলে লক্ষ্য করেছি এই সময়ে সৃষ্ট কথাসাহিত্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য। এই বিচিত্র বিষয়গুলিকে অনেকাংশে কথাসাহিত্যে নতুন নতুন প্রবণতা হিসেবেই লক্ষ্য করেছি। আর একটি কথা স্মরণীয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের লেখকরা কথাসাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ নিয়ে ভাবিত হন নি। এমন কি যুদ্ধের মধ্যাহ্নকাল আসার অব্যবহিত-পূর্ব প্রায় দু'বছরের মধ্যেও কথাসাহিত্যে তার যথাযথ গ্রহণ ঘটেনি। কারণ যুদ্ধ তখন দূর ইউরোপে ও ভারতের বাইরে কিছু ভূখণ্ডে। এর ফলে ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর পর্যন্ত অনেক লেখক যুদ্ধ পূর্ব ভাবনাকে একমাত্র বিষয় করেই কথাসাহিত্য রচনা করে গেছেন।

এই সূত্রেই আমাদের বক্তব্য, যুদ্ধ প্রভাবিত চিন্তা-চেতনায় উদ্দীপ্ত কথাসাহিত্য ছাড়াও বেশ কিছু গতানুগতিক সাহিত্য রচনারও পরিচয় আছে এই সময়ে। অবশ্যই যে কোন দেশের সংকটময় কালটিতে কিছু সাধারণ লেখক থাকেনই, যাঁরা কালচেতনায়

আদৌ তটস্থ না হয়ে নিজেদের খেয়ালখুশিমত সাহিত্য রচনা করে যান। আমরা সে রকম লেখক ও লেখকদের পরিচয় স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে রাখছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কল্লোলের কালে যাঁরা ছিলেন কিশোর ও যুবক লেখক, তাঁরাও যুদ্ধ সমকালে কিছু যুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া-বিচ্ছিন্ন সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। সেগুলি রচনার কালগত যৌক্তিকতা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উল্লেখও রাখছি। অর্থাৎ যুদ্ধ-সমকালে রচিত ও ঠিক এই সময়সীমার মধ্যে প্রকাশিত—দুই ধারার রচনার মধ্যেকার একটি গতানুগতিক বিষয় ধারার পরিচয় তুলে ধরাই আমাদেব উদ্দেশ্য।

যুদ্ধ-সমকালের কথাসাহিত্যে বিষয়ের দিক থেকে বিভিন্ন প্রবণতাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার আগে আর একটি প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই থেকে যায় আমাদের আলোচনার মধ্যে—তা হল রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ। ববীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটে ১৯৪১ সালে। ১৯৩৯ সাল থেকে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ববীন্দ্রনাথ একাধিক কবিতায় তাঁব পরিণামী প্রতিভার অসাধারণ স্বাক্ষর রেখে গেছেন, প্রবন্ধাদিতেও সেই পরিচয় সমানভাবে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই মানবতা-বিধ্বংসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন। তাঁর তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি-প্রবণ মনে যুদ্ধ-ঘটনা নানাভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা ভেবেই তিনি লিখেছেন 'সর্বনেশের' মত কবিতা, 'সভ্যতার সংকট' (১লা বৈশাখ, ১৩৪৮)-এর মত প্রবন্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রবীণ, প্রাজ্ঞঋদ্ধ বয়সান্তিক জীবন-চেতনায় স্থিতধী বিশ্বকবিকে দারুণভাবে আঘাত করে। প্রতিভার পবিণামী চেতনায় সেই আঘাতের প্রতিফলন ঘটেছে কবিতায়, প্রবন্ধে, জন্মদিনের বক্তৃতায়, বহু চিঠিপত্রে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর থেকে তাঁব মৃত্যু-কাল-এর মধ্যবর্তী সময়েব মধ্যে বিশ্বকবি মাত্র তিনটি গল্প রচনা করে গেছেন—যেগুলি তাঁর 'তিনসঙ্গী' গল্পগ্রন্থে (সম্প্রতি প্রকাশিত গল্পগুচ্ছ ৪র্থ খণ্ডে) সংকলিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য পর্বের মধ্যে সেগুলি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে বলেই রবীন্দ্রনাথকে সেই তিনটি গল্পের সূত্রে আলোচনায় রাখব।

বর্তমান অধ্যায়টি শেষ করার আগে পরবর্তী অধ্যায়গুলির বিষয়-নির্ভর বিভাগীয় লক্ষ্য এবং বৈশিষ্ট্য, সেই সঙ্গে বাংলা কথাসাহিত্য শাখার শিল্পরীতিগত অস্থিরতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের যুদ্ধ প্রতিক্রিয়াজাত বিভিন্ন প্রবণতার সূত্রে এখানে রাখছি।

(১) বাংলা কথাসাহিত্যে গতানুগতিক বিষয় ও ভাবধারার অনুসৃতি। যাঁরা প্রধানত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালেই আবির্ভূত, প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন ও সাধারণ—দুই ধারার লেখকের প্রাসঙ্গিক কথাসাহিত্য এই পর্বে আলোচিত হবে। (২) বাংলা কথাসাহিত্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চিত্র উপস্থাপনার প্রয়াসও আমাদের আর একটি লক্ষ্য।

গোপাল হালদার, নবেন্দু ঘোষ, সুবোধ ঘোষ, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়. মনোজ বসু, বরেন বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মত একাধিক কথাকারের গল্প ও উপন্যাস আমাদের আলোচ্য। (৩) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মন্বন্তর-প্রতিক্রিয়ার সফল ক্ষেত্র বাংলা কথা-সাহিত্য। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, প্রবোধকুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সরোজ রায়চৌধুরী, সুবোধ ঘোষ রমেশচন্দ্র সেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায, গোপাল হালদার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ আমাদের এই পর্যায়ে আলোচ্য লেখক। (৪) ব্যাপক গণবিক্ষোভের উজ্জ্বল ভিত্তিভূমি বাংলা কথাসাহিত্য। গোপাল হালদার, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু প্রমুখের রচনা এই পর্যায়ের আলোচনার লক্ষ্য। (৫) বাংলা কথাসাহিত্যে নবোদ্ভূত ধনিকশ্রেণী, সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য এবং অস্থিরতা ও অবক্ষয়ের চিত্র। তারাশংকর, গোপাল হালদার, জ্যোতির্ময় রায়, রমেশচন্দ্র সেন, প্রবোধকুমার সান্যাল. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সোমেন চন্দ প্রমুখের নাম এই ধারায় উল্লেখ্য। (৬) বাংলা কথাসাহিত্যে প্রেমভাবনা, নরনারীর দেহ-সর্বস্বতা ও উৎকেন্দ্রিক হৃদয়ভাবের জীবনচিত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে সমস্ত কথাসাহিত্যিকই কমবেশী এই বিষয়ে সমান শিল্প-সচেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের গল্প-উপন্যাসে। (৭) বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয়ে বিবিধ আস্বাদ বৈচিত্র্য। সমকালের ছোটগল্প ও উপন্যাসের বিষয় অবলম্বন ও চরিত্র-সৃষ্টিগত অভিনব দিক, কথাসাহিত্যে অলৌকিক রস, হাস্যরস ইত্যাদির ধারাই এই পর্যায়ে আমাদের লক্ষ্য। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, শিবরাম চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, রমাপদ চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসু, বনফুল এইসব লেখকের নাম প্রসঙ্গত স্মরণীয। (৮) বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গসজ্জা—রচনারীতি, গদ্যরীতি ও ভাষাদর্শ আলোচনা এই অধ্যায়ের একমাত্র লক্ষ্য।

যুদ্ধ সমকালে বাংলা কথাসাহিত্যে নানান বিপরীতমুখী স্রোতের সমাহার ঘটেছে। যেমন এই সময়ের বিপ্লবী, জাতীয় রাজনৈতিক ছোটবড দলগুলির মধ্যে এবং পুরনো-নতুন মতবাদের অনুসারী মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি, অস্থিরতা, মতাদর্শগত সংঘাতের রূপ মজ্জাগত ছিল, তেমনি কথাসাহিত্যেও ছিল বিষয় ও শিল্পরীতির বিভ্রান্তি, অস্থিত-চিত্ততার নিগূঢ় প্রয়োগ। আমরা প্রধানত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় তার স্বরূপই তুলে ধরবো পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে। যুদ্ধ-সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশ ও অবস্থা এবং কথাসাহিত্যধারাই উত্তরকালের সর্বদিকের গতি-প্রকৃতির একমাত্র নিয়ামক।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

১ 'সভ্যতার সংকট' জন্মোৎসবের ভাষণ : ১লা বৈশাখ, ১৩৪৮ রবীন্দ্রনাথ

২, ৩ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস ১ম খণ্ড প্রথম পর্ব-নবম অধ্যায় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় পৃ ৮৭, ৮৭

৪ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা (ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮) চতুর্দশ অধ্যায় নরহরি কবিরাজ পৃ ২১৫

৫ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস প্রথম পর্ব : পঞ্চম অধ্যায় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় পৃ ৪৯

৬, ৭ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা (ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮) চতুর্দশ অধ্যায় নরহরি কবিরাজ পৃ ২১৬, ২২১

৮ 'সাময়িকী' ভারতবর্ষ ২৭ বর্ষ ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৪৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ পৃ ৬৩৭-৬৩৮

৯ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড ৬ষ্ঠ পর্ব ত্রয়োদশ অধ্যায় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় পৃ ৭৮৮

১০ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নরহরি কবিরাজ চতুর্দশ অধ্যায় 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতের জাতীয় আন্দোলন' পৃ ২১৮

১১-১৫ বাংলাদেশের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) ড° রমেশচন্দ্র মজুমদার পৃ ৩৬৬, ত্রয়োদশ অধ্যায় পৃ ৪৬৫, ৪৬৫, ৩৫৮, ৩৫৯

১৬-১৮ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ষষ্ঠ পর্ব ত্রয়োদশ অধ্যায় পৃ ৭৮৮, ৭৮৯, ৭৯০

১৯ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নরহরি কবিরাজ চতুর্দশ অধ্যায় পৃ ২২৫-২২৬

২০ শনিবারের চি ঠি সম্পাদক-সজনীকান্ত দাস ১৪শ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ সংবাদ সাহিত্য পৃ ৪৪১-৪৪৪

২১ ভারতবর্ষ ৩০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ভাদ্র, ১৩৪৯ পৃ ২৯৪-২৯৫

২২, ২৩ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ষষ্ঠ পর্ব দ্বাদশ অধ্যায় পৃ ৭০৫ ৭৮৬

তৃতীয় অধ্যায়

গতানুগতিক বিষয় ও ভাবধারার অনুস্থিতি

এক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশ সম্যকভাবে অনুভব করে যে সে একটি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অন্তর্ভূক্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। এই অনুভব নিশ্চয়ই বিগত দুই-শতকের—যে সময় থেকে বৃটিশ শাসন স্থায়ীভাবে ভারতের বুকে চেপে বসে—সেই সময় থেকেই তীব্র থেকে তীব্রতর হয় বটে, তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে, সমস্ত প্রতিবাদ সত্বেও যুদ্ধরত রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করায় সেই তীব্রতা চরম অবস্থায় চলে আসে। ভারত তথা বাংলাদেশে যে একাধিক ঘটনায় একের পর এক ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তন ঘটে, তারই সূত্রে আসে সাহিত্য ভাবনার আমূল রূপান্তর। সেই হল বাংলা কথা-সাহিত্যের অগ্নিপরীক্ষার কালের একমাত্র সূচক।

বাংলা কথাসাহিত্যে এই পরিবর্তন একের পর এক নতুন নতুন প্রবণতা নিয়ে আসে। সমুদ্র তীরে আকস্মিক ভেসে আসা এক একটি বড় বড় ঢেউ যেমন পাড় ভেঙে এক একটি কঠিন রেখা এঁকে দিয়ে যায়, তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ঢেউ বাংলা কথা-সাহিত্যের প্রবাহে এক একটি নির্দিষ্ট ধাপ সৃষ্টি করে দেয়। সেই সৃষ্টিগুলি বিশ্বযুদ্ধেরই প্রত্যক্ষ লিখন। এই লক্ষণীয় পরিবর্তনের সময় একজন সৃজনশীল কথাসাহিত্যিক যথেষ্ট সচেতন হলেও সমস্ত সমকালীন ঘটনার প্রতিচিত্রণে রচনাকে সমৃদ্ধ করতে পারেন না। এই বক্তব্যের স্বপক্ষে এক সমালোচকের মন্তব্য যথার্থ বলে মনে করি,—
'A creative writer cannot keep pace with the world, he is, as we have seen, an old-fashioned camera, needing to be carefully focussed, and capable of giving an exquisite and original picture of a subject within his range—he is not a cine-camera, and it is not he who will present current events to the eyes and ears of the world.'[১]

সচেতন প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন কথাসাহিত্যিক অবশ্যই দেখেন সমালোচক-কথিত **'an exquisite and original picture of subject within his range.'**। কিন্তু ঠিক

এমন বদলের সময়ে বহু লেখক আছেন যাঁরা আদৌ সেটুকুও করেন না, বা করার মত শক্তিধর হন না। তাঁরা হন গতানুগতিক কথাসাহিত্য ধারার ধারক, বাহক, পোষক ও স্রষ্টা। যে পরিবর্তন সম্ভব হতে চলছে যুগের কারণে, বিশ্বযুদ্ধের মত এক ব্যাপক বিশ্বগ্রাসী বৃহত্তম ঘটনার অভিঘাতে, সেই পরিবর্তনকে শিল্পসম্মতভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা তাঁদের থাকে না। তাঁরা সমস্ত ঘটনা দেখেন, তার ভাগী হন সমকালের পরিবেশে, কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির সময় সে সব থেকে সম্পূর্ণ বিবিক্ত থেকেই চিন্তাকে ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন।

প্রথমত শিল্প-ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, দ্বিতীয়ত ঘটনাকে শিল্পীত করার মত যোগ্যতা-হীনতাই তাঁদের গতানুগতিক ধারার অনুপন্থী করে তোলে। তাঁরা অবশ্যই পাঠক পান, কিন্তু সে পাঠকও তাঁদের নিজেদের মত জাগতিক বাস্তব প্রয়োজনের সমস্ত কিছুর মধ্যে বেঁচে থেকে এক অদ্ভুত বিলাসিতায় 'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি' থেকে একটু স্বতন্ত্র স্বাদ গ্রহণেই তৃপ্ত থাকেন। যা কিছু প্রচলিত, পূর্ববর্তী ধ্যান-ধারণার একান্ত অনুগত, বশংবদ—তা গ্রহণেই তাঁরা সিদ্ধকাম। তাই এদের ভরসায় প্রতি কালেই একদল জনপ্রিয় কথা-সাহিত্যিক থাকেন যাঁরা নিজেদের জগতটুকুর বাইরে যাওয়ার বাসনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করেই সাহিত্য রচনায় নিবিষ্ট হতে ভালবাসেন। 'The popular novelist do not criticize or challenge. They do not look all round an accepted belief to see whether it looks as splendid underneath as it does on top. They accept the feelings and beliefs of the ordinary uncritical man and woman.'[২]

এই সমস্ত জনপ্রিয় সাহিত্যিক বেশীর ভাগই গতানুগতিক ধারাকে চিহ্নিত করেন। পাঠক জনতার ('reading public') তুষ্টি সাধন করতে বসে যে বিষয় তাঁরা আঁকড়ে থাকেন তার সঙ্গে বিশেষ একটি সময়ের লক্ষণীয় পরিবর্তনের, অবধারিত সমাজ-ন্যায়ের বিশিষ্ট রূপান্তরগুলির কোন যোগই থাকে না, থাকে না সময়কে যথাযথভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার অমোঘ নির্দেশ, সহজ সত্যসন্ধ প্রতিশ্রুতি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে গতানুগতিক ভাবনার মনোরম গন্ধে অনুসৃতি জনপ্রিয়তা আনে, আর এই জনপ্রিয়তার জন্য সৃষ্ট উপন্যাসগুলি—'not good books, whose vitality springs from an inner source, but poor books, on which the colour of life was reflected from their readers.'[৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই বাংলাদেশে একদল লেখক ছিলেন যাঁরা নিজেদের মনের জগতটুকু নিয়েই কথাসাহিত্যে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত, উপন্যাস ও ছোটগল্পের বাঁধা ছকে, বিষয়ের অতি-পরিচিত নিয়মানুগ অভ্যস্ততায় পূর্ণ-পরিতৃপ্ত, আত্মসুখী। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর আমাদের আলোচ্য সময়সীমায় তাঁরা এবং নতুন কিছু কথাসাহিত্যিক সেই জগতে থেকেই সৃষ্টির মধ্যে নিমজ্জিত থেকেছেন স্বকপোলকল্পিত মানসিক আরাম, বিলাস, প্রশান্তিতে। তাঁরা মূলত মানসিকতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখক এবং এই শ্রেণীর লেখক বিশ শতকের গোড়া থেকেই এমন একজাতীয় উপন্যাসধারার স্থায়ী প্রবাহ বজায় রাখতে সক্ষম হন, যা –'nourished the imaginations of a great many people with food which they found pleasant.'[৪]

আমরা এই প্রসঙ্গে সেইসব লেখকদের কথাই স্মরণ করছি, যাঁরা যুদ্ধ-সমকালে প্রচুর লিখেও সহৃদয় শিক্ষিত পাঠকদের প্রাগ্রসর কোন চিন্তায় দীপিত করতে পারেন নি, বাংলা কথাসাহিত্যকে নিয়ে যেতে পারেন নি কোন নতুন জায়গায়, কোন নতুন প্রাণের উজ্জীবনে সহায়ক সবুজ জমিতে—যেখান থেকে উত্তরসূরী লেখকরা সুস্থ প্রেরণা, প্রশ্ন ও প্রাণ পেতে পারেন। 'Writers who feel unable to come to terms with the world at large tend to retreat into the only corner they can feel reasonably sure of—…the tendency of the twentieth-century middle class writer either to turn in on himself and become entirely involved in his own neuroses or else to confine himself to an exceedingly narrow world in which he happens to feel at home.'[৫]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভাবনীয় পরস্পর বিপরীতমুখী ঘটনার ভয়াল উতরোলের মধ্যে এঁরা একটি নিজস্ব জগত তৈরী করে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন লেখক হিসেবে। তা-ই হল তাঁদের 'Exceedingly narrow world'। কোন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পক্ষে যখনি অন্য একটি উন্নত রাষ্ট্র শাসক হয়ে দেখা দেয়, তখন সেই শাসক-রাষ্ট্রের উন্নত সমাজ-ব্যবস্থা অনুন্নত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সমাজ-ব্যবস্থাকে এমনভাবে নেতৃত্ব দেয়, যার ফলে একে একে শোষণ, রক্ষণ, পরিচালন ও শেষে অস্বীকার করার মত অবস্থা স্বাভাবিক-ভাবেই তৈরী হয়ে যায়। এমন বক্তব্য রেখেছেন মহিলা অধ্যাপক-সমালোচক Moly Mahood তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থে,—'The approach of the technically developed societies to technically undeveloped has been first to exploit, then to protect, then to assist, and then to ignore.'[৬] যুদ্ধ-সমকালে যখন বাংলাদেশ সামগ্রিকভাবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশাসনে ও শোষণে পর্যুদস্ত, তখন এক দল কথাসাহিত্যিক যে আয়াসহীনভাবে মধ্যবিত্ত মানসিকতায় গম্ভীর-সন্তুষ্ট থেকে কথা সাহিত্যের স্তূপ বৃদ্ধি করবেন, তা তাঁদের ঔপনিবেশিক স্বভাব ও মানসিকতার পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা।

যুদ্ধ-সমকালে যে কোন যুদ্ধ-আক্রান্ত এমন রাষ্ট্রে জনমানস প্রধানত দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একদল শোষিত, আর একদল শোষক। শোষিতদের মধ্যে নিম্নবিত্ত, গরীব অথচ শিক্ষিতরা আছে। শোষকদের মধ্যে শুধুমাত্র রাষ্ট্র-পরিচালক-গোষ্ঠী নয়, সেই সঙ্গে অর্থের কৌলীন্যে সমাজের ওপর-তলায় বসবাসকারী মানুষও আছে। যারা নিম্নবিত্ত শিক্ষিত, গরীব-শিক্ষিত তারা কথাসাহিত্য-পাঠকে গ্রহণ করে নিছক আনন্দ উপভোগের মাধ্যম হিসেবেই। সেইভাবেই তাদের মানস গঠন, নির্মাণ করা হয় বুর্জোয়া সমাজে। সমাজের ওপরতলার বিলাসী আত্মতৃপ্ত স্বার্থপর ভোগী সুখী মানুষের কাছেও যুদ্ধ-সমকালে বিলাসের সাহিত্যই কাম্য হয়। এইভাবে 'পাঠক-জনতার মধ্যে' 'এভারেজ' পাঠক সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। আর, সেই কারণেই, আঠারো শতকের শেষদিকের ইংরেজী জনপ্রিয় উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এক বিদেশী সমালোচক যে মূল্যবান একটি উক্তি করেছেন, আমরা আমাদের এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর মন্তব্যটিকে একমাত্র প্রামাণ্য হিসেবে মেনে নিতে ইচ্ছুক—'...There is a large body of fiction which fed the appetite of the reading public, reflected and shaped their imaginations, and somtime broke out into experiment and creative adventure In this tract of generation of readers took their pleasure.[৭]

আমাদের দেশে দেখা গেছে, যুদ্ধ-সমকালের লেখকরা যখনি সাধারণ পাঠককে আনন্দ দেওয়ার জন্য এবং তাঁদের আনন্দে তৃপ্ত থাকার জন্য উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছেন, তখনি তা হয়েছে শিল্পের দিক থেকে ছোট মাপের সৃষ্টি। '...The two chief facts about the novel are its popularity as a form of entertainment and its inferiority as a form of art.'[৮] বিশুদ্ধ শিল্পের মাপে যথেষ্ট খাটো হওয়ার জন্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালের গতানুগতিক ও অনুল্লেখ্য বেশ কিছু কথাসাহিত্যিকদের নাম ও কিছু গ্রন্থের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেই তাঁদের প্রবণতা বোঝাব চেষ্টা করা যাক আপাতত।

অবশ্যই এমন গতানুগতিক ধারা চলতে চলতেই তারই প্রবাহের মধ্যে দেখা দিয়েছেন এমন কিছু প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন কথাসাহিত্যিক যাঁরা সংখ্যায় অল্প হলেও পরীক্ষা করেছেন উপন্যাস ও ছোটগল্পের সমকালীন বিষয় নির্বাচনে, রচনার বিশেষ আঙ্গিক গ্রহণে এবং যুদ্ধ-সমকালকে নীলকণ্ঠের মত ধারণ করে রূঢ় বাস্তবতায় তার চিত্রের প্রাগ্রসর প্রতি-চিত্রণে। তাঁদের রচনা ধরেই আমাদের পরবর্তী অধ্যায়গুলির বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

যুদ্ধের সমকালে বাংলা কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁদের গতানুগতিক লেখক ধারায় রাখতে চাই, তাঁরা বস্তুত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময় থেকেই একে একে সাহিত্যের আসর জুড়ে বসেন। অল্প ক্ষমতা-সম্পন্ন শরৎচন্দ্র-অনুকারী ও প্রভাবিত লেখকগোষ্ঠী, কল্লোলের কালের অপ্রধান কথাসাহিত্যিককুল এই আসরের প্রধান কুশীলব। অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন পাঠকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিটোল গল্প পড়ে নিছক আনন্দটুকু পাওয়ার বাসনাও বাড়ে। তাই আমাদের দেশের একজন প্রবীণ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ও প্রাজ্ঞ সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন,—'দ্বিতীয় দশকের শেষের দিক হইতে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, বিবাহের নবদম্পতীকে বই উপহার দেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়। এই চাহিদার ফলে অল্পমূল্যের অথচ-ভালো ছাপা ও বাঁধাই, দুই একটি ছবিওযালা, উপযোগী নামযুক্ত উপন্যাসের উৎপাদন ও বিক্রয় বেশ বাড়িয়া গিয়াছিল। ভালো, মাঝারি, নিরেশ—সব রকমের লেখকই প্রীতি-উপহার উপন্যাস রচনায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কোন কোন লেখক বছরে চার পাঁচখানি করিয়া উপন্যাস অথবা গল্পের বই বাহির করিতেন।'[৯] ডঃ সেনের এই মন্তব্য সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য। তবে হাল্কা ধরণের বাজার চাহিদা মেটানোর সঙ্গে যুদ্ধ-সমকাল পর্যন্ত এই ধরণের গ্রন্থাদি রচনার অন্য সামাজিক কারণও ছিল। সমস্ত বাস্তব দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে সরিয়ে এনে মানুষকে কিছু সময় ভোলানোর চেষ্টা, লেখকদের পলায়নী মনোবৃত্তি, মধ্যবিত্ত পাঠক-জনতার মনকে নিজ নিজ ক্ষমতা মত লালন করে লেখকদের চটকদারি মুনাফা করার বাসনা, গাল-গল্প, সস্তা প্রেমের কথায় পাঠকদের তন্দ্রালু করার মত ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত মানসিকতা—এ সবও এমন রচনাধারা বজায় রাখার পিছনে কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো বা পরোক্ষভাবে কাজ করেছে। অবশ্যই এইসব গ্রন্থের লেখকদের পাঠক-উপযোগী বাংলা গদ্য লেখার এবং বানানো গল্প বলার ক্ষমতা ছিল বলেই ডঃ সেন একটি যথার্থ মন্তব্য করেছেন,—'সাময়িক প্রয়োজনের ফসল হইলেও এই সবই একেবারে নির্গুণ নয়।'[১০]

গতানুগতিক ধারায় লেখকরা তাঁদের গল্প-উপন্যাস দিয়ে যুদ্ধ-সমকালের পাঠক-জনতার রুদ্ধশ্বাস মনের অবস্থায় কিছুটা 'Relief' দানের কাজ করেছেন। লেখার নিটোল কাহিনী, রোমান্টিক ও মেলোড্রামাটিক প্রেমকথা, বানানো আবেগাত্মক সেন্টিমেন্টাল করুণ রসপূর্ণ দুঃখকথা, সাধারণের অভাব-অভিযোগকে সুন্দরভাবে এবং মিষ্টি গদ্যে ও ভাষায় বলতে পেরেছেন বলেই 'একেবারে নির্গুণ' না হয়ে লেখাগুলি 'এ্যাভারেজ' পাঠকদের মর্মে গিয়ে আসন গ্রহণ করে যুদ্ধ-সমকালীন পরিবেশে।

দুই

সাধারণ মামুলি প্রেমের কাহিনী সরস ভাষায় ও মনোরম করে বলে পাঠকদের মন সহজেই জয় করা যায়। খ্যাতকীর্তি লেখকরা প্রেমের কথায় কিছু স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য রাখতে সমর্থ হন। অন্যত্র তাঁদের প্রসঙ্গ আলোচ্য হবে। গতানুগতিক ধারার কথাসাহিত্যে প্রেমের একেবারেই মামুলি নিটোল গল্প-রসেই যেসব লেখক ব্যস্ত থেকেছেন, তাঁরাই আপাতত এখানে আলোচ্য। অবশ্যই গতানুগতিকতার মধ্যেও কিছু অল্পক্ষমতা-সম্পন্ন লেখক কোন কোন গ্রন্থে গতানুগতিক বিষয় বাদ দিয়ে বিষয়ে বৈচিত্র্য আনতে সচেষ্ট থেকেছেন। সেই বিষয়-বৈচিত্র্য সমকালের ঘটনা, পরিবেশ ইত্যাদির অনুগত হতে দেখা যায় কোন কোন দিক থেকে।

নীরেন্দ্রনাথ রায় একালের একজন বিশিষ্ট অত্যন্ত মননশীল প্রবন্ধকার। তিনি যুদ্ধ-সমকালে রচনা করেছেন 'দাবী' নামের বড় গল্পের আকারে ছোট উপন্যাস বা নভেলেট। উপন্যাসটির মূল বিষয় গতানুগতিক প্রেম এবং সেই প্রেম হাল্কা রোমান্সরসে সিক্ত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকেব সমাজ-ভাবনা ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের স্বাভাবিক ক্ষমতা। কিন্তু উপন্যাসটির নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রগুলির শিল্পন্যায় আদৌ রক্ষা করতে পারেন নি। চরিত্রগুলি উপন্যাসের শেষে কয়েকটি নীরস 'টাইপ'-এ রূপ নিয়েছে। নায়ক-নায়িকার প্রেমের নিষ্ফলত্ব লেখকের শিল্প-উদ্দেশ্যের কেন্দ্রে প্রধান বিষয়।

পশুপতি ভট্টাচার্য 'অবশ্যম্ভাবী' উপন্যাসে তাঁর শিল্প ক্ষমতার অক্ষম দিকটির প্রমাণই রেখেছেন নায়ক রাসবিহারী চরিত্রটির জীবন-বৃত্তান্ত অঙ্কনে। এই চরিত্র আদৌ স্বাভাবিক ও সহজ হয়নি, কারণ, লেখক একাধিক মেলোড্রামাটিক ঘটনা যোগ করেছেন। সে সব ঘটনা চরিত্রের অন্তর-প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়-সম্পৃক্ত নয়। তারিণীকমল পণ্ডিতের 'দেবী' নামের উপন্যাসটি একেবারেই বঙ্কিমী যুগের স্মৃতি টেনে আনে। বিশ শতকের চারের দশকে উপন্যাস লিখতে বসে তিনি বঙ্কিমের শিল্পাদর্শের মূল শক্তিকে এতটুকুও গ্রহণ করতে না পেরে হাস্যকরভাবে তাঁর অনুসরণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। গ্রন্থে লেখক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের একটি ভূমিকা আছে, তা থেকে জানা যায়, 'দেবী' উপন্যাসের অধিকাংশ বিষয় লেখকের ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতা-অনুসারী। কিন্তু অভিজ্ঞতা শৈল্পিক-কল্পনায় সংযত ও দীপ্ত হয় নি আদৌ। লেখকের স্থূল নীতিকথায় উপন্যাসের অপমৃত্যু ঘটেছে কাহিনী সূত্রে। উপন্যাসের কাহিনী ও ঘটনার একাধিক অসঙ্গতি, লেখকের সংযমের অভাব 'দেবী' উপন্যাসকে হাস্যকর করেছে।

'পাষণপাদপ' গল্প সংকলনের তিনটি গল্পেই আর এক কথাকার জ্যোতি সেন গতানু-

গতিক ভাবনার অনুপন্থী। নাম গল্পটির ভরঘুরে নায়ক শুভঙ্কর ও নায়িকা সিসিলের যে প্রেম বা অন্য এক গল্পের যক্ষারোগাক্রান্ত নায়কের যে মানস ভাবনা তা যতটা যুক্তি-গ্রাহ্য তার থেকেও বেশী সেন্টিমেন্টাল, আবেগাত্মক। যুদ্ধ-সমকালে অবশ্যই এই জাতীয় আবেগময়তা—যা পূর্বসূরী মনীন্দ্রলাল বসু প্রমুখের রচনায় অত্যধিক ছিল, তাতে সাধারণ পাঠক আবিষ্ট হত সহজেই। 'পরিচয়' পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ সালে প্রকাশিত 'প্যানথার' গল্পে লেখক রজত সেন বেকার এম. এ. পাশ নায়ক হিরণ্ময়ের চরিত্র আঁকতে বসে যে প্রেমের কথা শুনিয়েছেন, তার মধ্যে অভিনবত্ব বা প্রেম ভাবনার বিশুদ্ধ কোন উত্তরণ অথবা সমকালীন সামাজিক বাস্তব কোন সমস্যার ছায়াপাত নেই। হিরণ্ময়ের প্রেমিকা ধনী কন্যা মায়া তার প্রেমিকের জন্য চাকরীর চেষ্টা করছিল কিন্তু তার বাবার বিরূপ কথায় সে এগোতে পারে না। গ্রামে বাবা মারা যাবার পর অবিবাহিতা বোন ও বিধবা মাকে নিয়ে আসে কলকাতায় এবং 'কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কে' চাকরীও পায় নিজের চেষ্টায়। সে কলকাতায় আসে মায়ার অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাওয়ার সংবাদে। গল্পের শেষে আছে চিরাচরিত চমক। হিরণ্ময় যে ব্যাঙ্কের কাজে একান্ত অক্ষম তা তার নিয়োগকর্তা বড়সাহেব মিঃ মিত্র বুঝতে পেরে ভীষণ তিরস্কার করে তাকে। আর তখন তার কাছে আছে মিঃ মিত্রের জন্য কেটে আনা মেট্রো সিনেমা হলের একটি টিকিট। তিরস্কারের পর মিঃ মিত্র যখন গাড়িতে ওঠে, তখনই হিরণ্ময়ের চোখে পড়ে সেই 'প্যানথার' গাড়িটায় আর একজন মহিলাযাত্রী, তারই প্রেমিকা মায়া। এই গল্পের নায়কের মনে পরিণামী বিপরীত অনুভূতি যে করুণ রস ও আকস্মিকতার সৃষ্টি করে, তা সাধারণ পাঠকের উপভোগ্য হলেও গল্পের কোন বড় বক্তব্য তুলে ধরে না।

এমন বহু অখ্যাতনামা ও নতুন লেখক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন। যুদ্ধ-সমকালে সেইসব লেখকের লেখনী বন্ধ বা মন্থর না হয়ে বরং নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ব্যস্ত থেকেছে। এই সময়ের যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত, সেগুলি সমকালের সমাজ-বাস্তবতাকে গ্রহণ করেনি, কোন কোন ক্ষেত্রে করলেও যথার্থ শিল্পের মর্যাদায় সেসব চিত্রিত হয়নি। এই লেখককুল সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত এক ইতিহাসকার বলেছেন,—'বর্তমান শতাব্দের দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ দশকের গল্প-উপন্যাস লেখকদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা স্বতন্ত্র গ্রন্থ সাপেক্ষ। ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রস্তুত গ্রন্থের পরিধিতে কুলাইবে না।'[১১] আমরাও এই মতের অনুপন্থী। তবে এই ইতিহাসকার তাঁর গ্রন্থে যাঁদের 'একত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত'[১২] হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত কথাকারদেরও নাম আছে। আমরা তাঁদের

বাদ দিয়ে, কারণ তাঁদের যুদ্ধ-সমকালের রচনা প্রসঙ্গ বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রসঙ্গ-অনুযায়ী বিস্তৃত আলোচনা করেছি, উৎসাহী অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের উল্লেখিত ইতিহাস-কারের রচিত অন্য কথাকারদের সেই প্রস্তুত তালিকাটি[১৩] দেখতে অনুরোধ কবি।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, যখন একটা সময় লক্ষণীয় রূপান্তরের সম্মুখীন, মানুষের নির্দিষ্ট সমাজ ভাঙতে ভাঙতে অন্য এক কেন্দ্রের দিকে যেতে উৎসুক, তখন সেই সমাজভুক্ত সেই সমাজের অনুবর্তী কিছু বুদ্ধিজীবী, বিশেষ করে কথাসাহিত্যিক যেমন রূপান্তর ও ভাঙনকে টীকা-ভাষ্যে, জীবনের ব্যাখ্যায় ধরতে উৎসুক থাকেন, তেমনি বহু অল্প-ক্ষমতা-সম্পন্ন লেখক সমস্ত বিপ্লব, আন্দোলন, রূপান্তর, ভাঙন থেকে সম্পূর্ণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আত্মতৃপ্ত সহজ সরল গালগল্প ও প্রণয় কথাকে প্রধান করে একজাতীয় সাহিত্য ভাবনায় রত থাকতে অভ্যস্ত হন। যুদ্ধ-সমকালে এমন দ্বিতীয়-দলের লেখক সংখ্যাতীত ছিলেন। তাঁদেব বেশ কিছু নামের উল্লেখ উপবি-উক্ত ইতিহাসকারের তালিকায় মেলে।

অবশ্যই এই অক্ষম, জীবনকে সহজ সরল করে দেখতে অভ্যস্ত লেখক বাংলাদেশের উনিশ শতকে বঙ্কিমের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেও কম সংখ্যায় দেখা যায় নি। বঙ্কিম-চন্দ্রের দীপ্ত প্রতিভার সমকক্ষ সে সময়ে কেউ ছিলেন না। তাঁর যাঁবা অনুকারী ছিলেন, তাঁদেব ক্ষমতাও স্বক্ষেত্রে কম নয়। কিন্তু তাঁদেব বাদ দিয়েও একদল কথাসাহিত্যিক হালকা জীবনযাপনেব বিলাসগুলিকে বিষয় করে উপন্যাস ও গল্প লিখেছেন, যেগুলির উল্লেখ শুধু ইতিহাসেই থাকে, 'দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে ফেলে যাওয়া' আগাছার মতই তাদের মর্যাদা। এমন সাহিত্যিককুল বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ ও শবৎ-চন্দ্রকে অনুকরণ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আরও ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব সময় পর্যন্ত এই অনুল্লেখ্য কথাসাহিত্যিকের দল বাংলা কথা-সাহিত্যের দীপ্তি ও বেগকে এতটুকু না বৃদ্ধি করে বরং তার ভারকে আরও বেশী ওজন দিয়েছেন।

যুদ্ধ-সমকালের গতানুগতিক ধারার বহু গল্পকার ও ঔপন্যাসিক এমন ভার যোগ করেছেন কথাসাহিত্যের ধারায়। এই জাতীয় সাহিত্য-রচনা সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থায় সম্ভব। জীবনের কোন দায়-দায়িত্ব-ভাবনা নয়, সুখী সময়ের মধ্যে কোনরকমে মুখ লুকিয়ে নিজেকে লালন করা এই বুর্জোয়া লেখক ও পাঠকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধ-সমকালের অপ্রধান ও অনুল্লেখ্য লেখকরা সেই বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের রচনায়।

একজন এদেশীয় সমালোচক বলেছেন, 'সাংস্কৃতিক সংকটের প্রভাব যেহেতু দুরবগাহ

ঠিক সেই হেতুই সাংস্কৃতিক সংকটমোচন বড় কঠিন।'[১৪] যুদ্ধ সমকাল ইতিহাসের সমস্ত দিকের মত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংকট দেখা দেওয়ার পক্ষেও এক বিশেষ চিহ্নিত সময়। এই সময়ে আবির্ভূত লেখকরা সচেতনভাবে তাঁদের ছোটগল্প ও উপন্যাসে সময়ের সাংস্কৃতিক সংকটকে চিত্রিত করতে সচেষ্ট ছিলেন, সংকট মোচনে তাঁদের সক্রিয়তা, অন্তত কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে, তেমন স্পষ্ট হয় নি, হতে পারে না। কারণ, এর পক্ষে আমাদের যুক্তি উপরিউক্ত সমালোচকের যুক্তির অনুরূপ। গতানুগতিক ধারার লেখক সেই সংকটকে করেছেন উপেক্ষা, অস্বীকার, অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়েছেন বিস্মৃত। এই বিস্মৃতি একদিকে, অন্যদিকে চটুল গ্রন্থ রচনার বাসনার উল্লাস। এর ফলে তাঁরা দায়িত্ব সম্পূর্ণ এড়িয়ে নিদ্রাভিভূত মধ্যবিত্ত আরাম-পিপাসু পাঠকদের কাছাকাছি থেকে, তাদের একান্ত সীমিত বোধ ও বুদ্ধির ওম্ গ্রহণ করে তৃপ্ত থেকেছেন।

স্বভাবতই এমন গতানুগতিক রচনা পর্বত প্রমাণ হয়েছে বাংলা কথাসাহিত্যের প্রবাহে। পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'মিলন লগ্ন,' রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের, 'কলঙ্কিনীর থাল', আশীষ গুপ্তের 'স্বপ্ন দেখা মেয়ে,' নবগোপাল দাসের উপন্যাস 'নিঃসহ যৌবন', গল্পগ্রন্থ 'তারা একদিন ভালোবেসেছিল', আশালতা সিংহের 'কলেজের মেয়ে', ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের 'তুহুঁ মম জীবন,' গৌতম সেনের, 'প্রিয়া ও মানসী,' অমলা দেবীর 'সুধার প্রেম' ইত্যাদি গ্রন্থের কাহিনীর বিষয় ও প্রতিপাদ্য যেমন, তেমনি চটকদারী গ্রন্থ-নামগুলিও প্রমাণ করে, এই ধারার লেখকরা যুদ্ধের রক্তক্ষয়ী, সর্বমানবতা-বিধ্বংসী পবিবেশে কি মানসিকতায় লেখনী চালনা করে গেছেন নির্বিবাদে।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই এক ধরণের অবধারিত হতাশা, অনিশ্চয়তা, মৃত্যু-ভয়, চরম দারিদ্র্য, বিষাদগ্রস্ততা, জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব-চিন্তা থেকে যায়। যুদ্ধ-সমকালের গতানুগতিক ধারায় লেখকদের গল্প-উপন্যাস রচনার প্রয়াস বস্তুত এমন অবস্থায় একধরণের পলায়নী মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। এই মানসিকতা সভ্যতার ক্রমবিকাশে যতদিন বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা বজায় থাকবে, ততদিনই দুরারোগ্য ব্যাধির মত থেকে যাবে। ভারত তথা বাংলাদেশের মত ঔপনিবেশিক যুদ্ধ-আক্রান্ত রাষ্ট্রে তা সমাজ-বিকাশের স্বার্থেই থেকে গেছে। গতানুগতিক ধারার লেখককুল তাই যেমন স্ব-ক্ষমতার সীমা চিহ্নিত করে, তেমনি স্ব-কালীন সমাজের শিকারও হয়ে ওঠে। যুদ্ধ সমকালে লিখতে বসে রসের সাহিত্যে হাল্‌কা পানসে রস পরিবেশন করে অধম লেখকরা শুধু শয্যা-শয়নের সুখটুকুই ভোগ করার ব্যবস্থা করেন নি, সেই সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার

চিরকালের বুর্জোয়াদের চিরকালের সুখনিদ্রার ব্যবস্থাও পাকা করতে চেয়েছিলেন। ভরসা, সে সময়ের অতি সচেতন লেখকরা। তাঁরা সময়, যুগ ও যুদ্ধ-পরিবেশকে নীলকণ্ঠের মতো সাহিত্যে গ্রহণ করায় আমরা আজও আশাবাদী।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

১ A Treatise of the Novel (1965) Robert Liddell Ch. 11 The Novelist's Range p 49-50

২ 'The Dangers of Fiction' Essay by Storm Jameson Society in Focus (1961) Edited by Denys Thompson P 62-63

৩ The Popular Novel in England 1770-1800 (1969) J.M.S Tompkins Preface P v-vi

৪ Ibid Ch II 'Old Patterns in the Novel' P 69

৫ An Introduction to the English Novel (Vol 2): From Henry James to 1950 Arnold Kettle Introduction P 149

৬ The Colonial Encounter: A Reading of Six Novels M. M. Mahood Ch 'Conclusion' P 187

৭ The Popular Novel in England 1770-1800 (1969) J M S Tompkins Preface P v

৮ Ibid Ch I The Novel Market P 1

৯-১৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড) (১৮৯১—১৯৪১) ডঃ সুকুমার সেন সংস্করণ ১৯৬৩ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : গল্প উপন্যাস ২২ পৃ ৩৫০ ৩৫০, ৩৫০ ৩৫০, ৩৫০—৩৫৪

১৪ 'মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির সংকট আর একটি দিক' প্রবন্ধ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় শারদীয়া আনন্দ বাজার পত্রিকা ১৩৮৭ পৃ ২৩

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চিত্র

এক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের কথাসাহিত্যে যে ব্যাপক বৈচিত্র্য দেখা দেয়, তার মূল কারণ সম-সময়ের অভিনব বিচিত্র ঘটনা-প্রবাহ ও পরিবেশ। বিশ শতকের মধ্যভাগে এমন একটি বৃহত্তম ও জটিলতম ঘটনার সূত্রেই অনেকাংশে উপজাত (By product) অংশের মত অবধারিত হয় খাদ্যাভাব, ভয়াবহ মন্বন্তর, যুদ্ধ-ভয়ে ভীত মানুষের শহরজীবন ত্যাগ, তীব্রতম রাজনৈতিক অস্থিরতা, গণ-বিক্ষোভ দেশীয় অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সামাজিক অবক্ষয়, ক্ষুধা-পীড়িত গ্রাম-মানুষের শহরমুখী হওয়ার স্থির-নির্দিষ্ট প্রবণতা ইত্যাদি।

ছোটগল্প ও ব্যাপকভাবে উপন্যাসে এ সবের অবলম্বন স্বতঃস্ফূর্ত হয়েই সম্ভব হয়। কারণ হিসেবে উপন্যাসের বিষয়-ভাবনায় এক সমালোচকের একটি যুক্তি স্মরণ করি, 'The novel..... explores the variety of life: material, social and psychological—may would say moral and spiritual also.' [১] বাংলা কথাসাহিত্যিকরা উপন্যাস ও ছোটগল্প উভয়তই-variety of life-কে চিত্রিত করতে বসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রূপকেও মাঝে মাঝে শিল্পসম্মতভাবে আঁকতে ভোলেন নি।

এই যুদ্ধ ইউরোপীয় ও এশীয় অন্যান্য রণাঙ্গনের মত ভারত তথা বাংলাদেশের বুকে আদৌ তেমনভাবে পা রাখেনি। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নয়, বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই ভারতের দোরগোড়ায় রণবেশে হুঙ্কার দিয়েছে। তবে যেভাবেই আসুক যুদ্ধ একটি দেশের বুকে তার কালোছায়া ফেলবেই যে কোন ভাবে বা রূপে। যদিও একজন সমালোচক [২] যুদ্ধকে বলেছেন পুরনো এক প্রতারক এবং তার স্বরূপ এখন আমাদের আর তেমন প্রবঞ্চিত করতে পারবে না, তা আমাদের সবুজ শস্যভূমির জীবন থেকে কবরখানার দিকেই পথ দেখায়, তবু বিশ শতকে এর দাপট অনেক বেশী। বিশ্বযুদ্ধ হয় দুই বিবদমান পক্ষের সঙ্গে—যারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী শক্তিধর। আর এই যুদ্ধ আরম্ভ হলে একপক্ষ আর একপক্ষকে ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধোন্মাদেই সোচ্চার হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে বৃটিশ শাসকের পক্ষ থেকে বৃটেনে মিঃ উইনস্টন চার্চিল 'হাউস অফ কমন্সে'

ঘোষণা করেন,—'I hope I may live to see Hitlerism destroyed.'[৩] একদিকে হিটলার-শাসিত জার্মান এবং তার সঙ্গী ইতালী, আর একদিকে বৃটেন-আমেরিকা—এই ছিল দুই যুদ্ধ-উন্মুখ প্রতিপক্ষ। এক পক্ষ আর একপক্ষকে চরম আঘাত হানতে সর্বশক্তি নিয়োগে বদ্ধপরিকর।

যুদ্ধের শুরু থেকে যে সমরায়োজন, তার ভিত্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল। অর্থাৎ যুদ্ধ যে আধুনিকতম সভ্যতার একটি অন্যতম দিকের উপজাত অংশ, তা রাষ্ট্রনায়করা ভেবেছেন পরিকল্পিত মননেই। স্বয়ং চার্চিল তাঁর একটি গ্রন্থে এই যুদ্ধের ভয়াবহতা ও অসহায়তার কথা প্রথম মহাযুদ্ধেরও অনেক আগেই লিপিবদ্ধ করেন। তিনি মন্তব্য করেন,—'In the quarrels of the civilised nation, great armies, many thousands strong, collide...In all this tumult, this wholesale slaughter, the individual and his feelings are utterly lost, only the army has a tale to tell. With events on such a scale, the hopes and fears, the strength and weakness of man are alike undistinguishable.'[৪]

যুদ্ধ ঠিক এমনি প্রভাব ফেলে। যদিও প্রত্যক্ষ ভয়াবহ যুদ্ধের ব্যস্ততম রণাঙ্গন নয়, তবু এই বাংলাদেশের আবাসিকদের মধ্যেও প্রথম দিকে ইউরোপীয় যুদ্ধ ভারতবাসীকে তেমন নাড়া দেয়নি, দেওয়ার কথাও নয়। টানা ছ'বছর ধরে যুদ্ধ যখন তার রথচক্রের গতি তীব্রতর করে দুর্ভাগ্যের ললাট লিখনকে একমাত্র সত্য করে তোলে, তখনি ভারতবাসীর তথা বাংলা দেশীয় সর্বাবয়ব জীবনযাপনকে তা হানে আঘাত। বাঙালীর এই সময়ের মানসিকতাকে চাপা তীক্ষ্ণ তীব্র শ্লেষ দিয়ে স্ব-চিত্রিত করেছেন সে সময়ের একটি বাংলা মাসিকপত্র,—'বর্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের দরুণ যদি আমাদের ব্যবহারিক অসুবিধা কিছু ভোগ করিতে না হইত, তাহা হইলে আমাদের মত সুখী জাত পৃথিবীতে এখন আর কেহ থাকিত না। আমরা নিয়মিত খাইতেছি দাইতেছি এবং যুদ্ধের ভবিষ্যৎ গতি লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিতেছি—এমন সুখের অবস্থা ফুটবল সিজনেই সম্ভব, প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের ব্যাপারটা এতদিন আমাদের কাছে শীল্ডখেলার মতই একটা উত্তেজনার ব্যাপারই ছিল। কাগজের দর বাড়িয়া এবং নোটের ভাঙানির অভাব ঘটিয়া আমাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ অশান্তি দেখা দিয়াছে।'[৫]

যুদ্ধের প্রভাব বাঙালী জীবনে ও মননে আসে ধীরে ধীরে। বাঙালী তরুণ বুদ্ধিজীবী লেখকরা এই যুদ্ধকে আরম্ভের পরবর্তী দু'বছর তেমনভাবে তাঁদের গল্প-উপন্যাসে গ্রহণ না করলেও পরবর্তী যুদ্ধের প্রখর মধ্যাহ্নকালে গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

যুদ্ধের স্বভাবই এই, যেভাবে হোক লেখক-বুদ্ধিজীবীদের তার সঙ্গে জড়িত করবেই। 'যুদ্ধমাত্রেই ধ্বংস ও মৃত্যু আছে, আছে নির্ভীকতা ও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত। তা শুধু নৃশংসতা নিয়েই পাপবৃত্ত রচনা করে না, উত্তেজনার বেড়াজালে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে শক্তি, সাহস ও তারুণ্যকে বন্দী করে ফেলে।'[৬] বাঙালী লেখক, সে সময়ে যাঁরা তরুণ নবাগত—তাঁরা যেমন, তেমনি যাঁরা প্রতিষ্ঠিত তরুণ—তাঁরাও বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যুদ্ধ ঘটনাকে ও পরিবেশকে গল্প-উপন্যাসে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত করেছেন।

কিন্তু সত্যিকারের 'ওয়ার লিটারেচার' বলতে পাশ্চাত্য দেশের লেখকরা যে কথা বুঝিয়েছেন, প্রত্যক্ষ রচনার মাধ্যমে যেভাবে একটি যুদ্ধ-বিষয়ক কথা-সাহিত্যের স্বতন্ত্র ধারাপথ চিহ্নিত করেছেন, তা, আমাদের বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে তৈরী হয়নি। 'War Literature'-এর বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে একজন সমালোচক বলেছেন, 'Honesty, inclusiveness, psychological and moral insight, the accurate notation of experience are all desiderate in war literature, but they are not sufficient in themselves, they must be combined with the search for an appropriate form and the struggle to articulate through this the author's complex vision of the truth.'[৭] জীবনের মধ্যে সত্যের সন্ধানই কথাসাহিত্যিকদের লক্ষ্য হয় নিশ্চয়ই, যুদ্ধ-সাহিত্যেও তার অন্বেষা থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের লেখকরা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ভয়াল ও করাল রূপ দেখেননি। ইউরোপীয় জীবনে অভ্যস্ত লেখকদের অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে সৈনিক ছিলেন। যুদ্ধ-রণাঙ্গনে সর্বদিকের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁদের রক্ত-মাংস-মজ্জা-প্রাণ। তাই শিল্পীমন ও যুদ্ধ-অভিজ্ঞতার বসদ তাঁদের যুদ্ধকে নিযে গল্প-উপন্যাস লেখায় যেভাবে প্রাণিত করেছে, বাংলাদেশের লেখকরা তার ধারে-কাছেও যেতে পারেন নি।

এক কথায় তা সম্ভবও ছিল না। আমাদের দেশের লেখকরা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে সৈনিক হিসেবে অংশ গ্রহণ করেননি, তাঁদের করতে হয়নি। তাঁরা কলকাতা, আসাম সীমান্ত, রেঙ্গুন এবং সারা বাংলাদেশের বুকে কিছু বোমাবর্ষণের ঘটনা, ভয়াবহতা, সাধারণ মানুষের পলায়ন-তৎপরতা ইত্যাদি বিষয়কে গল্প-উপন্যাসে প্রসঙ্গত গ্রহণ করেছেন। সে সবের প্রত্যক্ষ চিত্র নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের লেখকদের মত সেই যুদ্ধ-সত্যকে দর্শন দিয়ে টীকা-ভাষ্যে দীপিত করার কোন সুযোগই তাঁরা পাননি। হেমিংওয়ের 'ফর হুম দি বেল টোলস্' ও 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্', জাঁ পল সার্ত্রের 'উইনডো,' ভগনার-এর 'সীম', রাশিযান লেখক কোজিয়েভের 'স্টালিনগ্রাড', ভা-দা ভাসিলিয়েভস্কার 'রেইনবো', ইলিয়া এরেনবুর্গের 'ফল অব প্যারী', এরিখ মারিয়া রেমার্কের 'অল কোয়ায়েট অন দি

ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট,' টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস', মিথাইল শলোকভের 'এণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন,' জেমস জোন্স্-এর লেখা 'ফ্রম হিয়ার টু ইটার্নিটি' ইত্যাদি বিখ্যাত 'War novel' গুলির মত কোন কথাসাহিত্য বাংলা ভাষায় রচিত হয়নি। এইসব গ্রন্থ সম্পর্কে একটি সাধারণ সত্য, এক সমালোচকের 'War Novelist'-দের সম্পর্কে মন্তব্য-সূত্রে পরিষ্কার হবে,—'War novelists are not sociologists or historians, and neither are they average soldiers. The special training and talent of novelists lead them to express rather special moods. They are usually critically in temper and often they are self-critical to the point of being burdened with feelings of guilt. They are sensitive—about themselves in the begining, but if they have imagination (and they need it) they learn to be sensitive for others, including the conquered peoples......'[৮] বাংলাদেশের লেখকরা এমন সংজ্ঞায় আসতে পারেন না যদিও, তবু যুদ্ধ-বিষয়কে যতটুকু গল্প-উপন্যাসে গ্রহণ করেছেন তাঁরা, তাতে যথেষ্ট ক্ষমতাবান একাধিক বাঙালী কথাসাহিত্যিক লিখেছেন 'to express rather special mocds' এবং সেই সঙ্গে হয়েছেন 'self critical'-ও কোন কোন ক্ষেত্রে।

লক্ষ্য করার বিষয়, যুদ্ধ নিয়ে মহত্তম কথাসাহিত্য রচনা বাংলাসাহিত্যে যুদ্ধ-সমকালে যেমন সম্ভব হয়নি, তেমনি হয়নি যুদ্ধোত্তর কালেও। তবে যুদ্ধ-প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চিত্র এবং প্রভাব বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় নানাভাবে লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যে যুদ্ধ-ভাবনা দেখা গেছে উনিশ শতকের দেশাত্মবোধক গানে, কবিতায়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখের কাহিনী কাব্যে ও মহাকাব্যে যুদ্ধের বর্ণনা আছে দেশাত্মবোধে ও রোমান্স-রসে সিক্ত হয়ে। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং আরও একাধিক নাট্যকারের নাটকে গান ও অন্যান্য প্রসঙ্গে যুদ্ধকথা কিছু পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্য-ধারায় প্রত্যক্ষ যুদ্ধকথা এঁকেছেন 'রাজসিংহ' উপন্যাসে, পরোক্ষভাবে আছে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে। কিন্তু এসব জায়গায় যুদ্ধ ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশের বাইরে এবং সম্পূর্ণ প্রাচীন ঐতিহাসিক পরিবেশে। সেখানে যুদ্ধক্ষেত্র ও পরিবেশে আছে রোমান্সরস এবং মধ্যযুগীয় যুদ্ধ-ব্যবস্থা ও রীতি।

বিশ শতকের আলোচ্য যুদ্ধ-সমকালে কেবল কথাসাহিত্যিকদের নয়, কবিদের নানাধরণের রচনায় এবং চিত্রশিল্পীর চিত্রে যুদ্ধ স্থান পেয়েছে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর এক বন্ধুকে কলকাতায় জাপানী বোমাবর্ষণের অভিজ্ঞতার কথা দীর্ঘ চিঠির মাধ্যমে জানাতে গিয়ে যেভাবে যুদ্ধ-আক্রান্ত শহরের বর্ণনা দিয়েছেন, তা অনেকাংশে সমকালের

প্রত্যক্ষ যুদ্ধ-তথ্যের দলিল বিশেষ। কবি-বন্ধু অরুণাচল বসুকে লিখছেন, '·· কাল রাত্রিতেও আক্রমণ হয়ে গেল, ব্যাপারটা ক্রমশঃ দৈনন্দিন জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে, আর এটা একরকম ভরসারই কথা। গুজবের আধিপত্যও আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে। তোরা এখানকার সঠিক সংবাদ পেয়েছিস কিনা জানি না। তাই আক্রমণের একটা ছোট-খাটো আভাস দিচ্ছি। প্রথম দিন খিদিরপুরে, দ্বিতীয় দিনও খিদিরপুরে, তৃতীয় দিন হাতীবাগান ইত্যাদি বহু অঞ্চলে (এই দিনকার আক্রমণ সবচেয়ে ক্ষতি করে), চতুর্থ দিন ডালহৌসি অঞ্চলে (এইদিন তিন ঘণ্টা আক্রমণ চলে আর নাগরিকদের সবচেয়ে ভীতি উৎপাদন করে, পরদিন কলকাতা প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়) আর পঞ্চম দিনে অর্থাৎ গতকালও আক্রমণ হয়। ······সন্ধ্যায় বৌদির ওখানে পুনর্গমন করলুম এবং সভ্য আলাপেব খাতিরে বৌদির পরিবেশিত চা পান করে আবার বক বক করতে লাগলুম। ······কিছুক্ষণ গল্প করার পর, ৯-১০ এমনি সময় সেদিনকার সবচেয়ে বড ঘটনা ঘটল। বৌদি সহাস্য বলে উঠলেন, বোধহয় সাইরেন বাজছে। রেডিও চলছিল, বন্ধ করতেই সাই-রেনের মর্মভেদী আর্তনাদ কানে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দাদা তাড়াহুডো করে সবাইকে নীচে নিয়ে গেলেন এবং উৎকণ্ঠায় ছুটোছুটি, হৈ-চৈ করে বাডি মাৎ করে দিলেন। এমন সময় রঙ্গমঞ্চে জাপানী বিমানের প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু স্তব্ধ। আর শুরু হয়ে গেল দাদার 'হায় হায়,' বৌদির থেকে থেকে সভয় আর্তনাদ, আর আমার অবিরাম কাঁপুনি। ক্রমাগত মন্থর মুহূর্তগুলো বিহ্বল মুহ্যমানতায়, নৈরাশ্যে বিঁধে বিঁধে যেতে থাকল, আর অবিশ্রান্ত এবোপ্লেনের ভয়াবহ গুঞ্জন, মেসিনগানের গুলি আর সামনে পিছনে বোমা ফাটার শব্দ। সমস্ত কলকাতা একযোগে কান পেতে ছিল সভয় প্রতীক্ষায়। সকলেই নিজের নিজের প্রাণ সম্পর্কে ভীষণ রকম সন্দিগ্ধ। দ্রুতবেগে বোমারু এগিয়ে আসে, অত্যন্ত কাছে বোমা পডে আর দেহ মনে চমকে উঠি। এমনি করে প্রাণপণে প্রাণকে সামলে তিনঘণ্টা কাটাই। তখন মনে হচ্ছিল, এই বিপদময়তার যেন আর শেষ দেখা যাবে না।'[৯] কিন্তু সমকালের গল্পকার ও ঔপন্যাসিকগণ যুদ্ধকে নানাভাবে গ্রহণ করেছেন তাঁদেব সৃষ্টির মধ্যে। কোন কোন লেখকের লেখনীতে যুদ্ধ শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক ঘটনাই থেকে গেছে। যুদ্ধের কালের চরিত্র ও পটভূমি তাঁদের, কিন্তু যুদ্ধের পরিণামী সিদ্ধান্ত গল্পে ও উপন্যাসের মৌল কেন্দ্রে অনুপস্থিত। কোন কোন লেখক যুদ্ধের প্রস্তুতি কিভাবে শাসককুল গ্রহণ করেছে বাংলাদেশের বুকে, তার বিষয়কে বিস্তৃত করে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

একদল কথাকার আছেন, যাঁরা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাটুকুকে কাহিনী ও ঘটনা থেকে ক্রমশ চরিত্র-স্নায়ের গভীরে নিয়ে গেছেন। প্রত্যক্ষ যুদ্ধকে নিয়ে কোন দর্শন নয়,

প্রত্যক্ষ যুদ্ধ যে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কিভাবে গূঢ় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, তারই প্রতিচিত্রণ তাঁদের লক্ষ্য। যুদ্ধ-সমকালে আসাম সীমান্ত, সিঙ্গাপুর-বর্মার প্রত্যন্ত প্রদেশে কিভাবে যুদ্ধবাজ জাপানী বোমরু বিমান আক্রমণ করে, সহজ জীবন সমূলে বিপর্যস্ত হয়, তার নিপুণ বিবরণ দিয়েছেন একাধিক বাঙালী লেখক। উনিশ'শ বিয়াল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাস কলকাতার বুকে ভয়াবহ রাত্রির অভিজ্ঞতা আনে সাধারণ শহর-বাসীর জীবনে। তার ছবি আঁকতে সে সময়ের ক্ষমতাবান সময়-সচেতন প্রায় সব লেখকই কম-বেশী আন্দোলিত হয়েছেন।

তবে একথা ঠিক, যুদ্ধের প্রত্যক্ষ চিত্রের থেকে তার পরোক্ষ চিত্র নয়, প্রভাবই—যা অন্তঃশীল প্রতিক্রিয়ার মত—তাব পরিচয় বেশী দেখা গেছে যুদ্ধ সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে। সমকালীন কথাসাহিত্যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বর্ণনা মাত্র নয়, যুদ্ধের প্রত্যক্ষ রূপ ও পরোক্ষ রূপ—এই দুইয়ের শিল্পসম্মত ব্যবহার দেখা গেছে। একাধিক কথাকার আছেন, যাঁরা যুদ্ধের সঙ্গে প্রধানভাবে জড়িত সৈনিকদের জীবন-যাপন, বৈশিষ্ট্য ও সমকালে সৈনিকদের সশস্ত্র বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়ার কথাকেও যুদ্ধের মেজাজে উপস্থিত করেছেন তাঁদের রচনায়।

যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঙালী লেখকদেব বড কোন যুদ্ধজীবন-দর্শন রচনার সুযোগ করে দেয়নি, তবু এই যুদ্ধ নানাভাবে বাঙলা কথাসাহিত্যকে বিচিত্র-রসাস্বাদী করেছে। শহবের বুকে ব্ল্যাক-আউটের রাত্রি, একাধিক কর্ণ-বিদারণকারী এরোপ্লেন উড়ে যাওয়ার শব্দ, রাস্তার ধারের বাফ্‌ল্‌ ওয়াল নির্মাণ, ময়দানের বুকে সৈন্যদেব নিঃসঙ্গ গোপনতার জন্য পরিখা নির্মাণ, অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ করে সাইরেনের আত্ম-সতর্কতাসূচক চীৎকার, বোমাবর্ষণেব শব্দে ঘরের মধ্যে সংসারী মানুষেব আর্ত, অতর্ক প্রশ্নহীন নিঃসাড় প্রতীক্ষা, ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে নিক্ষেপিত বোমায় বিধ্বস্ত শহরের কিছু বাড়ি ও রাস্তার ছবি, রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারী সৈন্যের টহল দেওয়া ও হুইসল্‌ ধ্বনি—এসব বাংলাদেশের বুকে যুদ্ধ সমকালেই যুদ্ধের অনাগত অথচ প্রত্যক্ষ রূপাবয়বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায়। এসব সাহিত্যে কিছুতেই অস্বীকৃত হতে পারে না। কথাসাহিত্যিকরা সমকালকে নিশ্চয়ই রচনায় গ্রহণ করবেন। সেই অভিজ্ঞতাই তাঁদের ভবিষ্যৎ যুদ্ধ-সাহিত্য সংক্রান্ত শিল্প-অভিজ্ঞতার অন্যতম মানদণ্ড হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যকরা এসব থেকে নিজেদের কোনমতেই সরিয়ে রাখেন নি। তাই-সমকালে রচিত একাধিক গল্প-উপন্যাস যুদ্ধ-চিত্রের অংশত প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক অর্থে পরোক্ষ দলিলের মত মর্যাদা পায়। একমাত্র শিল্পের প্রয়োজনে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে বলেই সেই বিষয় বাংলা কথাসাহিত্যের এই ধারায় অভিনব সংযোজন হয়ে-আছে।

দুই

যুদ্ধ-সমকালে লেখকদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, প্রবোধ কুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোপাল হালদার প্রমুখ। একেবারে নবাগতদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ঘোষ—এঁদের নামও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। লঘুচালে গল্প-উপন্যাস লিখে সে সময়ে যথেষ্ট প্রবীণ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখককেও এই সময়ে যুদ্ধ চকিত কিছু রচনায় নিবিষ্ট হতে দেখি। এঁদের একাধিক ছোটগল্প ও উপন্যাসে নানাসূত্রে উপস্থাপিত হয়েছে যুদ্ধ-প্রসঙ্গ। অর্থাৎ প্রত্যেকটি লেখকই কম-বেশী যুদ্ধের ভাবনায় নিজেদের জড়িত করেছেন। কেউ যুদ্ধকে নিয়ে শ্লেষ করেছেন, তার ভয়াবহতাকে এঁকেছেন, কেউ বা আবার রাজনৈতিক অর্থ-নৈতিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রূপকে যাচাই করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কারো কারো রচনায় নায়ক-নায়িকাদেব যুদ্ধ ভাবনায় রোমাণ্টিক স্বপ্নবিলাসও প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রচ্ছন্ন কৌতুক ও শ্লেষের সূত্রে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'মাথুর' গল্পে যুদ্ধের পরিবেশ এনেছেন যদিও, তবু যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার তীব্র রূপ কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্রে নেই। এক বয়স্ক কৃপণের বৈশিষ্ট্য এই গল্পে চিত্রিত। বড় অফিসার মেজার গাঙ্গুলী সম্পর্কে মন্তব্যও—'যুদ্ধ বিগ্রহের দুর্যোগ, অর্দ্ধোদয় যোগেব ভিড় এনে ফেলায়, তাব টুরের বা 'ঘুরের' অন্ত নাই।'[১০] ভাগলপুরের মথুর দরজির কাছে এলেন মেজার গাঙ্গুলী শীতের কোট বানাবার জন্য। কথা প্রসঙ্গে মথুর জিজ্ঞেস করে : 'এই এক দুঃসময় এসেছে মশাই, কি যে হবে জানি না। আপনাদের কাছে তো সব খবরই আছে। কতদিনে এ জ্বালা চুকবে মশাই, খদ্দেরদের খুশি করতে পারি।'

'তোমাদের যতদিন না আশ মেটে বোধ হয় ততদিনই চলবে।' বলে হাসলেন। 'হরি আর হর দুজনেই ত সহায়।'[১১]

গল্পের শেষে মেজার গাঙ্গুলীর স্ত্রী বিরজা তাঁকে চা খেতে দেন। সেই প্রসঙ্গে উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে আছে যুদ্ধজনিত পরিবেশে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত দ্রব্যের অভাবের ইঙ্গিত এবং সেই সূত্রে লেখকের শ্লেষ :

'নাও—ভালো করে দুকাপ চা খাও দিকি।'

কেটলি থেকে চা ঢালতে ঢালতে—'চিনি কনট্রোলে গিয়ে গোলে ফেলেছে—মিষ্টি নেই—'

'তবে আর কেন—থাক্।'

'তা কি হয়, সরকার ভালর জন্যেই করেছেন, চা শুনেছি ভারি উপকারী, চীনেরা খায়।'

'তা এনেছ দাও, আজ বেশ পারবো, খুব পারবো। হ্যাঁ, উপকারী বই কি—মিষ্টি নাই বা হল, অনেক তো পেয়েছি, চিবদিনই কি থাকবে, যখন যেমন,—দাও। ভারতেব ভাগ্যই তো ত্যাগ ধর্ম—'[১২]

কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে যুদ্ধের প্রসঙ্গটুকু আছে, তার পরোক্ষ প্রভাবের স্বল্প ইঙ্গিতও দুর্লভ নয়, কিন্তু যুদ্ধের তীব্রতা, ভযাল কোন পরিচয় নেই। কিছু লেখক গল্পে প্রসঙ্গিকভাবে যুদ্ধকে ব্যবহাব কবেছেন মাত্র, যুদ্ধ-ভাবনায় তাডিত হযে তাকে কথা-সাহিত্যে গ্রহণ করেননি। 'মাথুর' গল্পের লেখক সেই শ্রেণীতে পড়েন।

সুবোধ ঘোষের 'কর্ণফুলিব ডাকে' গল্পটির আরম্ভেই আছে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ছবির সংবাদ ও তার জীবন্ত প্রতিক্রিযাব প্রতিচিত্রণ :

'বোমা পডছে দেড হাজাব মাইল দূবে জোহার বারুর জাঙ্গাল আর সিঙ্গাপুরের জাহাজঘাটায়। হাজার লোকেব জীবন্ত ধড ছিটকে পডলো হাওডা আর শেযালদা ষ্টেশনে। . ...পালাচ্ছে সবাই—ছেলে, মেয়ে, জোযান, বুড়ো সবাই,—সবজাতের লোক। আধমরা, উদভ্রান্ত, ফ্যাকাশে সব চেহারা, চোথ ঠিকবে পডছে, হিসেবের ঠিক নেই—কাশছে, হাঁপাচ্ছে, চীৎকার করছে।'[১৩]

যুদ্ধভয় এই গল্পের সচেতন নায়ক ধ্রুবেশের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া জাগায। একেবারে মধ্যবিত্ত সংসারী যুবক ধ্রুবেশ :

তার 'চাকরি গেছে, তবু বর্তমানে ধ্রুবেশের কাছে এটাই একমাত্র সত্য নয়। টালিগঞ্জের ছোট ছোট বাসাবাডিব ধোঁয়াটে সন্ধ্যায় তার চোখে সে ছবি ভেসে ওঠে—লিবিযাব মরুবেলায উদ্যত সঙ্গীনের ঝলক। শোনা যায খারকভের কঠিন তুষাবে লক্ষ পায়ের পথচলা ধ্বনি। মন্থিত প্রশান্ত সমুদ্রে আহত ক্রুজারের গর্জন, মহাদেশেব পথে পথে ট্যাঙ্কেব ক্রেঙকার, আকাশে বোম্বারের গুরু গুঞ্জন।'[১৪]

সুবোধ ঘোষ নাযককে যুদ্ধ-সচেতনার মধ্যে বেথে যুদ্ধ-সমকালেব মানুষের মানসিক বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চারিত্র্য :

'স্বার্থে ও সর্বার্থে সংঘাত বেধেছে। এই অভ্যুদয়ের যজ্ঞে পুড়ে যাচ্ছে জাতিবাদ, অর্থনীতির অনর্থ, প্রতাপের মূঢতা, পরস্ব শোষণের বসনা। সাম্রাজ্যের চর্বি গলে যাচ্ছে। ধূলিসাৎ হয়ে পড়েছে ফ্যাসিস্ত স্পর্ধার চূড়া।

ধ্রুবেশের মন প্রাণ ঘিবে অদ্ভূত এক ধরণের রোমাঞ্চ লাগে।'[১৫]

বাংলাদেশের বুকে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ তথনো আসেনি। কিন্তু নায়ক সেই যুদ্ধেব আশংকায় গভীরভাবে আলোড়িত। ধ্রুবেশ এমন একজন নায়ক, যার অভিজ্ঞতায় স্মৃতি-সূত্রে

আছে প্রথম মহাযুদ্ধের ছায়া। ধ্রুবেশের যখন চাকরী গেল, তখন সে তার জন্য তেমন চিন্তিত নয়, চিন্তিত যুদ্ধের জন্যই। স্ত্রী রমা বুঝেছে তার স্বামীকে। তার ভাবনা :

'কিন্তু এই মানুষটিকে সে কতকটা চেনে। এখুনি খবরের কাগজ নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। ক'বছর আগে ঠিক এইরকম স্পেন যুদ্ধের ভূতে পেয়েছিল ধ্রুবেশকে। রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকতো। এক এক সময় ঘুমোত না। বিছানা ছেড়ে সারা রাত ঘরের ভেতর পাইচারী করতো।'[১৬]

যুদ্ধের প্রভাব বাইরে নয়, গভীরে, রক্তের প্রবাহে। রমার প্রেমে গড়া ছোট সংসার—স্বামী টুটু আর সে এর সভ্য। সে এর জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত, কিন্তু :

'অকস্মাৎ এল আঘাত। এত বড় পৃথিবী পড়ে রয়েছে সেখানে—বড় বড় সাধু, বড় বড় লোভ আর পাপ। সেখানে লাগুক না যুদ্ধের আগুন। ছোট ছোট সুখ দুঃখে ধুকপুক করছে পাখীর নীড়ের মত রমার এই জগৎ। তাকে না ভেঙে-ছিঁড়ে ফতে-জঙ্গলের হানাহানি কি চলতো না? যুদ্ধের নাম শুনলে রমার সকল মন বিরূপ হয়ে ওঠে। রমার কাছে ঘর-ভাঙানিয়া এ যুদ্ধ ঘোর শত্রু।'[১৭]

অন্য দিকে :

'ধ্রুবেশের কাছে এ যুদ্ধ যেন যুগ গড়ানিয়া তীর্থংকর। সকাল সন্ধ্যা ঘুরে বেড়ায় পথে পথে—ট্রামে বাসে জনসভায়। দেশনেতাদের বিবৃতি পড়ে। ছাত্র ও শ্রমিকদের ইস্তাহার পড়ে। শোভাযাত্রা দেখে। পোষ্টারের ছবি আর লেখাগুলির কাছে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। কে কী বললে? কারা বুঝেছে এ মহাযুদ্ধ মহাপরিণামের পূর্বগামিনী ছায়া। কারা কাজের কথা বলেছে। কারা জেগে আছে।'[১৮]

সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ সকলেই যুদ্ধ সম্পর্কে চিন্তিত। এদের চিন্তা ভাবনা যেমন আসন্ন যুদ্ধের ভীতি সম্পর্কে, তেমনি যুদ্ধ শেষ হলে কি করবে তারা, কিভাবে তাদের যাবতীয় অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করবে, তা-ও ব্যক্ত। নায়ক ধ্রুবেশের প্রতিদিনের অস্থিরতার মধ্যে লেখক সেইরকম একটি চিত্র উপহার দিয়েছেন 'কর্ণফুলির ডাক' গল্পে :

'জ্ঞানী গুণী থেকে আরম্ভ করে ঝি বটার মা পর্যন্ত সকলের চিন্তা এক সুরে বাঁধা। যুদ্ধের পরে কে কি করবে, কি পেতে হবে—এটাই একমাত্র সমস্যা। সকলে ঝুড়ি ঝুড়ি কর্তব্য আর দাবীর পসরা মাথায় নিয়ে ব'সে আছে—যুদ্ধের পরে, মাসীমা যুদ্ধের পরেই বীণার বিয়ে দেবেন। পেট্রিয়টেরা যুদ্ধের পরে এক হাত লড়বেন—যারা জিতবে তাদের সঙ্গে। মহাবণিক সংঘ আজ থেকেই ছট্‌পট্ করছে—যুদ্ধের পরে কে কত বড় কারবার ফলাবে।'[১৯]

বাংলাদেশের বুকে জাপানী বোমাবর্ষণের প্রত্যক্ষ সংবাদ আছে 'কর্ণফুলির ডাকে' গল্পে। নায়কের যুদ্ধবিরোধী ভাবনা, সেই সঙ্গে তীব্র স্বদেশভাবনা, নিজ গ্রাম বিরাজপুরের প্রতি আকর্ষণ দিয়েই লেখক গল্পের উপসংহার টেনেছেন। সন্ধ্যের কলকাতায় কার্জন পার্কের নরম ঘাসের ওপর ক্লান্তির আরামের মধ্যে, মানসিক প্রশান্তির মধ্যে নায়ক ধ্রুবেশের এক হকারের আকস্মিক চীৎকারের অভিজ্ঞতায় যুদ্ধজনিত প্রতিক্রিয়া চিত্রিত :

'হকার ছেলেটা চীৎকার করে হাঁকছে বিকেলের টাট্‌কা খবর—চট্টগ্রামে বোমা পড়েছে—বোমা পড়েছে চট্টগ্রামে।

হুড়োহুড়ি আরম্ভ হলো কাগজ কেনা নিয়ে। ধ্রুবেশও হাতে পেল একটা। এক-রকম দৌড় দিয়েই সে এসে দাঁড়ালো একটা ল্যাম্পপোষ্টের কাছে।

দম বন্ধ করেই ধ্রুবেশ পড়লো। সামান্য বাহুল্যহীন কয়েক লাইনের খবর।—তারা এসেছে। বোমা পড়েছে চট্টগ্রামে। লোক মরেছে, লোক ঘায়েল হয়েছে।

তারা এসেছে। কর্ণফুলির জলে পড়েছে তাদের কুৎসিৎ কালো ছায়া। পূব আকাশের তারার গায়ে কালি মাখিয়ে দেখা দিয়েছে খণ্ডস্ফুলিঙ্গের দল।

ধ্রুবেশ কাঁপছিল থরথর করে। দাঁতে দাঁত পিষে যাচ্ছিল।····· কে এরা? দেশের মাটিতে আগুন ছড়ায়।

বিশ্ব ইতিহাসের সব লেখা ছাপিয়ে সোনালী আখরে ঝিলিক দিয়ে উঠলো একটি মাত্র নাম—বিরাজপুর। কর্ণফুলির জ্বালাভরা জলের ঢেউ অসহায়ের মত ডাকছে কলস্বরে। তাও শুনতে পাওয়া যায়।'[২০]

নরেন্দ্র ঘোষের 'এই সীমান্তে' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'পলাতক' গল্পেও আছে যুদ্ধের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ার ছবি। গল্পটির নায়ক তারাপদ মা, বাবা, স্ত্রী, পুত্র নিয়ে সুস্থ মানুষ ছিল একদিন। যুদ্ধের প্রয়োজনে, এবং যুদ্ধের পরিবেশে চাকরী কোথাও না পেয়ে চাকরী নেয় সৈনিকের। সেই সৈনিক জীবনই কি ভাবে তাকে তাড়া করে দিনের পর দিন, তার নির্মম ছবি এঁকেছেন লেখক 'পলাতক' গল্পে। সৈনিক হিসেবে সক্রিয় জীবন পরিবেশে দিনের পর দিন তারাপদ হতে বাধ্য হয় 'নিষ্ঠুর, হিংস্র আর বিবেকহীন' তবু তার যন্ত্রণা ছিল তীব্র। সৈনিকদের পরিবেশ থেকে পালিয়ে এসেও সে ভুলতে পারেনি সেই লিবিয়া ফ্রণ্টে ভয়াবহ যুদ্ধের কথা :

'মাথার ওপর ইতালীয় বোমারু বিমানগুলো অতিকায় ক্রুদ্ধ চিলের মত গর্জন করে ঘুরপাক খাচ্ছে, বোমা ফাটছে, মেসিনগানের গুলি ঝাঁকে ঝাঁকে ছিটকে পড়ছে বালুর ওপর, ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে উঠছে আর সঙ্গী সৈনিকেরা একের পর এক আর্তনাদ করে পড়ে যাচ্ছে।'[২১]

যুদ্ধের এই ভয়াবহতা লেখক তারাপদর চিন্তায় এমনভাবে এঁকেছেন, যা প্রত্যক্ষ যুদ্ধের নির্মমতাকে স্পষ্ট করে। এমন যুদ্ধ যে কত ভয়াবহ, মানবতাবিধ্বংসী, সমস্ত মানুষের কাছেই ঘৃণ্য, একান্ত অবাঞ্ছিত, তা লেখক এঁকেছেন যুদ্ধের আর এক আত্মহননেচ্ছু সৈনিক চরিত্র জোসেফর জীবন্ত চিত্রটিকে ওই তুমুল লড়াইয়ে কম্পিত রণক্ষেত্রের মধ্যেই উপহার দিয়ে :

'সে চীৎকার করে এগোতে লাগল—"কমরেডগণ—দোহাই ঈশ্বরের—থামাও এ খেলা, তোমরা কি ক্লান্তিবোধ করছ না ? থামাও এ সব—এ পৃথিবী সকলের জন্য—কেন তবে এই রেষারেষি ? আর যদি না থাম বেজন্মারা, তবে যিশুর রক্তের দিব্যি—আমায় মার—"[২২]

তারাপদ মা-বাবার স্নেহ-সম্পর্কের কথায় পাগল হয়, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের তৃষ্ণায় তৃষিত। কিন্তু সেই তারাপদ যুদ্ধের সৈনিক হিসেবে কি রকম ছিল লিবিয়ার একটি শত্রুদের ঘাঁটি অধিকার করার সময় ? সেই সময় সে একজন জার্মান সৈনিককে দেখতে পেল। তার দুটো পা হাঁটু থেকে উড়ে গেছে, বাঁ হাতটায় বেয়নেটের খোঁচা। তাকে দেখেই সে তার বেয়নেট উঁচিয়ে সোল্লাসে এগিয়ে গেল। রক্তের গন্ধে তখন তার মাথা ঝিমোচ্ছে। জার্মানটি বলেছিল :

"বাঁচাও ভাই, আমায় মেরোনা, আমিও মানুষ—" কিন্তু সে শোনেনি, তবে দক্ষিণের পাঁজরায় এমন জোরে সে বেয়নেটের খোঁচা দিয়েছিল যে তার পাঁজরাগুলো পাটকাঠির মতো মট্‌মট্ করে উঠেছিল……[২৩]

যুদ্ধ ও যুদ্ধের নির্মমতা 'এবং পরিণতি যে কত ভয়াবহ সর্বকালের মানবতা-বিনাশী অস্তিত্ব, লেখক তার প্রতিচিত্রণে নিপুণ লেখনী ব্যবহার করেছেন। পালিয়ে এসে তার নিজের সংসারে তারাপদ শান্তি পেয়েছিল, কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। যুদ্ধ তাকে পিছু পিছু শেষ সীমা পর্যন্ত বিতাড়িত করেছে, ছায়ার মত লেগে থেকেছে। তারাপদ নিদারুণ কষ্টের মধ্যে গল্পের শেষে আবার ধরা পড়েছে বটে পুলিশ অফিসার অজিতবাবু ও দুই কনস্টেবলের হাতে, কিন্তু তার ক্ষণিক সংসার-জীবন-উপলব্ধি তাকে যে কথা ভাবিয়েছে সে কথা সর্বকালের সবরকমের যুদ্ধ-বিরোধী বক্তব্যই :

'এখানে মরুভূমির বালু নেই, অপরিচিত দেশের ভয়াবহতা নেই, নেই বারুদের গোলা আর ঝকমকে বেয়োনেটের আড়ালে শত্রুদের নির্মম মুখ। এখানে শুধু শান্তি। দারিদ্র্য আছে, অভাব আছে কিন্তু তবুও শান্তি আছে।'[২৪]

বস্তুত এ শান্তি মানুষের, মানবজাতির তথা সুস্থ সবল সমাজ গঠনের উপযোগী মানবতার।

তিন

কথাসাহিত্যে সৎভাবে রাজনীতি-সচেতন থেকেই গোপাল হালদার যুদ্ধ সমকালীন পরিবেশের নানা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেছেন নানা বিচিত্র চরিত্রের ভিড়ে। তাঁর 'পঞ্চাশের পথ' উপন্যাসে নানাভবে যুদ্ধের পরোক্ষ রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। উপন্যাসের নায়ক বিনয় মজুমদার ডাক্তার, এবং বর্মা জাপানীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর প্রত্যক্ষ যুদ্ধজনিত প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা নিযে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। এমন একটি নাযক সৃষ্টি কবে লেখক যুদ্ধ-সমকালের নানা ঘটনাকে রাজনৈতিক তত্ত্ব-তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেয়েছেন। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই নায়কের চিন্তায এবং চব্বিশ পরগণাব কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মী এবং দুর্গা মণ্ডলের মধ্যে সংলাপ বিনিময়ের মাধ্যমে যুদ্ধের পরোক্ষ রূপের পরিচয় দিযেছেন। গ্রামেব চাষীরা যুদ্ধকে দেখেছে অন্যভাবে। এক বুড়ো চাষী কৈবর্তর কথা :

'জমি-জমা বাডি-ঘর সবই তো নিলে ফৌজের দরকারে। কেরোসিন নেই, লবণ নেই, কাপড নেই পবি কি ? সব যুদ্ধে গেছে—এখন কুইনাইনও আমাদেব দেবে না। ··ছেলে-পিলে আছে—মাগীরা যায় কোথায় ? ফৌজ এলেই তো বে-ইজ্জত করবে মেযেদের। মা-মেয়ে কিছু মানে তারা ? না, মানৃত বয়স, ধর্ম ?'[২৫]

নাযক বিনয় মজুমদাব নেযামতপুবে এসে গ্রামেব মানুষদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়। তার বর্ণনায লেখক বিনয়ের কথায বর্মা মুলুকেব যুদ্ধেব স্বরূপ উত্থাপন করেছেন। বিনয সেখানে :

'দেখেছিল রেঙ্গুনের মৃতেব সার। অবশ্য সে কথা সে বলেছে। কিন্তু একটিমাত্র কথায়—'আধ ঘণ্টায় বেঙ্গুনের পথে দু হাজার মানুষ শেষ হয়ে গেল বোমায আর গুলিতে' তারপরে বললে 'এই তো দেখছি—এর বেশি কিছু বুঝি না যুদ্ধের।'[২৬]

আবার দোগাছির এলাকায় যুদ্ধের প্রয়োজনে এরোড্রাম তৈরী নিয়ে কংগ্রেস দলের গোবিন্দবাবুর সঙ্গে জমিদার রাযবাহাদুরের হাকিম মিঃ বিহারী সেনের কথাপ্রসঙ্গে রায়বাহাদুর স্বয়ং ডঃ বিনয় মজুমদারকে বলে :

'যুদ্ধ যুদ্ধ খেলাই দেখেছেন আপনারা বর্মায়। এখানে দেখবেন যুদ্ধ যুদ্ধ ব্যবসা।'[২৭]

বাংলাদেশের বুকে যুদ্ধ সম্পর্কে এমন ধারণা বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক পরোক্ষ পরিচযেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সারা বাংলাদেশে যে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী, তা-ই বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে হয় বড অভিশাপ। যুদ্ধ।বাংলাদেশের বুকে সেই প্রস্তুতির অনুপাতে কিছুই নয, কিন্তু জনজীবন যুদ্ধ প্রস্তুতিতেই যুদ্ধের একজাতীয়

অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় 'পঞ্চাশের পথ' উপন্যাসে। অন্যতম চরিত্র, সরকারী আমলা মিঃ সেন এক স্কুল শিক্ষিকা ও সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী সুধা গুপ্তাকে বলেছে :

'জেলায় জেলায় আমরা চাষ বন্ধ করে বেড়াচ্ছি—নৌকো শালতি আমাদের হাতে এনে দিতে বলছি।—চাষ বন্ধ, বাজার বন্ধ, হাট বন্ধ, মাছ ধরা বন্ধ, লোক চলাচল বন্ধ—সব বন্ধ—জাপানের পথ বন্ধ করছি তো। কড়া হুকুম দিচ্ছি এক পালা ধানও যেন বেশি না থাকে এসব এলাকায়। জাপান যেন এলেও শুকিয়ে মরে।'[২৮]

'তেরশ পঞ্চাশ' উপন্যাসেও এই লেখক যুদ্ধ-প্রতিক্রিয়ার ছবি উপহার দিয়েছেন। কলকাতায় জাপানী বোমাবর্ষণ ঘটে গেছে। নায়ক ডঃ বিনয় সেই সাতদিন আগের ঘটনাকে স্মৃতিসূত্রে ধরে অতীতের অভিজ্ঞতায় নিমজ্জিত হয়ে যায় একসময়ে :

'সে রাত্রিতে সাইরেন বাজল, বোমা পড়ল, কলকাতায় নামল মৃত্যুর ত্রাস, প্রাণভীত পশুর মত অসহায় জনতা কলকাতা ছেড়ে শত দিকে ছুটল। আর সুধা ও অমিতের জীবনগতি যেন উল্‌টে গেল।'[২৯]

উপন্যাসের অন্যতম জটিল চরিত্র বীরু সেন একজন পুরনো রাজনৈতিক কর্মী, পরে হয়ে ওঠে যুদ্ধের জিনিষপত্তরের কণ্ট্রাক্টার। তার সঙ্গে বিনয় মজুমদারের তর্ক চলে জাপানীদের বোমাবর্ষণ প্রসঙ্গ নিয়ে। সেই কথোপকথনের মধ্যে উঠে আসে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ রূপের ব্যাখ্যা চরিত্রের নিজেরই চিন্তাধারার ন্যায়ে :

'যুদ্ধই হচ্ছে বড় ইণ্ডাষ্ট্রি। ...একই কণ্ট্রাক্ট বছরের পর বছর চলছে। ইট আছে, তৈরী হচ্ছে এরোড্রামের ঘর, পরের মাসে হুকুম হচ্ছে, আরও শক্ত করো—ভেঙে ফেলে গড়ো। সেই ইট দিয়েই গড়ো। সেই ইট দিয়েই গড়া হল আবার সেই 'শক্ত' ইমারত। ...ঘুষ খাওয়া (কণ্ট্রাক্টররা) মনে করে একবার জাপান এলেই হয়—আরও লুঠ, আরও মজা। অন্তত জাপান বোমাটোমা না ফেললে ওরা ভয়ানক বিরক্ত হয়ত বোমা ফেললেই আবার পথ তৈরী হবে, ঘর তৈরী হবে, আরও কণ্ট্রাক্ট্ পাওয়া যাবে।

বিনয় বললে, তুমিও তাহলে তাই চাও বীরু—বোমা পড়ুক ?

—চাইতাম। কিন্তু এ জেলার লোক আমি। আমি যাব কোথায় ?'[৩০]

'ঊনপঞ্চাশী' উপন্যাসের শেষে লেখক কলকাতার বুকে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের কালোছায়া নামার ছবি এঁকেছেন তথ্যের সত্য এবং শৈল্পিক সততার সঙ্গে। সুধার সঙ্গে বিনয়ের হৃদয়-সম্পর্ক গড়ে ওঠায় বিনয় ক্রমশ আত্মবিশ্বাসী, ভালোবাসায় আত্মমগ্ন হয়ে ওঠে। নানান রূঢ় বাস্তব কাজের শেষে একসময়ে সুধার সঙ্গে সূক্ষ্ম সম্পর্কে চিন্তা তাকে বিভোর করে দেয়। শীতের রাতের ফিন জ্যোৎস্নার পরিবেশে ব্যক্তি বিনয়ের মনে যে প্রেম স্মৃতির রোমাঞ্চ, তা মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় কলকাতার বুকে রাতে জাপানী

বোমারু বিমানের সক্রিয় হানার সংকেত ধ্বনিতে। বস্তুত যুদ্ধের প্রত্যক্ষতা এমনি নির্মম, অবধারিত—যা ব্যক্তির সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ চিন্তাকে ধ্বংস করে। এমন যুদ্ধের ছবি এঁকেছেন লেখক কেবল বিনয়ের কোমল ভাবনাকে আঁকতে বসেই শুধু নয়, বিনয়ের বোন হেনা, তার যুদ্ধের কি তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাকেও নিপুণভাবে উপস্থাপিত করার মধ্যে :

'ওই শোনো—এয়ার ক্রাফ্‌টের শব্দ। ওরা এল বোধ হয়।

হেনা চমকে উঠল। কান খাড়া করে শুনল। তার সমস্ত মুখচোখের উপর অনিবার্য উদ্বেগের ছায়া এক মুহূর্তে শত গুণ হয়ে উঠেছে। শুধু একটি ছোট কথা—'এলো'। মনে হল কতদূর থেকে ওর কত শক্তি দিয়ে হেনা বের করেছে কণ্ঠ থেকে এই কথাটি—তাতে সেই স্পষ্টতা নেই। সহজতা নেই আর।

আকাশে উড়োজাহাজের পরিচিত শব্দ শোনা যাচ্ছে। দিনেরাতে অনেক বার শোনা এই শব্দ—বোঁ ওঁ—ওঁ, তবু এই নিমিষে মনে হল যেন কি একটা শঙ্কার ইঙ্গিত তাতেই রয়েছে।

দুই একটা নিঃশব্দ নিমেষ। আকাশের প্রান্তে কোনদিকে যেন একটা নতুন শব্দ। সেই বোঁ—ওঁ—ওঁ শব্দটা দূবে চলে গেছে, একটা নতুন ঝর্‌-ঝর্‌ শব্দ যেন শোনা যাচ্ছে। হেনার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বিনয় সহজভাবে বলল, শুনছ? মনে হচ্ছে জাপানী প্লেনের শব্দ।

উৎকর্ণ হয়ে রইল সকলে।

বিনয় বলল, গুছিয়ে ফেল ঘরটা।······

রুদ্ধ ঘরের স্তিমিত আলোকে কারও মুখচ্ছবি তত দেখা যায় না। কিন্তু স্তব্ধতাই যেন সে ছবি পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলছিল।

সেই আকাশ চেরা ঝর-ঝর কোন দুরন্ত পাখী ছুটেছে। তারপর দুম্‌—দুম্‌—দুম্‌—

নিস্তব্ধ ঘরের কথা বন্ধ হয়ে গেছল। দূরের শব্দে ঘরের স্তব্ধতা যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। ঘরের দুয়ার, জানালা সব ঝটিকাঘাতে ছিটকে ভেঙে পড়বার মত। ইরা তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, মা।

কি ও।—শচীন্দ্রপ্রসাদ বুঝছিল, তবু যেন বিশ্বাস করতে চায় না।

বিনয় বলল, বোমা। খুব কাছে নয়, তবে দূরেও হবে না।

ইরা আবার কেঁদে উঠল, মা!

হেনা প্রাণপণ চেষ্টায় বলল, এই যে কি হয়েছে? কিছু নয়।

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবু বলতে হচ্ছে, যত পারে তত সহজ কণ্ঠে হেনাকে বলতে হচ্ছে, কিছু নয়। কিছু নয়, ইরা।

শব্দ তেমন জোরে নয়, নিকটেও সম্ভবত নয়। তবু ভয় ও আশঙ্কায় ইরা অস্থির।

মা! মা!—বারে বারে ইরা শিউরে কেঁদে উঠছে। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে।

আকাশের শব্দ থেমে গেল। ঘরে নিস্তব্ধতা কঠিন হয়ে রইল। কেউ কথা বলে না। সময় যেন কাটে না—থেমে আছে। বিনয়ই প্রথম কথা বলল, বোধ হয় দূরে চলে গেছে, বাধা পেয়েছে। তার কণ্ঠস্বর এখনও তেমনি উদ্বেগহীন ও উত্তেজনাহীন। যেন কোন পরিচিত সাধারণ ঘটনা সম্পর্কে সে কথা বলছে।

হেনাও দাদার এই স্বরে এই স্বাভাবিকতায় যেন অনেক আশঙ্কা অনেক ত্রাসের ভার থেকে মুক্তি পেল। জিজ্ঞাসা করল, দূরে চলে গেছে?—তার কণ্ঠে একটি আশার সুর।

শচীপ্রসাদ এই প্রথম প্রশ্ন করলো। ভয় অপেক্ষা দুশ্চিন্তাই তাতে প্রকট, সত্যি বোমা পড়েছে মনে করো?

মনে তো হয় সত্যি বলে, তার বেশি কি করে বলব?

কত দূরে? খুব দূরে বলে মনে হল?

তাতো বলা শক্ত—কলকাতার মত শহরে।

কোনদিকে? টালিগঞ্জের দিকে নয়, কি বল?

কিছু বলা যায় না।

অল ক্লিয়ার একটানা সুরে বেজে উঠল।'[৩১]

কলকাতা তথা বাংলাদেশের বুকে যুদ্ধ কিভাবে মানুষের আশ্রয় ত্যাগ করার মত ভয়, আতংক, অসহায়তা সৃষ্টি করেছে লেখক নায়কের সেই দৃষ্টি দিয়ে অল্প কথায় তা এঁকেছেন:

'বিনয় যেতে যেতে দেখলে আজ কলকাতার পলায়ন দৃশ্য। এমনটি সে রেঙ্গুনেও দেখতে পেত না। বাজার বসতে না বসতে ভেঙে গেছে। দোকান পাট খোলেনি।'[৩২]

যুদ্ধ-সমকালের অন্যতম কথাকার তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর 'মন্বন্তর' উপন্যাসের মূল পটভূমি কলকাতার বুকে বিশ্বযুদ্ধের আড়ষ্ট, অসহায়, রুদ্ধশ্বাস পরিবেশকে সার্থক শিল্পের সততায় আঁকতে ভোলেননি। আধুনিক সভ্যতার এক একটি স্তম্ভ হল একটি দেশের প্রধান শহর। কলকাতা শহর সেরকমই সাম্রাজ্যবাদী শাসক-গোষ্ঠী

-শাসিত সভ্যতার আর এক পীঠস্থান। এর ঔজ্জ্বল্য, উৎসাহ, ক্লেদ, গ্লানি, অন্ধকারময়তা, পিচ্ছিল জীবনকে লেখক গ্রহণ করেছেন সর্বদিক থেকে। আলোকিত এই শহরের অন্ধকার দিক আপাতদৃষ্টিতে আলোয় ধরা পড়ে না। কিন্তু যুদ্ধ-সমকালের প্রেক্ষাপটে যখন শহরজীবন রক্ষার কারণে ব্ল্যাক-আউটের ব্যবস্থা হয়, তখনি সভ্য ও অ-সভ্য দুই শ্রেণীর মানুষের রক্তমাংসের চেহারাই নানাভাবে অন্ধকারের কালি নিয়ে দেখা দেয়। তার মধ্যে জোতদার-মজুতদার-আমলাবাবুরা যেমন আছে, তেমনি আছে অসহায় গীতাদের দল। লেখক উপন্যাসে এঁদের নিপুণ ছবি এঁকেছেন ব্ল্যাকআউটের কলকাতার ছবির মধ্য দিয়েই। আর এই ব্ল্যাকআউট হওয়ার মূল কারণ শাসক কর্তৃপক্ষের যুদ্ধভয়। যুদ্ধের পরোক্ষ ছায়া প্রসারিত হতে হতে এক সময়ে কলকাতাকেও গ্রাস করে:

'ব্ল্যাকআউটের কলকাতা, · আজ শত্রুপক্ষের আকাশচারী বোমারুর শ্যেনদৃষ্টি হতে আত্মগোপনের জন্য তার সমস্ত আলো, আলোক-নিয়ন্ত্রণী আবরণে এমনভাবে আচ্ছন্ন করা হয়েছে যে, অন্ধকার জমাট বেঁধে শহরের বাড়ীগুলোর মাথায় এবং রাস্তার বুকের উপর নেমে এসেছে। ট্রাম-বাস-মোটরের আলোক রশ্মি দীপ্তিহীন প্রেতচক্ষের মত অন্ধকার রাস্তার মধ্য দিয়ে সশব্দে আসছে যাচ্ছে। বাস-ট্রামের ভিতরে আবছা আলোর অস্পষ্টতার মধ্যে যাত্রীদের দেখা যায়, চেনা যায় না, মনে হয় রূপহীন অবয়বের একটি দল চলেছে। রিক্সার যাত্রীদের দেখাই যায় না, নীচের কাগজ ঢাকা স্তিমিত আলো দুটি বিন্দুর মত ছুটে চলে যায়, নেহাৎ কাছে এলে দেখা যায় মানুষের দুটো পা শুধু উঠছে, পড়ছে। ফুটপাতের ওপর মানুষ চলছে সন্তর্পিত গতিতে

পথ-পার্শ্বের দোকানগুলির ভিতরে আলো জ্বলছে, কিন্তু তার রশ্মিধারা বাইরের দিকে নিয়ন্ত্রণ-আবরণীতে প্রতিহত।·· অন্ধকারের মধ্যে প্রায় অদৃশ্য চলন্ত মানুষের দল এইখানে এসে কালো কালো মূর্তির মত কয়েক মুহূর্তের জন্য জেগে উঠে আবার অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। ······আকাশের বুকে এরোপ্লেনের শব্দ উঠছে,— পাশাপাশি দুটি রঙিন উল্কাবিন্দুর মত লাল নীল দুটি আলোকবিন্দু আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দিকে চলে যাচ্ছে।'[৩৩]

এমন ব্ল্যাক-আউটের রাত আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে সাইরেন ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে, সভ্য মানুষের গভীর রাতের শান্তিটুকুও থাকে না। সাধারণ মানুষের আতংক বস্তুত প্রত্যক্ষ যুদ্ধের ভয়াবহতারই সমান। 'উপন্যাসের নায়িকা নীলার এক রাত্রির অভিজ্ঞতা চিত্রণে লেখক যুদ্ধভয়ের জীবন্ত মানস-ছবি এঁকেছেন:

'সাইরেন বাজছে। নীলা উঠে বসল। সাইরেন বাজছে, উঁচু পর্দায় উঠে নীচু পর্দায় নামছে, আবার উঁচু পর্দায় উঠছে। মহানগরীর আত্মা তার মাথার উপর মরণ লোকের শিকারী বাজপাখীর শব্দে মরণভয়ে আতংকিত হয়ে বিলম্বিত ছন্দে কাতর কান্না কাঁদছে, মধ্যে মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে। নীলার চোখে তখন ঘুম-বিহ্বল দৃষ্টি।'[৩৪]

যে কারণে শহরের বুকে এমন ব্ল্যাক-আউটের মহড়া যার মধ্যে আছে সাইরেনের বার বার বিপদ-সংকেত ঘোষণা, সেই রাত্রির অন্ধকারেই আসে সুযোগ-সন্ধানী যুদ্ধবাজ প্রতিপক্ষ। রাতের অন্ধকারে আসে, বোমাবর্ষণ করে নির্বিচারে, আবার ফিরে যায় তারা। শুধু আতঙ্কটুকু থেকেই যদি যুদ্ধভয়ের মানসমুক্তি ঘটত, তাতে তত অসহায়তা ছিল না। যারা অসামরিক ব্যক্তি, পরিবারভুক্ত, তাদের প্রাণ-সংশয়ের মর্মন্তুদ চিত্র যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফলেরই সামিল। নায়িকা নীলাদের একান্নবর্তী পবিবারে আছে বাবা-মা, দাদা-বৌদি, ভাই-বোন প্রভৃতি। বোমার ভয়ে তারা শহর ছাড়তে চায়। কিন্তু তাতেও তাদের মুক্তি নেই। অতর্কিতে আসে বোমাবর্ষণের প্রত্যক্ষ অভিঘাত :

'প্লেনের শব্দ উঠছে। এখানকার প্লেনের শব্দ থেকে শব্দের পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে। ধাতব শব্দের রেশ নাই এতে এবং মধ্যে মধ্যে যেন থেমে থেমে আবার জোব হয়ে ওঠে। সকলেই আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

সেই মুহূর্তেই হল বিস্ফোরণের শব্দ।

কয়ের মুহূর্ত পরেই আবার।

আবার!

সঙ্গে সঙ্গে উঠান প্রতিফলিত আলোকচ্ছটার আভার রেশ পাওয়া যাচ্ছে। বড় নাতনীটি ভয়ে কেঁদে উঠল।

আবার বিস্ফোরণের শব্দ।

আবার!

আবার!

উঃ কি প্রচণ্ড শব্দ! বাড়ীতে মেঝেতে কম্পন সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে।

দেবপ্রসাদ বললেন বড় ছেলেকে—মেয়েটাকে তুমি কোলে চেপে ধরে বস। বড় খোকাকে আমাকে দাও। চেপে ধরলে ওরা সাহস পাবে।

দরজার মুখে দাঁড়িয়েই পুত্রবধূ ডুকরে কেঁদে উঠল।—একি! একি! ওগো—মাগো!

—কি? কি বউমা!

—ওরে খোকন ! ওমা, আমার খোকন ? এ কি হল মা ?

আলোর সম্মুখে এনে দেখা গেল—শিশু বিবর্ণ—হিম—হয়ে গেছে। বিস্ফোরণের আতঙ্কে, মা কাঁপতে কাঁপতে শিশুর মুখে স্তন দিয়ে সজোরে তাকে বুকে চেপে ধরেছিল, —শিশু যত চঞ্চল হয়েছে, মায়ের বাহুবেষ্টনী ততই দৃঢ় হয়েছে—গভীরতর আতঙ্কের মধ্যে। শেষে সে যখন শান্ত শিথিল হয়েছিল—তখনও মা তাকে ঘুমন্ত ভেবে বুকে চেপে ধরে বসে ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই শিশু শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে।'[৩৫]

'মন্বন্তর' উপন্যাসে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ছবি এসেছে নানাভাবে। দুই বিরোধী পক্ষের সম্মুখে লড়াই-এর ক্ষেত্র কলকাতা ছিল না। কিন্তু একপক্ষ সামরিক দক্ষতায় বোমা বর্ষণ করে চলে যেত, আবার সাধারণ মানুষ তার বিষক্রিয়াকে নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করে অসহায় আতঙ্কিত জীবন, বহুক্ষেত্রে অমোঘ নিয়তির নির্দেশের মত মৃত্যুকে গ্রহণ করেই নীরব হয়ে যেত। সে সময়ের এক বামপন্থী কর্মী নৃপেন্দ্র তথা নেপীর যে আর্তমানুষের সেবার তৎপরতা, তার ছবিতে আছে যুদ্ধ-ক্রিয়ার বিষাক্ত রূপ :

'কানাই প্রশ্ন করলে—তোমার কাপড়ে জামায় এত রক্তের দাগ কেন নেপী ?

ম্লান হেসে নেপী বললে—বোমায় উণ্ডেভদের রক্ত কানুদা।

—উণ্ডেভদের রক্ত ?

—হ্যাঁ, সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য কানুদা। একটা বস্তীর ওপরে বোমা পড়েছে। কতকগুলি নিরীহ হতভাগ্য—উঃ, সে কি দৃশ্য—কারও হাত গেছে, কারও পা গেছে, কারও বুকে কারও পিঠে স্প্লিন্টার ঢুকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিয়েছে। বস্তীর মধ্যে কাটা হাত-পা-আঙুল এখনও পড়ে আছে।

কানাই একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললে। কলকাতার বুকে যুদ্ধের বলি আরম্ভ হযে গেছে।'[৩৬]

উপন্যাসের নায়ক কানাই-এর অভিজ্ঞতার ছবি আরও ভয়াবহ। রাতে শত্রুপক্ষের বোমা বর্ষণের পর ক্ষতির পরিমাণ দেখতে এসে কানাই অর্জন করে নতুন এক অভিজ্ঞতা। ইউরোপের রণক্ষেত্রে একের পর এক নির্বিবাদে নির্বিচারে সৈন্য মৃত্যুর যে ভয়াবহতা, সমস্ত রকম মানবতাবিধ্বংসী যে রণক্ষেত্রের লোলুপতা, তা এই যুদ্ধ-সমকালে রচিত কথাসাহিত্যের নায়করা পায়নি, কিন্তু সীমিত ক্ষেত্রে যেটুকু অভিজ্ঞতা যুদ্ধের, তা যে কত ভয়ানক, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কানুর আর্ত সেবার মধ্যে যেন তারই দলিল লিখেছেন :

'...কানাইয়ের মনে হল, নরম লম্বা কিছুর উপর পা দিয়েছে। টর্চ ফেলেই সে শিউরে উঠল। মানুষের একখানা হাত, বাহুর আধখানা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে এসে

পড়েছে। সেদিকে চেয়ে থাকবার মত সময় নাই। সে এগিয়ে গেল। একজন পড়ে গোঙাচ্ছিল, তার ওপর আলো ফেলে দেখল—তার মাথা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, কাঁধের থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, সে চেতনাহীন। কানাই বসল তার কাছে।'[৩৭]

বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই আসে শহরের বুকে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের পলায়নের হিড়িক। মনোজ বসু প্রমুখ এই পলায়নের ছবি এঁকেছেন তাঁর 'সৈনিক' উপন্যাসে, প্রবোধ সান্যাল এঁকেছেন সংক্ষেপে তাঁর কোন কোন গল্পে। তারাশঙ্কর 'মন্বন্তর' উপন্যাসে সেই পলায়নের দৃশ্যকে জীবন্ত করেছেন। গুজব যেমন আছে, তেমনি আছে নিষ্প্রদীপ রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা শহরের বুকে একাধিক সাইরেন ধ্বনি। বোমাবর্ষণের প্রত্যক্ষ শব্দের প্রতিক্রিয়াজনিত মানসিকতাতেই সর্বস্তরের মানুষের পলায়ন ঘটে দিনের পর দিন। নায়িকা নীলা অফিস থেকে ফেরার পথেই নানান গুজবকে শোনে। সেই রকম সব গুজবের থেকেই তৈরী হয় বিরাট শহরত্যাগীর দল :

'Keep away from Calcutta'—'কলকাতা থেকে সরে যাও'

জোর গুজব—'বড়দিনের রাত্রি থেকে নিউইয়ার্স-ডে পর্যন্ত কলকাতা তারা সমভূমি ক'রে দেবে।' মানুষের মনে গোপনে গোপনে আতঙ্ক সঞ্চারিত হয়েছে। আতঙ্কিত মানুষ প্রতি কথায় বিশ্বাস করে পালাবার যুক্তিকে প্রবল করে নিচ্ছে।

হাওড়ায় শিয়ালদহে বিপুল জনতার সৃষ্টি হয়েছে। স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে তিল ধারণের স্থান নেই। ছেলে-মেয়ে জিনিসপত্র নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে চাপ বেঁধে বসে আছে পতঙ্গের মত। কোলাপ্‌সিবল্‌ গেটে রেল কর্মচারীর বদলে ইউরোপীয় সৈনিক মোতায়েন হয়েছে। কুলিদের দর পয়সায়-আনায় কুলুচ্ছে না, পাঁচ-দশ-বিশ-পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত। ধনীদের রাশীকৃত মাল ঢুকে যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ থেকে কুলি কামিনের এক দশা। পড়ে আছে। ট্রেনের পর ট্রেন চলে যাচ্ছে। কতক ঢুকছে মরীয়ার মত, বাকী সব পড়ে থাকছে। চীৎকার করছে। মুহূর্তে মুহূর্তে আসছে ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ি, রিক্সা, আকণ্ঠ যাত্রি বোঝাই মোটর বাস। হাওড়া ব্রীজ জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে।'[৩৮] যুদ্ধের সূক্ষ্ম অন্তঃশীল সামাজিক ও নৈতিক প্রতিক্রিয়া যেমন ছিল গভীরে, তেমনি প্রত্যক্ষ যুদ্ধ-ভয়ের কারণে একাধিক মৃত্যু, সম্পদ ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে ভয়ার্ত মানুষের পলায়নের কারণে অসহায় 'ইভাকুয়ি'-র দল-ও দেখা দিয়েছিল কলকাতা ও শহরতলীর বুকে। তার চিত্র বস্তুত প্রত্যক্ষ যুদ্ধেরই এক পরোক্ষ অবধারিত রূপ।

মনোজ বসুর 'সৈনিক' উপন্যাস যেন যুদ্ধ-সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যের একটি অন্যতম উপযুক্ত দলিল। যুদ্ধ-সমকালকে লেখক সমস্ত দিক থেকে এর পটভূমি, ঘটনা,

চরিত্র ও প্রতিপাদ্যে কনকনে শীতের দিনে গায়ে জড়ানো অতিপ্রয়োজনীয় চাদরের মতই অবধারিত ও ওতপ্রোত করেছেন। বাংলাদেশ তথা কলকাতার বুকে যুদ্ধের প্রস্তুতি, প্রত্যক্ষ যুদ্ধের স্বরূপ চিত্রণ, যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষতগুলি—মন্বন্তর ইত্যাদি, গান্ধীজীর আগষ্ট আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া, গ্রামগঞ্জেও সুখে-শান্তিতে বাস করা কৃষকদের অপূরণীয় ক্ষতি ও অসহায়তা, রাজনীতির সন্ত্রাসবাদ—এসব মনোজ বসুর এই উপন্যাসে যুদ্ধ-সমকালকে লিখিত দলিলের মত নিশ্চিত করেছে। সে সময়ের দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচনার প্রতিবেদনে 'সৈনিক সম্পর্কে' বলা হয়,—'The novel is a powerful story of the cataclysmic times since the start of the second world war of the frustration, famine, devastation and holocaust of yesterday. His canvas is broad, his lines are boldly drawn, his men and women true to life. Intimate knowledge of the peasant life and stern realism of treatment has raised the book to the height of a living human document of the stark tragedy of our times.'[৩৯]

উপন্যাসের অন্যতম নায়ক সদ্য জেল-ফেরত পান্নালাল ও তার সঙ্গী শিক্ষিকা উমা সন্ধ্যায় কলকাতায় হেঁটে চলেছে। এ কলকাতা জনবহুল শহর নয়। রেঙ্গুন-বর্মার পতনের পর আসন্ন যুদ্ধ-ভয়ে ভীত সাধারণ মানুষগুলির শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর সন্ত্রস্ত শংকিত কলকাতা :

'এখন ব্লাক-আউটের মধ্যে মনে হচ্ছে, গহন অরণ্য ছায়ে অনন্ত রাত্রিবেলা চলেছে দু'টি প্রাণী। দু'পাশে রুদ্ধ-কবাট নিঃশব্দ বাড়িগুলি যেন বহু শতাব্দীর পরিত্যক্ত অট্টালিকা—মাটির নীচেকার বিলুপ্তি থেকে সম্প্রতি এক প্রাচীন নগর খুঁড়ে বের করা হয়েছে।

ভয় ভয় করছে উমার। কাছে—অত্যন্ত কাছাকাছি একেবারে পানুর গা ঘেঁসে চলেছে।

পানু-দা গো।

পান্নালাল অন্যমনস্ক ছিল, চমকে ওঠে।

ফুটপাথে উঠে এস। লরী আসছে ঐ যে। চাপা দেবে।

দুটো আলো অনেক দূরে—দৈত্যের রক্তাক্ত চোখ দুটো। গর্জন করতে করতে প্রবল বেগে লরী ছুটে গেল। বন্দুক হাতে একদল বিদেশী তার উপর। তাদের হাসির ধ্বনি আর লরীর আলোয় রাস্তা এক মুহূর্ত জীবন্ত হয়ে আবার গভীরতর অন্ধকারে নিমগ্ন হল।'[৪০]

কলকাতার বুকে যুদ্ধ আসেনি, এ হল আসন্ন যুদ্ধকে প্রতিরোধ করার মহড়া। শহরকে নিষ্প্রদীপ করে, বন্দুকধারী বিদেশী সৈন্যের তৎপরতা বৃদ্ধি করে, শহরে মানুষদের শহর-ছাড়া করে সে সময়ের শাসক-সম্প্রদায় যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল বাংলাদেশে, তা যুদ্ধের কালো ছায়ার ভয়কে থমথমে করে তোলে। আবার এই যুদ্ধ-কথাই সত্য হয় জাপানী বোমার প্রত্যক্ষ আক্রমণে। বাঁকাবডশি গ্রামে কলকাতা থেকে চলে-আসা জমিদার হরিহর রায়ের কাছে কলকাতার অনুপমের কাছ থেকে চিঠি আসে। তাতে জানা যায়:

'বাইশে ডিসেম্বর সেই যে বোমা পড়েছিল কলকাতায়। তারপর থেকে সমস্ত ঠাণ্ডা। এত আন্দোলন-আলোচনা হচ্ছিল বোমা নিয়ে। কিন্তু দেখা গেল বড় রকমের পটকা ফাটার চেয়ে হয়তো কিছু বেশি। পর্বতের মূষিক প্রসব। গ্যাসপোস্ট দু-একটা ছেঁদা হয়েছে, প্রচুর কাঁচ ভেঙেছে, মহিষ ও মানুষ মরেছে গুটিকয়েক, পার্কে ও রাস্তায় গর্তও হয়েছে দু-দশটা। ব্যাস, এদের তাড়া খেয়ে সেই যে বোমাওয়ালারা পালিয়েছে, আর কোনদিন হয়নি এমুখো। শহরে মানুষজন ফিরে আসছে। লোক চলাচল বেড়েছে রাস্তায়।'[৪১]

বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেনি, যদিও তখনো শাসকশ্রেণী অর্থাৎ বৃটিশরা ছিল যুদ্ধলিপ্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বাংলাদেশের মানুষকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দান করে। কলকাতার বুকে বোমাবর্ষণ সেই অভিজ্ঞতা দিলেও তা নামমাত্র। কিন্তু প্রত্যক্ষ-যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা নামমাত্র হলেও, তার পরোক্ষ ফল ভয়াবহ। তা সমাজদেহকে অন্যভাবে, আরও গভীর দুঃখজনক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত করে। শহর ছাড়িয়ে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে তার প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়াবহ। 'সৈনিক' উপন্যাসের শেষে উমা ও সুপ্রিয়া যখন হা-অন্নে হতাশ, বিধ্বস্ত, নিম্নবিত্ত ও কৃষকদের গ্রাম ঘুরতে বেরোয়, তখন সুপ্রিয়ার প্রশ্নাত্মক স্বগতোক্তির মধ্যে সেই ভয়াবহতারই ইঙ্গিত:

'নিঃশব্দে চলেছে উমা আর সুপ্রিয়া। আপন মনে হঠাৎ সুপ্রিয়া বলে ওঠে, অথচ একটা বোমা পড়েনি এদিকে কোথাও। কলকাতায় দু'চারটে পটকার মতো যা ফুটেছিল, তার আওয়াজ আসেনি এতদূরে। কিসে পুড়ল গ্রাম?'[৪২]

মনোজ বসু তাঁর উপন্যাসে যে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ চিত্র এঁকেছেন তা মূলত গ্রাম বাংলার ও কলকাতার বুকে নেমে-আসা, সাধারণ মানুষদের জীবন-যাপনে প্রভাবিত-করা যুদ্ধের ছায়ারূপ। বরেন বসু তাঁর 'রঙরুট' উপন্যাসে অবশ্যই গ্রামবাংলা থেকে সরে গেছেন, সাধারণ মানুষকে সাধারণভাবে রেখে যুদ্ধের ছবি আঁকেননি, তিনি বাঙালী যুবকদের অসহায়ভাবে যুদ্ধের সৈন্যদলে যোগদান ও সেই সৈনিকদের আসন্ন যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়ার

জন্য তৈরী-হওয়া এবং সেই সূত্রেই যুদ্ধ-পরিবেশ ও যুদ্ধ-অভিজ্ঞতার এক জীবন্ত ছবি উপহার দিয়েছেন। সৈনিকদের ক্যাম্পের একজন সদ্য সৈন্যদলে-নাম-লেখানো নায়ক অমলকে শোনায় :

'রঙরুট' হচ্ছে রিক্রুট কথাটার মিলিটারী সংস্করণ। যত্তো আকাট মুখ্যুর পাল্লায় পড়ে ইংরেজী ভাষায় এমনি হাল হয়েছে।'[৪৩]

কিন্তু ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতায় অমল বোঝে—'রঙরুট' কথাটার আর একটা অর্থই ঠিক—'ভুল পথ'। যুদ্ধ যে মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়, সমাজের কোন স্তরে নামাতে পারে, প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সৈনিক জীবন তারই প্রমাণ দেয়। বাংলাদেশ ছেড়ে অমল দেশীয় তরুণ সৈনিকদের সঙ্গে আসে আসাম সীমান্তে। সেখানে জাপানী সেনার ভয়ে ভীত ইভাকুয়ীদের অবস্থা শোচনীয়। সে রকম এক ইভাকুয়ীর নিরন্ন অসহায় অবস্থা থেকে সাময়িক বাঁচাতে গিয়ে অমল যখন হাবিলদার ভট্টাচার্যের কাছে খাবার চাইতে আসে সৈনিকদের সংরক্ষিত রসদ থেকে, তখন হাবিলদার যেভাবে কথা বলে, যে ইঙ্গিত দেয়, তা সমস্ত নৈতিক জীবনকে কবরস্থ করারই সামিল :

'......এটা হল লড়াইয়ের মাঠ, এখানে ওসব সেন্টিমেণ্টাল ব্যাপার চলেনা। জানেন ওই ইভ্যাকুয়ীদের কাছে হাজার হাজার টাকার বর্মা নোট আছে। এক টাকার জিনিষের জন্যে একটা দশ টাকার নোট ওরা অম্লান বদনে দিয়ে দেবে। আপনি যা জিনিষ দিচ্ছেন, তার জন্যে পঞ্চাশ টাকা ওই ভদ্রলোক হাসিমুখে দেবে। আমাকে অন্তত কুড়িটা টাকা দিতে হবে।'[৪৪] সৈনিক জীবনের নির্দয়তা সুগঠিত সমাজ-জীবনে আনে অভিশাপ।

বরেন বসু তাঁর উপন্যাসে যুদ্ধ-সমকালের বিশ্বপ্রেক্ষিতকে পটভূমিতে রেখেছেন। সেই যুদ্ধরত দুই ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠী এবং তার মধ্যে জড়িয়ে পড়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়া—এদের যুদ্ধজনিত তৎপরতা বাংলাদেশে ও বাঙালী মানুষদের যেভাবে যুদ্ধভীত ও রুদ্ধশ্বাস করে তোলে তা লক্ষ্য করার মত। ইম্ফলের দরজায় জাপান আপাতত শান্ত। বৃটিশদের তৈরী বাঙালী সৈন্যরা শাসক শ্রেণীর নির্দেশে সীমান্তে আড়ষ্টভাবে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষারত। এরই মধ্যে লেখক কিছু সৈন্যের যে প্রতিবাদী মানসিকতার ছবি এঁকেছেন তাদের সংলাপ-বিনিময়ের মাধ্যমে, তা তাদের তীব্র বৃটিশ-বিরোধিতাকেই স্পষ্ট করে :

'......সৈন্য সে যে দেশেরই হোক না কেন, আমাদের মতই তাদের অবস্থা। এই রকম একটা অমানুষিক অবস্থার মধ্যে কতদিন জীবন কাটাতে পারে। এইবার তারাই দেবে লড়াই বন্ধ করে।

খগেন বললে, 'তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক অনন্ত, এ শালার যুদ্ধ থামুক, আর যেন পারছি না।'

পাঁচকড়ি বললে, 'কিন্তু জার্মানী যদি রাশিয়ার হাতে ঘায়েল হয়, তাহলে এ শালা বৃটিশরা তো বহাল তবিয়তেই থেকে যাবে। তবে আর এত বড় যুদ্ধটা হয়ে লাভ কি হল।'

অনন্ত বললে, 'লাভটা এই হল যে ভারতবর্ষের কুড়ি লক্ষ লোক যুদ্ধের সমস্ত কায়দা শিখে নিলে। এই যুদ্ধ থামার সঙ্গে সঙ্গে তারাই পারবে এ শালাদের পিটিয়ে পগার পার করতে।'[8৫]

বাধ্য হয়ে যে সব বাঙালী সৈনিক-জীবন বেছে নিয়েছে, তারা কলকাতার পরিবার জীবন থেকে দূরে সরে থাকলেও পরিবার জীবনের সেই শান্তির নীড়ের আকর্ষণ, তার মধ্যে বাস-করা মানুষগুলির জন্য উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ত্যাগ করতে পারেনি। যুদ্ধভয় এবং যুদ্ধজনিত জীবনহানির ভয় তাদের মধ্যে পরোক্ষ গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। 'রঙরুট'র লেখক নিপুণ শৈল্পিক দৃষ্টিতে বাঙালী সৈনিক অনন্তর মানস জটিলতায় তা প্রাণবন্ত করেছেন। কলকাতায় থাকে অনন্তর সংসার, বাবা-মা-ভাই-বোনেরা। সেখানেই জাপানীরা একদিন বোমা বর্ষণ করে। এ খবর পায় সিভিলিয়ান এ এস. এম-এর মুখ থেকে :

'জানেন, কাল দুপুরে জাপানীরা কলকাতায় বোমা ফেলেছে।'

অনন্ত আচমকা সীট্ থেকে লাফিয়ে ওঠে, 'এঁ্যা—বোমা। কলকাতায়?'

এ. এস. এম. বললে, 'হ্যাঁ।'

ক্ষণেকের জন্যে অনন্তর হাত পা অবশ হয়ে যায়, ধপ করে আবার সে টুলটার ওপর বসে পড়ে। ধীরে ধীরে তার মাথাটা ভারী হয়ে আসে—ঝুঁকে পড়ে বুকের ওপর।

একটু পরে চোখ তুলে সে তাকায় এ. এস. এম-এর মুখের দিকে। সে বেচারী ফ্যাল ফ্যাল করে অনন্তর মুখের দিকে চেয়ে আছে—নিজেকে যেন সে মস্ত অপরাধী মনে করছে এমন একটা খবর দেওয়ার জন্যে। আর অনন্তর দৃষ্টি চলেছে রকেটের মত ছুটে, ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে, আসাম ছাড়িয়ে বাঙলায়-বাঙলার সোনার মাটি মাড়িয়ে, সবুজ গাছের তলা দিয়ে গিয়ে পৌঁচেছে কোলকাতার পিচঢালা ঝকঝকে তকতকে রাস্তায় —রাস্তার পর রাস্তা পার হয়ে তার এঁদো ঘুণধরা বাড়ীর সামনে। হঠাৎ তার দৃষ্টি থমকে যায়—ঘাড় মাথা গুঁজে এঁদো ঘুণধরা বাড়ীটা মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। তার মা, দাদা, বৌদিদিরা। এরা কি কেউ বেঁচে নেই! বাঁচার মত অবসর কি এরা কেউই পায়নি? তাদের জীবনের কোন আভাস তো সে পাচ্ছে না—একটা গোঙানির শব্দও

তো ওই ধ্বংসস্তূপ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে না। তাহলে কি সব শেষ—এই মানুষগুলো, যারা আর কিছুক্ষণ আগেও বেঁচে ছিল—কয়েকদিন আগেও যারা তাকে চিঠি লিখেছে পুনরায় বিয়ে করতে, বুক ভরে চেয়েছে সুখে শান্তিতে ঘর করতে—তাঁরা আজ কেউ নেই। জাপানীরা বোমা ফেলে সব শেষ করে দিলে—মুছে দিল তাদের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা এই পৃথিবী থেকে।

ঝুট করে অনন্ত উঠে পড়ে, হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে থাকে ক্যাম্পের দিকে। হ্যাঁ, ছুটি তার চাই-ই। তার ছুটি যদি না দেয়, তাহলে সে আজই ফোর ডাউন আসাম মেলে পালিয়ে যাবে—বাড়ী সে যাবেই। যাদের নিয়ে তার জীবন—যাদের জন্যে সে বেঁচে আছে, তাদের মরা বাঁচা সে নিজের চোখে দেখবে।'[৪৬]

আসাম সীমান্তে আছে রেঙ্গুন। বর্মার কোহিমাকে দুদিক থেকে আক্রমণ করেছে জাপানীরা। ডিমাপুরের পেট্রোল সাইডিং-কে বৃটিশ সৈন্যরা কড়া গার্ড দিয়ে ঘিরে রেখেছে। সংকটাপন্ন কোহিমার কথা ভেবে ডিমাপুরে থমথমে ভাব, চারপাশ ব্ল্যাক আউট। কলকাতার ব্ল্যাকআউটের চিত্র এঁকেছেন একাধিক কথাসাহিত্যিক। কলকাতায় বোমাবর্ষণের প্রত্যক্ষ ছবি, সাইরেন ধ্বনির ভয়াবহ নির্দেশের ছবি জীবন্ত করে এঁকেছেন একাধিক ঔপন্যাসিক। কিন্তু প্রত্যক্ষ যুদ্ধ-সীমান্তে বসে সৈন্যদের যে যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা, তার নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন বরেন বসু। সে অভিজ্ঞতা সিভিলিয়ানদের এলাকায় বোমাবর্ষণ থেকে ভিন্ন। একদিকে সৈনিকদের জীবনযাপনে উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্য-দিকে বাঁচার জন্য অসহায়তা—এই দুয়ের সংমিশ্রণে বরেন বসুর অঙ্কিত চিত্র ভিন্ন যুদ্ধ-স্বাদ দেয়:

'হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল।

দুঃসহ সে আর্তনাদ বুকফাটা কান্নার মত মানুষকে পাগল ক'রে তোলে। অসহ্য সে অবস্থায় মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ঊর্ধ্বে চোখ তুলে আকাশের দিকে চায়। চাঁদ। আকাশের কোণে চাঁদের আলো ঝলমল করছে। আতঙ্কে তাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই ছুটল এ্যান্টি-এয়ার ক্রাফ্‌ট থেকে গুলি। ডিমাপুর বেস-এর সব কটা এ্যাক-এ্যাক্‌ পোষ্ট থেকে একই সঙ্গে ফায়ারিং চলতে থাকে। কখনও গুলি ছুটছে রিপিট ফায়ারে—কখনো অটোম্যাটিক। সমস্ত আকাশটা ট্রেসার বুলেটের আগুনে সরল রেখার রূপালী জালে ছেয়ে গেছে।

সাইরেনের শব্দ অফিসাররা লক্ষ্য করছিলেন, ট্রেঞ্চে যাওয়ার আগে মদের গ্লাসে শেষ চুমুকটা দিয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু ফায়ারিঙের শব্দে হাত থেকে গ্লাস খসে পড়ে যায়—

নেশা তাঁদের ছুটে যায়। মেজর নেলসন্ এক দৌড়ে বাইরে ছুটলেন। সমস্ত স্টেশনটা কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা—কেবল দুহাত চওড়া জিগ্ জ্যাগ একটা রাস্তা রাখা হয়েছে থার্ডক্লাস ওয়েটিং রুমের সামনে। সোজা দৌড়ে বাইরে যেতে গিয়ে মেজর নেলসন্ হোঁচট খেলেন সেই কাঁটা তারের বেড়ায়, সামলে ওঠার আগেই তিনি আটকে পড়লেন কাঁটাতারের মধ্যে। 'ওহ্ গড'—আর্তনাদ যারা শুনলে তারা সজাগ হয়ে সঠিক রাস্তা ধরলে।

রেকী স্কোয়াড ব্রেনগানগুলোকে এ্যাক এ্যাক পজিশন করে নিয়েছে। এক ঝাঁক প্লেন উড়ে আসছে কোহিমার দিক থেকে, তার শব্দে হাওয়ার কাঁপন বেড়ে উঠেছে। ব্রেনগান ক্রু-র হাতের পাতা ঘেমে উঠেছে। রাইফেলম্যানরা 'নিল ডাউন' পজিশনে বসেও উরুর কাঁপন বোধ করতে পারছে না। প্লেনের ঝাঁকটা যেন ছড়িয়ে পড়েছে—জমাট্ শব্দ যেন পাতলা হয়ে যাচ্ছে। ক্রু নাম্বার ওয়ান চিৎকার করে উঠল, 'কোথায় গেল সেই শুয়োরকা বাচ্চা কর্নেল ?'

একজন রাইফেলম্যান বলে ওঠে, 'তুই চালা গুলি—সে শালা এতক্ষণে কেঁচোর গর্তে ঢুকেছে—'চাপা একটা গোঙানির শব্দ খুব কাছে, কোথায় গুমরে উঠেছে। চমকে সে সেইদিকে ফিরে চায়। তাদেরই একজন রাইফেলম্যান মুখ থুবড়ে স্যাণ্ডব্যাগের ওপর পড়ে রয়েছে।

ইয়ার্ড ফোরম্যান সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে পাইলট ইঞ্জিনটাকে কেটে নিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে সান্টিং নেক্-এ। পয়েণ্টস্ম্যানরা হাতবাতি নিভিয়ে শ্লিট ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিয়েছে। তারা চেয়ে আছে আকাশের দিকে, মৃত্যু যেন গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে তাদের কাছে—আরও কাছে।

রিজার্ভ ব্যাচ ততক্ষণে শুয়ে পড়েছিল। সাইরেনের শব্দে তারা উঠে বসেছে। এরপর আর তাদের কিছুই করবার নেই—তারা রয়েছে নিরাপত্তার সেরা বন্দোবস্তের মধ্যে। ইচ্ছে করলে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তভাবে শুয়ে থাকতে পারে—তবুও তারা উঠে বসেছে। এ্যাক্ এ্যাক্ ফায়ার যখন সুরু হল তখন জনকয়েক মাটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে—দু'তিন জন কাপড়ে পায়খানা করে ফেলেছে। কতক উঠে দাঁড়িয়ে কাঠ হয়ে আছে, কেউ কেউ আপন মনে বিড়বিড় করছে। হঠাৎ একজন চিৎকার করে উঠল, 'আমি পালাব—আমি মরতে পারব না—' অন্ধকারের মধ্যে ছোটাছুটি করে সে পথ খুঁজতে থাকে।'[৪৭]

বরেন বসু অঙ্কিত বাঙালী সৈনিকদের যেমন নতুন নতুন অভিজ্ঞতার চিত্র আছে উপন্যাসে, যেমন আছে যুদ্ধজনিত ভয়, হঠাৎ-মৃত্যুর আতঙ্ক-উৎকণ্ঠা, তেমনি আছে যুদ্ধ থেকে একদিন মুক্তি পাওয়ার জন্য আন্তরিক চাপা আশা-উৎসাহ-উল্লাস। আন্তর্জাতিক

দাবাখেলায় যুদ্ধের একদিন শেষ এগিয়ে আসে। জার্মানীর দিকে নাৎসী বাহিনীকে হটিয়ে আসে একদিক থেকে বীরদর্পী রাশিয়া, অপরদিক থেকে আমেরিকা। এদিকে বৃটিশ বাধা দিতে থাকে আর এক ফ্রন্টে জাপানীদের। জয়ের এমন বিজয় রথচক্রের উল্লসিত ধ্বনির মধ্যে বাঙালী সৈনিকদের প্রতীক্ষিত মুহূর্তগুলি নানাদিক থেকে উতরোল হয়ে ওঠে। যুদ্ধ যে মানুষ চায় না, যুদ্ধকে যে মানুষ ঘৃণা করে, যুদ্ধ কোনদিন শেষ হলে যে সর্বস্তরের মানুষের হৃদয়রক্ত পবিত্র আনন্দের নীল নীলিমাকে নিবিড় অলঙ্কৃত করতে পারে, এমন এক পরিস্থিতি এঁকেছেন লেখক রেডিও থেকে বাংলায় যুদ্ধের টাটকা খবর শোনার পর :

'ছেলেরা ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়ে—গোল হয়ে হিসেব করতে বসে, আর কতদিন। আশায়, আনন্দে মন নেচে ওঠে, বুক ভ'রে যায়—মুক্তির পথে তারা পা বাড়িয়েছে। লাল ফৌজ এগিয়ে চলেছে বার্লিনের দিকে—তাদের চলার পথে বুক ভরা দরদ ঢেলে দেয় লক্ষ যোজন দূরে বসে এই মুক্তিকামী মানুষগুলো। মুক্তির প্রতীক লালফৌজ—জীবনে তাদের এনেছে আশা, উৎসাহ, উদ্দীপনা। তারাও যেন চলতে থাকে লাল ফৌজের সঙ্গে কার্পেথিয়ান পর্বত ডিঙিয়ে ড্যানিয়ুব পার হয়ে, ওয়ারশ'র ওপর দিয়ে, দুর্মদ পদক্ষেপে বার্লিনের দিকে। বার্লিন। বার্লিন হয়ে গেলেই যুদ্ধ শেষ—তাদের মুক্তি—সৈনিক জীবনের অবসান। আবেগে উচ্ছ্বাসে বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে। তারাও তাহলে বাঁচবে। আবার তারা বাড়ী ফিরবে।'[৪৮]

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'রাত্রি' উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসেছে পরোক্ষভাবে—উপন্যাসের প্রধান প্রেক্ষিতরূপেই। যুদ্ধের কোন প্রত্যক্ষ চিত্র নেই, নেই পরোক্ষভাবে কোন চিত্রের উপস্থাপনা। যুদ্ধ আছে উপন্যাসের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলির বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি-তর্ক-আলোচনার মধ্যে। উপন্যাসটিকে লেখক প্রধান পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৩—এই পাঁচটি বছরে স্বতন্ত্রভাবে রেখে এবং প্রত্যেক বছরের নির্দিষ্ট সাল দিয়ে চিহ্নিত করে। প্রথম অধ্যায়ের সূচনাই যুদ্ধ আরম্ভের সংবাদ দিয়ে :

'প্রবীরের চীৎকার : 'যুদ্ধ—লেগে গেছে বলেছিলাম কিনা ?'

……সুদাস প্রবীরকে আর সময় দিলে না : 'যুদ্ধ কে বাধালো ?'

'কে আবার ? রণকামুক হিটলার।' সশব্দে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে প্রবীর বসে পড়ল—উত্তেজনা থামিয়ে এখন যুদ্ধের কূটনৈতিক পাকচক্রের আলোচনায় মন দিতে হবে।

'যুদ্ধ লাগবে তো জানাই ছিল। ওটা অমৃতবাজার স্পেশ্যাল ?'

কাগজটা সুহাসের হাতে তুলে দিয়ে দিয়ে প্রবীর বললে: 'হিটলারের ছবির নীচে ফ্যানাটিক লেখা—উপযুক্ত পদবী।'

……কাগজ থেকে মুখ তুলে সুহাসই বললে: 'যুদ্ধ ত সবাই চেয়েছিল—হিটলার তা হলে ফ্যানাটিক হতে গেল কেন?……তোরা কমুনিস্টরা ধনতন্ত্রের পতনের জন্তে একটা যুদ্ধ কায়মনপ্রাণে আকাঙ্ক্ষা করছিলি কেন?'

'সে যুদ্ধ মানে পোল্যাণ্ড আক্রমণ নয়—'[৪৯]

সঞ্জয় ভট্টাচার্য শিক্ষিত মানুষগুলির যুদ্ধজনিত উত্তেজনা ও যুদ্ধ বিষয়ে তর্ক-বিতর্কেই যেমন তাঁর যুদ্ধ-ধারণার পরিচয় রেখেছেন, তেমনি বাংলাদেশ তথা কলকাতার বুকে যুদ্ধের ক্রম-অগ্রগতির একটি চিত্র এঁকেছেন শিল্পের সততায়। সুহাসের ফ্ল্যাটে একটা রাত কাটাবার পর তার প্রেমিকা শ্যামলীর সঙ্গে সকালে চা খেতে খেতে সংলাপ-বিনিময়ের সময় যুদ্ধের একটা খবর-চিত্র আঁকা হয়ে যায়:

'যুদ্ধের উত্তাপে সারাদিন হুঙ্কার দিয়ে বেড়াতে চাও না কি তুমি?' হাসির সঙ্গে কথাগুলো ছিটিয়ে দিল শ্যামলী।

'তা ত নয়'—'টোস্ট চিবিয়ে চলল সুহাস: 'যুদ্ধটায় আমাদের খানিকটা সচেতন থাকা উচিত, আমাদের ভাগ্যের সঙ্গেও জড়িত যে এ যুদ্ধ, ততটুকু সচেতন। হল্যাণ্ড-ডেনমার্কে নাৎসী এরোপ্লেন বোমার ফসল বুনছে কিনা বা প্যারিস ত্যাগ করতে রেনো ক'ফোঁটা চোখের জল ফেলেছে এসব উত্তাপ সৃষ্টির খবর না রাখলেও চলে যদি এটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকে যে পৃথিবীর বং বদলাবার যুদ্ধ লেগেছে—আর ভারতবর্ষ সেই পৃথিবীরই একটা দেশ।'[৫০]

যুদ্ধ আরম্ভের বছর দুই পর থেকেই বৃটিশ উপনিবেশ শাসিত বাংলাদেশ তথা কলকাতা প্রত্যক্ষ যুদ্ধের ভয়ে তটস্থ হয়ে ওঠে। তার চিত্র এঁকেছেন লেখক:

'জনশূন্য হয়ে চলছিল কলকাতা। এতোদিন ব্ল্যাকআউটটা ভয়ংকর মনে হত না—এখন সত্যি ভয়ংকর মনে হয়। এই কালো রাত্রির গোপনতায় সত্যি কোথায় কি যেন একটা ষড়যন্ত্র চলছে—একসময় এসে তা ঝাঁপিয়ে পড়বে অসহায় কলকাতার উপর। বেজে উঠবে সাইরেনের একটা অশুভ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ—সেই যান্ত্রিক আর্তনাদ হাজার রক্তমাংসের আর্তনাদের সংগে মিশে ভরিয়ে তুলবে কলকাতার আকাশ।'[৫১]

অফিস থেকে নিজের গাড়ি করে শমীনকে নিয়ে সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় মুখর হয়ে ফেরার পথে একসময়ে দুজনেই নীরব হয়ে যায় যুদ্ধ ভয়ে ভীত সদা-চঞ্চল চৌরঙ্গীর পরিবেশ দেখে:

'জনহীনতায় নিষ্প্রাণ চৌরঙ্গী। বিশুষ্ক, বিশীর্ণ কলকাতার চেহারা। কিন্তু এই

বিশুদ্ধ দেহেও কোথায় যেন বেঁচে আছে প্রাণ। ১৯২১ বা ১৯৩০-এর প্রাণ না হোক তবু যে প্রাণেরই উত্তরাধিকার রক্তের ক্ষীণস্রোতে যেন আবিষ্কার করা যায়। বন্দেমাতরম ধ্বনির সঙ্গে ফিরে এসেছে আবার সেই উৎকণ্ঠা, সেই রহস্য। কিন্তু হয়ত বড় দুর্বল এই প্রাণের উৎসাহ। ভঙ্গুর, বাঁচতে পারবে না বেশিদিন।'[৫২]

'রাত্রি' উপন্যাসে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া আছে, যুদ্ধ চিত্র নেই। তবে প্রতিক্রিয়ার চিত্রে যুদ্ধ নিশ্চিতভাবেই তার একটি ঐতিহাসিক ক্রমে উপস্থাপিত।

চার

বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধ-সমকালের প্রেক্ষাপটে কেবলমাত্র উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের কয়েকটি দিন প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধকে দেখে। আর যুদ্ধের প্রস্তুতির কারণে কলকাতার বুকে নিষ্প্রদীপের মহড়া, ইতস্তত বাফল-ওয়াল তৈরী, ট্রেঞ্চ খোঁড়া, সাইরেনের ধ্বনি, বিমান আক্রমণের প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি, বাংলাদেশের বুকে ট্রেনে-ট্রাকে মিত্র-পক্ষের অগণিত সৈন্য সমাবেশ—এ সব দিয়েই যুদ্ধ সম্পর্কে একটা অভিজ্ঞতা গড়ে তোলে মনে। আমাদের দেশের কথাকারগণও সেই অভিজ্ঞতার ফসল রচনা করে গেছেন বাংলা ছোটগল্প-উপন্যাসে।

ইংরেজ কবি স্যাসুন, ওয়েন—এঁদের মত কোন লেখকই প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। এশিয়া-ইউরোপে ইলিয়া এরেনবুর্গ, আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে, লিও টলষ্টয়, মিখাইল সলোকভ, এরিখ মারিয়া রেমার্ক প্রমুখের মত প্রত্যক্ষ রণভূমিতে যোগদানের বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় আমাদের দেশের লেখকদের উপন্যাসে নেই, থাকার কথাও নয়। কারণ, প্রথম কথা হল, আমাদের দেশের জল-আবহাওয়ার পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থান যুদ্ধের ভয়ংকর ও বীভৎস মানসিকতা গঠনের একান্ত পরিপন্থী। তাই, যুদ্ধ কয়েকদিনের জন্য বাংলাদেশের বুকে সদম্ভ পদক্ষেপ ঘটালেও তার তীব্রতা তারাশংকর, সুবোধ ঘোষ প্রমুখের রচনায় নেই। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষ কোনদিনই বিশ্বযুদ্ধের একমাত্র রণাঙ্গন, উগ্র যুদ্ধপ্রেমীদের প্রধান লক্ষ্য হয়নি। ভারতের রূঢ় বাস্তব যুদ্ধের শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব হয়নি কোনদিনও প্রত্যক্ষ যুদ্ধের মাধ্যমে। ভারত শান্তি-প্রিয় দেশ। নিজের থেকে বাস্তব যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং প্রত্যক্ষ যুদ্ধজয়জনিত আগ্রাসন মনোভঙ্গির থেকে বরং প্রবল যুদ্ধ-বিরোধী মানসিকতাই তার চিরকালের চারিত্র্য।

এই সূত্রেই আসে যুদ্ধ নিয়ে বড় জীবন দর্শনকে উপন্যাস-গল্পে প্রস্তুত করার কথা। টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস' রেমার্কের 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট,'

হেমিংওয়ের 'ফর হুম দি বেল টোল্‌স্‌,' সলোকভের উপন্যাসের মত বড় জীবনদর্শন-দীপ্ত বক্তব্য তারাশংকরের 'মন্বন্তর' উপন্যাসের যুদ্ধচিত্রে, গোপাল হালদারের 'পঞ্চাশের পথ' উপন্যাসের যুদ্ধপ্রসঙ্গে, নরেন বসুর 'রঙরুট' উপন্যাসের শিক্ষার্থী সৈনিকদের জীবনে, নবেন্দু ঘোষের 'পলাতক' ও সুবোধ ঘোষের 'কর্ণফুলির ডাকে' গল্পের নায়ক ভাবনায়, মনোজ বসুর 'সৈনিক' উপন্যাসের প্রতিপাদ্যে স্পষ্ট হয়নি। যা হয়েছে, তা মূলত যুদ্ধ প্রস্তুতির মহড়াকে লক্ষ্যে রেখে কলকাতা শহরের পরিবেশ-প্রতিচিত্রণ মাত্র।

অর্থাৎ বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে যুদ্ধপ্রভাব এসেছে নিছক চিত্রের বাস্তবতায়, শিল্পের দর্শনে নয়। তার পরোক্ষ রূপ দেখতেই আমরা অভ্যস্ত হয়েছি কথাকারদের বিবিধ বিচিত্র রচনায় ও মানসিকতায়। পরিবেশ-সচেতনা গল্প ও উপন্যাসে অনেকটা উদ্দীপন বিভাবের মত কাজ করেছে, তার বেশী কিছু নয়। গল্প ও উপন্যাসের কাহিনী ঘটনা ও পরিবেশের পথে মানস-পরিভ্রমণ করতে করতে স্বভাবী পাঠক যুদ্ধের কিছু পরোক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন বাস্তব চিত্রের সততায়। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যুদ্ধ-প্রসঙ্গটুকু উল্লেখ করেই গল্প শেষ করেছেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য মধ্যবিত্ত বিলাসী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যুদ্ধের তথ্যকে বিতর্কের জোরালো আলোয় তত্ত্বাভাসে রূপ দিয়েই তাঁর উপন্যাসিক কর্তব্যটুকু সমাধা করেছেন। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যক্ষভাবে বোমাবর্ষণের ভয়াবহতা, আড়ষ্টতা, অসহায় অবস্থার শিল্পসম্মত প্রতিচিত্রণে থেমে গেছেন।

যুদ্ধ হয়েছে আসামে আর বাংলাদেশে। আসাম সীমান্তে সৈনিকরা যুদ্ধ করেছেন, বাংলাদেশে সীমান্তে যুদ্ধের কারণে বোমাবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে মাত্র। এই সামান্য অভিজ্ঞতা শিল্পের সূত্রে জীবনের গভীরতা প্রকাশে স্বচ্ছ আয়নার কাজ করেনি। রেমার্কের উপন্যাসের সেই ফ্ল্যাণ্ডার্সের ভয়াল রণক্ষেত্র তো হয়নি কলকাতা তথা বাংলাদেশ। তাই টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীসের' মত বিরাট যুদ্ধ-জিজ্ঞাসার মহাকাব্য হয়ে ওঠেনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালের কোন বাংলা উপন্যাস। বরং আমরা মনে করি, যুদ্ধের ভয়াল অন্ধকার, আড়ষ্ট রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ প্রতিকী রূপ পেয়েছে বাঙালী লেখকদের সমাজ-চেতনায়, নৈতিক ভাঙন ও অবক্ষয় ভাবনায়। যুদ্ধের পরোক্ষ চিত্র ও প্রভাব সমাজ, ব্যক্তি ও জীবনের গভীরে এনেছে প্রত্যক্ষ তথ্যের সত্যরূপ, সমকালের উপন্যাস ছোটগল্পে তারই সাদর শিল্প-স্বীকৃতি।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

১ 'Modern Noveiists (1968)' : Introduotion Edited by Peroy Wilson C.B. P 8

২ 'War is an ancient imposter, but none of his masks and smiles and gallant trumpets can any longer delude us , he leads the way through the cornfields to the cemetory of all that is best'. The Mind's Eye Edmund Blunden P 43.

৩ News in The Daily Statesman (Published from India) Monday September 4 1939 P 1

৪ The Story of Malakand Field Force (London, 1898) Winston R S, Churchil. P.12-13.

৫ 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদক-সজনীকান্ত দাস 'সংবাদ সাহিত্য' ১২শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৪৭ পৃ ৫৫০

৬ কল্লোলের কাল জীবেন্দ্র সিংহ রায় পৃ ১২

৭ The Literature of War (1978) Andrew Rutherford Ch.4-'The Common Man as Hero' P 99

৮ The Literary Situation Malcolm Cowley P 19

৯ সুকান্তের চিঠি ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৪২ বেলেঘাটা সোমবার বেলা ২টো 'সুকান্ত সমগ্র' নবম মুদ্রণ মাঘ ১৩৮৩ পৃ ২৯১-২৯৩

১০-১২ 'মাথুর' গল্প কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নমস্কারী' গল্প-সংকলন প্রথম সংস্করণ ১৯৪৪ পৃ ১, ৩, ৭

১৩ ২০ 'কর্ণফুলির ডাকে' গল্প সুবোধ ঘোষ 'পরশুরামের কুঠার' গ্রন্থ (১৯৪২) পৃ ৮৭, ৯৩, ৯৪ ৯৪, ৯৬, ১০৬, ৯৬, ১০৮

২১-২৪ 'পলাতক' গল্প নবেন্দু ঘোষ এই সীমান্ত গ্রন্থ (মে, ১৯৪৫) পৃ ৭২, ৭৬-৭৭, ৮১

২৫-২৮ পঞ্চাশের পথ (অক্টোবর ১৯৪৪) গোপাল হালদার পরিচ্ছেদ-দুই পৃ ৩০, পরিচ্ছেদ-তিন পৃ ৬৪ ৭৫, চতুর্থ অধ্যায় ৮২

২৯, ৩০ 'তেরশ পঞ্চাশ' গোপাল হালদার প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৪৫ প্রথম অধ্যায় পৃ ১০, পঞ্চম পরিচ্ছেদ পৃ ৮৭

৩১-৩২ উনপঞ্চাশী গোপাল হালদার পরিচ্ছেদ এগারো পৃ ২২২-২২৪, পরিচ্ছেদ-বারো পৃ ২৬৮

৩৩-৩৮ 'মন্বন্তর' তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় সংস্করণ মে ১৯৪৫ অধ্যায়-আট পৃ ৭০-৭১, অধ্যায়-বাইশ পৃ ২৩৫, ২৫ অধ্যায় : পৃ ২৮৪, অধ্যায় একুশ পৃ ২৩২, অধ্যায়-তেইশ পৃ ২৬২-২৬৩, অধ্যায়-বাইশ পৃ ২৪৫

৩৯ Book review Amrita Bazar Patrika 22.7.1945 P 4

৪০-৪২ সৈনিক মনোজ বসু ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৫১ প্রথম পরিচ্ছেদ ৩ পৃ ৮-৯, সপ্তম পরিচ্ছেদ ১ পৃ ১২২. একাদশ পরিচ্ছেদ ১২ পৃ ২১৪

৪৩-৪৮ রক্তরূট বরেন বসু প্রথম সংস্করণ .৯৪৫ দ্বিতীয় অধ্যায় পৃ ৩৪, পরিচ্ছেদ ৬ পৃ ১৫৪, পরিচ্ছেদ ১১ পৃ ২৩২, ২৩৫-২৩৬, পরিচ্ছেদ ১৫ পৃ ২৯১-২৯২, পরিচ্ছেদ ১৬ পৃ ৩১১

৪৫-৫২ রাত্রি (১৯৬৬) সঞ্জয় ভট্টাচার্য অধ্যায় : ১৯৩৯ এক পৃ ৯-১১, অধ্যায় : ১৯৪০ এক পৃ ১৩৭, অধ্যায় : ১৯৪২ এক পৃ ২৫৫, অধ্যায় : ১৯৪২ দুই পৃ ২৮৯

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মন্বন্তর-প্রতিক্রিয়ার ছবি

এক

বাংলা কথাসাহিত্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের পরিবেশে সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে প্রাকৃতিক দুর্যোগ চিত্র ও মন্বন্তরের কথায়। গল্প ও উপন্যাসের বড় বিষয় তখন চতুর্দিকে চেপে-বসা মহামন্বন্তরই। কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও বা পরোক্ষে, কখনো আবার মন্বন্তরের গভীর কালো ছায়াপাতে বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাসের বিষয় হয়েছে সমৃদ্ধ। বলা যায়, সে সময়ের লেখকরা নানাভাবে তাড়িত হয়েছেন এমন একটি সুবিশাল সর্বব্যাপক ভয়াবহ ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হওয়ার কারণেই। এই সময়ে গতানুগতিক ধারার লেখকরা এসব থেকে সচেতন-ভাবে এবং সজ্ঞানে সরে গিয়ে যেভাবে গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছিলেন, তাতে তাঁরা প্রধান লক্ষ্য করেছিলেন কথাসাহিত্যের মূল দু'টি বৈশিষ্ট্য। এক বিদেশী সমালোচকের ভাষায় সেই বৈশিষ্ট্য দু'টি চিহ্নিত করা যাক,— 'The two chief facts about the novel are its popularity as a form of entertainment and its inferiority as a form of art.'[১] মন্তব্যটি সমালোচক করেছেন ইংলণ্ডের মধ্য-আঠারো শতকের চারজন বড় উপন্যাসকারের রচনার পরিবেশ, তাঁদের উপন্যাসের শিল্পমূল্য ও উদ্দেশ্য বিচার প্রসঙ্গে। এই মন্তব্যটি আমাদের দেশের দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ-সমকালের গতানুগতিক ধারার কথাসাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে যথোপযুক্ত মনে করি।

কিন্তু অত্যন্ত সচেতন ও প্রথম শিল্প বোধ এবং বুদ্ধিসম্পন্ন লেখকরা মন্বন্তরকে এঁদের মত আদৌ এড়িয়ে না গিয়ে স্পষ্টভাষায় ও গূঢ় ব্যঞ্জনায় বিষয় করেছেন, বাস্তবতায় রূপ দিয়ে গেছেন গল্পে ও উপন্যাসে। মন্বন্তরের করাল ভয়ঙ্করী রূপের সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধসমকালীন সমাজের ও মানব-ভাগ্যের মধ্যে নিশ্চিত ভাঙন করতে শুরু হয়েছিল। বাইরে ও ভিতরে সেই ভাঙনের ভয়াবহ রূপ। তা ক্রমশ চরম নৈরাশ্য ও অবক্ষয়কে অবধারিত করে তোলে। আর এই সময়ের কথাসাহিত্যে তা-ই স্পষ্টত গৃহীত হয়েছে। চারপাশের অবক্ষয়কে কেউ হুবহু এঁকেছেন আগামী দিনের নৈরাশ্যকেই সত্য ভেবে, কেউ বা আবার মন্বন্তরের পরেও বড় জীবনের আশা জানিয়ে রচনায় তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মোটকথা, বাংলাদেশের সে সময়ের বুদ্ধিজীবী লেখকরা সচেতনভাবেই গল্পে ও উপন্যাসে সমাজের মহতী অবক্ষয়ের রূপকে অভিনন্দিত করেছেন রূঢ় বাস্তব-বোধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকাল পর্যন্ত বৃটিশ কথাসাহিত্য সম্পর্কে এক সমালোচক যে মূল্যবান মন্তব্যটি করেছেন, তা আমাদের দেশের আলোচ্য সময়ের লেখকদের লেখা সম্পর্কেও সমান মানে প্রযুক্ত হতে পারে,—'...they write about a society which manifests all the classic aspects of decadence ; what a significant is that the writers themselves partake over-whelmingly of the values of the society they depict.'[২] বাংলা সাহিত্যের লেখকরা নানাদিক থেকে মহামন্বন্তরের দ্রষ্টা, সাক্ষী ছিলেন বলেই মন্বন্তরজনিত অবক্ষয়কে যথাযথ শিল্পের মমতায় ও শিল্পীর নিরাসক্ত-চিত্ততায় আঁকতে সক্ষম হয়েছেন।

মন্বন্তর ছিল মূঢ় অবিবেকী মানুষেরই সৃষ্ট অবস্থা। এগারো শ' ছিয়াত্তর সালে যে মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল, তা-ও ছিল স্বার্থান্ধ মানুষের তৈরী। দেশে দুর্ভিক্ষ এসেছে বৃটিশ শাসন স্থায়ীভাবে ভারতের বুকে কায়েম হওয়ার পর থেকে তাদের ব্যবহৃত নীতির শ্লথ-মন্থর গতিমুখে এবং নিগূঢ় অভিশাপেই। বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থায় বাংলাদেশে যখন শহর গড়ে ওঠে অগণিত গ্রামকে অবহেলা করে, দ্রুত শহরের বুকে শ্রেণীবিন্যাস দেখা দেয়, তখন থেকেই দুর্ভিক্ষ তার মাটি তৈরী করতে থাকে। এই সমাজ-উদ্ভবের ইতিহাস ও মন্বন্তরের অবধারিত আবির্ভাবের মৌল ন্যায়কে মনে রেখে প্রখ্যাত এক বাঙালী ইতিহাসকার মন্তব্য করেছেন,—'কলকাতায় ও শহরতলীতে, মুখ্যত কলকাতায় যখন এই শ্রেণী দ্রুত গড়ে উঠছে, ঠিক তখনই দশকের পর দশক জুড়ে বাঙলার গ্রামাঞ্চল ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। ভূমির যাঁরা নূতন মালিক হচ্ছেন জলসেচ ব্যবস্থার দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁদের কোনো সচেতনতা নেই, ইংরেজ রাজসরকারের তো তা নেই-ই। তার ফলে কৃষির ক্রমাবনতি এবং দুর্ভিক্ষের পৌনঃপুনিক করাল গ্রাস অনিবার্য হলো।'[৩]

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় বস্তুত শাসক সম্প্রদায়ের নিদারুণ অদূরদর্শিতা ও কুৎসিত সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থপরতাই এমন মহামন্বন্তরের জনক। এর সঙ্গে যুক্ত হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভয়াবহ বন্যা। উনিশ শ' একচল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিটলারী বাহিনীর সহযোগিতায় ও প্রেরণায় যুদ্ধের অবতারণা করলে ভারত তথা বাংলাদেশে যুদ্ধ নানাদিক থেকে প্রভাব ফেলে। এরই সূত্রে ঘটে পূর্ব সীমান্তের বাংলাদেশ ও আসামে পূর্ণোদ্যম যুদ্ধ প্রস্তুতি। কলকাতার বুকে বেশ কয়েকবার বোমা-বর্ষণে তার রূপ আরও ভয়াবহ হয় সাধারণ নাগরিকদের জীবনে।

এমন যুদ্ধ-পরিবেশে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার মধ্য থেকে জন্ম নেয় মন্বন্তর—অনেকটা

সমুদ্র মন্থনে জাত অমৃতধারার পাশে সীমাহীন বিষ-স্রোতের মত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসককূল সেই বিষে নীলকণ্ঠ হতে চাইল না, মন্বন্তরের বিষ ও তার জ্বালা অণু-পরমাণুর আকারে ছড়িয়ে পড়ল আমাদের দেশের ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার-ভিত্তিক জীবন-যাপনের গভীরে। উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সালের দুর্বার আগষ্ট আন্দোলনের প্রতিরোধ ও জ্বালা তখন শাসককূলকে ক্ষিপ্ত পশুর মত অত্যাচারী করে তুলেছে দেশীয় মানুষের বিরুদ্ধে। এমন মানসিকতার প্রতিশোধ নিতেই বুঝি শাসককূল আসন্ন মহামন্বন্তরের প্রধানতম অবিবেকী ভূমিকায় থেকে যায়।

(১) উনিশ শ বিয়াল্লিশ সালের অক্টোবরে মেদিনীপুর নিদারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ অর্থাৎ সাইক্লোনে বিধ্বস্ত হয়ে যায়, সেই সঙ্গে আশপাশের জেলাগুলিও , (২) উনিশ শ' তেতাল্লিশ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঘটে বিপুল শস্যহানি , (৩) এই সালেই আবার দেখা দেয় দামোদরের প্রচণ্ড বন্যা। এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ছবি বাংলাদেশেব বুকে যুদ্ধ-শুরুর পর থেকেই ছিল। এই বিষয়টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের একটি বাংলা মাসিক পত্রিকায় সংবাদ আকারে এইভাবে অঙ্কিত,—'পশ্চিম বাংলার উপরে অন্নকষ্ট ও দুর্দশার করাল ছায়া পডিয়াছে। বাঁকুডা ও বীরভূমে এবার সময়ে বৃষ্টি হয় নাই এবং যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাও পরিমাণে বড কম। ইহার ফলে, সময়-মত ধান্য রোপন হয় নাই। তবুও আশ্বিন কার্ত্তিকে বৃষ্টি হইলে, ধান্য কতক পরিমাণে বাঁচিত এবং ইক্ষু আলু ·ইত্যাদি ববিশস্যেব আবাদ হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সময়েও বৃষ্টির অভাব হইয়াছে।··· · অনাবৃষ্টি জনিত শস্যহানি পশ্চিমবাংলায় অভূতপূর্ব নহে।'[৪] যুদ্ধ আরম্ভের পর প্রথম দিকে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আগস্ট বিপ্লবের পর তা চরম ভয়াবহ রূপ নেয়। কিন্তু এই যুক্তি ঠিক নয় যে এই দুর্যোগকে মানুষের পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যে শস্যের অভাব তাকে না দূর করে, তার ওপর 'খাঁড়ার ঘা'-এর মতই শস্যের শোষণ নির্বিচার, অবারিত ও বর্ধিত আকারে চলে শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা যুদ্ধের রসদ মেটানোর অজুহাতে। অর্থাৎ (১) যুদ্ধের রসদ সংগ্রহের অজুহাত, (২) নবসৃষ্ট জোতদার-মজুতদার-চোরাকারবারীদের কালো হাতের কলকাঠি চালনার ষড়যন্ত্র—এই দুই কারণে এমন এক মন্বন্তর বাংলাদেশের বুকে বুকচাপা অনড ভারী পাথরের মত চেপে বসে, যার ফলে এক কোটির মত লোকের জীবন নানাভাবে ধ্বংসমুখীন হয়।

সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী এর নিরসনে দু'টি পথ ধরে—প্রথমত,' অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযানের সূচনা ঘটায়, দ্বিতীয়ত, খাদ্য রেশনিং প্রথার প্রবর্তন করে। দুটি খাদ্যনীতিই উনিশ শ' তেতাল্লিশে গৃহীত ও বাস্তবায়িত করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে

সঙ্গে বাংলাদেশের বুকে বসতির চাপ ভয়ানক বাড়ে,—'....যুদ্ধের দরুণ আমাদের বাংলা-দেশে নিদারুণ অন্ন-সমস্যা দেখা দিতেছে।......ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ভারতবাসী অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য বাংলাদেশে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। এই সকল দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ পথই বাংলাদেশ। যুদ্ধের জন্য সহস্র সহস্র নতুন লোকেরও আমদানি এখানে হইয়াছে, ফলে অন্ন-সমস্যা মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে।'[৫] সাময়িক পত্রের এই সম্পাদকীয় প্রতিচিত্রের ভাষ্য সত্য। এই পত্রিকাই অপর একটি সংখ্যায় রেশনিং ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত থেকে আরম্ভ করে সর্বহারা শ্রেণীর মানুষ পর্যন্ত কোন্ জাতীয় অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছে, তার একটি নিপুণ আলেখ্য সংবাদ আকারে পরিবেশন করেছেন,—'১৩৫০-এর মন্বন্তরে যেমন মহামৃত্যুস্নানের মধ্য দিয়া বাংলার তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের সকল সমস্যার নিরসন হইয়াছে, ১৩৫১ সালে তেমন নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু লজ্জাকর ও ক্লেশকর সমাধান হইয়া যাইবে। মৃত্যুর শীতল করাঙ্গুলি ইতিমধ্যেই তাহাদের দিকে প্রসারিত হইয়াছে।...বলা নাই কহা নাই সাধারণ গৃহস্থ ভদ্রলোকেরা নিঃশেষিত জীবনীশক্তি লইয়া পথের মাঝখানে অকস্মাৎ মরিয়া বাঁচিতেছেন। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ইহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক একটি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।'[৬]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটে ভারত তথা বাংলাদেশে যে মহামন্বন্তরের সূচনা, তার মূল ভিত্তিতে সম্ভাব্য কারণগুলিকেই আমরা আলোচনা করলাম। এই মন্বন্তরের ফলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, গরীব, সর্বহারা—সকলেই নানাভাবে ঘা খেয়েছে। এদের শ্রেণী-সচেতনা যেমন তীব্র হয়েছে, তেমনি তার উৎকট স্বাতন্ত্র্য মার খেয়েছে নানাসূত্রে। অভিজাতরা আভিজাত্যবোধকে বিসর্জন দিয়েছে, কেউ বিসর্জন না দিতে পেরে আত্মহননে নিঃশেষ হয়েছে নিজে এবং তার পরিবারকেও সেদিকে ঠেলে দিয়েছে। সুস্থ জীবন-নীতির হয়েছে সমূলে বিনাশ। কখনো নিজেদের সারল্যে কখনো বা ইচ্ছাকৃতভাবে, আবার কখনো প্রবল অনীহার মধ্যে নীতি, আদর্শ থেকে সরে গিয়ে দুর্নীতির দুঃসাহসকেই একমাত্র জীবন ও সত্য করেছে নারীরা।

এইসব গ্রহণ করেই বাংলা কথাসাহিত্যে মহামন্বন্তর হয়েছে অন্যতম উজ্জ্বল বিষয়। সেই বিষয় অনেকাংশে বাংলা কথাসাহিত্যে একটা চরম অগ্নিপরীক্ষার পরিবেশও রচনা করে। এমন অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যেই সৃষ্টি হয় প্রবোধ কুমার সান্যালের 'অঙ্গার'-এর মত গল্প, প্রকাশিত হয় পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত 'মহামন্বন্তর' গল্প-সংকলন, মনোজ বসুর 'দুঃখ নিশার শেষে' গল্প সংকলন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রঙিন ঘাট' গল্প এবং একাধিক

লেখকের মন্বন্তর বিষয়ক গল্প-রচনা। এসবের পাশাপাশি গোপাল হালদারের 'ঊনপঞ্চাশী,' 'পঞ্চাশের পর' ও 'তেরশ পঞ্চাশে'র মত মন্বন্তরভিত্তিক 'ট্রিলজি' জাতীয় উপন্যাস, তারাশংকরের 'মন্বন্তর', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ প্রমুখের একাধিক উপন্যাস-ছোটগল্প ও মন্বন্তরের জীবন্ত ছবিকে জীবন-ন্যায়ে স্পষ্ট করে দেয়। উনিশ শ' তেতাল্লিশ সালের মহামন্বন্তর যে সমাজ জীবনে এনেছিল ক্ষয়রোগের থেকেও মারাত্মক ব্যাধি, আজকের সমাজ তা প্রমাণ করে। যে ব্যাধি প্রবেশ করে সে সমাজে, তা কর্কটরোগের মত দুরারোগ্য। একাধিক লেখক মহামন্বন্তরকে গল্পে, উপন্যাসের জীবন-শিল্পে প্রতিষ্ঠিত করতে বসে সমকালের ন্যায়ে স্থির থাকেননি, আগামী দিনের কথাকে ব্যঞ্জনায় বোঝাতে সচেষ্ট থেকেছেন। কেউ আশাবাদী, কেউ বা নৈরাশ্যের দিকে ঝুঁকেছেন সিদ্ধান্তে এসে নির্বাক বিস্ময়ে। প্রগাঢ় বিষণ্ণতায় গল্প-উপন্যাসের উপসংহারে স্তব্ধবাক বিস্ময়ে থেমে থেকেছেন একাধিক কথাকার। সচেতন সমাজবাদী লেখকরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিরাসক্তচিত্ততায় মন্বন্তরের ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাটিকে যুক্তি-তর্কে ও মননধর্মী শিল্পের মর্যাদা দিতে উৎসুক থেকেছেন। মন্বন্তর যে মানুষ, সমাজ ও জীবন এবং মানবতার আদর্শে প্রাণিত 'পরিবার-জীবন—সমস্ত দিক থেকে অক্টোপাশের বন্ধনের মত জড়িয়ে ধরেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের প্রেক্ষিতে রচিত একাধিক বাংলা গল্প ও উপন্যাস তা-ই প্রমাণ করে।

দুই

বাংলাদেশে প্রথম যে মন্বন্তর দেখা দেয়, তা হল বিখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং তারই সজীব ছবি এঁকেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর ছিল আরও ভয়াবহ, নির্মম। এক ব্যঙ্গগল্পের লেখক প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে এই দ্বিতীয় মন্বন্তরের চিত্র উপহার দিয়ে বলেছেন,—'এদেশে একবার মন্বন্তর ঘটেছিল, এবারে ঘটল মহামন্বন্তর। একদিকে পথে পথে ক্ষুধার্ত নরনারীর মিলিত আর্তনাদ, অন্যদিকে খবরের কাগজে সভায় সমিতিতে তার প্রতিধ্বনি। চোখের সম্মুখে রাজপথের উপর লোক মরছে, পথে পথে মৃতদেহ পড়ে আছে, মা মৃত শিশুকে কোলে নিয়ে কাঁদছে, স্ত্রী স্বামীর মৃতদেহের পাশে কাঁদছে। কলকাতা শহরেই এই ভয়াবহ দৃশ্য দিনের পর দিন আমরা দেখেছি, আর তার সঙ্গে দেখেছি এই হতভাগ্যদের ফটোগ্রাফ, মৃত ও মুমূর্ষুর বীভৎস সব ছবি, সর্বত্র একই ধরণের ছবি, যেমন পথে পথে একই ধরণের কান্না আর একই ধরণের মৃত্যু।

ব্যাপারটি এমনই কল্পনাতীত, এমনই আকস্মিক যে প্রথমে এ দৃশ্য চোখে দেখলেও

কারও ঠিক মতো বিশ্বাস হয় নি। প্রথমে এল গৃহসংসার ভেঙে দিয়ে পল্লীবাসীরা, এসে চালের দোকানের সম্মুখে 'কিউ' করে দাঁড়াল। বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, বসল। শেষে বসতেও পারল না, শুয়ে পড়ল। চব্বিশ ঘণ্টা পথের উপর অপেক্ষা করে থাকলে তবে কণ্ট্রোলের দোকানে সকালে দু-সের চাল মিলতেও পাবে। রৌদ্রে বৃষ্টিতে পথের উপর পশুদলের মতো জীবন্মৃত নরনারীর ভিড় জমে গেল। যারা মরে গেলেও পথে বেরিয়ে আসতে পারেনি তাদের কি দুর্দশা হল জানা গেল না।'[৭]

এমন চিত্রের সার্থকতম প্রতিরূপ হল বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাস, যেগুলি যুদ্ধ সমকালে, ১৯৪৩ সালে ও অব্যবহিত পরবর্তী কালে রচিত হয়েছে। গল্পকার ও ঔপন্যাসিকরা সকলেই সমান ক্ষমতায় ও সবক্ষেত্রে উচ্চ শিল্প-মর্যাদা দিয়ে যে মন্বন্তরকে চিত্রিত করেছেন, তা নয়, তবে বাংলা কথাসাহিত্যের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসমকালীন পরিবেশে এইসব চিত্রের বাস্তবতায় ও তথ্যনিষ্ঠায় লেখকরা যথেষ্ট আন্তরিকতা ও যত্নশীলতার প্রমাণ দিয়েছেন। কথাকারদের বক্তব্যের বলিষ্ঠতা যেমন আছে, তেমনি আছে মহামন্বন্তরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবজাত সূক্ষ্ম জটিল রূপের, সমাজ-ন্যায়-পরিবর্তনের প্রতিচিত্রণ।

মন্বন্তর যুদ্ধ-সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশ থেকে জাত এক দুষ্ট ও দুরারোগ্য ক্ষত। এই ক্ষত কেবল অন্নের অভাব ও তা থেকে অকাল, অস্বাভাবিক ভয়ঙ্কর বীভৎস মৃত্যুকেই নির্দিষ্ট করেনি, অতি সংগোপনে আমাদের সচেতন মনের অজ্ঞাতে কখন যে কর্কট রোগের বীজাণু আমাদের সমাজদেহে ও জীবন-মনের রক্তে সংমিশ্রিত করে দিয়েছে, তা জানতেই পারিনি। জীবন-নীতি ও মানবতার নীতিতে আমরা যে কতটা ফাঁকা, ফাঁপা হয়ে গেছি যুদ্ধসমকাল থেকেই, সমাজের বাঁধন ছিঁড়ে সমাজকে কতটা যে উৎকেন্দ্রিক করেছে এই মানুষের তৈরী করা মন্বন্তর, তার পরিচয় সমকালের লেখক-বুদ্ধিজীবীরা নানাভাবে তাঁদের রচনায় প্রমাণ রেখেছেন। শিল্পীর আঁকা ছবিতে, সমাজ-সচেতন কবির কবিতায়, সমকালের দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত গায়কের গানে যেমন এই মন্বন্তরের নিপুণ ছবি মেলে, তেমনি করুণ সমবেদনায় সার্থক হয়ে আছে তা গল্পে উপন্যাসেও।

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক-সমালোচক গোপাল হালদার মন্তব্য করেছেন,—'এই মন্বন্তরকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারেন ঐতিহাসিক নয়, স্রষ্টা। তাঁর দৃষ্টিতে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে তবু একটি সম্পূর্ণতার সাক্ষর থাকবেই।'[৮] 'মহামন্বন্তর' গ্রন্থে সঙ্কলিত গল্পগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ নাটকের আঙ্গিকে লেখা শচীন সেনগুপ্তের 'রাজধানীর রাস্তায়' রচনাটি বাদ দিলে থাকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কালনাগ', নবেন্দু ঘোষের 'কন্ধি', পরিমল গোস্বামীর 'শেষের হিসাব' ও 'ভাঙন', প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার',

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভিড়', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বীরুর প্রশ্ন', মনোজ বসুর 'দ্বীপের মানুষ', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে', সরোজ রায়চৌধুরীর 'ক্ষুধা' ও 'ক্ষুধার দেশের যাত্রী' নামের এগারোটি গল্প। গল্পগুলি ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের প্রামাণ্য দলিল বিশেষ। 'ভূমিকা'য় গোপাল হালদার বলেছেন,—'বেদনার যে তীব্রতা, যে নিষ্ঠুরতা, যে সুগভীর মনস্তাপ এই সমসাময়িক লেখকদের চেতনাকে অস্থির ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে তা বোধ হয় ভবিষ্যৎ শিল্পীরা এমন করে উপলব্ধি করতে পারবেন না। হয়ত সে ইঙ্গিতও তাঁদের গ্রহণ করতে হবে এইরূপ সমসাময়িক চিত্র উপকরণ থেকেই—সমধর্মী শিল্পীদের চেতনায় এই মন্বন্তর কি দাগ রেখে গেছে তা থেকেই।......ইতিহাসের স্বাক্ষব এর পাতায়, সাহিত্যেরও নতুন স্বীকৃতি এর সকল কাহিনীতে।'[৯]

'মহামন্বন্তরে' সংকলিত গল্পগুলি সম্পর্কে 'নিবেদন' অংশে সম্পাদক আরও কিছু সাধারণ অথচ মূল্যবান মন্তব্য করেছেন,—'বিশুদ্ধ গল্পমূল্য ছাড়াও দুর্ভিক্ষের মর্ম ইতিহাস হিসাবে এর একটা অতিরিক্ত পৃথক মূল্য আছে এবং সেইখানেই 'মহামন্বন্তর'-এর বিশিষ্টতা।...এব প্রত্যেকটি কাহিনীই চোখে দেখা ঘটনা থেকে লেখা।...এর গল্পগুলোতে ট্র্যাজেডি ফুটে উঠেছে তাব কারণ লেখকগণ চোখে দেখা ঘটনার ট্র্যাজেডি থেকেই তাঁদের গল্পের প্লট সংগ্রহ করেছেন অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের ট্র্যাজেডিই তাঁদের গল্প লেখায় অনুপ্রাণিত করেছে।'[১০] দুর্ভিক্ষেব ট্র্যাজেডি দু'দিক থেকে স্পষ্ট হতে পারে, এক, স্থূল অর্থে প্রতিদিনের অন্নবস্ত্রের বাঁচাব সংস্থান সংগ্রহে অক্ষমতা ও অক্ষম সংগ্রামের দিক থেকে, দুই, সূক্ষ্ম অর্থে সমস্ত রকম সামাজিক, মানবিক, নৈতিক সম্পর্ককে রক্ষা করার প্রয়াস, প্রয়াসে পরাজয়, অসহায় পতনের দিক থেকে। স্থূল এবং সূক্ষ্ম দু'দিকেই মানুষে মানুষে সম্পর্কের কথা নিশ্চয়ই প্রধান। তবে 'দিনযাপনের, প্রাণ ধারণের গ্লানি'টুকু একদিকে যেমন সত্য, অন্যদিকে তেমনি সমস্ত রকম মানসিক জটিলতা, বৈষম্যের সূত্রে মানুষের আত্মিক সংকট, মানবিক সম্পর্কের সমূহ ধ্বংস ও সেই সূত্রে মানুষে মানুষে চরম বিচ্ছিন্নতাও সত্য হতে দেখা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মানুষের সৃষ্ট খাদ্যাভাবে যে দুর্ভিক্ষ, তা দূর হয়ে যায় একদিন। শুধু খাদ্য বস্ত্র আবার একদিন মেলে। কিন্তু এক সময়ের খাদ্যাভাবের যে সামাজিক-মানবিক ও নৈতিক সংকট গভীর ছায়াকে গভীরতম করে মানুষের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে, তাকে সম্পূর্ণ সরানো আর কোন দিন হয়ে ওঠে না। বিপরীত ও নতুন সামাজিক প্রেক্ষিতে তা নতুন রূপ নিয়ে সমাজের ও মানুষের মনে ও জীবনে সম্পৃক্ত থেকে যায়। তা প্রগতির ভিত্তিকে যেমন জীর্ণ করে, মানুষের মন ও প্রাণের নৈতিক বোধের পরিশীলনের প্রক্রিয়ায় প্রধান অন্তরায় হিসেবে থেকেই যায়। বুর্জোয়া সমাজ

ব্যবস্থায় এমন একটি মন্বন্তর সমাজ-জটিলতার যেমন স্রষ্টা, তেমনি সমস্ত রকম মানুষে মানুষে মানবিক-নৈতিক সম্পর্কে গোপনতম, সর্বহন্তারক, শীতল আততায়ীও।

মন্বন্তরের এমন আততায়ীর ভূমিকা লক্ষ্য করি প্রবোধ কুমার সান্যালের 'অঙ্গার' গল্পে। এই গল্পে 'মহামন্বন্তর' গ্রন্থে সংকলিত অন্য গল্পগুলির মত মন্বন্তরের নিষ্ঠুর, বাস্তব নগ্ন তথ্যের ভার নেই, আছে মন্বন্তরের সর্বগ্রাসী করাল ছায়ার শান্ত হিমশীতল সত্য-রূপ। 'অঙ্গার' গল্পের দিল্লীর সরকারী চাকুরে উত্তমপুরুষ কথক নলিনাক্ষ অবশ্য তার বর্ণনায় যুদ্ধের তথ্যকে বর্জন করেনি,—'এই বিরাট মহানগর একদিকে হয়ে উঠেছে কাঙ্গালী প্রধান ও আর একদিকে চলছে যুদ্ধ সাফল্যের প্রবল আয়োজন। ফলে, যারা অবস্থাপন্ন ছিল তারা হয়ে উঠেছে বহু টাকার মালিক, আর যারা গরীব গৃহস্থ ছিল, তারা হয়ে এসেছে সর্বস্বান্ত। দেশের সবাই বলছে দুর্ভিক্ষ, গবর্নমেণ্ট বলছেন, না, এ দুর্ভিক্ষ নয়, খাদ্যাভাব। ···অসংখ্য যানবাহনের জটলা—ট্রাম, বাস, মোটর, গরুর গাড়ি আর মিলিটারী লরির চাকার আঁচড়ানির মধ্যে শোনা যাচ্ছে অগণ্য মৃত্যু পথযাত্রী দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের আর্তরব। জঞ্জালের বালতি ঘিরে বসে গেছে কাঙালীরা, পরিত্যক্ত শিশুর কঙ্কাল গোঙাচ্ছে মৃত্যুর আশায়, স্ত্রীলোকদের অনাবৃত মাতৃবক্ষ অন্তিম ক্ষুধার শেষ আবেদনের মতো পথের নালার ধারে পড়ে রয়েছে।'[১১] নলিনাক্ষর ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় লেখক এঁকেছেন মন্বন্তরের তথ্যের প্রমাণ দেওয়া নগ্ন ছবি,—'আমার হোটেলের নিচে সমস্ত রাত ধরে শত শত কাঙালীর কান্না শুনে বিনিদ্র দুঃস্বপ্নে এই কটা দিন কোনমতে কাটিয়েছি—আর পারিনে। দুর্গন্ধে ভরা কলকাতা।'[১২] খাদ্য ও অর্থ নিয়ে লাভ ও লোভের খেলায় বুর্জোয়া সমাজে একদল হয় ধনী শোষক, আর একদল হয় চিরকালের সর্বহারা শোষিত। এমন সমাজ-রূপ ও পরিবর্তনের পরিবেশ যে ১৯৪৩-এর মন্বন্তরই, সে বিষয়ে লেখকের তথা গল্পের কথকের সূক্ষ্ম-সচেতনা এই জাতীয় মন্তব্যে লক্ষ্য করার মত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে মন্বন্তরের যোগ গভীর, নিবিড়। মানুষের সম্পূর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তৈরী-করা যুদ্ধ যে মানুষের মধ্যে এনেছে বৈষম্য, নৈতিকতার অধঃপতন, ঘটিয়েছে মানবতার সমূল ধ্বংস, যুদ্ধই যে সৃষ্টি করেছে চিরকালের সুযোগ-সন্ধানীদের, মুনাফাখোর-মজুতদারদের, বাড়িয়েছে লোভীর লোভ, অবলীলায় সৃষ্টি করেছে অর্থ-ক্ষমতার গর্বের ও আভিজাত্যের নতুন ধরণের বণিক সমাজ, তার পরিচয় আছে নলিনাক্ষর বিশ্লেষণে,—'আজকাল অন্ন দুর্লভ, চাকরি দুর্লভ নয়। যারা চিরনির্বোধ ছিল, তারা হঠাৎ চতুর হয়ে উঠলো এই সম্প্রতি। একশো টাকার বেশি মাইনে পাবার কল্পনা যাদের চিরজীবনেও ছিল না, তারা যুদ্ধ সরবরাহের কণ্ট্রাক্টে সহসা হয়ে উঠলো লক্ষপতি এবং দুর্ভিক্ষকালে

চাউলের জুয়াখেলায় কেউ কেউ হলো সহস্রপতি। হয়তো মুটুর মতো বালকও সেই যুদ্ধকালীন জুয়ার ভাগা ফিরিয়ে ফেলেছে। এ যুদ্ধে কি না সম্ভব ?'[১৩]

প্রবোধ কুমার সান্যাল 'অঙ্গার' গল্পে যুদ্ধ-সমকালেই যে সমাজের ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের বীজ নিহিত আছে, তা বুঝেছিলেন। গোটা সমাজের নৈতিক অধঃপতনের সর্বাবয়ব চিত্র যেমন এঁকেছেন, তেমনি দেখিয়েছেন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের যুবকদের ম্লান মূর্তি, প্রাণহীনতা, যুবপ্রাণের ভিতরের শক্তির ক্ষয়রোগে অপচয়। শেয়ালদার বাজারের কাছে ছোট পিসির মেজ ছেলে পঁচিশ বছরও বয়স হয়নি এমন টুনুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ার পর টুনুর যে ছবি এঁকেছে নলিনাক্ষ তার তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতায়, তা দুর্ভিক্ষ-কাতর, বলা ভাল বিধ্বস্ত এক সমকালীন যুবকেরই প্রকৃত রূপ :

'দেখা হতেই সে থমকে দাঁড়ালো। বললুম, কিরে টুনু ?

চমকে সে ওঠেনি, কিছুতেই বোধ হয় সে আর চমকায় না। কেবল তার অবসন্ন চোখ দুটো তুলে সে শান্ত কণ্ঠে বললে, কবে এলে ছোটদা ?

তার হাত ধরে বললুম, তোদের খবর কিরে ?

খবর ?—বলে সে পথের দিকে তাকালো। কসাইখানার মিলিটারী মৃত্যুপথযাত্রী রুগ্ন গাভীর মতো দুটো নিরীহ তার চোখ, যেন এই শতাব্দীর অপমানের ভারে সে চোখ আচ্ছন্ন।'[১৪]

পিসিমা-শোভনা-হারু-মীনুদের বৌবাজারের বাড়িতে হঠাৎ দেখা করতে এসে নলিনাক্ষর যে অভিজ্ঞতা, তা-ই 'অঙ্গার' গল্পের কেন্দ্রীয় এবং একমাত্র বক্তব্য। সেখানকার অভিজ্ঞতার সূত্রে পাঠকরা যে চিত্র দেখে, তার মূল সমাজ জীবনের একেবারে গভীরে প্রোথিত। তা কোনদিন আর উন্মূলিত হবে কিনা এমন সন্দেহই আছে গল্পের মূল জিজ্ঞাসায়। আশা নয়, হতাশা দিয়েই গল্পের পরিণতি অঙ্কিত। বৌবাজারের বাড়িতে প্রথম ঢোকার পর প্রকাশ্য দিবালোকে নলিনাক্ষর পিসিমা-মীনু-হারুর মধ্যে যে অভিজ্ঞতা অর্জন, তা ভয়াবহ। মন্বন্তরের কারণেই ফরিদপুরের গ্রাম ছেড়ে ঠিকানা গোপন করে, নলিনাক্ষর প্রতি মাসের সুস্থ সাহায্য-দান-টুকুকে অস্বীকার করে এই বাড়িতে আছে তারা। পারিবারিক মান-সম্মান লজ্জা গোপন করতেই এমন আত্মগোপন, আত্মনির্বাসন! নির্বাসন—সমস্ত সুস্থ সমাজজীবন, মন ও পরিবেশ এবং আত্মীয় সম্পর্ক থেকেই :

'পিসিমা এতক্ষণ বসেছিলেন, অতটা লক্ষ্য করিনি। তিনি এবার উঠে দাঁড়াতেই তাঁর ছিন্ন ভিন্ন কাপড়খানার দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, এ বাড়ির ঠিকানা তুমি কাউকে দিয়ো না বাবা।

এমন সময় মীনু এসে দরজার কাছে চঞ্চল হাসিমুখে দাঁড়ালো। বললো, মা, মা, শুনছ? এই নাও একটা আধুলি···হবিশবাবু দিল—।

মীনুর মাথার চুল এলোমেলো, পরণের কাপড়খানা আলুথালু। মুখখানা রাঙা, গলার আওয়াজটা উত্তেজনায় কাঁপছে। অত্যন্ত অধীরভাবে পুনরায় সে বললে, যোগীন মাষ্টার বললে কি জানো মা, আজ রাত্তিরে গেলে সেও আট আনা দিতে পারে।

পিসিমা অলক্ষ্যে আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ঝংকার দিয়ে বললেন, বেরো —বেরো হারামজাদি এখান থেকে। ঝেঁটিয়ে মুখ ভেঙে দেবো তোর।

মীনু যেন এক ফুৎকারে নিবে গেল। মায়ের মেজাজ দেখে মুখের কাছ থেকে সরে গিয়ে সে অনুযোগ করে কেবল বললে, তুমিই ত বলেছিলে।

হারু ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, ফের মিছে কথা বলছিস, মীনু? এখন তোকে কে যেতে বলেছিল? মা তোকে রাত্তিরে যেতে বলেছিল না?'[১৫]

নলিনাক্ষর পিসিমার মেয়ে মীনুকে সে এ বাড়িতে ঢোকার সময়েই যেভাবে দেখেছে, সে অভিজ্ঞতা-চিত্র,—'বছর বারো তেরো বয়েসের একটি মেয়ে সকৌতুকে উপর তলাকার সিঁড়ি বেয়ে মেসের দিকে যাচ্ছে এবং তাকে দেখে চার পাঁচটি লোক উপর থেকে নানা রঙ্গে হাতছানি দিচ্ছে, আমি তাকে দেখেই চিনলুম, সে পিসিমার মেয়ে।'[১৬] আর এই সঙ্গে প্রথম সেই গ্রামের পিসিমাকে দেখার আঘাত তাকে স্তম্ভিত করে,— 'পিসিমা হিন্দুঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবা, স্নান, আহ্নিক, পূজা, গঙ্গাস্নান, দান ধ্যান এই সব নিয়ে চিরদিন তাঁকে একটা বড় সংসারের প্রতিপালিকার আসনে দেখে এসেছি। সদ্যস্নাতা গরাদের থান পরা পিসিমাকে পূজা অর্চনার পরিবেশের মধ্যে দেখে কতদিন মনে মনে প্রণাম করে এসেছি। কিন্তু তিন বছরে তাঁর একি পরিবর্তন? আমিষ রান্নাঘরে বসে ভাঙা কলাইয়ের বাটিতে চা খাচ্ছেন তিনি।'[১৭]

পিসিমার এই অবতরণ—এ হল সমাজের মধ্যে ঘুণ ধরার প্রতীক-প্রতিম দিক। মা হয়ে সদ্য-ফুটে-ওঠা কিশোরী স্ব-কন্যাকে পাঠায় রাতে মেসের পুরুষদের কাছে পয়সা আনতে। মেয়ে মীনু তা উৎসাহে পালনও করে, ছেলে হারু মা-বোনের সামনে সে কথা চীৎকার করে বাইরের মানুষের কাছেও বলতে নির্দ্বিধ। এ চিত্র মহামন্বন্তরেই সম্ভব হয়েছে।

বউবাজারের বাড়ির সংসারে শোভনা এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিজেকে নিঃশেষ করেনি মনের দিক থেকে। তাই নিজের ছেলেকে বিধবা হবার পর শ্বশুর বাড়ির লোকদের কাছে ছেড়ে দিয়েও বাঁচার জন্য সংগ্রামে ক্লান্ত হতে হতে নলিনাক্ষকে কাছে পেয়ে শ্বাসরুদ্ধ আর্ত কণ্ঠে বলতে পেয়েছে,—'ছোড়দা বলতে পারো আর কতদিন এমনি করে

বাঁচতে হবে? এ যুদ্ধ কি কোনো দিন থামবে না?'[১৮] এই শোভনার শেষতম চিত্রটি শোভনার ঘরে আসার জন্য উদগ্রীব খাঁকি-শার্ট-পরা লোকটির সামনে নলিনাক্ষকে বলা উক্তি, তার কাতর উগ্রভঙ্গিও:

'শোভনা সহসা আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। বললে, কবে ছোড়দা, কবে এই রাক্ষুসে যুদ্ধ থামবে, তুমি বলে যাও। তুমি বলে যাও, কবে এই অপমানের শেষ হবে, আমাদের মৃত্যুর আর কতদিন বাকি?

আস্তে আস্তে আমি পা ছাড়িয়ে নিলুম। শোভনার হৃৎপিণ্ড থেকে আবার রক্ত উঠে এলো। বললে, তুমি যেখানে যাচ্ছ, সেখানে যদি কেউ মানুষ থাকে, তাদের বলো, এ যুদ্ধ আমরা বাধাইনি, দুর্ভিক্ষ আমরা আনিনি, আমরা পাপ করিনি, আমরা মরতে চাইনি…।'[১৯]

শোভনার মধ্যে বাঁচাব তীব্রতম আকুতি এবং বাঁচার প্রয়াস সুস্থ জীবন-বাসনা নিয়েই। কিন্তু মন্বন্তরের অভিশপ্ত নিশ্বাসে যে জীবন পতনে ও পচনে অন্ধকারদুষ্ট, তা কি খাদ্যাভাব মিটলে ফিরে আসবে আগের সুস্থতায়? পিসিমা নিজের কিশোরী মেয়েকে পাঠিযেছে মেসের আবাসিকদের কাছে। আব বড মেয়ে বিধবা শোভনার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি রকম? মানুষে মানুষে সম্পর্কে যে বিচ্ছিন্নতা, মা-মেয়ের মানবতার সম্পর্কে যে নগ্ন কদর্য রূপ, তা সেই হারু-মীনুকে নির্দয় প্রহারের কথায়, সম্পর্কের স্থির চিত্রে নিখুঁত:

'পিসিমা কলতলার পাশ থেকে বললেন, মারবো না? কলঙ্কের কথা নিয়ে দুজনে বলাবলি করছিল, তাই বেদম মেরেছি। বেশ করেছি।

কিন্তু ওদেব মেরে কলঙ্ক ঘোচাতে তুমি পারবে?

পিসিমা চিৎকাব কবে উঠলেন, ভাবি লম্বা লম্বা কথা হয়েছে তোর শোভা। এত গায়ের জ্বালা তোব কিসেব লা? দিন রাত কেন তোর এত ফোঁস-ফোঁসানি? কপাল পোড়ালি তুই, মান খোয়ালি, সে কি আমার দোষ? পেটের ছেলে-মেয়েকে আমি মারবো, খুন করবো, যা খুশি তাই কবো—তুই বলবার কে?

শোভনা গর্জন কবে বললে, পেটের মেয়েরা যে তোমার পেটের অন্ন যোগাচ্ছে, তার জন্যে লজ্জা নেই তোমার? মেরে মীনুটার গায়ে দাগ করলে তোমার কী আক্কেল? একেই ত ওর ওই চেহারা, এর পর ঘর খরচ চলবে কোত্থেকে? লজ্জা নেই তোমার?

তবে আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙবো, শোভা—এই বলে পিসিমা এগিয়ে এলেন। উচ্চকণ্ঠে বললেন, নলিনাক্ষ আছে তাই চুপ করেছিলুম। বলি, ফরিদপুরের বাড়িতে বসে বিনোদবালার ঠিকানা কে যোগাড় করেছিল? গাড়িভাড়া কার কাছে নিয়েছিলি তুই?

অধিকতর উচ্চকণ্ঠে শোভনা বললে, তা হলে আমিও বলি। মাস্টারকে কে এনে ঢুকিয়েছিল এই বাসায়? হরিশ যোগেনদেব কাছে কে পাঠিয়েছিল মীনুকে? আমাকে কেরানি বাগানের বাসায় কে পৌঁছে দিযে এসেছিল? উত্তর দাও? জবাব দাও? হোটেলের পাঁউরুটি আর হাড়ের টুকরো তুমি কুড়িয়ে আনতে বলোনি হারুকে? ন্টু বাড়ি আসা ছাড়লো কার জন্যে?

মুখ সামলে কথা বলিস, শোভা।...

মারমুখী মা ও মেয়ের এই অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য অধঃপতন দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালুম।'[২০]

এমন কলহের চিত্রে এই দুই নায়িকা একদিন বাংলাব শ্যামল গ্রামেব স্নেহশীলা আচাবনিষ্ঠা, ঈশ্বরবিশ্বাসী মা ও পরম আদরের কন্যা গৃহবধূ ছিল—তা ভাবতেই পাবা যায় না। ১৯৪৩-এর ভযাবহ মন্বন্তব একে একে অবতরণিকাদের জন্য সিঁড়ির ধাপগুলি তৈরী করে দিয়েছিল। মন্বন্তরের নির্মম নিযতিব নির্দেশ এর মধ্যেই! মা ও মেয়ের, মা ও ছেলের, ভাই ও বোনের, স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক যে কত মধুর, কত বড়, তাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেয়, যেন বা ভুল প্রমাণ করে 'অঙ্গার' গল্পের এমন চিত্রগুলি। নলিনাক্ষ শেষে ওদের জন্যে জামা-কাপড়, খাদ্য এনে দিলে অসীম তৃপ্তিব মধ্যে শোভনা সেই অতীতেব মানবিক সম্পর্ক, আত্মসম্মানবোধ. আভিজাত্যবোধেব স্মৃতির মধ্যে ডুব দেয়:

'ছোড়দা, মনে আছে কোরা জামা-কাপড় পরে লোকের সামনে এসে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে কি লজ্জার কথা ছিল? দোকান থেকে চাল-ডাল এলে লুকিয়ে সেগুলোকে সরিয়ে ফেলতুম—পাছে কেউ ভাবে, চাল কেনার আগে আমাদের বুঝি খাবার কিছু ছিল না। মনে আছে ছোড়দা?'[২১]

বস্তুত প্রবোধ কুমার সান্যাল মন্বন্তরেব যথার্থ প্রতিক্রিয়াটি শিল্পসম্মত এবং নিস্পৃহ এক ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝেছিলেন যুদ্ধের পরিবেশে এই মন্বন্তর কোন সাময়িক অবক্ষয় মাত্র সৃষ্টি করবে না, এর প্রভাব আগামীদিনের সমাজ-ক্ষযের উপযুক্ত ভূমিকাই রচনা করছে। গ্রামবাংলার পরিবারের শহরমুখী হওয়া, শহরের দুষ্ট ক্ষতকে সর্বাঙ্গে দুরারোগ্য ঘৃণ্য কোন যৌনব্যাধিব মত গ্রহণ করা, শহবের অমোঘ মৃত্যুবাণ যে মানুষে মানুষে চিরকালেব মানবিক সম্পর্কে ভাঙন সৃষ্টি ও একজন থেকে আর একজনকে অবধারিত alienation-এর মধ্যে ঠেলে দেওয়ায় তার আঘাত গ্রহণ—এই বিষয়কেই লেখক গল্পের মধ্যে আশ্চর্য নিরাসক্ত দৃষ্টিতে এঁকেছেন। এই নিরাসক্তি কত বড় শিল্প-ব্যঞ্জনা পেয়েছে, তার প্রমাণ নিহিত আছে গল্পের বর্ণনায়

একাধিক উপমা ব্যবহারের মধ্যে। মন্বন্তরের অন্তঃশীল স্তূপের ছবি আঁকতে গিয়ে লেখক শোভনার একটি হাসিকে এভাবে চিত্রিত করেছেন :

'দেখতে দেখতে তার গলার ভিতর থেকে পচা ভাতের ফেনার মতো একপ্রকার রুগ্ন হাসি বমির বেগে উঠে এল। শীর্ণ মুখখানা যেন প্রবল হাসির যন্ত্রণায় সহসা ফেটে উঠলো। শোভনা হা-হা করে হাসতে লাগলো। সে হাসি বীভৎস, উন্মত্ত, নির্লজ্জ এবং অপমানজনকও বটে। আমার নির্বোধ কৌতূহল স্তব্ধ হয়ে গেল।'[২২]

গল্পের মূল কথক নলিনাক্ষও একটি চরিত্র এবং গল্পের মূল লক্ষ্য থেকে সে বিচ্ছিন্ন নয়। সে এদেরই পরিবারের একজন। সে দিল্লীর অধিবাসী এবং একজন মোটা মাইনের চাকুরে। বাংলাদেশে যুদ্ধসমকালীন মন্বন্তর সম্পর্কে সে একেবারেই অজ্ঞ। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে যেমন কৌতূহলের, তেমনি বিষাদময়তার, তেমনি নির্মম আঘাতের ও বেদনার। তার একের পর এক পরিবার-জীবন, ব্যক্তিজীবন, সমাজ জীবন সম্পর্কে ধারণা ভাঙতে ভাঙতে এক সময় সে নিজেকে ফাঁকা ফাঁপা মনে করে। সেও যেন পরিবার জীবন থেকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন এক মানুষ—এক নির্জন দ্বীপ। এক ইংরেজ কবির ভাষায় 'We are the hollow mcn'[২৩]-এর একজন। সেই বিধ্বস্ত কলকাতায় আসা এক প্রবাসী বাঙালীর আত্মোক্তি নিহিত নিঃসঙ্গতা ভয়ঙ্কর :

'আমি এই পরিবারের মানুষ, আমি এদেরই একজন, এই আত্মীয় পরিবারেই আমার জন্ম। অথচ আজ মনে হচ্ছে এখানে আমি নবাগত অপরিচিত ও অনাহূত একটা লোক। যারা আমার পিসিমা ছিল, ভগ্নি ছিল, যাদের চিরদিন আপনার জন বলে জেনে এসেছি—এরা তারা নয়, এরা বৌবাজারের বিনোদবালাদের সহবাসী, এরা সেই আগেকার সম্ভ্রান্ত পরিজনদের প্রেতমূর্তি।'[২৪]

বাংলাদেশের সচেতন মানুষের পক্ষে যুদ্ধ-সমকালীন পরিবেশে যে প্রত্যক্ষ বিচ্ছিন্নতাবোধ, তা কেবল বিশেষ দেশেই দেখা দেয় নি, বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডবাসীকেও সেই বিচ্ছিন্নতার অসুখে যে আক্রান্ত হতে হয়েছিল, তার সমর্থন মেলে এক সমালোচকের লেখায়,—'Before the last war the main problem was seen to be economic, the failure of distribution. Since the war it is seen to be psychological: alienation.'[২৫] 'অঙ্গার' গল্পের নায়ক নলিনাক্ষর বিচ্ছিন্নতাবোধ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাজাত। নলিনাক্ষ যে বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত, তা তার সমাজ থেকে অসহায়ভাবে সরে আসায় ও ব্যক্তিক শক্তিহীনতাতেই স্পষ্ট হয়। এটাই স্বাভাবিক, কারণ 'Alienation is a measure of the individual's powerlessness in mass society, a sense of personal helplessness in

face of powerful political forces which appear remote from and unresponsive to individual demands and needs.'[২৬]

এমন বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে নলিনাক্ষর আত্মোক্তির মধ্যে উত্তেজনা, হাহাকার, নানা জিজ্ঞাসার মাধ্যমে মানবতা ধ্বংসের আততায়ীর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় আছে :

'এরা কে? সেই .ফরিদপুরের ছোট বাড়িটিতে ফুলেব চারা আর শাকসব্জী দিয়ে ঘেরা ঘরকন্নার মধ্যেও আচারশীলা মাতৃরূপিনী পিসিমা, লাজুক একটি সদ্য-ফোটা ফুলের মতন কুমারী ভগ্নী শোভনা, চাঁপার কলির মতন নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হারু, হুটু, মীনু, এরা কি সেই তারা? কেন একটি সুখী পরিবার ধীরে ধীরে এমন সমাজনীতিভ্রষ্ট হলো? কেন তাদের মৃত্যুর আগে তাদের মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটলো এমন করে? কোন্ দয়াহীন দস্যুতা এর জন্যে দায়ী?'[২৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে বিগত এই প্রায় চুয়াল্লিশ বছরে কলকাতার বুকে পতিতা নারীব সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে। এই ব্যবসা প্রকাশ্যে এবং গৃহস্থ ঘরের তথাকথিত ভদ্র আচরণ ও আবরণের মধ্যে নানাভাবে জাঁকিয়ে বসেছে। এর বাহ্যিক ও মানবিক সমস্ত রকম দায়দায়িত্ব মানুষেব, বুর্জোয়া সমাজের, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার বিশিষ্টতায় গভীর নিহিত। যার আবির্ভাব নতুন রূপে মন্বন্তরের মধ্য দিয়ে, তাব বিলোপ কোনদিনই সম্ভব হবে না যতদিন ধনতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা বজায় থাকবে। প্রবোধ কুমার সান্যাল এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দিযেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে বসে মন্বন্তব নিয়ে এমন 'অঙ্গার'-এর মত এক সার্থকতম গল্পটি বচনা কযেছেন।

'মহামন্বন্তর' গ্রন্থের প্রথম গল্প 'কালনাগ'-এ অচিন্ত্যকুমাব সেনগুপ্ত প্রবোধ কুমার সান্যালের মত দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়ার সর্বগ্রাসী রূপের কথা না ভেবে কেবলমাত্র ভেঙে-পড়া মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের মানবিক সম্পর্কটিকেই ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল করেছেন। হোক দুর্ভিক্ষ, তবু ভয়ঙ্কর অভাবের মধ্যেও মানুষ মানুষকে ভোলে না। এর প্রমাণ আছে স্কুল শিক্ষক ভবতোষের স্ত্রী সুধার মধ্যে। সুধার স্বামী-সন্তান নিযেই ঘর। দুর্ভিক্ষের মধ্যে তাদের পর পর চারদিনেও অন্ন জোটেনি। রেশনে লাইন দিয়ে চাল যোগাড করতে যায় সে নিজেই এক ভোরে কাউকে না জানিযে। এমনিতেই উপবাসে দুর্বল, তবু সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে তার চাল জুটে যায়, কিন্তু নিজের কষ্ট, ক্লান্তি, অভাবের মধ্যেও সে ভুলতে পারেনি লাইনে দাঁড়ানো সম্পূর্ণ অপরিচিত আর এক উপবাসক্লিষ্ট পুরুষ সঙ্গীকে। 'ঘোলাটে' অপরিচ্ছন্ন চাউনির, 'গায়ে একটা ছেঁড়া ও কুঁচকানো চীনে-সিল্কের পাঞ্জাবি'-পরা অপরিচিত লোকটিকে সুধার অজ্ঞাতে ভবতোষ কুৎসিতভাবে তাড়িয়ে দিলে সুধা বলে

'……আমিই তো ডেকে এনেছিলাম।

কাছাকাছি বোমা পড়লেও ভবতোষ এত চমকাতো না। বললে, 'তুমি ডেকে এনেছ? কেন জানতে পারি?'

'চারটি ওকে খেতে দেব বলে। ও আমার সামনেই ছিল, পুরুষের লাইনে। আমার নেয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দোকান বন্ধ হয়ে গেল, আর ও আমার চোখের ওপর মাটিতে ভেঙে পড়লো টুকরো টুকরো হয়ে। বললে, বাড়িতে বসে আছে সবাই চালের প্রত্যাশা করে, সে গেলে তবে উনুন ধরবে। তবু তো স্ত্রী পরিবারকে এক বেলা আধপেটা সে খাওয়াচ্ছিল, কিন্তু নিজে সে উপোস করে আছে প্রায় চারদিন। পাছে ওদের ভাগ কম পড়ে তাই মিথ্যে করে বলতো যে বন্ধুর ওখানে তার নেমন্তন্ন। কিন্তু চারদিনের উপোসেব পব নেমন্তন্নের কথা নাকি সে কিছুতেই বলতে পারবে না। তাই আমি ওকে বলেছিলাম, চলুন আমার ওখানে, অন্তত ভাত খাবেন আপনি পেট ভরে। প্রথমটা বিশ্বাস করেনি। পরে বিশ্বাস করলেও রাজি হতে পারেনি। স্ত্রী-পুত্রের জন্যে চাল না নিয়ে গিয়ে নিজে ভাত খাবে লুকিয়ে, হয়তো যন্ত্রণা হচ্ছিল, কিন্তু জঠরের যন্ত্রণা তার চেয়েও ভয়ানক।'[২৮] এমন সংলাপ-চিত্রে লেখক দুর্ভিক্ষের করুণ রূপের সঙ্গে মানুষের মানবিকবোধ ও মানুষে-মানুষে চিরন্তন মানবিক সম্পর্কের প্রত্যয-নিষ্ঠ চিত্রের ব্যঞ্জনা এনেছেন। 'অঙ্গাব' গল্পের দমবন্ধ-করা পরিবেশ ও পবিণতি এখানে নেই, আছে একটি ক্ষুদ্র খণ্ডচিত্রের মাধ্যমে মানুষের ওপর বিশ্বাস বাঁচানোর প্রয়াস।

'মহামন্বন্তর' গ্রন্থে সংকলিত অন্যতম গল্প 'কল্কি'। নবেন্দু ঘোষের এই 'কল্কি' (প্রথম প্রকাশ, 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা, ১৩৫০) গল্পে লেখক তীব্র শ্লেষ-কটাক্ষে দুই সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র তুলে ধরে মন্বন্তরের বীভৎস দিকটি এঁকেছেন। আঙ্গিকের অভিনবত্ব এনেছেন গল্প বলার মধ্যে মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাদের সম্বোধন করে। কিন্তু লেখক-সৃষ্ট এই পাঠক-পাঠিকারাই ক্ষুধায় কাতর, অর্ধমৃত, মৃত, সর্বহারা মানুষগুলির একেবারে বিপরীত কোটিতে বাস করে। তাদের এমন আর্ত উতরোলের মধ্যে আছে মন্বন্তর নিয়ে ভাবনা, রাজনীতির আলোচনা, বুভুক্ষু মানুষদের সাহায্যের জন্য তৎপরতায় স্বামী-স্ত্রী পুত্র-কন্যা-বন্ধুবান্ধবসহ পারিবারিক জীবনের বিলাসবহুল শান্তি, ভোগ-সুখ-আকাঙ্খা, নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য সমস্ত রকম উপরতলাকার আত্মতৃপ্ত সুবিধা-ভোগকারী প্রয়াস। এরা বুর্জোয়া শ্রেণী। সর্বহারাদের তীব্র যন্ত্রণা-জ্বালা ক্ষুধা-দহনের পাশে এরা পরম আত্মসুখী। গল্পটির আদ্যন্ত আছে শহর কলকাতায় ভিড় করা মানুষদের হা-অন্নের ছবি। নবেন্দু ঘোষ সেই নিরন্নের মিছিলের মধ্যে নিয়েছেন মা তারা, মেয়ে দুর্গা, ছেলে ভোলা ও একটি শিশুর পরিবারকে সমগ্রের প্রতীক হিসেবে। নিরন্নের চিত্রে

তথ্যের সত্য আছে, হয়ত কিছুটা বর্ণনার গতানুগতিকতায়, কিন্তু এক একটি অংশ মন্বন্তরেরই চিরন্তন ছবির ব্যঞ্জনা পায় :

'দূরে একটি ডাস্টবিন দেখা গেল। দুর্গা ভোলা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল। সেই দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনার স্তূপ সরাইয়া সরাইয়া তারা একটি ছাই-মাটি লাগানো শুষ্ক রুটি ও ভোজন শেষে পরিত্যক্ত একটি শালপাতা পাইল। শালপাতায় কয়েকটি ভাত লাগিয়া আছে। দুর্গা মায়ের হাত হইতে রুটিটি কাড়িয়া লইল। ভোলা সেই শালপাতা পরম আগ্রহে লেহন করিতে লাগিল।

'দূরে একটি হৃষ্টপুষ্ট দেশি কুকুর শুইয়া আছে। সে নির্লিপ্তভাবে তাহাদের দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। ওই খাদ্যে তাহার লোভ নাই।'[২৯]

যা ডাস্টবিনের নির্বুদ্ধি কুকুরের কাছেও অখাদ্য পরিত্যজ্য সেই খাদ্য মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার মধ্যে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা লক্ষণীয়। তারা বাংলা দেশের গ্রামের বাঙালী মা। তার কাছে ভাতই একমাত্র খাদ্য। সেই দীর্ঘদিনের অভুক্ত তারার কাছে ভাতের স্বাদ কি রকম? সেই ভাবনার চিত্রে এবং সেই সঙ্গে মা ও পুত্র-কন্যার সম্পর্কের অমানবিক বোধের রূপ-চিত্রণে লেখক অনন্য :

'ভোলা ও দুর্গার খাওয়া দেখিতে দেখিতে তারার রসনায় জল আসিল। ভাত! আহ্! সে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, দুগ্‌গা মা, ক্যামন লাগছে রে?

দুর্গার কানে সে কথা গেল না।

ওরে, শুনছিস তোরা, আমায় চারডি দিবি?—তারার চোখ ঝাপসা হইয়া আসিল।

মায়ের ভিক্ষা কেহ শুনিল না।'[৩০]

পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত 'মহামন্বন্তর' গ্রন্থে সংকলিত নবেন্দু ঘোষের 'কল্কি' গল্পটি লেখকের নিজস্ব 'এই সীমান্তে' গল্পগ্রন্থের মধ্যেও স্থান পেয়েছে। 'এই সীমান্তে'র অপর তিনটি গল্প 'ত্রিশংকু', 'বাঁকা তলোয়ার' ও 'এই সীমান্তে' এই তিনটি গল্পও যুদ্ধ-সমকালীন হা-অন্নের নিষ্ঠুর করুণ, অসহায় ছবির রঙে রচিত। 'কল্কি' গল্পের মত 'ত্রিশংকু' ও 'বাঁকা তলোয়ার' গল্প দুটির পরিবেশ শহর, 'এই সীমান্তে'র পরিবেশ গ্রাম। 'ত্রিশংকু'র নায়ক-নায়িকা ও তাদের পরিবার অর্থাভাবে ও অন্নাভাবে একেবারে ভেঙে-পড়া একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবন-যাপনের অন্তর্ভুক্ত। 'বাঁকা তলোয়ার' গল্পের নায়ক-নায়িকারা গ্রাম্য চাষী পরিবারের, কিন্তু অন্নাভাবে গ্রামের লঙ্গরখানাতেও খেতে না পেয়ে পেটের জ্বালায় শহরের এক একান্নবর্তী বড় পরিবারে দাস দাসী হিসেবে আশ্রিত। 'এই সীমান্তে' গল্পের গ্রাম্য পরিবেশে চরিত্রগুলি সর্বহারা শ্রেণীর, যারা ভিক্ষাজীবনকেই একমাত্র সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছে বাধ্য হয়ে।

'ত্রিশঙ্কু'র নায়ক নন্দলাল মুহুরি একটি বেসরকারী অফিসের অতি সাধারণ চাকুরে। তার মাহিনায় এমন নিদারুণ অন্নাভাবের দিনে অক্লান্ত ধার করেও সংসার চলে না। অভাবের তাড়নায় সে যখন স্ত্রী বিমলা, যুবতী মেয়ে সীতা ও দশ বছরের ছেলে এবং আট বছরের মেয়ে মিণ্টু-টুনির সংসার চালাতে একেবারে নিরুপায়, তারই মধ্যে অফিসে উদ্বৃত্ত লোকের কারণে তার চাকরী যায়। চারপাশের জমে-থাকা ঋণের ভার, অভাবের দিনে যুবতী সীতার প্রতি পাড়ার যুবকের উদ্দেশ্যমূলক সাহায্য করতে এগিয়ে আসা, মিণ্টু-টুনির চুরি করে খাওয়ার অভ্যাস, বিমলার চরম অসহায় ও দুর্বল রূপ, সাংসারিক মান-মর্যাদার একেবারে হানিকর অবস্থা—এ সবের মধ্যেই ছাঁটাই-হওয়া ছাপোষা কেরানী নন্দলাল মুহুরি রাতে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। এমন অসহায়, নিষ্ঠুর, অমানবিক আত্মহনন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের অবধারিত নিয়তি ছিল হা-অন্নে ভেঙে-পড়া নিম্নবিত্ত পরিবারের পক্ষে। মন্বন্তরের চিত্র এখানে জীবন্ত। কিন্তু যে কমরেড বন্ধু লেখককে গল্প লিখতে বলেছিল এবং সেই অনুরোধে লেখক প্রেমের গল্প না লিখে প্রত্যক্ষ বাস্তব হা-অন্নের গল্প লিখতে বসেছেন, সেখানে তাঁর সময়-সচেতনতা প্রমাণিত হলেও, নন্দলালের মৃত্যু দিয়ে তিনি গল্পের নায়ককে নিয়ে জীবনযুদ্ধে নৈরাশ্যকেই প্রমাণ করেছেন। সর্বশেষ, লেখক গল্প থেকে সরে গিয়ে স্বগতোক্তির মত নিজের সংলাপ যোজনা করেছেন গল্পের উপসংহার হিসেবে :

'কমরেড। নন্দলালেরা মরবেই। ত্রিশঙ্কুর বংশধর ওরা—স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝামাঝি যে অনন্ত শূন্য তার মধ্যে ওরা চিরদিন দুলবে। নন্দলালেরা মরবেই।

আগুন জালিয়ে লোহা পুড়িয়ে আমি লাল করেছি। আমার একটি রাইফেল চাই। কমরেড। তোমার হাতুড়িটা তুলে ধর, আমার উত্তপ্ত লাল লোহা নরম হয়ে আছে—তাকে তুমি রূপ দাও।'[৩১]

এমন সংলাপ যোজনায় সমস্ত প্রতিবাদী কণ্ঠ রক্তাক্ত হলেও গল্পের মূল চরিত্র নন্দলাল মুহুরি ও তার পরিবারের জীবন-ন্যায়ে আদৌ যুক্ত হয়নি। অর্থাৎ এমন গল্পের মধ্যে মাঝে মাঝে গল্প-বিবিক্ত লেখকের আত্মকথন বঙ্কিমী প্রথার আধুনিকতম প্রয়োগ হলেও এবং তা গল্পের মধ্যে রূপ-কৌশলে অভিনবত্ব আনলেও গল্পের মূল-চরিত্র-ন্যায়ে যুক্ত না হওয়ায়, তার সঙ্গে ওতপ্রোত না হওয়ায় গল্পের মধ্যে নৈরাশ্যই সত্য হয়, লেখকের স্বতন্ত্র বিদ্রোহবাণী তেমন শিল্পের দায়িত্বে বড় হয় না।

'বাঁকা তলোয়ার' গল্পে এই লেখক অবশ্য চরিত্রের রক্তমাংস মজ্জার মতই তাঁর প্রতিবাদী শপথকে দীপ্ত করেছেন নায়িকা পার্বতীর চরিত্রে :

'পার্বতী হাতের দিকে চাহিয়া ভাবে—অতীতের কথা নয় ভবিষ্যতের। নিজের

মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্যে সে যেন একটা বাঁকা তলোয়ার ধরিয়া আছে। দুই চক্ষু তাহার নির্বাণোন্মুখ চিতাগ্নির মত জ্বল জ্বল করিতে থাকে।

পার্বতী ভয় নাই। সৈনিকেরা প্রস্তুত আছে।'[৩২]

কিন্তু শেষ চরণটিকে অনেকাংশে শ্লোগানের মত শোনায়। এই চরণে পার্বতীর নিজস্ব চরিত্র-ছায়া নেই, আছে পার্বতীকে সম্বোধন করে লেখকের বঙ্কিমী রীতি-সুলভ—'তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?'[৩৩]—এই জাতীয় সাবধানবাণী উচ্চারণ। গল্পটির শেষতম এই চরণটি বাদ দিলে গল্পটি নিটোল, নিখুঁত এবং সার্থক বক্তব্য-অনুসারী সিদ্ধান্ত হতে পারত। পার্বতী স্বামী মানিক ও একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে নিয়ে গ্রাম ছাড়ে অন্নাভাবে। রাস্তায় ছেলেটিকে শিয়ালে খায় ওদের চোখের সামনে। শহরে এসে পার্বতী অক্ষয়বাবুদের বাড়ি ঝি-এর কাজ নেয়। স্বামী মানিক কাজ নেয় পাশের এক বড়-লোকের বাড়ি। অভাবে ও লোভে মানিক হয় চোর। চাকরী যায়। আবার অভাবে পড়ে। অক্ষরবাবুর যুবক প্রবাসী শ্যালক অনুপমের কুৎসিৎ লোভের সামনে একদিন রাতে অসহায়ভাবে লাঞ্ছিত হয়ে মানিক ও পার্বতীকে কন্যাসহ বাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে হয়। রাস্তায় আশ্রয় নিয়ে ক্ষুধার্ত স্বামী ও কন্যাকে আর কোনভাবে বাঁচানোর উপায় না পেয়ে পার্বতী নিজেই আসে অনুপমের ঘরে নিভৃতে। কিন্তু উপায় তার ব্যর্থ হয়ে যায় পার্কের ধারে স্বামী ও টুনুর অসহায় মৃত্যুর সামনে। পার্বতীর হাতের মুঠোয় তখন বাঁচার মত অনুপমের কাছে পাওয়া 'একটা টাকার নোট ও খুচরা কয়েক পয়সা।' আর স্থায়ী খাদ্যের আরও ব্যবস্থা হয়েছে—'অনুপম কথা দিয়েছে—তাহার আবার বহাল হইবে।'[৩৪] এমন মৃত্যুর সামনে নির্বাক যন্ত্রণার তীব্রতায় ও আত্ম-অপমানের কম্পনের মধ্যে মুষ্টিবদ্ধ হাতে পার্বতী যে শপথ করে, বা লেখক যে উজ্জ্বল শপথের ব্যঞ্জনা প্রতীকী ভাষায় রেখেছেন শেষতম চরণটির আগে, তা গল্পটিকে শিল্পের সার্থকতা দেয়।

'এই সীমান্তে' গল্পটি অন্নাভাবে হারাণ-ফুলি-কেষ্টচরণের মধ্যেকার যে সম্পর্ক-জটিলতা রচনা করে, ফুলি কেষ্টচরণের সঙ্গে পালিয়ে গেলে কয়েক মাস আগে জাত পুত্রটিকে সামনে নিয়ে হারাণের জীবনের যে অসহায়তাকে স্পষ্ট করে, তা গ্রাম্য ভিক্ষুক অর্থাৎ সর্বহারা মানুষদের নিষ্ফল আক্রোশ ও মৃত্যুবরণকেই তির্যক ভাষায় দীপিত করে। গল্পের নায়ক হারাণ যেমন রক্তমাংসের পুরুষ, ফুলকুমারীও তেমনি রক্তমাংসের মানুষ, বাস্তব চরিত্রের রমনী। ভিখারী কেষ্টচরণের অস্তিত্ব তাদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে যেমন হারাণ সহ্য করতে পারে না, লাগে তার পৌরুষে, পরাজিত আত্মাভিমানে, তেমনি ফুলিও ক্রমশ অভাবে-অসহায়তায় এবং কেষ্টচরণের বলিষ্ঠ দেহের ও ভালোবাসার আকর্ষণে, সর্বোপরি কেষ্টচরণের চুরি-করে-আনা মূল্যবান সোনার গহনার চাকচিক্যে ও লোভে তার দিকে

চলে যেতে নির্দ্বিধ হয় সদ্য জাত পুত্র ও স্বামীকে ত্যাগ করেও। এটাই বুঝি মানব-চরিত্রের সব রকম অসঙ্গতির মধ্যেও নিষ্ঠুর চরিত্র-নিয়তি। কিন্তু গল্পের শেষে নবেন্দু ঘোষ নায়ক হারাণের হাত দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে নিজপুত্রের মৃত্যুদান ঘটিয়েছেন। তার মূলেও সেই এক অসহায় ভিক্ষা-জীবনের নিষ্ফলতার নিয়তি, ব্যর্থতা, হতাশ্বাস। ক্রমশ পালিয়ে যেতে চায় হারাণ তার পুত্রের কবরস্থান থেকে। মায়া তাকে টানে ভয়ঙ্কর :

'......কিছুদূর গিয়াই সে আবার ফিরিয়া আসিল। সেই মাটির ঢিবির উপর কান রাখিয়া কি যেন শুনিবার চেষ্টা করিল। অনেকক্ষণ। তারপরে আবার উঠিল।'[৩৫]

হারাণের চারপাশের ঘন জঙ্গল অতিক্রম করলেই এক বিশাল ক্ষেত, তারপরেই নূতন গ্রাম। হারাণ সেখানে আশ্রয় চায়। লেখক মুমূর্ষু হারাণের সামনে রেখেছেন গল্পের সিদ্ধান্তের উপযোগী এক সার্থক প্রতীক। অন্নাভাবে ক্লান্ত হারাণ, বাঁচার জন্য আগ্রহী হারাণ অনেক চেষ্টা করেও, মাটির ওপর হেঁটে, হামাগুড়ি দিয়ে, শেষে গড়িয়ে জঙ্গলের শেষ সীমানায় পৌছলেও আর যেতে পারে না। তার শ্বাস টেনে বাঁচতে চাওয়ার নিপুণ চিত্রের পর লেখক সিদ্ধান্ত টেনেছেন, হারাণের মত সর্বহারা মানুষ এভাবে বাঁচবে না, বাঁচতে পারে না। কারণ সামনের ক্ষেতে বিপুল পরিমাণ শস্য হলেও তা জোতদার-মজুতদারদের হাতে যাবেই। যারা বুভুক্ষু তাদের জন্য শস্য সাম্রাজ্যবাদী, যুদ্ধলিপ্সু, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শাসকদের বিধিতে রাখার ব্যবস্থা নেই, থাকতে পারে না :

'হারাণ মরিবেই। দেশে অন্ন নাই। কিন্তু হারাণের সম্মুখের বিস্তৃত ক্ষেত হয়ত একদিন বর্ষায় অজস্র বারি সিঞ্চনে সুস্নিগ্ধ ও সুকোমল হইয়া হরিৎ জীবনের অঙ্কুরে ভরিয়া উঠিবে, আলো ও বাতাস হইতে অমিত জীবনের কণিকা আহরণ করিয়া হয়ত সেগুলি ক্রমে বড় হইবে, ক্রমে পাকিয়া সুবর্ণের মত ঝকঝক করিবে, মানুষকে বাঁচাইবে কিন্তু তাহাতে হারাণের কি লাভ? হারাণ সেদিন মাটিতে মিশিয়া যাইবে।

'সীমান্তে সৈনিক চাই'।'[৩৬]

উপসংহারের এই শেষতম চরণটি হারাণের নয়। সেরকম কোন ব্যঞ্জনা নেই, লেখকই একান্ত নিজস্ব একটি মন্তব্য করেছেন। তবু লেখকের লক্ষ্য দিয়ে গল্পের এই উপসংহার গল্পটিকে আগামী দিনের সুষ্ঠু গ্রামজীবন ও গ্রামসমাজ গড়ার উপযোগী বলিষ্ঠ বিষয় নির্বাচনের মর্যাদা দিয়েছে।

পরিমল গোস্বামীর দুটি গল্প 'শেষের হিসাব' ও 'ভাঙন' মন্বন্তরে আক্রান্ত মানুষদের সম্পর্কে ভিন্ন অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। 'শেষের হিসাব' গল্পের নামহীন, মাসিক আশি টাকা মাইনের নায়ক যে ছোট পরিবারটিতে বছরের পর বছর বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে করতে শেষে দুর্ভিক্ষের কাছেই আত্মহননে আত্মসমর্পণ করে, তার পরিচয় দিয়েছেন

লেখক নতুন ফ্ল্যাটে সেই পূর্বতন বাসিন্দার হিসেবের খাতার বিস্তারিত হিসেব তুলে ধরে। এই গল্পের উপস্থাপনা-রীতি অভিনব। চাল, কাপড, কয়লা ইত্যাদির দাম বাড়তে বাডতে গৃহস্বামীকে ক্রমশ বিলাস বাদ দিতে হয়, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর আনার পরিমাণ কমাতে হয়, ক্রমশ প্রতিদিনের খরচের টাকায় যেতে হয় ভাগ্যের দিকে। লটারীর টিকিট কেনা, সর্বসিদ্ধি কবচ, ভাগ্যলক্ষ্মী মাদুলী এসবে খরচ করেও হতাশ হয়ে দেশে স্ত্রী-পুত্রের পঠানোর জন্য সব খরচ তাদের হাতে দিয়ে, তাদের সেখানে পাঠিয়ে নিজেই দড়ি কলসি—যার দামও সস্তা নয়, তা দিয়ে আত্মহননে নিঃশেষ হয়ে যায়। পরিমল গোস্বামী মূলত ব্যঙ্গ গল্পের লেখক। এই গল্পের সর্বশেষ ব্যঞ্জনায় সেই ব্যঙ্গ হঠাৎ তীব্র-ভাবে ঘা মারে পাঠকের বুকে। ক্রমশ ধীরে ধীরে খাদ্যাভাব ও মন্বন্তর দেখা দেওয়ার একটি প্রাথমিক চিত্র এ গল্পে স্পষ্ট হ'তে থাকে।

'ভাঙন' গল্পে গ্রামের সহজ সরল নিষ্পাপ বধূ লক্ষ্মী চার বছরের শিশুটিকে তাব অকাল মৃত্যুতে হারিয়ে স্বামী ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে আসে কলকাতায়। সেখানেও ক্ষুধার তাড়নায় একদিন ষষ্ঠীচরণ খাদ্যান্বেষণে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি লক্ষ্মীর কাছে। এই লেখক নবেন্দু ঘোষের মত জীবন্ত তথ্য চিত্র এঁকেছেন মাঝে মাঝে এ গল্পে, যেখানে রাস্তার খাদ্য চোখে পডায় 'এক ভিখারীতে আর এক কুকুরে তাই নিয়ে পডল কাডাকাড়ি।'[৩৭] —এমন চিত্র এঁকেছেন। এর পাশে আছে অন্নসত্র খোলার নামে হঠাৎ লক্ষপতি হওয়া পুণ্যলোভী ধনীর অগণন মৃত্যুপথযাত্রীকে অন্নদানের প্রহসন। লেখকের শ্লেষাত্মক কণ্ঠ:

'অর্থ লাভে যদি কিছু পাপ হয়ে থাকে অন্নদানে তার পনেরো আনা দূর হয়ে যাবে এই তাঁর ধারণা, পৃথিবীতে দয়া-ধর্মের জন্যই নিঃস্বদের আস্তিত্ব। নিঃস্ব হাভাতে না থাকলে পৃথিবী থেকে এত বড় ধর্মটা লোপ পাবে। দুর্ভিক্ষের জন্য এদেশে অনেকের পুণ্য-মুনাফা চোরা বাজারের মুনাফার মতোই বেডে উঠল এইভাবে।'[৩৮]

লক্ষ্মী স্বামী-পরিত্যক্তা হয়ে এমন এক অন্নসত্রের খাদ্য খেতে খেতে যখন অভুক্ত শরীরে আগের কমনীয়তা, সাহস, শক্তি ফিরে পায়, তখন তাকেই অন্নসত্রের কর্তারা পরি-বেশনের ভার দেয় প্রতিদিনের নির্দিষ্ট একশ' জন অন্নহারাদের জন্য। এখানে লেখক লক্ষ্মীর যে মানসিকতা, যে অহল্যার প্রতীক্ষাব মত স্বামী-প্রতীক্ষার এক করুণ অতি গোপন মনের খবর দিয়েছেন, তাতেই গল্পটির অনবদ্যতা। বাঙালী বধূর স্বামীপ্রেমের নিষ্ঠা, সততা, তার আগামী দিনের আবার সংসার গডার স্বপ্নের মধ্যে মানবতা থাকে, লেখকের লক্ষ্য সেই দিকে। কিন্তু সে লক্ষ্য মানব ভাগ্যের বিপরীত চিত্রকেই স্পষ্ট করে। সেই চিত্র এক ব্যঙ্গ কথাশিল্পীর হাতে হয়েছে নিপুণ এই গল্পের শেষেই:

'প্রতিদিন সে ভিখারীদের মধ্যে স্বামীকে খোঁজে। এখন আর সে তাদের মুখের দিকে তাকাতে সাহস করে না। সে ভাবতে চেষ্টা করে যারা প্রতিদিন খেয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে তাব স্বামীও আছে।

এ ধারণা ভুল হয় হোক, কিন্তু সে ভুল সে ভাঙতে চায় না।

সে প্রাণপণে বিশ্বাস করতে চায় তার স্বামী রোজ এসে তার হাতে খেয়ে যাচ্ছে।

কোনো ভিখাবীকেই সে ভাল করে দেখে না, পাছে তার ভুল ভেঙে যায়।

মাঝে মাঝে সে প্রার্থনা করে 'ঠাকুর আমার চোখ দুটো অন্ধ করে দাও।'··

····· প্রতিদিন কাজের সময় এক আশ্চর্য শক্তি জেগে ওঠে তাব মধ্যে। অকাতবে সে একদল ভিখারীকে অন্ন পবিবেশন করে। তার স্বামী তাকে একদিন এই ভিড়েব ভিতব থেকে 'লক্ষ্মী' বলে তাকে ডাকবে এই বিশ্বাস তাকে বাঁচিয়ে রাখে।· ····

·····সে কল্পনা কবে আবার তার স্বামীকে সে ফিবে পাবে, আবার দেশে ফিবে গিযে ঘর বাঁধবে। তাই সে মনে কবে অন্ধকাব মিথ্যা। আলোই সত্য।'[৩৯] গ্রামের সহজ সরল স্বামী-স্ত্রী মন্বন্তরের অভিশাপে বিরাট কলকাতা শহরে অন্ন-অন্বেষণেব কারণেই একদিন হারিযে যাবে, বিচ্ছিন্ন হযে যাবে, এই চেহাবা মন্বন্তর-আক্রান্ত অভিশপ্ত শহরেবই নিযতি। অন্নসত্রের ভিড়ে একদিন ষষ্ঠীরও দেখা মিলতে পারত। কিন্তু হলেই বা কি, না হলেই বা কি, ষষ্ঠীর ফিবে আসাব সম্ভাবনাব কথা ভেবে লক্ষ্মীর যে প্রতিদিনের সলজ্জ, আকুল আর্ত অথচ একান্ত গোপন প্রতীক্ষা—তাব মানবিক দিক এবং একই সঙ্গে নিষ্ঠুর অমানবিক ধ্বংস হওয়াব দিক—সবই ১৯৪৩ সালেব মন্বন্তবেব মানব ভাগ্যের দলিলে তমস্সুকের মত লেখা যেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভিড়' গল্পে মন্বন্তবেব প্রত্যক্ষ ছবি বা তার মর্মন্তুদ কোন পরিণতি-চিত্র নেই। আসন্ন মন্বন্তবের সংকেতকে পরিবেশ হিসেবে এনেছেন লেখক। ট্রেনে ওঠাব সময ক্ষুধার্ত ভিখাবীর আকুল ভিক্ষা চাওয়াব মধ্যে মন্বন্তরের সংকেত ধবা পড়ে। ট্রেনের মধ্যে হিংস্র ভিড়ের অমানবিক রূপ। সেই ট্রেনের মধ্যেই লুঙ্গি-পরা এক যাত্রীর বিগত বছরেব আশ্বিনেব প্রলয়ংকর ঝড় ও এ বছরের দুর্বার বন্যা স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে জব-মহামারীর প্রকোপে তাব নিজের বাইশ বছরেব ছেলেটিব হঠাৎ মৃত্যু-চিন্তায় দুঃসহ কান্না ঠেলে ওঠে। সে কান্না বস্তুত আকালের কান্নাই। আব সেই কান্নাই ভিড়ের সমস্ত নির্মমতাকে মুহূর্তে করেছে মানবতায় সহনশীল :

'গাড়িব আবহাওযা ওর কান্নার সুরে কি আশ্চর্যভাবেই বদলে গিযেছে। এই নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা উগ্র স্বার্থবোধ যা হাওড়া থেকে উঠে পর্যন্ত সমানে দেখে আসছি, যাতে শুধু মানুষের পশুত্বের ছবিই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল চোখের সামনে, ওই লুঙ্গি-

পরা লোকটির চোখের জলে সব যেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মানুষের লজ্জা হল মানবতার অপমানে যেন। যেন সবাই সতর্ক হয়ে উঠল।'[৪০]
দুর্ভিক্ষের ভয়াল রূপকে পিছনে রেখে মানবতার সত্যরূপকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন লেখক 'ভিড়' গল্পে।

'বীরুর প্রশ্ন' গল্পে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় অবশ্যই ক্ষুধা-সচেতন মানুষের প্রতিনিধি করেই এঁকেছেন গল্পের নায়ক বীরেশকে। বীরেশ বাঁচার আভিজাত্যকে বড় করে দেখেছে ক্ষুধার্ত মানুষগুলির পক্ষে থেকেই। গল্পের কথক-বন্ধুর সঙ্গে তার মূলগত পার্থক্য আছে স্বভাবের। বীরেশ ক্ষুধার্তদের মাথা তুলে দাঁড়াবার, খাবার সংগ্রহ করে বেঁচে থাকার কথাই ভাবে। তার প্রশ্ন :

'আমাদের বাঁচবার অধিকার রয়েছে অথচ উচ্ছিষ্ট দানের আশায় দিনানুদিন চেয়ে থাকি কেন ?'[৪১]
গল্পের উত্তমপুরুষ কথক সবশেষে বীরেশের এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত ভেবেছে :

'যত মানুষ গেল আর যত যাইবে সবার মনুষ্যত্বের প্রতিভূ হইয়া বীরেশ এই প্রশ্ন রাখিয়া গিয়াছে।'[৪২]
এই গল্পের লেখকেরও অন্বিষ্ট হল মন্বন্তরের ঘায়ে জর্জরিত সর্বহারা মানুষগুলির মনুষ্যত্বের, মানবতার।

সরোজ কুমার রায়চৌধুরী তাঁর 'ক্ষুধা' ও 'ক্ষুধার দেশের যাত্রী' গল্প দুটিতে মন্বন্তরের প্রচলিত ছবিই এঁকেছেন। 'ক্ষুধা' গল্পের নায়ক জীবনকৃষ্ণের তার স্ত্রীর, পাঁচ-ছয় সন্তানের মা সুন্দরী সন্ধ্যার প্রতি সন্দেহের দিকটি এত বেশী উজ্জ্বল করে দেখিয়েছেন লেখক যে মন্বন্তরের ভয়াবহতা, অমানবিকতা তেমন মহৎ শিল্পের ভিত্তি পায়নি। মন্বন্তরের পরিচিত চিত্রগুলি থাকলেও গল্পটি এক সন্দেহ-রোগাক্রান্ত স্বামীর কথাই বড় করে তোলে। 'ক্ষুধার দেশের যাত্রী' গল্পে গয়ারামের প্রাকৃতিক দুর্যোগে অর্থাৎ ঝড় ও বন্যায় সর্বস্বান্ত হওয়া এবং সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষের চাপে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হওয়ার কাহিনী বিবৃত হলেও সার্থক ছোটগল্পের শিল্পে তা দীপিত হয়নি। তবে এই গল্পে লেখক মন্বন্তর আসার আগের আশ্বিনের সেই সর্ববিধ্বংসী ঝড়ের একটি চিত্র উপহার দিয়েছেন। এমন ঝড় ও পরের বছরের বন্যা যে সমস্ত স্তরের মানুষকে সহজাত ললাট লিখনের মত সর্বহারা করেছিল এক সময়, এক সময়ে মন্বন্তরকে তীব্র করার সহায়ক হয়েছিল, তার পরিচয় দিয়েছেন লেখক :

' ....রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল ঝড়।

সে কী ঝড়! যেন সহস্র দৈত্য একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। খড়ের চাল দেওয়ালের

বাঁধন ছিঁড়ে যেন উড়ে যেতে চায়। বড় বড় গাছ মাটিতে নুয়ে নুয়ে পড়ে। দীঘির কালো জল যেন লক্ষ সাপের মতো ফণা তুলে শান বাঁধানো ঘাটে মুহূর্মুহু আছাড় খায়। বৃষ্টির ধারা ছুঁচের মতো এসে গায়ে বেঁধে। কত বাড়ি গেল, কত গরু-বাছুর মরে গেল। যে বাড়িগুলো পড়লো না সেগুলোতেও ঝড়ের হাতের স্পর্শ রয়ে গেল। যেন একটা প্রকাণ্ড দৈত্য তার মস্ত বড় হাত দিয়ে মসৃণভাবে দেওয়ালের অর্ধেক মাটি চেঁছে নিয়ে গেছে।

মনে হয়েছিল, এ ঝড় বুঝি থামবে না। এ কালরাত্রি বুঝি আর প্রভাত হবে না। এই মহাপ্রলয়ে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।'[৩৪]

মনোজ বসুর 'দ্বীপের মানুষ' গল্পে অতিকথন দোষ ও অতিনাটকীয়তা থাকলেও লেখক উচ্চবিত্তের জীবনযাপনের বিলাসের চিত্র, তাদের হৃদয়হীনতার ও স্বার্থপরতার জীবন্ত ছবির পাশে সর্বহারা মানুষের হা-অন্নের চেহারা যেভাবে এঁকেছেন, তা ১৯৪৩ সালের মহামন্বন্তরের যথার্থ দলিলের মতই। যেখানে হাজার হাজার মানুষ হা-অন্নের হাহাকারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, সেখানে অর্থবানদের সেসব থেকে নিজেদের একটি স্বতন্ত্র জগত তৈরী করে উল্লাসে উচ্ছ্বাসে বাঁচার প্রয়াস আরও বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। একই দেশের মানুষের মধ্যে একজাতীয় বৈষম্য বজায় রেখে শোষকরূপে ধনীদের এই যে বিচ্ছিন্নতায় বাঁচার প্রয়াস, বস্তুত তা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করারই সামিল। বুড়ো মাঝি ভৈরব একদিন বাঁচায় যে হিরণ ও তার মেয়ে অমিতা ও স্ত্রী প্রভৃতিদের নিজের ছেলেকে জলে ডুবে যেতে দেখেও, সেই ভৈরবকে তারা কুড়িটাকা দান ক'রে মহত্তম মানবতার পরাকাষ্ঠা দেখায়। সরল ভৈরব তা বিশ্বাস করে, আর সেই ভৈরবই বিবাহের বিলাস-বাহুল্যে তাদের গৃহের সামনেই পরিত্যক্ত হয় আবর্জনার মত শুধু এক মুঠো ভাত না পেয়ে। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত গভীর বিশ্বাস ছিল, যে বাবুদের সে বাঁচিয়েছে একদিন নিজের পুত্রকে জলে বিসর্জন দিয়ে, সেই বাবুরা তাকে অন্তত এক মুঠো ভাত খেতে দেবেই। এমন ভৈরবের সংখ্যাই লাখ লাখ ছিল মন্বন্তরের দিনগুলিতে। এদের ভয় পেত অর্থে ও শিক্ষার কৌলীন্যে, স্বার্থে, দম্ভে অহংকারে একদল বিলাসী অহংমুখ মানুষ। তাদের যে সমাজ, মর্মন্তুদ হা-অন্নের কোলাহলের পরিবেশে তাদের যে বাঁচার প্রয়াস তা তো বাঁচার নামে প্রহসন। নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত মানুষ যেন তারা। এদের অস্তিত্ব এবং এদেরই শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ স্থাপন যেন এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে যাতায়াত। তাই প্রভাবতী-হিরণের মেয়ে অমিতা মা-বাবার বাড়ি থেকে বিয়ের পরদিন বরের পাশের অতি মনোরম নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে যখন শ্বশুরবাড়ি যায় তখনও তার গাড়ির চারপাশে ক্ষুধার্ত মানুষকে বিপুল জলরাশির মত মনে হলেও তার যাত্রা যেন বা এক সু-আশ্রয় দ্বীপ থেকে অন্য এক সুনির্ভর দ্বীপেই :

'......শুয়ে আছে, বসে আছে—আরও কত। বসে থেকে ক্ষুধা-লোলুপ চোখে যারা তাকাচ্ছে, তারা আরও ভয়ানক মড়া জ্যান্ত হয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকালে যে রকমটা হয় তেমনি। অমিতা শিউরে তাড়াতাড়ি মোটরের কাঁচ তুলে দেয়, রাস্তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে বরের দিকে তাকায়।......এক দ্বীপ থেকে আর এক নিরাপদ দ্বীপে যাচ্ছে। মাঝের লবণাক্ত সমুদ্রটুকু চোখ-কান বুজে কোন রকমে কাটিয়ে দিতে পারলে হয়।'[৪৪]

মহামন্বন্তর সংকলনের অধিকাংশ গল্পে আছে দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ চিত্র এবং একেবারে সর্বস্বান্ত মানুষদেরই যথাযথ প্রতিচিত্রণ। কিন্তু 'দ্বীপের মানুষ' গল্পের লেখক মন্বন্তরে প্রচণ্ড মার-খাওয়া মানুষের কথা বললেও প্রধানত যারা শোষক, স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব, এক অর্থে মন্বন্তরের স্রষ্টা ও পোষকও, তাদের নিদারুণ অসহায়তার কথাই গল্পের শেষতম সিদ্ধান্তে মূর্ত করেছেন। মন্বন্তরের সময় শহর-গ্রাম মিলিয়ে নিরন্ন মানুষের সংখ্যাই সর্বাধিক, মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধাভোগী ধনী মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল ছলে বলে কৌশলে। কিন্তু সেই অস্তিত্ব যে অগণন সর্বহারা মানুষের মধ্যে এক নির্জন নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতই এবং সে দ্বীপের অধিবাসীদের যাবতীয় সম্পর্ক স্থাপন:যে এমনি এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে যাওয়া, আত্মগোপন করারই সামিল, লেখক প্রচ্ছন্ন শ্লেষ-কটাক্ষে তা-ই গল্পের মূল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। গল্পের শেষে অমিতার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার প্রসঙ্গটি তা-ই সূচিত করে। শুধু নিরন্ন ক্ষুধাক্লান্ত, রোগ-জর্জর অসহায় মানুষ ও ভিখিরির দলই নয়, মন্বন্তরে প্রচণ্ড আত্মিক সংকটে যারা ভুগেছে, যারা জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে একা নির্জন একটি জগত ও পরিবেশ রচনা করে বাস করেছে, তাদের নির্মম অসহায়ত্ব, স্বভাবের নিষ্ফলত্ব, স্বতঃস্ফূর্ত জীবনের পক্ষে বন্ধগলির মত অন্ধকার গ্রহণকেই লেখক সুনিপুণ চিত্রময়তা দিয়েছেন গল্পের শেষের ব্যঞ্জনায়। 'দ্বীপের মানুষ' গল্পে মনোজ বসু দিয়েছেন মন্বন্তরের সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এক স্বাদ।

'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চিরকালের মানব প্রাণের এক অদ্ভুত খবর দিয়েছেন আমাদের। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কালনাগ' গল্পে ভবতোষের স্ত্রী সুধা সারাদিনের অসহনীয় কষ্টের রেশন-লাইনের মধ্যেই সম্পূর্ণ অপরিচিত চারদিন অভুক্ত এক পুরুষকে নিজের অতি কষ্টার্জিত চাল থেকেই ভাত খাওয়ানোর প্রস্তাব দিয়ে যে মানবতার পরিচয় দিয়েছে, তা মহৎ হলেও বিশাল নির্মম মন্বন্তরের পটভূমিতে মাত্র একদিনের গৌরব গরিমায় উজ্জ্বল। 'বীরুর প্রশ্ন' গল্পে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বীরেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে উচ্ছিষ্ট দান গ্রহণে বাঁচার থেকে সমস্ত মানুষকে আরও বড়ভাবে বাঁচার কথা বলার ও নিজের আত্মত্যাগের মধ্যে মহৎ মানবতা

প্রতিষ্ঠার দিকটিকে গল্পের একমাত্র ব্যঞ্জনায় গভীর শিল্পত্ব দিয়েছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভিড' গল্পে ট্রেনের অসম্ভব ভিড়ে সমস্ত মানুষের অমানবিক ব্যবহারের মধ্যে হঠাৎ এক যাত্রীর তার বাইশ বছরের ছেলের আকস্মিক দুর্ভাগ্য-ভাবনায় কেঁদে-ওঠার মধ্যে মানবতার যে সর্বগ্রাসী সুস্থ রূপ চিত্রিত করতে প্রয়াসী, তা গল্পের সেই শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় শেষতম সিদ্ধান্তই। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর' কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পে মানবতাকে যেমন গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উচ্চগ্রামে বেঁধেছেন, তেমনি তাকে সর্বকালের জীবনদায়িনী রক্তের কণিকার সঙ্গে একাত্ম এবং অবধারিত করে রেখেছেন।

গল্পের প্রথম বাক্যটিই সর্বকালের সর্বস্তরের মানব-প্রাণের মূলকে ধরে নাড়া দেয়:

'সেদিন আপিস যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় প্রথম মৃত্যু দেখল—অনাহারে মৃত্যু। এতদিন শুধু শুনে আর পড়ে এসেছিল ফুটপাতে মৃত্যুর কথা, আজ চোখে পড়ল প্রথম।··· কয়েক-মিনিটে মৃত্যুঞ্জয়ের সুস্থ শরীরটা অসুস্থ হয়ে গেল।'[৪৫]

মৃত্যুঞ্জয় খুব ভালো মাইনের এবং পদের কাজ করে অফিসে। সে নিরন্ন সর্বস্বান্ত শ্রেণীর নয়। তার অনাহারে মৃত্যু দেখার এবং চারপাশের অগণন হাহাকার ও মৃত্যুর অভিজ্ঞতার মধ্যে এই শারীরিক অসুস্থতা বেশীক্ষণ থাকার কথা নয়, কিন্তু:

'মনে আঘাত পেলে মৃত্যুঞ্জয়ের শরীরে তার প্রতিক্রিয়া হয়, মানসিক বেদনাবোধের সঙ্গে চলতে থাকে শারীরিক কষ্টবোধ। আপিসে পৌঁছে · সে রীতিমত কাবু হয়ে গেছে।'[৪৬]

অর্থাৎ শারীরিক কষ্ট থেকে মানসিক কষ্টটা ক্রমশ আত্মিক সংকটে দাঁড়ায় মৃত্যুঞ্জয়ের। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানবিক বোধকে একেবারে চরিত্রের মূলে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছেন। এই মৃত্যু ক্রমশ সেই বিশাল ব্যাপ্ত বোধেই, তার গভীর-প্রোথিত প্রতিক্রিয়াতেই সর্বস্বান্ত করে দেয় নায়ককে। তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, অফিসের চাকরী, বন্ধু-বান্ধব, ওপরতলার নিরাপদ জীবন সব কিছু থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সে:

'মৃত্যুঞ্জয়ের গা থেকে ধূলিমলিন সিল্কের জামা অদৃশ্য হয়ে যায়। পরনের ধুতির বদলে আসে ছেঁড়া ন্যাকড়া, গায়ে তার মাটি জমা হয়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। দাড়িতে মুখ ঢেকে যায়। ছোট একটি মগ হাতে আরও দশজনের সঙ্গে সে পড়ে থাকে ফুটপাতে আর কাড়াকাড়ি মারামারি করে লঙ্গরখানায় খিচুড়ি খায়। বলে, গাঁ থেকে এইছি। খেতে পাইনে বাবা। আমায় খেতে দাও।'[৪৭] মৃত্যুঞ্জয়ের এই পরিণতি সমগ্র গল্পেরও পরিণতি।

এমন করুণতম পরিণতির আগের চিত্র যা মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের, স্ত্রীর মানসিকতার

দ্যোতক—তা মৃত্যুঞ্জয়ের জীবনধারণের পক্ষে বেগ সৃষ্টির উপযোগী। মৃত্যুঞ্জয়ের অফিস-বন্ধু নিখিল—যে সহকর্মী এবং পরিবারেব সহমর্মীও, সেও মৃত্যুঞ্জয়ের অসুস্থ স্ত্রীকে তার স্বামীর দিকে একটু গভীর নজর দিতে অনুরোধ জানায় তার এমন ক্রমশ পরিবর্তনের জন্য :

'নিখিল বলে, 'আপনি যদি সুস্থ হযে উঠে ঘরেব দিকে তাকান তাহলে যতক্ষণ পারি সঙ্গে থাকব, নইলে নয।'

টুনুব মা বলে, 'উঠতে পারলে আমিই তো ওর সঙ্গে ঘুরতাম ঠাকুরপো।'

'ঘুবতেন ?'

'নিশ্চয়। ওব সঙ্গে থেকে থেকে আমিও অনেকটা ওর মত হয়ে গেছি। উনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন, আমারও মনে হচ্ছে যেন পাগল হযে যাব। ছেলে-মেয়েগুলির জন্য সত্যি আমার ভাবনা হয না। কেবলি মনে পড়ে ফুটপাতেব সেই লোকগুলিব কথা। আমাকে দুতিন দিন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে টুনুর মা আবার বলে, 'আচ্ছা, কিছুই কি করা যায না ? এই ভাবনাতেই ওঁর মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কেমন একটা ধারণা জন্মেছে, যথাসর্বস্ব দান করলেও কিছুই ভাল করতে পারবেন না। দারুণ একটা হতাশা জেগেছে ওঁর মনে। একেবারে মুষড়ে যাচ্ছেন দিনকে দিন।'

নিখিল শোনে আর তার মুখ কালি হয়ে যায়।'[৪৮]

মৃত্যুঞ্জয় একা নয়, তাব সঙ্গে আছে তার সহমর্মী হিসেবে উপযুক্ত স্ত্রীও। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক সর্বগ্রাসী, জনের সঙ্গেই একমাত্র জীবনযাপনে গভীর-নিবিড় যুক্ত লতাগুল্মের মত সর্বকালিক মানবতাবোধকে এই গল্পে এঁকেছেন। কোন ব্যক্তির বিশেষ মানব্য ভাবনা নয, মৃত্যুঞ্জয ও তার স্ত্রী এক নির্বিশেষ মানবতায় দীক্ষিত হয়েছে। তাই তাদের স্বার্থের সংসার মিথ্যে হয়ে যায় সেখানে। লেখক সেকালেব মর্মান্তিক মানবতাবিধ্বংসী মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে গল্প লিখতে বসে গভীরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সর্বহারা মানুষের কাছে তাদের সমস্ত হারানোর দিনে যদি বুর্জোয়া সমাজ মিথ্যে খোলস ত্যাগ করে নেমে না আসে, তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর সুস্থ বোধের জাগরণ যদি না ঘটে, নিরন্ন মানুষদের ভিড়ে তাদের গায়ের গন্ধে, ক্ষুধার্ত চীৎকারে অশনে বসনে যদি তা অস্থি-মজ্জা-মাংস-রক্তের মতো মিলিত হতে না পারে, তবে সর্বকালীন মানবতার প্রতিষ্ঠা কোনক্রমেই হয না। বুর্জোয়া শ্রেণীর জোড়াতালি দেওয়া, মুখোশ-আঁটা মিথ্যে মেকী মানবতাবোধ সে ক্ষেত্রে বিকৃত মুখ-ভেঙানোর মতই নে হবে। কেবল ওপরে বসে ভিক্ষার অন্ন যুগিয়ে গেলেই, তাদের জন্য হা-হুতাশ

করলেই মানবতার স্বপক্ষের কাজ সম্পূর্ণ হয় না, তাদের অভাবকে, তাদের দুঃখ-যন্ত্রণাকে তাদেরই মানব-প্রাণের আলোয় হৃদয়ের রক্তে মিশিয়ে নিতে হবে। মানবতার ধ্বংসের দিনে সব মানুষকে শোষিতের সঙ্গে একাসন হতে হবে, তবেই ধ্বংস বন্ধ হবে, বিশুদ্ধ মানব প্রাণের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

মৃত্যুঞ্জয়ের যে পরিণতি তা বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'বীরুর প্রশ্নে'র অনুরূপ হলেও, বীরেশের জিজ্ঞাসা যেখানে আংশিক, মৃত্যুঞ্জয়ের প্রশ্ন সেখানে সম্পূর্ণতার। 'অঙ্গার' গল্পে প্রবোধ কুমার সান্যাল সমাজ-ন্যায়ের ও নীতির দিক থেকে মানবতার ভয়ংকর ক্ষয়িষ্ণু রূপ দেখেছেন। সেখানে শিক্ষিত ভদ্র মধ্যবিত্ত ক্লেদাক্ত নিম্নবিত্তে ও গরীবস্তরে নেমে আসছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন উপার্জনশীল সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ সর্বহারাদের জন্য সত্যিকারের সহমর্মী হয়ে উঠছে। মানবতার ধ্বংস-স্তূপ এই গল্পেই চিত্রিত। তবে 'অঙ্গার' এর লেখক কোন সুস্থ সমাধান না দেখিয়ে বিচ্ছিন্নতার রুদ্ধশ্বাস অসহায়তায় এসে শেষ করেছেন, আর 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে'র লেখক বলিষ্ঠ মানবতাবাদের প্রত্যক্ষ জমি রচনা করে উপসংহার করেছেন।

মন্বন্তর নিয়ে একাধিক গল্প লিখেছেন সে সময়ের খ্যাতনামা ও অখ্যাতনামা লেখকরা। রজত সেনের 'ভাত' (পরিচয় পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৫০) গল্পে দুর্ভিক্ষের তথ্যের সত্যরূপ অংকিত। দারিদ্র্য, অনাহার, মৃত্যু এই গল্পের পটভূমিতে চিত্রিত। প্রধান চরিত্র এক পাগল। সর্বগ্রাসী ক্ষুধাই তাকে পাগল করেছে। খাদ্যের অন্বেষণে সে যখন খাদ্য পায়, তখন একই থালায় মানুষ ও পশুর ভোজন চিত্র দিয়ে মন্বন্তরের করুণ-নিষ্ঠুর ছবি উপহার দিয়েছেন এই লেখক—যা সে সময়েরই বাস্তব তথ্য ও সত্য।

অন্নদাশংকর রায় তাঁর 'মন পবন' গল্প সংকলনের অন্তর্গত 'সবার উপর মানুষ সত্য' নামের গল্পটিতে মন্বন্তর প্রসঙ্গ আনলেও প্রবোধ কুমার সান্যাল প্রমুখ উল্লিখিত গল্প-লেখকদের মত প্রত্যক্ষ মন্বন্তর-চিত্র আঁকেননি, তিনি ভয়াবহ মহামন্বন্তর স্মরণে ভয়াল দুর্ভিক্ষ ও চিরন্তন মানবতাবাদ—কোনটি প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত—তারই একটি তত্ত্বভিত্তিক প্রসঙ্গ গল্পের আঙ্গিকে উত্থাপন করেছেন। গল্পের প্রথমেই উত্তমপুরুষ কথকের বৌদির একটি কথা :

'বৌদিদি বললেন, "দেখলে তো ভাই তোমার দেশের ধারা। একটু ফ্যান দাও দুটি ভাত দাও করে লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণী প্রাণ বিসর্জন করল। কিন্তু দেশের জন্য নয়। এই মানুষগুলো যদি মরণ ধ্রুব জেনে দেশের নামে মরত তা হলে কি একটা বিপ্লব—"[৪৯]

এই প্রসঙ্গেই গল্প শুরু করে কথকের স্কুলের সহপাঠী বিরাজমোহন ওরফে বোকুর ইংরেজ, হিন্দু মুসলমান, সমস্ত রাজনীতির অভিজ্ঞতা অর্জনের শেষে লেখক মানুষ সম্পর্কে বোকুর

ট্র্যাজিক উপলব্ধির জগতে আমাদের এনেছেন। সেখানেই লেখক যে প্রশ্ন তুলেছেন তা একদিকে মন্বন্তর, অন্যদিকে মানবতাবাদ, মানুষকে ভালবাসা—দুয়ের বিপরীত স্বভাবটি স্পষ্ট করে :

'আমি বললুম, "কোন্‌টি বড ট্র্যাজেডি বলতে পারো ? মন্বন্তর না মনান্তর ?"

"নিশ্চয় মন্বন্তর।"

"না, বৌদি, পাঁচ কোটি ইংরেজ আর দশ কোটি মুসলমানের সঙ্গে ত্রিশ কোটি হিন্দুর মন মিলছে না, কোনো দিন মিলবে তার লক্ষণ দেখছিনে। ঠিক এমনি মনান্তর থেকে এসেছে যুদ্ধ। আমার বন্ধুর সুখস্বপ্ন ভেঙেছে। সে এখন প্র্যাক্‌টিসে মন দিয়েছে বটে, কিন্তু ভুলতে পারছে না যে মানুষ কোথাও নেই। আছে শুধু ইংলিশ ম্যান, মুসলমান জাপম্যান, ব্রাহ্‌ম্যান। কোনটা বড ট্র্যাজেডি ? মানুষের অন্তর্ধান না মানুষ-গুলোর মৃত্যু ?"[৫০]

বস্তুত বোকুর যে মানবতাবাদের অন্বেষণ, তা সমস্ত মন্বন্তরে মৃত মানুষের দুঃখের ঊর্ধ্বে বৃহত্তম মানবতাবাদের—যেখানে কোন বিশেষ জাতি, ধর্ম, দেশ নেই। এই বিশেষ জাতির ভাগ প্রকট বলেই দেশের যুদ্ধ ও স্বাধীনতা এমন বার বার বাধা পেয়েছে। বোকু তথা লেখকের যে জিজ্ঞাসা, তা মন্বন্তরের তথ্য ও চরম দুঃখের সত্যের থেকে বড হয়েছে আবহমান কালের মানবজাতির বৃহত্তম মানবতাবাদের জয় ঘোষণায়।

সুবোধ ঘোষ 'কর্ণফুলির ডাকে' গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পটভূমি যেমন এঁকেছেন, তেমনি তার মধ্য থেকে মন্বন্তরের আগামী দিনের ছায়াকেও স্পষ্ট করেছেন প্রাথমিক ভূমিকা হিসেবে। নায়ক ধ্রুবেশ ও নায়িকা রমার মধ্যবিত্ত সংসারের আসন্ন দুর্দশার চিত্রে সেই ছায়াপাত :

'উদ্বৃত্ত যা কিছু ছিল টেনে টেনে একটা মাস চলেছে। গয়লা ফিরে গেল দোর থেকেই দুধের কলসী দেখিয়ে। মাসকাবারী ব্যবস্থা করতে সে রাজি নয়। রোজ নগদ নগদ কিনতে হবে। এ বাড়িতে কপাল-ভাঙাদের ক্ষুধা এবার খুব ভালভাবেই পাকিয়ে উঠেছে। গয়লার সজাগ কারবারী চোখে সে রহস্য ধরা পডতে দেরী হয় নি।'[৫১]

'বন্যা' গল্পে মনোজ বসু যুদ্ধ-সমকালীন বাংলাদেশে যে ভয়াল প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়, তারই প্রেক্ষাপটে মানুষের অসহায়তার চিত্র শুধু নয়, সেই সহায়হীন নিষ্ঠুর পরিবেশে শোষিত মানুষদের সঙ্গে শোষক শ্রেণীর তিক্ত, প্রতিশোধমূলক সম্পর্ক ও সংঘর্ষের এক সার্থক ছবি উপহার দিয়েছেন। শোষক শ্রেণী যখন শোষণের যন্ত্র চালায়, তখন একবারও ভাবে না, সে নিজেও একদিন এই যন্ত্রেরই শিকার হতে পারে, হতে পারে শোষিতদের হাতের মুঠোয় অসহায় করুণ দুর্বল এক জীব। মিলের মালিক নববিবাহিত প্রেমতোষ,

যে একদিন নিবারণ-শ্রীপতিদের ঘরছাড়া করে দোর্দণ্ড অত্যাচারে, সে তার স্ত্রী সুপ্রীতিকে নিয়ে বন্যার মধ্যে মৃত্যুর মুখোমুখি হয় নীচের তলার মানুষদের মতই। প্রকৃতির নির্মম নিয়ম কোন বাছ-বিচার করে না। লেখক বন্যার মত ভয়াল প্রাকৃতিক দুর্যোগ-চিত্র এঁকেছেন এই সূত্রেই :

'জল বাড়ছে, খরবেগ স্রোত আঘাত করছে রেল-রাস্তার পায়ে। কালভার্টের মুখে ঘোলা জল আবর্তিত হয়ে ঢুকবার চেষ্টা করছে। দুপুর নাগাত দেখা গেল, চারিদিক সমুদ্রের মতো হয়ে উঠছে, গ্রাম-বাড়ি-ঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, গাছের মাথা আর দু-একটা পাকা বাড়ির ছাত।... ভেঙে ফেলেছে ইঁটে গাঁথা পাকা কালভার্ট। দুর্বার স্রোত ওপারে যাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে, ভেঙে চুরে ভাসিয়ে পাক খেয়ে জল বেরুচ্ছে। বড় বড় গাছের ডাল এক নজর দেখা দিয়ে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, দেখতে দেখতে মাটি ধ্বসে গিয়ে জলধারা বিশাল পথ করে নিল। রেল-রাস্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, শূন্যে পড়ে আছে কেবল বিরাট সরীসৃপের মতো কাঠে-আঁটা লোহার লাইনগুলো।'[৫২]

এমন বন্যার পরিবেশে প্রেমতোষ-সুপ্রীতি বাঁচার জন্য আর্ত, একটু আশ্রয়ের আশায় উৎকণ্ঠিত। দশ টাকা পাওয়ার লোভে দুরন্ত বন্যার মধ্যেও কিছু মানুষ প্রেমতোষের গাড়ি ঠেলে গাছের তলায় আনলে :

'সুপ্রীতি নবনীত-কোমল হাতে জড়িয়ে ধবল গাছের ডাল। চোখে চশমা, নীল সিল্কের শাড়ি সুঠাম সুশুভ্র দেহলতা ঘিরে আছে। সমস্ত জলে কাদায় মাখামাখি। কি ব্যাকুলতা তার চোখে মুখে! ডালটা ধরে ঝুল খেয়ে সে উঠবার চেষ্টা করে।'[৫৩]

একসময় আশ্রয় পায় অবহেলিত মানুষগুলির ভিড়ে :

'বন্যা ঘুচিয়ে দিয়েছে মানুষে মানুষে ব্যবধান। নইলে ধরুন, শ্রীপতি সরকারের সঙ্গে মিসেস সুপ্রীতি রাহার ঘনিষ্ঠতা—সাবধানে মাটি বাঁচিয়ে চলে যে সুপ্রীতি, মাটিকে তার বড় ঘৃণা, মাটির কণিকা ফর্সা অঙ্গে লেগে রূপ মলিন করে সেজন্য অনেক দামী সাবান খরচ করতে হয় তাকে—এ হেন রূপসী কাদা-মাটি মেখে শ্রীপতিদের সঙ্গে এক গাছের উপর বসবাস করল, কে ভাবতে পেরেছিল এ কথা?'[৫৪]

গল্পের অন্যতম চরিত্র শ্রীপতি নিবারণের বাড়ি এসে দেখেছে শোষিত মানুষগুলিকে, তাদের অন্নটুকু কেড়ে নেওয়ার পরেও অসহায়ভাবে শোষকের কাছেই আত্মবিক্রয়ের দিক :

'ঐ মাংসলেশহীন ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ যতীন কামারের মধ্যে, ঐ সুরথ বিশ্বাস নীলরতনের মধ্যে—আত্মা যাদের মরে গেছে, উচ্ছিষ্টের আশায় স্পাই হয়ে খবরাখবর দেয়, আপনার লোকের মাথায় লাঠি মারে।'[৫৫]

লেখক শ্রীপতির উপলব্ধির মধ্যে আগামী দিনের আশার ছবি এঁকেই গল্পটির উপসংহার টেনেছেন এইভাবে :

'আজকের এই সব ভেসে-যাওয়া মেঘম্লান অপবাহ্নে দুরন্ত প্রলয়-কল্লোলের মধ্যে শ্রীপতি আর এক মহাবন্যার তরঙ্গধ্বনি শুনতে পেল।'[৫৬]

'কণ্ট্রোলের লাইন' গল্পেও আছে তেতাল্লিশের মন্বন্তরের সময় শোষক মানুষ ও শোষিত মানুষের তিক্ত সম্পর্কের চিত্র, কিন্তু এখানে লেখক অন্যভাবে বক্তব্য রেখেছেন। সোনার চামচ মুখে দিয়ে মানুষ-হওয়া, ধনীর অত্যন্ত স্নেহের সন্তান অতুল বিবাহের পরেও বাবার স্নেহে রুদ্ধশ্বাস। চারপাশের বৈভব তাকে অস্বস্তির মধ্যে ধরে রাখে, সে আড়ষ্টতায় সহজ জীবনে আসতে চাইলেও আসতে পারে না স্ত্রী করুণা, শ্বশুর মনোহর, সঙ্গী সুবল—এদের সবল বাধায়। গ্রামের শ্বশুরবাড়ি এসে সমস্ত বাঁধাবাঁধি থেকে কৌশলে গোপনে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সুবলের সঙ্গে অতুল সাধারণ কণ্ট্রোলের লাইনে থেকে দাঁড়ানো হা-অন্নের মানুষগুলির মধ্যে অন্য জগতের অভিজ্ঞতা পায়। কণ্ট্রোলের লাইনে ভোররাতে বসে থাকার সময় অতুলের অভিজ্ঞতা অভিনব :

'একখানা ইট যোগাড় করে সে বসেছিল। খাতির করে সেটা অতুলের দিকে এগিয়ে দিল।

অতুল বলল, কোঁচড়ে কি ভাই?

বকফুল। আঁধারে আঁধারে পেড়ে নিয়ে এলাম। এ নিয়েও কাড়াকাড়ি বাবু। কত বড়ো অশ্বত্থের মতো গাছ। পাতা নেই শুধু ফুল—আর এখন গিয়ে দেখুনগে, কুঁড়ি অবধি খুঁটে নিয়ে গেছে।

শিশির-ভেজা এক মুঠো লাল কুরুবক সে বের করল। বলে, নিন বাবু, পকেটে পুরে রাখুন। ভাজা খেয়ে দেখবেন, তোফা লাগবে। ডালনাও হয় কাঁচকলা আর নারকেলের দুধ দিয়ে।

আবার কানে কানে বলে, আপনাদের চাল দু-ঠোঙা কিন্তু আমার।'[৫৭]

মন্বন্তরের এই ছবি তথ্যের সত্যে ও শিল্পের সত্যে সার্থক। এর পরের অভিজ্ঞতায় অতুলের যে স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তা সম্পূর্ণ তার, দীর্ঘদিনের সুখী জীবন স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিবাহ বার্ষিকীতে সমগ্র বাড়ির একান্তে স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হৃদয়-বিনিময়ের সম্পর্কের সময় অতুল অন্য মানুষ হয়ে যায়। মনের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে নেমে আসে কণ্ট্রোলের লাইনের সেই মানুষগুলির কাছে—যারা ড্রেনের দুর্গন্ধ নাকে নিয়ে দিনরাত কিছু চালের আশায় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে। লেখক এই চিত্রে মানুষের সুস্থ প্রগতিমূলক ভাবনাকেই শিল্পের আলোয় উজ্জ্বল করেছেন। প্রচ্ছন্ন শ্লেষটি সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না :

'অতুল ভেবে বলে, ফাল্গুন মাসে হয়েছিল বিয়ে। সেটা উনত্রিশে? এতও মনে থাকে তোমার?

কি দেবে আমাকে?

তুমিই বলো।

করুণা ঘাড় দুলিয়ে বলে, বলব না—বলব না তো, খুব নতুন একটা কিছু—

নতুন ডিজাইনের একটা শাড়ি কি গয়না—

করুণা আগুন হয়ে উঠল। শাড়িতে শাড়িতে পাহাড় জমেছে। সোনা জহরতে মুড়ে রেখে দিয়েছে। ফের যদি শাড়ি গয়না আসে কোনদিন, শাড়ির আঁচলে ফাঁস টেনে মরে থাকব।

হঠাৎ কৌতুকে তার চোখের মণি নেচে ওঠে। বলে, এনেছ—ঐ যে কি নিয়ে এসেছ পকেটে ভরতি। ফুল এনেছ? ঐ তো আমি চাই।

বকফুলের রাশি বের করল অতুল।

করুণা আবদার করে বলে, তুমি আমার চুলে পরিয়ে দাও।

পরাব তোমাকে? ভাজা করে দিতে হবে। ···আচ্ছা, আচ্ছা—মুখ হাঁড়ি কোরো না, দিচ্ছি দুটো। করা যাক এ দুটো বাজে খরচ আজকের দিনে।

পরিয়ে দিয়ে অতুল বলে, বিয়ে একলা তোমার হয় নি। হয়েছিল আমারও। আমায় কি দেবে?

দেব না, দিচ্ছি। এদিক-ওদিক তাকায় করুণা। কাছে—খুব কাছে আসে——

ছিটকে সরে গেল অতুল। দু-হাতে মুখ ঘসে বলে, দুত্তোর! পাউডার লেপটে দিলে খানিক। গন্ধে গা কেমন করছে।

হল্লা আসছে। কণ্টোলের লাইনে চাল দেওয়া শুরু হয়েছে বুঝি—অতুল ঘসে ঘসে পাউডার তুলে ফেলে। কণ্ট্রোল-লাইনের ধারে ড্রেনে যেমন দুর্গন্ধ, এ-ও তেমনি কতকটা।'[৫৭]

যে লাল ফুলে ছিল বিলাস, সেই ফুলই হয়েছে মন্বন্তরের দিনে বাঁচার উপযোগী খাদ্য—একান্ত প্রয়োজনীয়। করুণার কাছে যা বিলাসের অতুলের কাছে তা ঘৃণার। এমন কি এতদিন যে অতুল পাউডার ইত্যাদির গন্ধের জগতে সুখে-আরামে বিলাসে-বৈভবে মানুষ, তার কাছে বিবাহ-বার্ষিকীর দিনের যুবতী, সুন্দরী স্ত্রীর পাউডার-ঘষা মুখের ঘনিষ্ঠ চুম্বনের মধ্যেও পায় কণ্টোলের লাইনের ধারের ড্রেনের দুর্গন্ধ। অতুলের চরিত্রের এই অন্তর্নিহিত উত্তরণের চিত্রে লেখক অনবদ্য ব্যঞ্জনা

এনেছেন—যা মন্বন্তরকেই, তার অসহায়তা ও বীভৎসতাকেই আরও তীব্র শ্লেষ-জ্বালাজর্জর করে তোলে।

'মানুষ ও গোরু' গল্পে কৃষকদের মধ্যে মন্বন্তরের তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং সেই সূত্রে মালিক শ্রেণীর জোরজুলুম ও অত্যাচারের সঠিক ছবি এঁকেছেন লেখক। চাষী ধনঞ্জয়, স্ত্রী মেনকা ও চাষের আদরের গরু মুংলি। এরা খেতে পায় না। অথচ এদের জমির ধান কৌশলে নিতে চায় সাহেব-মালিক নায়েব ও প্যাইকদের সাহায্যে। কিন্তু গল্পের শেষে সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করার পরেও এক সময় ধনঞ্জয়ের যে প্রতিবাদী গৌরবদীপ্ত রূপ, তা মূলত শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিতদের সবল জাগরণেরই প্রতীকী ব্যঞ্জনা যেন:

'ধনঞ্জয়কে ধরে নিয়ে যায় কার সাধ্য? গায়ে যেন অসুরের বল হয়েছে। পাইকদের হাত ছিনিয়ে বলতে লাগল, চোর কেন—অমূল্য ঠিকই বলে—তোমরা সব খুনে। পিরথিমে এসেছি, মাটির উপর বসত করছি—বাতাস পাচ্ছি, বৃষ্টির জল পাচ্ছি, আর ভাতটাই পাব না?'[৫৯]

গল্পের উপসংহারে মনোজ বসু আগামী দিনের কৃষক-মানুষের হয়ে সর্বহারাদের মহান প্রতিশ্রুতির দিক স্পষ্ট করতে চেয়েছেন:

'প্রলাপের মত শোনাচ্ছে—না? এ সমস্ত বলছে কি ধনঞ্জয়? গোরুগুলো পিটুনি খাবে, আরও ভাল করে লাঙল টানবে—এই তো হয়ে আসছে চিরদিন। কাঁধের জোয়াল ফেলে দিয়ে যদি সব শিঙ উঁচিয়ে দাঁড়ায়—সর্বনাশ। জগত তাহলে চলবে কি করে? সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে না তো আজকের জগৎ, আমরাই ঘোরাচ্ছি খুশিমতো, টুঁটি ধরে তাকে রক্ত-সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়াচ্ছি। এত মানুষের এত বড় পৃথিবী—তবু কি অসহায়।'[৬০]

যারা আত্ম-স্বার্থে, অর্থ ও অন্নলোভে চলে, তারা প্রয়োজনে গোরুকেও খাদ্য দেয় তার কাছ থেকে কাজ আদায়ের জন্য, মানুষকে নয়। কিন্তু চাষের মাটিতে মানুষ ও গোরু তো একাত্ম। দু'য়ের শ্রমেই তো ফসল। অন্ত জন্তু আর প্রান্ত মানুষের যৌথ সক্রিয়তাতেই তো পৃথিবীর সুন্দর রূপ। মন্বন্তরের সময় শোষক মানুষের নির্দয় স্বার্থবুদ্ধি যে কিভাবে নিজেদের পায়ের তলার মাটিকে নরম করেছে, লেখক সূক্ষ্ম শিল্প-ভাবনায় তার প্রমাণ রেখেছেন এ গল্পে।

মন্বন্তরে মানুষের শরীরে যদিও থাকে হা-অন্নের দুর্বলতা, অক্ষমতা, কিন্তু তারা একদিন সমবেত হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। ন্যায়-অন্যায়, আইন-কানুন তারা বোঝে না। পেটের জ্বালা তাদের মনের জ্বালা ধরায়। আর তারই আগুনে একদিন স্বার্থ-সর্বস্ব প্রতিপক্ষ ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে

গ্রামের অভাবী মানুষের সামনে মজুতদারদের কি অসহায় রূপ, মার-খাওয়া হা-অন্নের মানুষগুলিরই বা কি তেজ, তার একটি ছবি এঁকেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'রঙিন ঘাট' গল্পে :

'অন্যান্য বছর যা হোক কিছু হয়, কিন্তু চরম দুর্দিন এবার। যুদ্ধের বাজারে একটা করাল বিভীষিকা। দু-চারখানা মাঠ ছাড়া একটি শীষ নেই ধানের। ক্ষেতের অবস্থা দেখে মহাজন ধার দেয় না, হাটে হাটে বিক্রী হয় গরু-মহিষ, শেষ সম্বল থালা-বাটি, এমন কি লাঙলের ফলা পর্যন্ত।

দুর্ভিক্ষ আর ক্ষুধার দুটো রূপ আছে—হত্যা আর আত্মহত্যা। একটা ব'য়ে আনে আর একটাকে। তাই একদিন বুভুক্ষু মানুষের একটা আত্মঘাতী ঝড় বয়ে গেল মধুগঞ্জের হাটের ওপর দিয়ে। হাট লুঠ হয়ে গেল, রাধাচরণ কুণ্ডুর গদিতে লাগল আগুন। হ্যাণ্ডনোটের তাড়া বাঁধা কাগজগুলো পুড়ে রাশি রাশি কালো ছাই হয়ে গেল। আর বন্ধকী সোনা-রূপোগুলো গলে গলে তাল পাকিয়ে রইল কতকগুলো দগ্ধ নরমুণ্ডের মত।

কিন্তু আত্মহত্যার এটা প্রথম পর্ব। দুর্দিনের মধ্যেই আইন এল ধর্ম-সংস্থাপন করতে। গুলির মুখে কেউ কেউ ক্ষুধা আর দুশ্চিন্তার হাত থেকে লাভ করল মহা-নির্বাণ, সরকারের নিরাপদ আশ্রয়ে কেউ কেউ আশ্রিত রইল সুদীর্ঘ কালের মত। অপ্রত্যাশিত মরা-নদীতে যে জোয়ার এসেছিল, প্রথম ভাঁটার টানে তার চিহ্ন-মাত্র রইল না ...।'[৬১]

মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ যন্ত্রণার নাভিস্থল থেকে উঠে-আসা জ্বালায় যে প্রতিবাদ তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের মানুষের স্বভাবে যেমন ছিল, তেমনি তাকে শান্ত করার মত কঠিন ছিল শাসকের অত্যাচার। লেখক মন্বন্তর ও যন্ত্রণার এক অসহায় অথচ অবধারিত প্রকাশকে এভাবে রেখেছেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর 'অসমতল' গল্প সংকলনের একাধিক গল্পে মন্বন্তরকে একমাত্র বিষয় করেছেন। এরই অন্তর্ভুক্ত অথচ ১৯৪৩ সালে রচিত 'মদনভস্ম' গল্পটিতে বৃদ্ধ ধনঞ্জয় ধূপী ও যুবতী স্ত্রী মালতীর সাধারণ সচ্ছল জীবনে কিভাবে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া তাদের দৈনন্দিন স্বভাবকে বিপর্যস্ত করে, তারই শিল্পরূপ দিয়েছেন। লেখক এ গল্পে দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকেছেন এইভাবে :

'মাস খানেক আগে যে সব বাড়ীতে একবেলা হাঁড়ি চড়েছে, কদিন ধরে সে সব বাড়ীতে শাপলা আর কচুসিদ্ধ চলছে। পঞ্চাশ-ষাট টাকা দরে চালও মিলছে না কোথাও। দু'তিনটে পাড়ায় ইতিমধ্যেই কলেরা আরম্ভ হয়েছে। এ পাড়ায় সবচেয়ে আগে ধরল ধনঞ্জয়কে বার কয়েক ভেদবমি হওয়ার পর শুয়ে শুয়ে নিজেই নাড়ী

টেপা আরম্ভ করল ধনঞ্জয়, আর কতক্ষণ জীবন আছে নাডীর গতি দেখে সে নির্ণয় করবে।'[৬২]

এই ধনঞ্জয় মালতীর সঙ্গে ভাগ্নে মানিকের মেলামেশাকে আদৌ পছন্দ করে না। অথচ তিন দিন ধরে কচুসিদ্ধ খাওয়ার পর মালতী যখন মরিয়া হযে বাইরে বেরিয়ে কিছু অন্নযোগাড় করে ফেরে, তখন ফেরার পথে দেখা হয় ক্ষুধার্ত মানিকের সঙ্গে। কিন্তু সে সময়ে জৈবিক দেহলালসার ক্ষুধা বড নয়, বড হয় পেটে খেয়ে বাঁচার বাসনা। তাই তারা দুজনেই সামান্য ভাত নিয়ে কাডকাডি আরম্ভ করে। ধনঞ্জয়ের এই দৃশ্যে চাপা প্রশান্তি কাজ কবে মনের গভীরে। কিন্তু কাডাকাডির মধ্যে সাদা যুঁইফুলের মত যে ভাতগুলি মাটিতে পডে থাকে, সেগুলির দিকে তাকিয়ে ধনঞ্জয়ের চোখে আসে জল। ধনঞ্জয় চরিত্রের হাসি-কান্নার থেকেও বড কথা, লেখক মন্বন্তরের অসীম ক্ষুধাকে যুবক-যুবতীর অ-সম ক্ষুধার থেকেও বড কবে মন্বন্তরের করুণ ছবিকেই স্পষ্ট করেছেন এ গল্পে। মানিক-মালতীর সম্পর্কের যে উত্তরণ তা যেন মদনভস্মের পরের পবিত্র নবজন্মের স্বরূপ।

'মদন ভস্ম' গল্পে মন্বন্তর মানুষের জীবনকে ন্যায়-নীতিনিষ্ঠ বড জীবনের শিক্ষা দিয়েছে, কিন্তু 'রূপান্তর' (বঙ্গশ্রী, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪) গল্পের শাশুডি হেমাঙ্গিনীকে বৌ সরমা ও নাতি নাতনীদের অভিমানে সংসার ত্যাগ করিয়ে লেখক একটি ভাবপ্রবণ মনের নিখুঁত আলেখ্য আঁকতেই বেশী মনোযোগী হয়েছেন। এ গল্পেও হেমাঙ্গিনী গ্রামের ছেলের সহায়তায় অনাথ আশ্রমে গিয়েও শোনে দুর্ভিক্ষের কথা। অনাথ বালকদের সেবার মধ্যেও মনে পড়ে বৌমা সরমার কথা, তাব অসহায় নাতি নাতনীদের কথা—যাদের ছেডে তার নিরুদ্দিষ্ট পুত্র শ্রীপতি অনেক আগেই সন্ন্যাসী হয়েছে। আবাব হেমাঙ্গিনী এমন চরম মহামন্বন্তরে পর্যুদস্ত পুত্রেব সংসারে টাকা পাঠিয়ে তার স্নেহার্দ্র মানবিক হৃদয়ের পরাকাষ্ঠা দেখায়। সংসার ভাঙে ব্যক্তিগত রাগে, মান-অভিমানে, কিন্তু জুডে যায় মন্বন্তরের অ-মানবিক আঘাতের কারণে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র মন্বন্তবের বাস্তব চিত্র ও নির্মম প্রহারের রূপচিত্র আঁকার থেকে তাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিমনের কিছু সেন্টিমেণ্টাল সূক্ষ্ম ভাবাদর্শেব কথাকেই শিল্পরূপ দিতে আগ্রহী। 'মদনভস্ম' গল্পটির মত 'রূপান্তর' গল্পটিও তা প্রমাণ করে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'বীভৎস' গ্রন্থের 'হাড' গল্পে এক নিপুণ মন্বন্তরের চিত্রের মধ্যে একদিকে ধনী আর একদিকে সর্বহারা বুভুক্ষু মানুষ—দুয়ের সমাবেশ ঘটিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন মন্বন্তর-যন্ত্রণার জীবন্ত রূপ এঁকেছেন। বালিগঞ্জে মনোহরপুকুর রোডের রায় বাহাদুর এইচ. এল. চ্যাটার্জীর বাড়িতে মনোরম বিলাসে সাজানো পুরনো সব হাড়ের যে সৌন্দর্য ও রহস্য-মায়া, তার মর্ম রাস্তার ডাষ্টবিনে ভিড করা বুভুক্ষুদের

পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তারা পেটের ক্ষুধা মেটাতেই হাড় চোষে। মন্বন্তর মানুষেরই সৃষ্টি। যারা স্রষ্টা তারা তো এই রায় বাহাদুরের দল, ধনতন্ত্রের ধারক ও বাহক তারাই। তাদের জন্যই সারা ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে ঢাকা কলকাতা জুড়ে সর্বহারাদের সমাবেশ :

'বুভুক্ষুর কলোনি বসেছে সেখানে। নগরীর নির্মল স্ফটিক জলে জোয়ারের বানে ভেসে আসা একরাশ দুর্গন্ধ আবর্জনা। চীৎকার করছে, কলহ করছে, পরস্পরের মাথা থেকে উকুন বাছছে, জানোয়ারের মতো ঝুঁকে পড়ে কালো জিভ দিয়ে খাচ্ছে হাইড্রেনের ময়লা জল ?'[৬৩]

রায়বাহাদুরের কাছে যে সব হাড় বিলাসের সামগ্রী, বুভুক্ষুদের কাছে তা-ই পরম ও চরম খাদ্য :

'কাঠির মতো হাত-পা আর বেলুনের মতো পেট-ওয়ালা একটা ছোট ছেলে দুহাতে কী চুষছে প্রাণপণে। হাড ? হাঁা, হাড়ই তো।'[৬৪]

রায় বাহাদুরের বহু অর্থে সাজানো স্বপ্নপুরী থেকে বেরিয়ে গল্পের উত্তমপুরুষ কথকের কাছে এমন দৃশ্য দেখার ঘটনা সম্পূর্ণ অন্য এক ভাবনায় নিয়ে যায়, নিমগ্ন করে ধনতন্ত্র ধ্বংসকারী এক অমোঘ শক্তিকে অভিনন্দিত করার চিন্তায়, এক অমোঘ মন্ত্রকে গ্রহণ করার তীব্র তীক্ষ্ণ বলিষ্ঠ বাসনায় :

'ওই কালো আকাশের রং আগুনের মত লাল হয়ে উঠবে কবে, এই ম্যালেরিয়ার গন্ধজড়িত মিঠে হাওয়ায় ঝড়ো আগুনের ঝলক লক্ লক্ করে বয়ে যাবে কবে ?

হাড় ওরা পেয়েছে, কেবল মন্ত্র পাওয়াটাই বাকী।'[৬৫]

কঠিন মন্বন্তরের কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নায়ক যে কথা চিন্তা করে, তার ধনতান্ত্রিক শ্রেণীবৈষম্যচকিত পরিবেশ ও ইতিপূর্বে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে জাত স্বতঃস্ফূর্ত এক পরিশীলিত সুস্থ জীবন-উপলব্ধির দলিলের মত।

তিন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে রচিত একাধিক ছোটগল্পে যেমন মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ তথ্য ও সত্যের সঙ্গে শিল্পের সততা সমন্বিত করে বাংলাদেশের সে সময়ের কথাসাহিত্যিকরা তাঁদের শিল্পের দায়িত্ব পালনে সনিষ্ঠ ছিলেন, তেমনি উপন্যাসের ব্যাপক পটভূমিকায় নানাভাবে মন্বন্তরকে ব্যবহার করায় ছিলেন তৎপর। ক্ষমতাবান কথাকার তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র 'মন্বন্তর' নাম দিয়েই যেমন একটি সুবৃহৎ উপন্যাস লিখেছেন এবং তার মধ্যে সমকালীন মন্বন্তরকে কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র ও বক্তব্যে ওতপ্রোত রেখেছেন তেমনি আবার জ্যোতির্ময় রায় প্রমুখ অল্প ক্ষমতাবান কথাসাহিত্যিক প্রয়োজন মত কখনো

পটভূমি হিসেবে, কথনো বা চরিত্র-ন্যায়ে, আবার কথনো কাহিনী ও ঘটনার তীব্র গতিময়তায় ও তাৎপর্যে মন্বন্তরকে নিজেদের ক্ষমতাব সীমবদ্ধতার মধ্যে কিছুটা শিল্পের সংযমে গ্রহণ করতে সচেষ্ট থেকেছেন।

জ্যোতির্ময় রায় সে সময়ে তাঁর অতি জনপ্রিয় 'উদয়ের পথে' উপন্যাসের আরম্ভই করেছেন ঐতিহাসিক তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তবের তথ্যভিত্তিক সত্যছবি উপহার দিযে :

'তেরশ পঞ্চাশ। শতকার্ধের শেষভাগে বাংলার দেশজোড়া দুর্ভিক্ষের ব্যাধি কুৎসিৎ আর উৎকট হয়ে ফুটে উঠেছে প্রতি শহরে আর নগবে। কলকাতার পথে পথে তথন অভুক্ত মানুষ আবর্জনার মতোই এথানে ওথানে জমে রয়েছে। একদিকে কংকালসার নগ্নপ্রায় অসংখ্য নবনারীব আর্তনাদ, অন্যদিকে ধনস্ফীতির নির্লজ্জ বিকাশ—দুই এসে দাডিযেছে পাশাপাশি। নগরেব এই পটভূমিকায একথানা বিরাট গাড়ি এগিয়ে চলেছে বড বাস্তা ধরে।'[৬৬]

উপন্যাসের শুরুর এই চিত্র অবশ্যই উপন্যাসের পববর্তী অংশে গভীবতম কোন শিল্প ও জীবনশিল্পেব দাবীতে প্রধান স্থান নেযনি। লেথক মহামন্বন্তরের এই পটভূমিতেই এই উপন্যাসে দেথিয়েছেন একদিকে সদ্য গড়ে-ওঠা ধনী, আব একদিকে দরিদ্র—দুয়েব তীব্র বিরোধের চিত্র। সেই বিরোধ-চিত্রে মন্বন্তবের প্রত্যক্ষ চিত্রের থেকে প্রাসঙ্গিকতাই কাহিনীর মধ্যে কিছু গতিময়তা সৃষ্টি করে।

উপন্যাসের মূল কাহিনী বাস্তাব হা-অন্নের মানুষগুলির মধ্য থেকে উঠে-আসা কোন নায়কের কেন্দ্রে থাকেনি, একটি মধ্যবিত্ত পরিবার একেবারে নিম্নবিত্তের স্তরে নেমে যাচ্ছে. তারই মধ্যে থেকে উঠে আসে নায়ক অনুপ বসু—যে এক বিরাট ধনীর প্রতিস্পর্ধী চরিত্র। এমন নায়ক চরিত্র আঁকতে বসে লেথক চরিত্র-ন্যায়ের ভিত্তিতে বেথেছেন নায়কের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষগুলির জন্য অতি অন্তরঙ্গ সহমর্মিতাবোধ। চাকরী যথন নেই, অথচ বাড়িওলা শ্রীকণ্ঠবাবুর যথন অশালীন তাগাদা তাকে বিরক্ত করে, তথনি অন্তর্জ্বালায় সে অস্থির হয়। এমন অস্থির মানসিকতার বর্ণনায় লেথক তার চরিত্র-পরিচয় এঁকেছেন মন্বন্তরের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করে :

'সকাল থেকে সমস্ত দিন তার কেটে যায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের পেছনে। অন্নের নামে অথাদ্য বিলিয়ে, শুশ্রূষার নামে শেষ কৃত্য করে বাড়ি ফিরতেই অনেক রাত হয়ে যায়।......ঘরবাড়ী ছেড়ে আজ যারা পথে নেমে এসেছে, ঘরে তারা ফিরবে না—দানের অন্নে অসংখ্য এই অভুক্তদের বাঁচানো যাবে না—অনুপের এ বিশ্বাসে কোন দ্বিধা নেই। তবু এই ব্যর্থতার পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম সে করে চলেছে—উপায় নেই, এ হল মানুষের প্রতি মানুষের শেষ কর্তব্য। যারা মরতে বসেছে তারা মরবেই—যারা বেঁচে রইলো,

নিজেকে মানুষ বলে মনে করার মতো খানিকটা সম্বল তাদের হাতে থাকা দরকার।'[৬৭]

মন্বন্তরের সঙ্গে নায়ককে যুক্ত করে লেখক নায়কের মানসিকতা ও কর্মতৎপরতায় একটি মানবতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট। এই উপন্যাসে মন্বন্তর পটভূমি মাত্র যদিও, তবু নায়ক ব্যক্তিগতভাবেও মন্বন্তরের অভিশাপে অস্থির :

'চালের মন চল্লিশে উঠেছে—উঠেছে বস্তুকে অবলম্বন করে নয়, দরটা উড়ছে যেন নিছক হাওয়ায়। এর চেয়ে বেশি দাম দিলেও বস্তু মিলবে তার কোন কথা নেই। অনুপ বিশেষ করে এ সব ব্যাপারে মোটেই করিৎকর্মা নয়, তাই আজ তার বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে নি। হতাশ হয়ে অবশেষে আপিসে এসেছে সে খানিকটা পাঁউরুটি আব চা গিলে।

বুভুক্ষিতদের বীভৎস চিত্রে আর চীৎকারে চোখ কান তার অভ্যস্ত হযে গেছে, আজকে যেন সেগুলো আবার নতুন করে তার স্নায়ুতে দাগ কেটে বসেছে। মর্মন্তুদ চীৎকারগুলো কেবলই কানে বাজতে থাকে, ছবির পর ছবি চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যায়। এখনো যারা একেবারে পথে নেমে পড়েনি তাদের ঘরের স্ত্রীলোকেরা দীর্ঘ রেখায় সাব বেঁধে দাড়িয়ে বা বসে আছে এক মুঠো চালের আশায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের থাকতে হবে। অপেক্ষা বিনোদন করতে একে অন্যের রুক্ষ কেশ আর শতছিন্ন পরিধেয় থেকে বসে বসে উকুন বাছে। দিন শেষে শেষের লোকগুলোকে হয়তো ফিরতে হবে খালি হাতে। তারপর অভুক্ত অবস্থায় চালের সেই লাইনে শুযে ফুটপাথে বাত্রি যাপন।'[৬৮]

অনুপের অভিজ্ঞতার এই মন্বন্তরের চিত্র যুদ্ধ-সমকালীন পরিবেশের এক উজ্জ্বল, সত্য তথ্যেরই স্পষ্ট উচ্চাবণ।

'উদয়ের পথে' উপন্যাসেই লেখক নায়ক অনুপের সংলাপে স্পষ্টভাবে এঁকেছেন মানুষেরই সৃষ্টি-করা মন্বন্তরের রূপকে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ নয, মহামন্বন্তরের সমস্ত মানুষের সুখ-দুঃখই একমাত্র সত্য এবং সুস্থ মানবতা প্রতিষ্ঠার একমাত্র ক্ষেত্রও। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' নামের বিখ্যাত গল্পটিতে ব্যক্তিগত দুঃখকে বিশ্বজনীন করেছেন মন্বন্তরে বিধ্বস্ত মানুষগুলির মধ্যে নায়ককে একেবারে রক্তের আত্মীয়তায় মিশিয়ে দিয়ে, যদিও সেই শিল্প-ক্ষমতা ও বড় জীবন-দর্শনে নয়, তবু জ্যোতির্ময় রায়ের উপন্যাসের নায়কের ভাবনাও তারই অনুপন্থী। বোন সুমিতা কলেজের বান্ধবী ধনীকন্যা গোপাদের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ-বাড়ি থেকে তার বৌদির ব্যবহারে অপমানিত হয়ে বাড়ি ফিরে এলে, তার অপমানে কালো মুখ-চোখ দেখে অনুপ যা বলে, তা তার নিজের জীবনেরই আদর্শ, মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে বড় মানবতার শপথ গ্রহণের মত :

'মানুষের হাতে গড়া এই যে এত বড একটা দুর্ভিক্ষ—লক্ষ লক্ষ স্ত্রী পুরুষকে নগ্ন করে পথে টেনে এনে তিলে তিলে না খাইযে মারছে—দয়ার নামে অখাদ্য খাইয়ে উপহাস করছে—মানুষেব হাতে মানুষের এত বড অপমানের তুলনায় আমাদের ব্যক্তিগত এ অপমান তো অতি তুচ্ছ। কাঁদবাব মতো হালকা দুঃখের বিষয এটা নয় সুমিতা—আমাদের চোখ আছে। সে চোখ জলে ঝাপসা করলে চলবে না। তাকে শুকনো রেখে পথ চিনতে আব চেনাতে হবে।'[৬৯]

গোপাল হালদার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের একজন মননশীল কথাসাহিত্যিক। তাঁব 'ঊনপঞ্চাশী' নামের উপন্যাস দিয়ে শুরু করে পরবর্তী 'পঞ্চাশের পথ' ও 'তেরশ পঞ্চাশ' উপন্যাস দুটিতে মহামন্বন্তরের এক যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন তথ্য ও সত্যেব যাথার্থ্যে। কিছুটা সাংবাদিকতা, কিছুটা উপন্যাস শিল্পেব মিশ্রণে এই ত্রয়ী নতুন রীতির উপন্যাসে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণত বৈজ্ঞানিক। 'উদয়ের পথে'র লেখক জ্যোতির্ময রায় মন্বন্তরের কোন ঐতিহাসিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তিকে উপন্যাসে আদৌ গ্রহণ করেন নি, চরিত্রগুলির কার্য-কারণ শৃঙ্খলায় আত্মার অধিগত করেন নি, বলা ভাল, করতে পারেননি মন্বন্তরের অভিঘাতকে। সেখানে চরিত্রদেব সেন্টিমেণ্টাল বাকসর্বস্বতায় মন্বন্তরচিত্র উপরিতলভিত্তিক (Superficial) অস্তিত্ব মাত্র হযে উঠেছে। সেক্ষেত্রে গোপাল হালদার মন্বন্তব-আক্রান্ত একটি যুগের দুর্যোগকে কথাসাহিত্যে গ্রহণ করতে গিযে শিল্পেব সততায় অনেকাংশে ঐতিহাসিক সত্য-ভাবনা এবং নিষ্ঠাকে নিখুঁত চিত্রে বজায় বেখেছেন। করুণ, আবেগধর্মী, ভাবপ্রবণ কোন চিত্র নয়, মূলত গ্রাম বাংলা ও রুক্ষ শহরের ব্যাপক মন্বন্তবের সত্য-স্বরূপই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

'পঞ্চাশের পথ' উপন্যাসে নায়ক ডঃ বিনয মজুমদাব সোনাপুব এসে বীরুদের বাজনৈতিক কর্মী বাঙ্গ আম্মাব সঙ্গে পরিচিত হয। সেখানেই বিনয়কে বলা বাঙ্গ আম্মার একটি যুক্তিহীন ভারহীন উক্তির মধ্যে যুদ্ধের কথা এবং সেই সূত্রে রুদ্ধশ্বাস মন্বন্তরের কারণে সর্বহারাদের আগামী দিনে চরম অসহায়তাব ইঙ্গিত আছে :

'সেই আজিজকে চেনো ?—চলে গেছে জাহাজের কাজে, খেতে পাবছে না, জাহাজের কাজে গেছে। লডাইর খবর জিজ্ঞাসা করেন বাঙ্গ আম্মা। 'দুনিয়ার লড়াই চলছে—গরীবকে মারছে, সবাই মিলে মারছে। জমি চাষ করে, ফসল করে, খেতে পায় না গরীবই কিন্তু। মরবার বেলা তবু তাদেরই পড়ে প্রথম ডাক।'[৭০]

উপন্যাসের নায়ক বিনয়। গ্রামের সাধারণ-অসাধারণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সমস্ত মানুষের কথা তাকে নাড়া দেয়। বর্মা ফেরত ডাক্তার বিনয়। সেখানকার প্রত্যক্ষ যুদ্ধের

ভয়াবহতা, সাধারণ মানুষের যুদ্ধ ভয়ে সব কিছু ছেড়ে অমানবিক পরিবেশে পলায়ন, অসহায়তা, ক্ষয়ক্ষতি, মৃত্যু—এসব তার অভিজ্ঞতায় এসেছে। সেই অভিজ্ঞতার মধ্যেই বাংলাদেশের পূর্ববাংলার একটি গ্রামের মধ্যে, কখনো বা চব্বিশ পরগণার চাষীদের ভিড়ের মধ্যে মহামন্বন্তরের বিরোধী শক্তিকে অন্বেষণ করে। লেখক গোপাল হালদার নায়ক বিনয়ের আত্মোক্তিমূলক চিন্তার মধ্যেই বাঙ্গ আম্মার আগামী দিনের দুর্ভিক্ষের কথায় নায়কের সত্যদর্শনের দিক নির্দেশ করেন :

'বিনয় যেন আপনার মনে তাই বুঝতে পারছে—এ কথার পিছনে আছে এ দেশের মা আর এ দেশের মাটি। কিন্তু বিনয় বুঝতে না পেরে নিজেকে জিজ্ঞেস করলে—এই ভাষাই কি সকল দেশের মায়ের আর সকল দেশের মাটির ?'[৭১]

'তেরশ পঞ্চাশ' উপন্যাসের প্রথমেই লেখক মন্বন্তর শুরু হওয়ার ইঙ্গিত রেখেছেন। পূর্ব বাংলার সোনাপুর থেকে সীতার চিঠি এসেছে বিনয়ের কাছে। সেই চিঠির মধ্যেই বিনয়কে সে জানিয়েছে মন্বন্তরের কথা :

'জানিয়েছে সোনাপুরের মানুষের দুর্দশার কথা—মানুষ খেতে পায় না, পরতে পায় না, ইস্কুলে-কলেজ বোধ হয় বন্ধ হয়ে যায়। ভুখ-মিছিলও শুরু হয়েছে।'[৭২]

গোপাল হালদারের উপন্যাসে মন্বন্তরের পটভূমি তৈরী হয়েছে ধীরে ধীরে ঘটনাবিহীন শান্ত কাহিনীর ভিতরে অন্তঃশীলভাবে। 'তেরশ পঞ্চাশ' উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন চাষীদের ক্রমিক অসহায় রূপ। কঠিন অভাবের মুখে একসময় তারা সমস্ত ধান চাল বিক্রী করতে বাধ্য হয়। তারা ফসলের জন্য বীজধানও রেখে দেয়নি। এই অবস্থায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুটা অভিজ্ঞ বিনয় প্রমথকে জিজ্ঞেস করে :

'কি বলেন, সত্যই কি দুর্দিন এল দেশে ?

প্রমথ বললে—দুর্দিন নয়, ডাক্তারবাবু,—দুর্ভিক্ষ, দুর্ভিক্ষ।

বিনয় নিজে থেকেই উচ্চারণ করলে—দুর্ভিক্ষ।

প্রমথ বললে—দুর্ভিক্ষ এসে গেছে প্রায়। আর দেরী নেই—সবে পৌষ মাস এখনি ধান নেই, চাল নেই, দেশে তেল নেই, নুন নেই, দেশলাই নেই, কয়লা নেই, কাপড় নেই—কিছু নেই—নেই, নেই, নেই—'[৭৩]

প্রমথর উক্তির মধ্যে দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশের মাটিতে জমিয়ে বসার স্পষ্ট ইঙ্গিতটুকু লক্ষ্য করার মত। চরিত্রের সংলাপে লেখক দুর্ভিক্ষের ন্যায়সঙ্গত দেখা দেওয়ার দিক উল্লেখ করেছেন।

নায়ক বিনয় নিজের মধ্যেই জটিল হয়ে ওঠে দুর্ভিক্ষের চিন্তায়। তার অভিজ্ঞতায় আছে বর্মা মুলুকের নির্মম যুদ্ধের প্রত্যক্ষ রূপ, তার কারণে মানুষের অর্থাভাব, অন্নাভাব,

করুণ মৃত্যুর পরিচিতি। কিন্তু এসবের পাশাপাশি মন্বন্তর কত ভয়াল? কিভাবে কোন দিক থেকে তার আক্রমণ ঘটে মানুষের ওপর? সুধা ও অমিতের সম্পর্কে ভাবতে বসে বিনয় দুর্ভিক্ষ-ভাবনায় সপ্রশ্ন হয়ে ওঠে নিজের মধ্যেই:

'বিনয় যেন ভাববার মত একটা নতুন রহস্য পেল। 'তোমরা দেখেছ জাপানের বোমা, আর দেশে আসছে দুর্ভিক্ষ।' দুর্ভিক্ষ! কি তার পাপ? কি তার আয়োজন—বিনয় ভাবতে লাগল। যুদ্ধের একটা ছায়ারূপ সে দেখেছে—সে চেনে। অভাব ও মৃত্যু দেখেছে বর্মার পথে—দুর্দিন। কিন্তু কি সে ছায়াময় মূর্তি—দুর্ভিক্ষ?'[৭৪]

'তেবশ পঞ্চাশ' 'উপন্যাসের শেষে লেখক বিনয়কে নিয়ে এসেছেন কলকাতায়। কলকাতায় তখন চারপাশে হা-অন্নের নির্মম ছবি। পথে পথে গ্রাম-ছেড়ে-আসা মানুষ, তার পরিবার ক্ষুৎকাতর হয়ে ঘুরে বেড়ায়, নিজেদের বিকিয়ে দেয়, অবহেলায় উপেক্ষায় মরে। এমন সর্বহারাদের ভিড়ে ধনীর কলকাতা শ্মশানের রূপ নেয়। তারই মধ্যে বিনয় দেখে সোনাপুর থেকে আসা, কখনো বা চব্বিশ পরগণা থেকে আসা কিছু পরিচিত মানুষ। স্মৃতিতে ধরা গ্রামের যতীনদার প্রশ্নে হা-অন্নের মানুষগুলির মধ্যে বিনয় নানা বিচিত্র খবর পায়:

'—চেনো যতীনদাকে?—নিকটে এগিয়ে এল সেই পুরুষটি সাগ্রহে—সোনার মানুষ—রইল না। তাই তো আমরা মানাব।

বিনয় সবিস্ময়ে বললে, কি হয়েছিল?

—ক্ষয় কাশ। এই বোশেখ মাসে গেল—নইলে এ দশা হয়।

—দুর্গা কই? হারু মোল্লা?

—চেনো তাদের? হারু এলো না। বলে—'শুকিয়ে মরব, তবু মরব আমাদের এ গাঁয়ে, বাঁচি, ফসল ফলবে, বাঁচব, আমি হারুমোল্লা, আমি যাব ভিক্ষা করতে শহরে—জমিদারের কাছে মাথা নোয়াই নি।' দুর্গাই বললে, 'কলকাতার বাবুরা ভাত দিচ্ছে। কাপড় দিচ্ছে। চলো।' কোথায় দুর্গা, কদিন পরে ঠিকও নেই—জ্বরে পড়েছিল।

সেই দুর্গা—চিরদিনের আধপাগলা দুর্গা, কৃষক সভা বুঝত। বিনয়ের মাল বয়ে নিয়েছিল সেবার।'[৭৬]

লেখক বিনয়ের সামনে যে মন্বন্তরে আক্রান্ত কৃষকদের ছবি এনেছেন তা নিরাসক্ত ছবি। নিষ্ঠুর মন্বন্তরের কথায় কোনো আবেগ, কোন করুণা বা মায়া লেখক এসব সংলাপে বসান নি। এই সমস্ত সংলাপ থেকেই আমরা ধরতে পারি মন্বন্তরের কালো ছায়া, আর তার অমোঘ নিয়তি-নির্দেশক ইঙ্গিত।

মনোজ বসু 'সৈনিক' উপন্যাসে মন্বন্তরের চিত্র শিল্প-ন্যায়ে আঁকতে বসে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উল্লেখ করতে ভোলেন নি। গ্রামে রঞ্জনের বাড়ি পান্নালাল আশ্রয় নেওয়ার পর রাতে সেই দুর্যোগের পরিবেশ ভয়াবহ রূপ নেয়:

'বাতাসের দাপটে বিষম জোরে জানলা খুলে গেল।

লীলা ডাকছেন, ত্রস্তকণ্ঠে প্রাণপণ চেঁচাচ্ছেন, সর্বনাশ—বাইরে এস গো। বান ডেকেছে—

বেরিয়ে দেখে, সে কি প্রলয় দৃশ্য, বাঁধ ভেঙেছে। রাত্রির অন্ধকার বিচলিত করে প্রমত্ত বেগে স্রোতের পর স্রোত আসছে। হাহাকার শোনা যাচ্ছে নিকটে দূরে।

রঞ্জন হতভম্ব হয়ে ছিল মিনিটখানেক। লীলার আর্তনাদে তার সম্বিত ফিরল।

দাদুর কি করবে কর শিগগির। সময় নেই।

রঞ্জন বলে, চলে আয়, নে পানু। আমার কাঁধে ওঁকে তুলে দিবি। বাহাদের দোতলা বাড়ি—সেখানে নিয়ে তুলব?

আর জিনিষপত্তোর, গরু-বাছুর?

লীলা আর দিদি যা পাবেন করবেন। আয়—আয় তুই—

সজোরে সে হাত ধরে টানল পান্নালালের।

উঠোন দিয়ে দ্রুত ছুটেছে। হাঁটুজল এরই মধ্যে।'[৭৬]

এমন দুর্যোগে যে বিশাল ধ্বংস নামে জনজীবনের দৈনন্দিন অভ্যাসে, পান্নালালের কাছে সে দৃশ্য অসহনীয়। লেখক নায়কের সেই তাৎক্ষণিক মানসিকতায় দুর্যোগের ভয়াবহতা আরও প্রকট করেছেন এই ভাবে:

'সকালের আলোয় যে দৃশ্য দেখল, তাতে পান্নালালের আর তিলার্ধ থাকতে ইচ্ছে করে না এ অঞ্চলে। কিন্তু পালাবে কি করে? সাঁকো পুল সমস্ত ভেসে গেছে, এত গাছ উপড়ে পড়ছে যে অসম্ভব রাস্তায় চলাচল করা। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধন ছিঁড়ে গেছে এই অঞ্চলের। আশ্রয় নিতে এসেছিল রঞ্জনলালের বাড়ি, সে বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই।······

সাইক্লোনে উজাড় হয়ে গেছে দেশ—দেশান্তর বিশেষ করে মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণার বহু অঞ্চল। ঘর-বাড়ি খাদ্য বস্ত্র-খাবার-জল পর্যন্ত নেই। অথচ খবরের কাগজে না রাম না গঙ্গা—টুঁ শব্দটি হচ্ছে না এত বড় সর্বনাশের। দু'সপ্তাহের পরে একটু আধটু বেরুল। এ নাকি সামরিক সতর্কতা। শোনা গেল, একদল সেবাব্রতী গিয়ে নাজেহাল হয়ে ফিরে এসেছেন, থানায় আটকে রেখেছিল—'বাপ' 'বাপ' বলে ফিরতি টিকিট কিনে বাঁচেন তাঁরা। গরু, ছাগল আর মানুষের মৃতদেহ পচে দুর্গন্ধ হয়েছে,

শিয়াল শকুনে খেয়ে শেষ করতে পারছে না। নৌকাগুলোও থাকত যদি এ সময় কত লোক ভেসে বেড়াতে পারত, কত পরিবার বাঁচত।

পান্নালাল পালাচ্ছে। স্টেশনের সেই মেয়েটির মুখ মনে পড়ে, পালাল—ছুটে পালাল জোর পায়ে—এখন সে পালাচ্ছে পুলিশের ভয়ে নয়। শ্মশানের বিভীষিকা চোখের উপর। রাতে ঘুম নেই, আকাশ-বিদারী আর্তনাদ ঘুমুতে দেয় না। সেই রাত্রে যা শুনেছিল, কানের কাছে তাই যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় রাত্রি হলেই। ভাতের থালার সামনে বসে মনে পড়ে যায়, অর্ধেক শিয়ালে খাওয়া উলঙ্গ-দাঁত শবগুলি—মাঠে-ঘাটে খানাখন্দে—যা পড়ে থাকতে দেখছে। মুখে আর ভাত তুলতে পারে না।'[৭৭]

যুদ্ধ-সমকালে যুদ্ধের কারণে যে ভয়ানক মন্বন্তরের ছায়া নামে বাংলাদেশের শহরে শুধু নয়, গ্রামে-গঞ্জে, সুদূর সুন্দরবন অঞ্চলেও—যেখানে খাদ্যের কোন অভাব থাবার কথা নয়—সেই চিত্র এঁকেছেন মনোজ বসু তাঁর 'সৈনিক' উপন্যাসেও। শহর থেকে গ্রামে মন্বন্তরের ছায়া নামে ধীরে ধীরে। শহরের মানুষ বোমার ভয়ে শহর ত্যাগ করে গ্রামে আশ্রয় নিয়ে নিজের খাদ্য সংগ্রহের ও মজুত-করার লোভ ও স্বার্থপরতাকে কমায়নি। বিখ্যাত ধনী হরিহর রায়ের অনুগত বউডুবির হাটখোলার ভূষণ দাস আর এক মজুতদার। তার সঙ্গে বৃদ্ধ চাষী দ্বারিক সর্দারের যে অন্ন-সাহায্য-ভিক্ষার অসহায় কথোপকথনের চিত্র এঁকেছেন লেখক, তার মধ্যে আসন্ন মন্বন্তর—যা বাংলাদেশের সচ্ছল গ্রামকেও একদিন গ্রাস করবে—তার পরোক্ষ ইঙ্গিত আছে :

'দ্বারিক সর্দারের মতো মানুষ হাত জোড় করে সামনে দাঁড়াল।

দিতেই হবে। তোমার ভাল হবে দাস মশায়। শলি-খানেক অন্তত ধান দাও আমাদের। তোমার অনেক আছে।

ভূষণ দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। অনেক আছে? কোন শালা রটাচ্ছে এসব কথা? বদনাম দিয়ে বাড়ি ছাড়া করবে আমায়।

খপ করে দ্বারিক তার হাত চেপে ধরে। আবার পা ধরতে যায় দেখে ভূষণ পা তুলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল।

দ্বারিক বলে, কত যত্নের ঘর আমার। বাদা থেকে কাঠ আনা, দক্ষিণি কারিগর এনে খুঁটির উপর শাল তোলা, দেখেছ তো—কত বছর লেগেছিল ঐ ঘর বাঁধতে, সমস্ত ভেঙে-চুরে নিয়ে এসেছ তুমি। আমার বাগান নাও, পুকুর নাও,—ভাদ্র আর আশ্বিন এই দুটো মাস কেবল চালিয়ে দাও ভূষণ। বুড়োমানুষ—বলছি, তুমি রাজ্যেশ্বর হবে, ছাইমুঠো ধরলে সোনামুঠো হবে আমাদের আশীর্বাদে।'[৭৮]

হা-অন্নের জন্য যে মানুষগুলি গ্রামের মজুতদার, ধনীদের কাছে অন্নভিক্ষা চেয়েও

পায়নি, এবং ক্রমশ যখন গ্রামেও দেখা দিল তীব্র অভাব, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মোকাবিলা করার মত গ্রামবাসীদের মানসিক নৈরাশ্যজনক অবস্থা, তখন গ্রামের মানুষই শেষতম সংগ্রামে পরাজিত হয়ে গ্রাম ছাড়তে থাকে। যুদ্ধ-ভয়ে ভীত মানুষ ছেড়েছিল শহর, এসেছিল গ্রামে, আর অন্নাভাবে ও বস্ত্রাভাবে করুণ অসহায় ভীত মানুষগুলি গ্রাম ছাড়ে, বাস্তু-ভিটার মায়া ত্যাগ করে চলে শহরের দিকে। এই দৃশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের গ্রাম বাংলার নিষ্ঠুর সত্য তথ্য। মনোজ বসু সেই অসহায় মানুষগুলির আর এক ছবি এঁকেছেন :

'নিশুতি' গ্রাম শ্মশানের মতো। ভূষণ, বিনোদ আর বহু ছেলেমেয়েরা চলেছে। দিনমানে যাওয়া যায় না, দশকথা উঠবে, দশ রকম জবাব দিতে দিতে হিমসিম হতে হবে। লোকে চোখ ঠারাঠারি করবে, ভূষণ দাস আর কাজিপাড়ার সখিনা বিবিতে তা হলে তফাতে রইল কোনখানে?

বাঁকাবড়শি গ্রামের ভিতর এসে মনে হল, সাঁ করে কারা আমবাগানের ছায়ার অন্ধকারে সরে গেল।

বিনোদ চড়া গলায় প্রশ্ন করে, কে?

জবাব নেই। ভূষণ বলে, চল-চল। ছ্যাচোড় হবে হয়তো। বিনোদ তবু হ্যারিকেন উঁচু করে কয়েক পা চলল সেইদিকে।

মতিরাম যেন! কি হচ্ছে ওখানে?

মতি বলে, গাঁ ছেড়ে চললাম—

চলবে তো রাস্তা দিয়ে—জঙ্গলের মধ্যে কেন?

মতি এগিয়ে এল খানিকটা।

যাচ্ছিলাম। তা মেয়ে দুটোও যাচ্ছে কিনা, তোমাদের দেখে সরে দাঁড়াল।

ভূষণ আশ্চর্য হয়ে বলে, রাত্তির বেলা এই ঘুরঘুটি অন্ধকারে মেয়েছেলে নিয়ে যাচ্ছ?

দিনমানে যাব কি করে?

নিজের পরনের কাপড়ের দিকে তাকাল মতি। পরিধেয়ের যে অবস্থা—পুরুষমানুষ, বুড়োমানুষ—তার পক্ষেই এদের সামনে হ্যারিকেনের আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা শক্ত। কিছু আর ব্যাখ্যা করে বলতে হয় না।'[৭৯]

এই চিত্রের অনুরূপ আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে আরও করুণ প্রতিবাদী অসহায়তায় লক্ষ্য করি। মানুষের ক্ষুধা সহ্য করার একটা সীমা আছে। সীমা অতিক্রম করলে মানুষ মরে যায়। কিন্তু উৎপীড়িত শোষিত মানুষ ক্ষুধাকে কেন্দ্র করে সবল বিদ্রোহে, বিপ্লবে, গভীরতম ক্রোধে-আক্রোশে সমবেত প্রতিবাদ জানাতেও পিছপা হয় না।

গ্রামে নায়ক মাস্টার মশাই পান্নালালের নেতৃত্বে একসময় তারা ভূষণের বিরুদ্ধে পথে দাঁড়ায়। এমন সমবেত মানুষের ঋজু প্রতিবাদ বস্তুত অন্নহীন, বস্ত্রহীন অসহায় নিরক্ষর মানুষগুলির মহামন্বন্তরের অন্তর্নিহিত বেগ থেকে একধরণের শিক্ষাই :

'রাত্রির আঁধার বিদীর্ণ করে লক লক করছে আগুনের শিখা। ঘরে আগুন দিয়েছে—জতুগৃহ-দাহের অবস্থা হল যে। ঘরের ভিতরেই পুড়িয়ে মারবে। পিছন দরজা খুলে আমবাগানের দিক দিয়ে পালিয়ে যাবে বলে যেই বেরিয়েছে, একজন অমনি ঝাপটে ধরল ভূষণকে—

ছেড়ে দে···দোহাই। পাঁচটাকা দেব···দশ টাকা ··ধর্ম্মবাপ তুই আমার—

টানতে টানতে তাকে নিয়ে এল বাগানের বাইরে। অনেক মানুষ জুটে গেছে—এ মারছে, ও মারছে। ভূষণ হাত জোড় করে, কালীর দিব্যি—ও আমার ক্ষেতে ফলেছিল, ও আমার খোরাকি চাল—

কে একজন বলে উঠল, খোরাকি চাল—তা ওকে চাট্টি খেতে দেতো মা। খা—খা—কত খাবি খা—

ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে ভূষণকে। মুঠো মুঠো চাল এনে ঠাসছে তার মুখে। আর খাবি। খা—খা—

মুখ ভরত্তি, ঠেসে ঠেসে তবু সেই কাঁচা চাল ভরছে মুখের ভিতর। চোখ লাল দম আটকে আসছে। ঘূনিত চোখে এক ভয়াবহ ভঙ্গি করে ভূষণ অসাড় হয়ে গেল।'[৮০]

মহামন্বন্তরের বীভৎস চিত্র সবচেয়ে জীবন্ত ছিল শহর কলকাতাতেই। কলকাতায় তখন খাদ্যের রেশনিং ব্যবস্থা। তা-ও এক প্রহসন। সেই শহরের হা-অন্নের পরিবেশে দলে দলে গ্রাম থেকে মানুষ আসে,ফুটপাথে, গাড়ীবারান্দার নীচে, রাফল্ ওয়ালের গায়ে আড়ালে আশ্রয় নেয়। যুদ্ধের কারণে শহরে ব্ল্যাকআউট, কৃমি কীটের মত পরিত্যক্ত ক্লান্ত বুভুক্ষু মানুষ পথে পথে—কেউ মৃত, কেউ মুমূর্ষু, কেউ বাঁচার জন্য অসহায়ভাবে তৎপর। এর ছবি এঁকেছেন মনোজ বসু তাঁর উপন্যাসের শেষে :

'রাত্রির কলকাতা একেবারে আলাদা। অন্ধকারে যেন নিরালম্ব প্রেতদলের আর্তনাদ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে—

মা, মাগো।··

পথে ঘাটে ধুঁকতে ধুঁকতে দিনভর যারা ডাস্টবিনে উচ্ছিষ্ট খুঁজে বেড়ায়, রাত্রি হলে তাদেরই কংকাল ছায়া টকটকে রাঙা চোখ মেলে আঁধারে যেন মিছিল করে ফেরে সুপ্রিয়র চোখের সামনে দিয়ে।···

·· শহর সত্যিই যেন প্রেতভূমি। প্রথমটা নজরে আসে না, তারপর খানিকক্ষণ

তাকিয়ে আবছা ছায়া মূর্তি দেখতে পাচ্ছে, একটা দুটো নয়···অনেকগুলির যেন প্রেতের মেলা বসেছে। বিনিয়ে বিনিয়ে ডাকছে, মা-মাগো, ফ্যান দাও। একটু খালি ফ্যান। ভাত চাইতে ভরসায় কুলোয় না, ভাত কে দেবে এমন দিনে? অবিরাম চেঁচাচ্ছে, ফ্যান-ফ্যান ফ্যান—'[৮১]

'সৈনিক' উপন্যাসে মনোজ বসু উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে শহর ও গ্রাম বাংলাব্যাপী যুদ্ধের কালো ছায়া, যুদ্ধের ছোটখাটো প্রত্যক্ষ রূপ থেকে ক্রমে মহামন্বন্তরের শহর ও গ্রামব্যাপী বিশাল বীভৎস করাল করোটি-চিত্র উপহার দিয়েছেন। লেখকের সমকালীন সময়-চেতনায় তা শিল্প-সম্মত ও যথার্থ হয়েছে।

গোপাল হালদার তাঁর 'ঊনপঞ্চাশী', 'পঞ্চাশের পথ' ও 'তেরশ পঞ্চাশ'—উপন্যাস-এয়ীর মধ্যে, বাংলাদেশের যুদ্ধ-সমকালীন অন্যতম অভিশাপ মহামন্বন্তরকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সমাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে রেখে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে অভিনব রীতির কথাসাহিত্যের স্বাদ দিয়েছেন। তারাশংকর সমকালে বসে একই বিষয় নিয়ে 'মন্বন্তর' উপন্যাস লিখতে বসে সেই জটিল বৈজ্ঞানিক ন্যায়ে নিজেকে নিবিষ্ট করতে পারেন নি। মন্বন্তর একটি বড় অভিশাপ। তারাশংকর তাঁর এই উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে নিয়েছেন গান্ধীজীর ঐতিহাসিক আগষ্ট আন্দোলন, সর্ববিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের সময়কে অতিক্রম করে ধীরে ধীরে কঠিন কালো রাত্রির অন্ধকার নামার মত মন্বন্তর আসার সময়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে তাঁর 'অশনি সংকেত' উপন্যাসে মন্বন্তরকে সূক্ষ্ম শিল্পের মর্যাদায় গ্রহণ করেছেন, তারাশংকর তা-ও করেননি। নিটোল কাহিনী, সমসাময়িক প্রত্যক্ষ ঘটনা দিয়ে শুধুমাত্র মন্বন্তর আসার কয়েকটি ছবি এঁকেই উপন্যাস শেষ হয়েছে তারাশংকরের। উপন্যাস হিসেবে 'মন্বন্তর' দুর্বল রচনা। লেখকের বড় ক্ষমতার পরিচয় এখানে নেই, নেই কোন মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে বড় জীবনদৃষ্টির (attitude to life) ইঙ্গিত।

তবু 'মন্বন্তর' উপন্যাসের শেষ দিকে কিছু প্রত্যক্ষ চিত্র আছে, যা বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের সত্যরূপ। উপন্যাসের শেষের যে সময় নির্দিষ্ট করেছেন লেখক কাহিনীর মধ্যে তা শহরের বুকে মন্বন্তর নামার সময় নিশ্চয়ই। নেপী সর্বমানবিক আবেগে আদর্শের টানে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলে খাদ্যাভাবে ক্লিষ্ট মানুষগুলির মধ্যে। তারই মানবিকতার কারণে দুটি অন্নক্লিষ্ট মূর্ছিত আহত মেয়ে আসে নীলা-গীতাদের আশ্রয়ে। গীতা তাদের শুশ্রূষা করে, ভীত মেয়ে দুটির অসহায়তার চিত্রে লেখক এনেছেন হা-অন্নের অভিঘাত :

'গীতা বললে—ভয় কি? কাঁদছ কেন? তুমি ভাল জায়গাতেই রয়েছ।

মেয়েটির কান্না তাতে থামল না। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল—আমার চাল?

—চাল ? চাল তো তোমার ছিল না।

—ছিল না। চাল যে নিতে এসেছিলাম। চাল যে আর পাব না।

—না পাও। তোমার জ্বর হয়েছে। চাল নিয়ে কি করবে ?

—ঘরে আমার বাচ্চা আছে। তিনটি বাচ্চা। তারা—কি খাবে ?

—তাদের পাঠালেই তো পারতে ? জ্বর নিয়ে কি আসে ?

—ছেলেরা ছোট। মেয়েটা সোমত্থ। কাকে পাঠাব ?

—মেয়েকে পাঠালেই পারতে।

মেয়েটি ভৎ'সনার সুরে বললে—আপনারা বড়লোকের মেয়ে। গরীবের মেয়ের ললাট জানা। সোমত্থ মেয়ে—কেউযে দাঁড়ালে—ভদ্রলোকে ইসারা করে, বদমাইস গুণ্ডারা যা-তা বলে।'[৮২]

অন্নাভাবে ভেঙে-পড়া মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মর্যাদা কোথায় নামতে পারে, এখানে তারই করুণ ছবি। দুর্ভিক্ষ শুধু মানুষকে প্রাণে মারেনি, তার থেকে অনেক বড়, তার থেকেও অনেক গভীর শিকড় বসিয়েছে অবক্ষয়ের। এমন চিত্রে তারই ইঙ্গিত। গ্রামের মানুষ আসছে শহরে। গ্রামে অভাব থাকার কথা নয়, কিন্তু সেখানেই আগে টান পড়েছে খাদ্যের। একদল সচ্ছল ধনী ও মধ্যবিত্ত মানুষ প্রাণের দায়ে পালাতে থাকে গ্রামে-গঞ্জে। সে পলায়নের মূলে যুদ্ধজনিত বোমাবর্ষণের মৃত্যু ভয়। আর একদল সে ভয় ও গুজবকে অস্বীকার করে শুধু দুটি অন্নের আশায় চলে আসে শহরে। পরিবার ভিত্তিক গ্রাম-জীবন হয় বিচ্ছিন্নতা-আশ্রয়ী শহরজীবনকেন্দ্রিক। লেখক উপন্যাসে নীলার অভিজ্ঞতার চিত্রে তার রূপ দিয়েছেন :

'রাস্তায়, গৃহস্থের দরজায় নিরন্ন মানুষের দল।

নীচে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে কেউ কাতরস্বরে বলছে—মা—মাগো। চারটি ফেন ভাত দাও গো মা। তোমার পায়ে পড়ছি গো। মা—মাগো। মা—। মাগো।

নীলা বের হতেই তার পথ রোধ করে দাঁড়াল তিনটি কংকালসার ছেলে নিয়ে একটি মেয়ে।

—মা, দুটি ভাত। আমার ছেলে ক'টাকে দুটো ভাত দেবা মা ?

নীলাকে দাঁড়াতে দেখে ওপারের ফুটপাত থেকে ছুটে আসছিল আরও একটা দল। জন চারেক।

মোটরের হর্ন শুনে থমকে গেল। দুজন সার্জেণ্ট মোটর বাইকে টহল দিয়ে ফিরছে। একজন গাড়ীর গতি মন্থর করে ভিখারীদের শাসন করে দিলে—এমনভাবে জ্ঞানহীনের

মত ছুটলে চাপা পড়ে মরবি। নীলার মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল। গাড়ী চলে যেতেই তারা ছুটে এল।—দুটো ভাত—একটু ফেন, হেই রাণীমা।

নীলা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললে—ভাতের সময় আসতে পার নি? আর তো নেই!

দুটো এঁটো কাটা দাও মা।

একটা ছেলে ডাস্টবিনের ভেতরে উঁকি মেরে দেখছে।'[৮৩]

উপন্যাসের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে এমন অমঙ্গলের মধ্যেও দুই যুবক-যুবতীর ভবিষ্যৎ সুস্থ জীবন-কামনায় ও আর্তমানুষের সেবার আশায় হৃদয়ের ললিত কোমল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের সময়টুকুতেও কালো ছায়া বাধা দেয়। সে কালো ছায়া একই সঙ্গে যুদ্ধের ও ও মন্বন্তরের। যুদ্ধ ও মন্বন্তর—ভারত তথা বাংলাদেশের বুকে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। একটির সঙ্গে আর একটি নাড়ীর বন্ধনে বাঁধা। মানুষের সৃষ্ট, লোভী শাসকদেরই তৈরী-করা মন্বন্তর হলেও, সাম্রাজ্যলিপ্সুদের নিয়ে-আসা যুদ্ধ হলেও যুদ্ধ ও মন্বন্তর হাত ধরাধরি করে চলে যে কোন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক শাসক-গোষ্ঠী-শাসিত রাষ্ট্রে। বাংলাদেশে তা ই ছিল। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 'মন্বন্তর' উপন্যাসের উপসংহার অধ্যায়ে কানু ও নীলাকে কাছাকাছি রেখে এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায়, সেই দুয়ের যৌথ আক্রমণের স্বরূপ মানব-মানবীর জীবনে কি, তা দেখিয়েছেন:

'আকাশের দূর প্রান্তে প্লেনের শব্দ উঠছে। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ঠিক মাথার উপর দিয়ে ভীষণ কঠিন কর্কশ গর্জন তুলে উড়ে গেল একসঙ্গে দশখানা প্লেন। সকলে চাইলে আকাশের দিকে।

নীচে পথের উপর থেকে ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে ডাক উঠল—ভাত দাও মা চারড্ডি, বাসি ভাত।

নীলা এবং কানাইয়ের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। এ মন্বন্তর শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাসিটা তাদের কাছে অপরাধ বলে মনে হল।'[৮৪]

যুদ্ধ এবং মন্বন্তর দুয়েরই মুখ বিকট-দর্শন রাক্ষসের মত, দুয়েরই স্বভাব জটিল-দেহ অক্টোপাশের মত, দুয়েরই স্থিতিকাল সভ্যতার পূর্ণ বিনাশের ক্ষণ পর্যন্ত। তাই কানু ও নীলার স্বতঃস্ফূর্ত সহজ হৃদয়-মনের হাসি বেমানান, ভয়ংকর অপরাধের।

যে মন্বন্তর বাংলাদেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে মহামন্বন্তর হয়ে ওঠে এগার শ ছিয়াত্তর সালে সংঘটিত ঐতিহাসিক মন্বন্তরের তুলনায়, তা নিঃসন্দেহে মানুষেরই সৃষ্টি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেখানে ঘটনামাত্র। যুদ্ধসমকালীন পরিবেশে যুদ্ধের একান্ত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী মন্বন্তরকে জিইয়ে রেখেছিল,

এই সূত্রে অগণন মানব-প্রাণ-হানিকে অস্বীকার, অবজ্ঞা করতে পেরেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগেও এই বিশ শতকের গোড়ার দিকে মন্বন্তর ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সে মন্বন্তর দেখা দিলেও বিদেশী শাসকদের সেই সূত্রে প্রতিবক্ষার তৎপরতাহীন মূঢ়তার কারণেও বাংলার গ্রাম-মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। এমন মন্বন্তরের রেখাচিত্র আঁকতে ভোলেন নি রমেশচন্দ্র সেন তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে রচিত 'শতাব্দী' উপন্যাসে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হওয়ার আগের প্রায় একশ বছরের বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবন কাহিনীকে লেখার প্রেক্ষিত হিসেবে গ্রহণ করার সময়। 'শতাব্দী' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজেশ্বর নমঃশূদ্র হলেও পরগণা নেপালপুরে গ্রামের প্রধান মণ্ডল সে। সেই সচেতন রাজেশ্বরই প্রত্যক্ষ করে নেপালপুরের দুর্ভিক্ষ-আক্রান্ত নিষ্ঠুর সত্য ও রূঢ় বাস্তব ছবি :

'কয়মাস যাইতে না যাইতেই পরগণায় দুর্ভিক্ষ লাগে। গতবার আমন ভাল হয় নাই। আউশ মাঠে পুড়িয়া গিয়াছে। আড়াই টাকা তিনটাকা হইতে চাল সাত টাকা আট টাকায় উঠিয়াছে। রাখীবন্ধনের সময়ই অনেকের জমিজমা বন্ধক পড়ে, ঘটিবাটি বিক্রয় হয়।

এর পর শুরু হয় ভিক্ষা। কিন্তু ভিক্ষা দেওয়ার লোক এক গ্রামে দু চারজনের বেশী নাই। ভিখারীই প্রায় সকলে। অন্নের অভাবে লোকে প্রথমে মাছ ও কাছিম খাইল। তাহা ফুরাইলে কচু ও কলমী শাক। শেষে তাহাও মিলিত না।

পরাধীন দেশে রাজশক্তির রথ প্রজার প্রয়োজনে খুব মন্দ গতিতেই চলে। চলার তাগিদ তার নাই। অন্তর ও বাহির, কোন দিক দিয়াই বাধ্যবাধকতা নাই। তাই দুর্ভিক্ষের সরকারী সাহায্য আসে প্রয়োজন বহুলাংশে মিটিবার পর। এই মিটাইবার ভার স্বল্প-শক্তি দেশবাসী কিছু নেয়। আর নেয় প্রকৃতি ও মহাকাল।'[৮৫]

লেখক যে সময়ের দুর্ভিক্ষ-চিত্রের রেখাভাষ্য দিয়েছেন, সে সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সংক্রান্ত রাখীবন্ধন জাতীয় স্বদেশ-চেতনার অব্যবহিত পরবর্তী কাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে শুধু নয়, প্রথম মহাযুদ্ধেরও আগে এদেশের শাসকশ্রেণীর অবহেলা, সমাজ জীবনের অভ্যন্তরে অবক্ষয়, শাসকদের দেশ শাসনে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা কতটা ছিল, এসব চিত্রে তার প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রলয়ংকর রাজনৈতিক ঝঞ্ঝার আবর্তে তারই ভয়ংকরী রূপ।

'রাত্রি' উপন্যাসে সঞ্জয় ভট্টাচার্য মন্বন্তরের চিত্র এঁকেছেন উপন্যাসের '১৯৩৩' শীর্ষক শেষ অধ্যায়ে। সারা কলকাতা জুড়ে গ্রাম থেকে চলে-আসা বুভুক্ষুদের অবিরাম মিছিল আর অন্নের জন্য ক্ষুধার্ত আর্তনাদ 'ভাত দাও' ফ্যান দাও।' স্ত্রী শ্যামলী কাছে নেই।

নায়ক সুদাম রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শোনে নিরন্নদের আর্তনাদ, অস্থির হয়, তাড়িত হয়। তার চিন্তা তাকে ভীষণভাবে কাঁপিয়ে দেয়:

"ফ্যান দাও—মা—"

ভাত চায় না ওরা—শুধু ফ্যান। ভাতই দিতে পারে সুদাম—একশো, দুশো, হাজারটা উপোসী মুখে একদিন দিতে পারে ভাত। একদিন দিতে পারে—পারে কি দুদিন, তিনদিন, সপ্তাহ, মাসের পর মাস? পারে কি দশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার, লক্ষ, দশ লক্ষ মুখে ভাত তুলে দিতে? পারে না। তার স্বপ্নের আর কল্পনার সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়েও পারে না।'[৮৬]

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শহরবাসী নায়কের চিন্তায় মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ রূপ অসহায়তার ছবিই আঁকে। অন্যদিকে কারখানার মালিক, প্রচুর অর্থের ধনী মহীতোষ—যাদের জন্যে এত অসন্তোষ, যাদের ওপর এমন মন্বন্তর নেমে আসার কিছু দায়-দায়িত্ব বর্তায়, সে বাঁচতে চায় এমন বীভৎস করুণ অসহায় অবস্থার মধ্যে থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে:

"... ..কাশ্মীর প্রস্তাবটা কিন্তু ঠিক।—পূজোর ছুটিতে এখানে থাকা চলবে না—যা সুরু হয়েছে, কলকাতায় থাকা মুস্কিলই হয়ে উঠবে।"

"তার মানে?" শঙ্কিত হয়ে উঠল রত্নার চোখ।

"ভিখিরির ভিড় বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। ফুটপাতে চলা মুস্কিল ওদের জ্বালায়। হাঁড়িকুড়ি, মালসা মগ, কাঁথা মাদুর নিয়ে দিব্যি সংসার জাঁকিয়ে বসেছে একেকজন।" পাইপে টু-বাকো টিপতে শুরু করল মহীতোষ।

"তাতে কলকাতায় থাকা মুস্কিল হবে কেন—ভিখিরি আর বড়লোক নিয়েই ত চিরদিনের কলকাতা।" বোঝা গেল মহীতোষের কথায় রত্না কোথায় যেন একটা অস্পষ্ট আঘাত পেয়েছে।

"মুস্কিল হবে না? এপিডেমিক সুরু হয়ে যাবে ওদের নোংরামিতে।"

"ফুটপাথে যারা থাকে নোংরা না হয়ে উপায় কি তাদের? এপিডেমিক যদি সুরু হয় সুরু হবে শুধু আমরা ওদের ফুটপাথ থাকতে দিচ্ছি বলে।" মহীতোষের কাছে নিজেকে কেমন যেন খাপছাড়া করে তুলল রত্না।'[৮৭]

লেখক একদিকে মালিক শ্রেণী আর একদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী—এদের চিন্তাভাবনায় মন্বন্তরের দুই বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে, মহীতোষের স্ত্রী রত্নার মধ্যে একধরণের বিদ্রোহিতাকে ব্যঞ্জিত করে শেষে জেলে-যাওয়া উকিল শমীমের প্রতীক্ষারতা প্রেমিকার ভাবনায় এমন মন্বন্তরের একটা অবেগাত্মক রোমান্টিক সমাধানের কথা এনেছেন:

'শমীকদার মতো বা সুবীরের মতো আরো যারা হাজার হাজার কারাপ্রাচীরের আড়ালে পড়ে আছেন, তাঁরাও কি হঠাৎ একদিন এই কঙ্কালের মৃত্যু-যাত্রার পথরোধ করে এসে দাঁড়াতে পারেন না? তাঁরাই পারেন রক্ত মাংসের স্তবকে ফুলের মতো স্নিগ্ধ করে তুলতে এদের জীবন। এদের মিনতিকে দাবীর মর্যাদা দিতে পারেন তাঁরাই। তাঁরা আছেন। বিশ্বাসে গভীর হয়ে ওঠে অম্বুর দৃষ্টি।'[৮৮]

উপন্যাসের একেবারে শেষে কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনের বাঁকে ভিড়-করে-থাকা নিরন্নদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে প্রবীর নিরন্ন মানুষের কথায় গভীর নিমগ্ন থেকে ভাবে :

'কাদের পায়ে শৃঙ্খলা আনতে চায় প্রবীর? মৃত্যু পথযাত্রীদের পায়ে? কবরের পাশে অপেক্ষা করছে যারা, তাদের পায়ে কিসের শৃঙ্খলা চায় সে? মৃত্যুর অপেক্ষায় তারা সুশৃঙ্খল। জীবনের জন্যে আর নয়।'[৮৯]

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শিক্ষিত বুদ্ধিমান মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলি মূলত শ্লেষ-মেশানো চিন্তাতেই নিরন্ন মানুষের অসহায়তার মূল্যায়ন করেছে।

মন্বন্তরের আর এক করুণ ছবি আছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'যায় যদি যাক' উপন্যাসে :

'মা গো, একটু ফেন দাও, মা!'

এ-ডাক এরা কোত্থেকে শিখল, কোন মার রন্ধনশালায়?

ঝাঁক বেঁধে, কাতার দিয়ে লোক আসছে শহরে, আকাশ কালো-করা পঙ্গপালের মত। কি বলবে এদের? ভিক্ষুক বলবে, না, ক্ষুধার্ত বলবে? দেনদার বলবে, না, বলবে দাবিদার?' [৯০]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত নিরন্নের চিত্রে নিরন্নদের এমন জিজ্ঞাসায় ধরার চেষ্টা করেছেন। যেন সচেতন সকাতর লেখকের নায়ক-মনের বকলমে আত্মজিজ্ঞাসা। নায়ক সুজন এমন নিরন্নের পরিবেশে অবধারিত ক্ষুধার বলি। স্ত্রী সেবা আর মা-ভাইবোন নিয়ে সামান্য মাইনের শিক্ষক, যুদ্ধের সময়ে ফাঁকা কলকাতায় বেকার শিক্ষক এক ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি। একে একে মধ্যবিত্ত অবস্থা থেকে নিম্নবিত্তশ্রেণী ধরে নেমে আসতে বাধ্য হয় সর্বহারাদের আর্তির মধ্যে নিজেকে একজন সর্বহারা তৈরী করে। স্ত্রী সেবা স্বামীর শারীরিক অপরিসীম অসহায়তা থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে মন্বন্তরের আর এক কোটিতে আশ্রয় নেয়, যেখানে সব যুবতী নারী দেহের বিনিময়ে অর্থ-উপার্জনে উৎসুক। যুদ্ধ এনেছে সারা কলকাতায় খাদ্যের রেশন-ব্যবস্থা। সুজনকে নামতে হয় সেই রেশন আনতে কণ্ট্রোলের লাইনে। কিন্তু অর্থ কোথায়? সুজন যায় সস্তা সাবান পাঁচ আনা করে এক একটা বিক্রী করতে, সেবা যায় লাইনে :

'গত যুদ্ধে দেখা দিয়েছিল খাটো চুল আর খাটো ঘাগরা, হাত-কাটা খাটো শার্ট আর পা-কাটা খাটো প্যাণ্ট। এরা দেখা দিয়েছে রেশনের থলে হাতে।

সম্রান্ত ভিক্ষার ঝুলি।

নিম্ন মধ্যবিত্তের দল। আপিস-আদালতের কেরানি, আমলা-ফয়লা তো বটেই, আরো একটু ওপরের লোক। যারা বাজারে যাবার অবসর পায়নি এতদিন, যাদের সমস্ত জীবনের আভিজাত্য ছিল এই বাজারে না যাওয়ায়, তারাও। সবাই আজ বীরের ভঙ্গিতে থলে ঝুলিয়ে চলেছে।'[৯১]

তীব্র ব্যঙ্গে লেখক নিরন্নের দিনে সামান্য খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থাকে ও অভিজাত মানুষের অসহায়তাকে এঁকেছেন। সেবা চাল আনে, কিন্তু তাকে, তার বাবা শ্রীভূষণ বাবু—যিনি সেবাকে একদিন অসম্ভব মেরেছিলেন—সেই অসহায় বাবাকেই বেশীর ভাগ চাল দিয়ে দিতে হয়। মন্বন্তরের দিনে এমন মানবতা সত্য হয়েছিল ক্ষুধার চিত্রে। সেবাকে কলকাতার রাস্তায় সাহায্য করতে আসে তার আগের পরিচিত, গ্রামের জমিদারপুত্র বারিধি। আক্ষরিক অর্থেই দাম দিয়ে চায়, কিন্তু সে দাম অর্থ নয়, সেবার দেহভোগের বিনিময় মূল্য। বারিধি একদিন সেবাকে অন্তঃসত্ত্বা দেখে ভয়ে টাকা দিয়ে কলকাতায় পাঠাতে দ্বিধা করেনি সন্তান নষ্ট করার জন্য। সেই সেবাই চাল নেওয়ার কথায় বাধা দিয়ে বলে:

'না। এ দেওয়ার পিছনে আছে আপনার ক্ষতিপূরণের লালসা। আমাদের গ্রাস আচ্ছাদন করতে গিয়ে নিজের গ্রাস রেখেছেন উদ্যত করে। নিজেদের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে আপনার ক্ষুধাকে আমরা প্রশ্রয় দিতে পারবো না, কিছুতেই না।' সেবা আবার পা চালাল।'[৯২]

একদিকে দেহের উদরের ক্ষুধা আর একদিকে নারী-দেহভোগের ক্ষুধা—দুই প্রবল ছিল মন্বন্তরের পরিবেশে। ক্ষুধার্ত সুজন তার এক সময়ের প্রেমপ্রার্থী-বান্ধবী স্কুল-মিসট্রেস পুরশ্রীর কাছে সাবান বিক্রী করতে গিয়ে বলে:

'এক শ্রেণী থেকে আর শ্রেণীতে চলে আসছি, ইস্কুল মাস্টার থেকে ফিরিওয়ালা, চলে আসছি শ্রেণীহীনতায়, ফল বড় হল না।'[৯৩]

সুজন এমন খাদ্যাভাবের কারণেই ফ্লাটবাড়ি থেকে আসে বস্তীবাড়ীর জীবনে, শেষে পথে। অনেকটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পের নায়কের মতই। সেবা বস্তীর মধ্যে রঙ মুখে মেখে বিড়ি ধরিয়ে দাঁড়ানো মেয়েদের মত না হয়ে অন্যের ছেলেকে নিজের ছেলে বানিয়ে রাস্তায় ঘোমটা পরা বউ হয়ে নেমে আসে। সে ভিক্ষে চায়, সেই সঙ্গে দেহদানেও আপত্তি থাকে না, কারণ সংসারে তখন শাশুড়ী

না খেতে পেয়ে অসুস্থ, মুমূর্ষু স্বামী সুজনও। মন্বন্তরের দিনে আশাবাদী সুজন হয়ে ওঠে চরম সিনিক। পুরশ্রী সুজনকে সুস্থভাবে বাঁচার কথায় বলে :

'না, আছে। জায়গা আছে। এখনো আছে চাঁদ, আছে শিশু, আছে রাত্রির ভোর হাওয়া।'

'বিশ্বাস করি না। শুধু আছে যুদ্ধ, আছে বলি।'[৯৪]

এমন উত্তর এক নিরন্ন মানুষের পক্ষেই যথার্থ। যে সুজন ছিল ভালবাসার জীবনে চরম আশাবাদী, আত্মসম্মানবোধ-দীপ্ত স্বতন্ত্র মনের মানুষ, অনমনীয়, সেই সুজন মন্বন্তরের দিনে সম্পূর্ণ ক্ষয়িত হতে পিছপা হয়নি।

'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসে সুবোধ ঘোষ অংশত মন্বন্তরের চিত্র গ্রহণে তৎপর হয়েছেন কাহিনীর প্রয়োজনেই। উপন্যাসের নায়ক শিশিরের ভৃত্য বিপিন, তার স্ত্রী টুনি ও গ্রামের আর এক ভয়াবহ রমণী পুনি কেউটানির ছবি কলকাতার রাস্তায় জীবন্ত করে এঁকে লেখক বীভৎস মন্বন্তরের ছবি উপহার দিয়েছেন আমাদের। তেতাল্লিশের মন্বন্তরে বিষাদমগ্ন অন্ধকার কলকাতার রাস্তায় অন্যতম কংগ্রেসকর্মী অবনীনাথের দৃষ্টি দিয়ে লেখক সুবোধ ঘোষ মন্বন্তরের একটি নিপুণ ভাষাচিত্র উপহার দিয়েছেন শিল্পের ব্যঞ্জনায় :

'আর একটু অন্যমনস্ক হলেই মাড়িয়ে ফেলতো অবনী। পথের ওপরেই একা শুকনো নারকেলের ডেগোর ওপর ছোট একটি ছেলে ঘুমোচ্ছে। ছেলেটার চোখের কোটর দুটো মাটিতে ভর্তি—বিকট পক্ষহীন প্রেতচক্ষুর মত দেখাচ্ছে। মরেনি এখনো, পেট আর পাঁজরাগুলির মধ্যে নিশ্বাসের স্পন্দন এখনো লুকোচুরি খেলছে।

উনিশশো তেতাল্লিশের কলকাতার একটি অপরাহ্নের এই এক রূপ। বিরাট একটা কটাহে যেন মনুষ্যত্ব ভাজা হচ্ছে। হৃত-অন্ন যুদ্ধদাস বাংলার প্রতি গ্রামে জনপদে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত নাড়ীর লালা বেনো জলের মত সব ঠাঁই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। মেঠো ইঁদুরের মত নিরাশ্রয় মানুষেরা দলে দলে কলকাতার চড়ায় এসে ঠেকেছে। সকাল বিকেল সন্ধ্যা রাত্রি—এরা আসছেই। ট্রেনে চড়ে, পথে হেঁটে, বনবাদাড় ঝোপঝাপ ঠেলে তারা আসছে। ক্লান্তি নেই। এক অফুরান অন্ত্যেষ্টির মিছিল।'[৯৫]

এমন চিত্রের মধ্যেই আছে পুনি কেউটানির মত বুড়ি যে খেতে না পেয়ে বিপিনের ছেলেকে কেড়ে নেয় টাকা ফেরত না দেওয়ার জন্য। মাত্র বারো-তেরো টাকায় বিপিনের ছেলে বুঝি ফুটপাথেই বিক্রী হয়ে যায়। সুবোধ ঘোষ অংকিত মন্বন্তর চিত্র বীভৎসতার আর এক রাক্ষসী রূপ।

চার

প্রাকৃতির দুর্যোগ ও মন্বন্তরের চিত্রকে বাংলাদেশের কথাকাররা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন। এই দেখার সূত্র ধরেই একাধিক অত্যন্ত ক্ষমতাবান লেখক তাঁদের যুদ্ধ-সমকালে রচিত গল্প-উপন্যাসে একটি বিশেষ জীবনদৃষ্টির পরিচয়ও রেখেছেন। (১) একদল লেখক মন্বন্তরকে চিত্রিত করে মহত্তম মানবতার বিধ্বংসী রূপকে স্পষ্ট করতে সচেষ্ট। মন্বন্তর কেন হল, তার পিছনকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক কারণ না দেখিয়ে তারই অভিঘাতে বাংলাদেশের সর্বাবয়ব সাধারণ মানুষের মানবিক নৈতিকবোধে যে চরম আঘাত আসে, যে সমাজ উৎকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে তার দিকেই তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন তাঁরা। প্রবোধ কুমার সান্যাল, মনোজ বসু প্রমুখের গল্প ও উপন্যাসে এর পরিচয় পাই। (২) কোন কোন কথাকার দুর্ভিক্ষজনিত নিছক করুণ রসের সফল ক্ষেত্র রচনা করেছেন একালের বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যে। করুণরস এমন একটি রস, সর্বশ্রেণীর পাঠক-হৃদয়কে বুদ্ধিবর্জিতভাবেও অভিভূত করতে পারে। মন্বন্তরে অখাদ্য খাওয়া, কিছু না খেয়ে মৃত্যু বরণ, মায়ের কোলে শিশুর অমোঘ মৃত্যুদৃশ্য, ফ্যান ভিক্ষার মত বার বার করুণ আবেদন-কণ্ঠ—এসব দিয়ে কিছু গল্পকার-ঔপন্যাসিক বাংলা কথাসাহিত্যে মন্বন্তরের কথা ভেবে গেছেন। নবেন্দু ঘোষের গল্প, তারাশংকরের উপন্যাস ইত্যাদিতে অংশ-বিশেষে তার পরিচয় মেলে। (৩) কোন কোন সচেতন বুদ্ধিদীপ্ত লেখক মন্বন্তরকে সমকালের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ন্যায়ে গ্রহণ করেছেন তাঁদের রচনায়। গোপাল হালদারের তিনটি উপন্যাস—'ঊনপঞ্চাশী', 'পঞ্চাশের পথ', 'তেরশ পঞ্চাশ' এর স্বপক্ষের উদাহরণ। তিনি যুক্তি চিন্তা মনন দিয়ে মন্বন্তর দেখা দেওয়ার কারণ, অর্থনৈতিক বণ্টন-বৈষম্যের কুফল, রাষ্ট্রীর অব্যবস্থা, শাসক শ্রেণীর মূঢ়তা, অবিমৃষ্যকারিতা, ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের অবাধ শোষণ-প্রয়াস—এ সবকেই মন্বন্তরের মূলে দায়ী করে মন্বন্তর বিষয়ে কথাসাহিত্য রচনা করে গেছেন। হৃদয় ও ভাবাবেগ নয়, করুণ রসের আর্দ্রতা নয়, মানবতা ধ্বংসের মূলে যে মন্বন্তর দেখা দেওয়ার ন্যায়—তাকেই এঁকেছেন ঐতিহাসিকের আন্তর নিষ্ঠায়। (৪) কোন কোন লেখকের রচনায় আছে তাঁর জীবনদর্শনের উপযোগী মন্বন্তর চিত্র। নবাগত সাম্যবাদে দীক্ষিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পে উচ্চ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষের মনের প্রতিক্রিয়ায় তাকে নামিয়ে এনেছেন শোষিত সর্বহারাদের মধ্যে। মন্বন্তর তাঁর নায়কদের সচেতন করে যেখানে নামিয়ে এনেছে, তাতে আগামী দিনের শোষক শ্রেণীর অবলোপে শোষিত সর্বহারাদের দল ভারি করার ক্ষেত্রই চিহ্নিত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ও বুর্জোয়া অর্থনৈতিক

পরিবেশে আবার মন্বন্তর আসতে পারে, তাই মধ্যবিত্ত কারুণ্য, আবেগ, ভাবপ্রবণতা ইত্যাদি নয়, মহত্তম মানবতাকেই উপরতলায় নয় একেবারে নীচের তলার মানুষগুলির সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। ব্যক্তিক নয়, সর্বকালিক সর্বমানবিক সমস্যার কেন্দ্রেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্বন্তর-নিহিত লক্ষ্য ও সিদ্ধান্ত রূপ পেতে উৎসুক। (৫) মন্বন্তরকে আগামী দিনের মহাপ্রলয়ের ভূমিকা হিসেবেও একাধিক লেখক ভেবেছেন। একটা রোমান্টিক বিপ্লবের কথা ভেবে কিছু লেখক মন্বন্তরকে উপন্যাস-গল্পে রূপ দিয়েছেন। অচিন্ত্য কুমারের রচনায়, মনোজ বসুর 'সৈনিক' উপন্যাসে ও অন্যান্য কিছু গল্প আলোচনায় আমরা তা দেখিয়েছি। (৬) মন্বন্তর থেকে জাত ও সেই পরিবেশেই প্রত্যক্ষ বুভুক্ষুদের ব্যবহারের বীভৎসতা. উৎকট কদর্য রূপের প্রতিচিত্রণে একাধিক লেখক উপন্যাস-গল্প লিখেছেন। সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসেব বিপিন, টুনা, এদের সঙ্গে পুনি কেউটানির যে সংঘর্ষ-চিত্র, এবং নবেন্দু ঘোষের একাধিক গল্পে রাস্তার মন্বন্তর-চিত্রের বীভৎসতায় তার পরিচয় মেলে। মন্বন্তরের অন্তর্নিহিত প্রতিক্রিয়া থেকে বাইরের বীভৎসতা দিযে মন্বন্তর-ভাবনাকে সক্রিয় করার শিল্প-প্রয়াসই এসবের মূলে।

আগেই বলেছি, লেখকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মন্বন্তরকে দেখলেও কেউই ভাগ্যের কাছে মন্বন্তব-আক্রান্ত চরিত্রগুলির কথা ও চিন্তা-ভাবনা গচ্ছিত রাখেন নি। সব লেখকই নায়ক-নায়িকাদের দিয়ে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করিয়েছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কালনাগ' গল্পের নায়িকা, নারাযণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়' গল্পেব নায়ক—এদের ভাবনায় ও ক্রিয়াকর্মে সংগ্রামী মনোভাব আছে। একই মনোভঙ্গির শিকার নবেন্দু ঘোষের একাধিক গল্পের চরিত্রও। নবেন্দ্রনাথ মিত্র মন্বন্তর প্রসঙ্গকে নাযক-নায়িকার প্রেম-সম্পর্কের জটিলতা প্রকাশে অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর 'মদনভস্ম' গল্পে এর প্রমাণ মেলে। পরিমল গোস্বামী তাঁর 'ভাঙন' গল্পের নায়িকার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর প্রত্যাশার ও প্রতীক্ষাব করুণ চিত্র এঁকে মন্বন্তরের মধ্যে ব্যক্তিক জীবনে কঠিন অভিঘাতকে নিযতির মত দেখিয়েছেন। অন্নদাশংকর রায় মানবতার অনুসন্ধানী। বস্তুত মন্বন্তর প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকরা তাঁদের কথাসাহিত্যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দুর্ভিক্ষকে দেখেছেন, ব্যবহার করেছেন বলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে রচিত এই বিষয়ক কথাসাহিত্য যথেষ্ট বিস্তার ও বৈচিত্র্য পেযেছে।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

১ The Popular Novel in England (1770-1880) 1969 J M. S. Tompkin Ch I 'The Novel Market' P 1

২ An Introduction to the English Novel (Vol.2) From Henry James to 1950 Arnold Ketle Introduction P 150

৩ 'মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির সংকট : আর একটি দিক' নীহার রঞ্জন রায় শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৮৭ পৃ ২৩

৪ 'পশ্চিম বাংলার দুর্ভিক্ষ' প্রবন্ধ ভারতবর্ষ : ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা ২৮বর্ষ ১৩৪৭ পৃ ২৯৬

৫ 'সংবাদ সাহিত্য' শনিবারের চিঠি সম্পাদক : সজনীকান্ত দাস ১৪শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ পৃ ২১৫-২১৬

৬ ঐ ১৬শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা চৈত্র ১৩৫০ মার্চ ১৯৪৪ পৃ ৫৩৪

৭-১০ 'মহামন্বন্তর' গ্রন্থ সম্পাদক : পরিমল গোস্বামী (নূতন আকারে পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর) নিবেদন পৃ ১, ভূমিকা, পৃ ৩, পৃ ৩, পৃ ৩

১১-২২ ঐ 'অঙ্গার' গল্প প্রবোধ কুমার সান্যাল পৃ ৪১ ও ৪৮, ৪৩, ৪৩, ৪২, ৪৭-৪৮, ৪৪, ৪৫, ৫১ ৫২, ৫৩, ৫৬, ৫২

২৩ Poem by T S. Eliot

২৪ 'অঙ্গার' গল্প প্রবোধ কুমার সান্যাল 'মহামন্বন্তর' গ্রন্থ পৃ ৫২

২৫, ২৬ Six Novelists Look at the Society (1977) John Atkins chapter 1 sub ch. Alienation P 35, 41

২৭ 'অঙ্গার' গল্প প্রবোধ কুমার সান্যাল 'মহামন্বন্তর' গ্রন্থ সম্পাদক পরিমল গোস্বামী পৃ ৫৪

২৮ 'কালনাগ' গল্প অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত ঐ প ৭

২৯, ৩০ 'কঙ্কি' গল্প নবেন্দু ঘোষ ঐ পৃ ১৯, ২০

৩১ 'ত্রিশঙ্কু' গল্প নবেন্দু ঘোষ 'এই সীমান্তে' গল্পসংকলন পৃ ১০৫

৩২ 'বাঁকা তলোয়ার' গল্প নবেন্দু ঘোষ ঐ পৃ ১৮৪

৩৩ কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, 'উপকূলে' শ্রীধর প্রকাশনী দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৭৯ পৃ ৭

৩৪-৩৬ 'বাঁকা তলোয়ার' গল্প নবেন্দু ঘোষ 'এই সীমান্তে' গ্রন্থ পৃ ১৮৪, ১৪২, ১৪৩

৩৭-৩৯ 'ভাঙন' গল্প নবেন্দু ঘোষ পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত মহামন্বন্তর গল্প-সংকলন পৃ ৩৬, ৩৭, ৩৮-৩৯

৪০ 'ভিড়' গল্প বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ পৃ ৬৫

৪১, ৪২ 'বীরের প্রশ্ন' গল্প বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ঐ পৃ ১০, ১১

৪৩ 'ক্ষুধার দেশের যাত্রী' গল্প সরোজ কুমার রায়চৌধুরী ঐ পৃ ১২১

৪৪ 'দ্বীপের মানুষ' গল্প মনোজ বসু ঐ পৃ ৮৬

৪৫-৪৮ 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ পৃ ৮৭, ৮৭, ৯২, ৯১

৪৯, ৫০ 'সবার উপরে মানুষ সত্য' গল্প অন্নদাশংকর রায় 'গল্প ১৯২৯-১৯৫০' প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ পৃ ১৭০, ১৭৭

৫১ 'কর্ণফুলির ডাকে' গল্প সুবোধ ঘোষ 'পরশুরামের কুঠার' গ্রন্থ (১৯৪২) পৃ ১০৪

৫২-৫৬ বন্যা' গল্প মনোজ বসু 'দুঃখ নিশার শেষে' গল্পগ্রন্থ প্রথম সংস্করণ, ১৯৪৪ পৃ ৩৪-৩৮, ৩৯, ৪১, ৪১, ৪১

৫৭, ৫৮ 'কণ্ট্রোলের লাইন' গল্প মনোজ বসু ঐ পৃ ৬০, ৬১-৬২

৫৯, ৬০ 'মানুষ ও গরু' গল্প মনোজ বসু ঐ পৃ ৯৬, ৯৬

৬১ 'স্বস্তিন ঘাট' গল্প নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা, ১৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫০ পৃ ৫৯০-৫৯১

৬২ 'মদন ভস্ম' গল্প নরেন্দ্রনাথ মিত্র গ্রন্থাবলী-১ 'অসমতল' গল্পগ্রন্থ পৃ ৩৮৬

৬৩-৬৫ 'হাড়' গল্প নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বীতংস (১৯৪৫) পৃ ২০, ৩০, ৩০

৬৬-৬৯ 'উদয়ের পথে' জ্যোতির্ময় রায় ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০শে পৌষ ১৩৫৭ পৃ ৫, ৩৮-৩৯, ৬১, ৩৫-৩৬

৭০-৭১ 'পঞ্চাশের পথ' গোপাল হালদার দশম পরিচ্ছেদ পৃ ১২৬ ১২৭

৭২-৭৫ 'তেরশ পঞ্চাশ' গোপাল হালদার প্রথম পরিচ্ছেদ পৃ ১১, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পৃ ৪৭, ৪৯, আঠারো পরিচ্ছেদ পৃ ৩৩৩

৭৬-৮১ 'সৈনিক' মনোজ বসু ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: ২ পৃ ১১২-১১৩, ১১৫-১১৬, অষ্টম পরিচ্ছেদ ৩ পৃ ১৫৬-১৫৭, নবম পরিচ্ছেদ ৩ পৃ ১৭২-১৭৩ ১৮৫-১৮৬, দশম পরিচ্ছেদ ২ পৃ ১৯৯-২০০,

৮২-৮৪ 'মন্বন্তর' তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় সংস্করণ, মে ১৯৫৫ অধ্যায়-আটাশ পৃ ৩১৯-৩২০, অধ্যায় উনত্রিশ পৃ ৩২২-৩৩৩, অধ্যায় তেরো পৃ ৩৫৮

৮৫ 'শতাব্দী' (প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫) রমেশচন্দ্র সেন দ্বিতীয় ভাগ পৃ ১৫৪

৮৬-৮৯ 'রাত্রি' (১৯৬৬) সঞ্জয় ভট্টাচার্য অধ্যায়: ১৯৪৩ তিন পৃ ৩৭৯, অধ্যায়: ১৯৪৩ তিন পৃ ৩৬৩, অধ্যায় ১৯৪৩ চার পৃ ৩৮৭, ৩৮৩

৯০-৯৪ 'যায় যদি যাক' (১৯৪৮) অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত অধ্যায় ১৫ পৃ ৮৯, অধ্যায় ১১ পৃ ৯৫, ৯৫, অধ্যায় ২০ পৃ ১৩০, ১৩১

৯৫ তিলাঞ্জলি (১৯৪৫) সুবোধ ঘোষ পৃ ৫৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যাপক গণবিক্ষোভের উজ্জ্বল ভিত্তিভূমি বাংলা কথাসাহিত্য

এক

আলোচ্য যুদ্ধ-সমকালের বিক্ষোভগুলি একে একে দেশীয় মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যেই দেশীয় রাজনীতির 'ক্রস্‌কারেন্টে' পুঞ্জীভূত হচ্ছিল বিশ শতকের গোড়া থেকেই। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শেষ পর্যন্ত সারা ভারত জুড়ে যে ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আবেগপ্রাণ জাতীয়তাবোধের জাগরণ ঘটে, তা মূলত ছিল শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত মানুষের স্বাজাত্যবোধের জাগরণ। প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশে না হলেও বাঙালী শ্রী অরবিন্দ ঘোষ সারা ভারতে জাতীয় চেতনায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সঞ্চার করেছিলেন। বিশ শতকের প্রথম দশকে আসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। উনিশ শ পাঁচ সালে যে আন্দোলনের সূত্রপাত, উনিশ শ বারোয় তা স্তিমিত হয়ে যায়। আবার আসে উনিশ শ কুড়ি সালে গান্ধিজী-নির্দেশিত অসহযোগ আন্দোলন, কিন্তু তার বেগ ও গতি এক সময়ে হতাশায় থেমে যায়। এগুলি ছিল জাতীয় স্বজাত্যবোধ-প্রাণিত আন্দোলন। আন্দোলন ছিল অহিংস। কিন্তু এরই পাশাপাশি হতোদ্যম যুবশক্তি সহিংস সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝোঁকে। উনিশ শ ছত্রিশ সাল পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চলে। রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে সেই সন্ত্রাসবাদের প্রতিচিত্রণে এনেছেন অতীন্দ্র-এলার কাহিনী। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র সব্যসাচীও সন্ত্রাসবাদী নায়ক। যুদ্ধ-সমকালে রচিত মনোজ বসুর 'ভুলি নাই' উপন্যাসেও আছে স্মৃতিসূত্রে সেই সন্ত্রাসবাদী যুবকদের চরিত্রচিত্র। জাতীয় আন্দোলন তথা অহিংস আন্দোলন থেকে সহিংস সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হয়েই আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন যুদ্ধের সময়ে স্পর্শ করে সাম্যবাদশীলিত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে। অহিংসবাদ, সন্ত্রাসবাদ, সাম্যবাদ তথা সমাজবাদ—এসব 'ইজম'-দিয়ে যে রাজনৈতিব ঘূর্ণাবর্ত দেখা দেয় আলোচ্য সময়কালে ফ্যাসীবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদকে প্রতিরোধ তথা সমূলে উৎপাটিত করার জন্য, তার কথা মনোজ বসু, গোপাল হালদার নবেন্দু ঘোষ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গল্পে-উপন্যাসে গ্রহণ করেছেন যথার্থ শিল্পীর মমতা দিয়ে।

আমাদের দেশে বৃটিশ শাসনের সময় থেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরী হতে থাকে।

উনিশ শতকে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই গ্রামের কৃষকদের থেকে সমস্ত আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে। একজন বাঙালী ইতিহাসকার বলেছেন,—'স্থানীয়, আঞ্চলিক সামাজিক নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়ে নূতন এক নগর নির্ভর বিদেশী ভাষা ও শিক্ষা নির্ভর মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে সামাজিক নেতৃত্বের হাত বদল, এ যে কত বড় এক সামাজিক পরিবর্তন তা বোধ হয় এখনও আমরা বুঝে উঠতে পারিনি।'[১] এমন নতুন গড়ে-ওঠা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিশ শতকেব গোড়া থেকে স্বাধীনতা-চেতনায় দীপ্ত হয়ে ওঠে। একাধিক আন্দোলনে থাকে তারাই। যুদ্ধের সময় যে সমস্ত আন্দোলন হয়েছে, সমস্ত আন্দোলনই ছিল প্রথমে শহরমুখীন, পরে তা সারাদেশে বিস্তৃত হয়। গ্রামের গরীব কৃষকরা এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু মূল আন্দোলনেব প্রাণশক্তি উৎক্ষিপ্ত হয় মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে থেকেই এবং সেই নেতৃত্বই গণবিক্ষোভের বিশাল-রূপকে লেলিহান আগুনের মতো চারপাশে ছড়িযে দেবাব শক্তি অর্জন করে। প্রখ্যাত ইতিহাসকার তাঁর সুনিপুণ বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন,—মুষ্টিমেয় 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীই আবার ভারতবর্ষকে, তথা বাঙালী ও বাংলাদেশকে মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও পরোহিত শাসনের বদ্ধ অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করে এনে সাম্প্রতিক পৃথিবীব বুদ্ধি ও যুক্তিশাসিত বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-বোধতাড়িত সাম্প্রতিক পৃথিবীর উদার মহিমার কেন্দ্রে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতিব, এক কথায ভারতীয় রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবোধ, স্বাজাত্য-বোধের অভ্যুদয় ও বিকাশ সমস্তই সম্ভব হয়েছে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই সক্রিয় চেষ্টায় ও নেতৃত্বে। বস্তুত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্প্রসারণ বন্ধ হযে গিয়ে তাদের ভেতর বিক্ষোভ-বিরোধেব সৃষ্টি না হলে, আর্থিক শোষণেব দংশন অনুভূত না হলেও রাষ্ট্রীয স্বাজাত্যবোধের এত দ্রুত বিকাশ ঘটতো কিনা সন্দেহ।'[২]

মধ্যবিত্তের আর্থিক শোষণ ভয়াবহ রূপ নেয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কাঠামোতেই। যুদ্ধের সময় সারা বিশ্বে ছিল ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারী রথচক্রের দুর্মদ ঘর্ঘর-ধ্বনি। যুদ্ধেব প্রযোজনে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসন হয়েছিল তীব্রতম। সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংঘর্ষ তীব্র হলে, স্বার্থপরতা তুঙ্গে উঠলে ফ্যাসিবাদ দেখা দেয়। সাম্রাজ্যবাদ আর ফ্যাসীবাদ মিলে-মিশে এক একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে যন্ত্রের জীবন গড়ে তোলে। বাংলাদেশ তথা সারা ভারতে বৃটিশ শাসকরা তারই প্রমাণ রেখেছিল। মধ্যবিত্তের যে আন্দোলন উত্তাল হয়েছিল বাংলা-দেশে, তাকে ফ্যাসিস্ত কৌশলে দমন করতেও দ্বিধা করেনি শাসককুল।

বস্তুত'...imperialism is the capitalism which has burst the bounderies of the nation-state even as it first overcame the seclusion of the

village community of the feudal epoch.'[৩] বৃটিশরা প্রধানত যুদ্ধের ভয়াবহ ভারকে সুষ্ঠুভাবে:যুদ্ধের কাজে নিহিত রাখার কারণেই শহরে ও গ্রামে শোষণকে সুনিয়মিত করে রেখেছিল। উপনিবেশবাদের সমস্ত রকম কৌশলই এখানে ভালভাবে প্রযুক্ত হয়। মধ্যবিত্ত মানুষের নিপীড়ন চরম রূপ নেয় শাসকদেব নিযুক্ত এ দেশীয় মানুষের দ্বারাই কোথাও প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষ বিধি-ব্যবস্থায়। সারা দেশে যে বিপুল গণজাগরণ তাকে ধ্বংস করাই তাদের লক্ষ্য। দেশে তখন কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদ রক্তের আলোয় দীপ্ত, নবাগত সাম্যবাদ-প্রভাবিত সমাজতন্ত্রের ভাবনা নানাদিক থেকে দেশের মানুষকে প্রভাবিত করছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র যে উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই একান্ত কাম্য—একথাও আন্দোলনে বার বার উত্থিত হয়। সাম্রাজ্যলোভী বৃটিশ শাসক তাই ফ্যাসিষ্ট কৌশলেই তার মোকাবিলা করতে উদ্যত। ফ্যাসিজম্‌এর বৈশিষ্ট্যই হল—'Once in power the fascists must follow certain inevitable steps, first destroy the working class organisations, secondly muzzle the organs of democratic opinion, thirdly guarantee the profits of big business by organising commerce and industry on lines of monopoly capitalism, fourthly give employment to the workers and dividend to the shareholders by gigantic schemes of rearment.' [৪] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধের কারণই ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিব নিজেদের আভ্যন্তরীণ সংকটগুলির সমাধানের উপায় স্বরূপ। বৃটিশবা এই সংকটে বাংলাদেশে তার কৌশল প্রয়োগে সেই পথই কম-বেশী গ্রহণ কবে।

যেমন অর্থনৈতিক শোষণ থাকে অব্যাহত, তেমনি ফ্যাসিষ্ট কৌশল 'can not afford to allow any intellectual liberty . in a state of what little liberty the intellectual has, now will inevitably be taken from him.'[৫] বলেছেন এক প্রখ্যাত বিদেশী সমালোচক। এবং রাজনৈতিক দিক থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীদের দমন করে, জেলে পুরে বৃটিশরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বুকে তারই নমুনা রাখে।

বাংলাদেশে গান্ধীজির ঐতিহাসিক নয়ই আগস্ট বিপ্লব শুরু হয়। সাম্যবাদীরা তাঁদের নিজেদের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার অব্যাহত রাখে নানা বিরোধী শক্তির সামনে। আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে বৃটিশ শাসকদের শাসনে—উপেক্ষা ও অবজ্ঞায়। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর ইংলণ্ডেও তার স্বাধীনতা বিপদ-মুখীন হলে যেমন 'for a period something like national unity was

achieved...unity somehow became a reality'[৬] ঠিক তেমনি সমস্ত রকম স্বাধীনতা চাই—এই বৈপ্লবিক ঘোষণায় ও দাবী আদায়ের কারণে ভারত তথা বাংলাদেশেও দলমত নির্বিশেষে একটা স্বজাতীয় ঐক্যবদ্ধ প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল গণ চেতনায়।

এই যে বৈপ্লবিক পরিবেশে নানান পরিবর্তন দেখা দেয় সমাজে, রাজনীতিতে ও ব্যক্তি-মনে, তা আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের নানাভাবে আন্দোলিত করে। দেখা গেছে, বৃটিশ রাজত্বেও ইংলণ্ডের বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক ডরিস লেসিং (Doris Lessing)-ও নির্দ্বিধায় আক্রমণ করেছিলেন 'on the shallowness of the British Colonial set in Africa.'[৭] ভারতের মাটিতে বাঙালী লেখকরাও কখনো ব্যঙ্গে, কখনো বা কাহিনী-ঘটনা-চরিত্র ও প্রতিপাদ্যে বাংলা কথাসাহিত্যে সেই সচেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। কারণ সারা বিশ্বের দিকে তাকিয়ে সচেতন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালী লেখকরা, এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ, সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসীবাদী ও উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রকাঠামোয় কি জাতীয় বিধ্বংসী বীজাণুর স্থায়ী অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে সমাজ জীবনে, তা বুঝেছিলেন। ইলিয়া এরেনবুর্গ তাঁর আত্মজীবনীর পঞ্চম খণ্ড—'The War 1941—1945' গ্রন্থের এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন,—'অনেকেই কিঞ্চিত সংস্কৃতির মিশ্রণে এই মহামারী ব্যাধিকে জীইয়ে রাখতে চায় আর এর মধ্য দিয়েই একদিন প্লেগ বীজাণু সক্রিয় হয়ে উঠবে। আমাদের মনে রাখতে হবে কিছু লোকের লোভ আর নির্বুদ্ধিতা এবং কিছু লোকের হঠকারিতা আর ভীরুতার জমিতে ফ্যাসিজম্ অংকুরিত হয়েছিল।......ফ্যাসিজম্ ভয়ংকর ক্যান্সার ব্যাধির তুল্য। একে কখনও সুস্থ করে তোলা যায় না। একে সমূলে উচ্ছেদ করতে হয়। জহ্লাদদের জন্যে যারা অশ্রুপাত করে সে সব সহৃদয় ব্যক্তিদের উপর আমার কোন আস্থা নেই। ঐ দয়াবানরা লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিষ্পাপ মানুষের জন্যে মৃত্যুশয্যা রচনা করছে।'[৮]

এমন নিষ্পাপ নিরীহ মানুষদের মৃত্যুশয্যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় বাংলা কথা-সাহিত্যিকদের রচিত গল্পে উপন্যাসে। প্রবোধ কুমার সান্যাল প্রমুখ যেমন মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে তার ছবি এঁকেছেন, গণবিক্ষোভের ফলে অত্যাচারিত মানুষের ভিড়ে শাসক-শোষক ও শোষিতদের তেমনি ছবি উপহার দিয়েছেন গোপাল হালদার, নবেন্দু ঘোষ, মনোজ বসু, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক। এই সমস্ত লেখক নিছক পরিবেশের পরিবর্তনের স্রোতে কথাসাহিত্যের বিষয় ও চরিত্রে বদল ঘটাতে লেখনী ধরেন নি, প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী, শোষণপন্থী শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গণবিক্ষোভের রূপ ও তাতে অংশগ্রহণকারী দেশীয় মানুষদের মর্যাদার কথা বলেছেন শিল্পীত করে। বাংলাদেশের

ঔপনিবেশিক জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রণা, হীনমন্যতা ও অসহায়তা, প্রতিবাদী কণ্ঠ ও প্রতিরোধমূলক চিন্তা-চেতনা লেখকদের কাঁপিয়েছিল গণবিক্ষোভের পরিবেশে। সমগ্র যুদ্ধ-সমকালে লেখকরা তাঁদের মানসিক তীব্র অস্থিরতা ও উত্তেজনা নিয়েই কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখনী, ব্যবহার করেছেন—'The novelist is a delecate barometer of the winds of change. His temperament and his experience of the colonial encounter enable him to anticipate those changes of theory and policy that cause an empire to be built, transformed, and relinquished.'[৯] আমাদেব বেশ কিছু লেখক এ বিষয়ে অনেকাংশে ছিলেন সচেতন।

গণবিক্ষোভ ছিল জাতীয় জীবনের ও চরিত্রের মধ্যে মাতা-পুত্রের নাড়ীর যোগের মতই। এই প্রয়োজনে কথাসাহিত্য রচনায় 'উদ্দেশ্য' থাকতে পারে, কিন্তু তা ক্ষণকাল দিয়ে চিরকালের মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে। 'যে মানুষ আর্টিষ্ট সে মানুষ কেবল আর্ট চর্চা করে ক্ষান্ত হবে না, সে ভালোর সপক্ষে ও মন্দের বিপক্ষে প্রোপাগাণ্ডা করবে, তলওয়ার ও জোলার মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ চালাবে। এর-জন্যে যে তার যুগান্তর সৃষ্টির ক্ষতি হবে এমন নয়।'[১০] যুগান্তর সৃষ্টির যে ক্ষতি হয নি, ফ্যাসিবাদকে, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদকে ঘৃণ্য কীটের মত মনে করে পৃথিবীব সাহিত্যে যাঁরা ফ্যাসীবাদ-বিরোধী অমর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁদের নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ করলেই আমাদের মন্তব্যেব স্বপক্ষে প্রমাণ দেওযা যাবে। যেমন, পোলাণ্ডের ভান্দা ভাসিলিযে-ভ্স্কা, জার্মানীর ব্রুনো আসিৎস, ক্রিষ্টা ওটেন, রাশিয়ার ভালেনতিন কাটায়েভ, ফ্রান্সের লুই আবার্গ, চেকোশ্লোভাকিয়ার জঁা দ্রদ ও জিরি ম্যবেক, হাঙ্গেরীর টিয়োর ডেরি প্রমুখ।

বাংলা কথাসাহিত্যের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালকে প্রেক্ষিতে রেখে, ব্যাপক গণবিক্ষোভের উত্তেজনাকে গ্রহণ করে গোপাল হালদাব, সোমেন চন্দ, নবেন্দু ঘোষ, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, বরেন বসু, তারাশংকব বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কথনো প্রত্যক্ষ, কথনো পরোক্ষে, কেউ মননধর্মী সমাজ-অর্থনীতির ন্যায় বিশ্লেষণে, কেউ প্রবল সৎ আবেগধর্মিতায়, কেউ বা সোচ্চার বিক্ষোভের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠ থেকে গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। এমন কথাসাহিত্য যেমন সমকালের মানুষদের প্রবল প্রেরণা দিয়েছে, দিয়েছে সুস্থ বিপ্লবের শিক্ষা, তেমনি বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয়কে করেছে দীপ্ত, বহুমুখী।

দুই

যুদ্ধ সমকালের গল্প-উপন্যাসে গণবিক্ষোভের রূপ প্রধানত তিনটি দিক থেকে চিত্রিত—এক, গান্ধীজীর নয়ই আগষ্টের বিপুল আন্দোলনের পটভূমিকায়, দুই, গ্রামের চাষী ও

শহরের শ্রমিক শ্রেণীর মত সর্ব-হারাদের দুঃখ-দুর্দশা ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চিত্রে, তিনি, প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির দিক থেকে ফ্যাসীবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার মধ্য দিয়ে। এ সবের সঙ্গে কোন কোন লেখক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সংঘটিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কথা স্মরণে রেখে রাজনৈতিক উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ সময়ের ক্ষমতাবান লেখকরা ঐতিহাসিক আগষ্ট বিপ্লব ও ব্যাপক মধ্যবিত্ত ও সর্বহারাশ্রেণীর গণ-বিক্ষোভকে শিল্পের যথাযথতায় কাজে লাগিয়েছেন।

যুদ্ধ-সমকালে শহর কলকাতা হয়েছিল উত্তাল ফ্যাসিবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে। 'কর্ণফুলির ডাকে' গল্পের নায়ক ধ্রুবেশকে লেখক সুবোধ ঘোষ করেছেন সেইরকম আন্দোলনের এক যুবক নেতার মত। কার্জন পার্কের সভা ছিল সাম্যবাদীদের। 'পার্কের সভায় ভীড় হয়েছে খুব। মণ্ডপ উছলে জনতা রেলিং পর্যন্ত গড়িয়ে পড়েছে। শত শত লাল নিশানে লেগেছে ঝড়ো হাওয়ার পুলক।'[১১]

সভায় ধ্রুবেশের যে বক্তব্য তা মহৎ মানবতার কথায় দীপ্ত :

'আমাদের আত্মোৎসর্গে উজ্জ্বল সেই নতুন প্রভাতে মুক্ত মানবতার মিছিল পথ ধরে আসবে।'[১২]

লেখক সুবোধ ঘোষ ধ্রুবেশের দৃষ্টি দিয়ে জনতার বর্ণনা দিয়েছেন :

'জন সমুদ্রে গহন থেকে এক একটা জলস্তম্ভ উঠে যেন মহারোলে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। —'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' 'হাজার হাতের বজ্রমুষ্ঠ তুলছে ভৈরব গর্বে।'[১৩]

যুদ্ধে ভারতবর্ষের ভূমিকা নিয়ে রাজনীতিকদের নানা মতভেদ ছিল। সুবোধ ঘোষ নায়ককে করেছেন সাম্যবাদী। অন্যদিকে বর্ণনা করেছেন বিপরীত মতবাদীদের :

'দেশের শ্রদ্ধাস্পদ ছিল যারা, যাদের কাছে দুটো ভরসার কথা শোনবার জন্যে—কাজের ইসারা, পথের দিশা পাবার জন্যে লোকে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো, তারা দিনের পর দিন বিবৃতি দিচ্ছে।—'এ যুদ্ধে আমাদের কিছু করবার নেই। এ বৃটিশে জাপানে যুদ্ধ, ভারত নিরপেক্ষ।'

ধর্মতলার এক চায়ের কেবিনে বসে পরিচিত অপরিচিত কত লোকের মুখে ধ্রুবেশ মন্তব্য শোনে—'কিছু করবার নেই। বাদ-প্রতিবাদে কুতর্কের ঝড় ওঠে। ধ্রুবেশের এক একবার মনে হয় কিছু একটা বলি। সোজা একা প্রশ্ন করি, 'ভারতবর্ষ কার দেশ ?'[১৪]

'ঘরে আগুন' গল্পে মনোজ বসু বিক্ষুব্ধ গণমানুষের ও তাদের নেতৃত্ব-দানে সক্ষম এক মানুষের জটিল মানসিকতার চিত্র এঁকেছেন। যুদ্ধের সময় গ্রাম বাংলার বুকে

চাষীদের নানাভাবে বিপর্যস্ত হতে হয়। তারাই খাদ্য যোগায় অথচ মন্বন্তরে তারাই মুমূর্ষুদের তালিকায় শীর্ষে। প্রাচীনকাল থেকেই জমিদার শাসন করেছে চাষীদের, ধান তুলেছে নিজেদের ঘরে। চাষ তারা করে না, ভোগ করে। যারা চাষ করে তারা নানা ছলে অবহেলিত। সহজ সরল চাষীরা জমিদারের কৌশল বোঝে না। নিজেদের ভাগ্য ভেবেই তারা সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে জমিদারের পায়ের কাছে পড়ে থাকে। যে রসময় পনের বছর আগে গ্রামে এসেছিল চাষীদের মধ্যে সুদে টাকা খাটাতে, সে এখন গ্রামের জবরদস্ত জমিদার। তারই জমিদারীতে আসে মুকুন্দ পাঠশালা করতে। সে অন্যদের মত ক্ষণস্থায়ী শিক্ষক নয়, চিরকালের জন্যই বসবাস করে পাঠশালা চালাতে চায়। এই মুকুন্দ খুব ধীরে ধীরে বিষ্টু, পূর্ণ, জগন্নাথ এদের দিয়ে জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড করায়। জমির ধান তাদের ন্যায্য পাওয়া—এই দাবীতে তাদের শক্ত করে তোলে। যদি না দেয় তা হলে জমি চাষ করবে না জমিদারের, অন্যত্র তাদের কাজের ব্যবস্থাও করে আসে রসময়কে ফ্যাসাদে ফেলার জন্য। দাবী আদায়ের এই একটিমাত্র পথ। রসময় রাজি হলে আবার তারা জমি পাবে। যতদিন না পায় ততদিন অন্যত্র উপায়ের ব্যবস্থা। কিন্তু মুকুন্দ হেরে যায়। চাষীরা দীর্ঘদিনের পুরনো অভ্যাসে যে আত্মশক্তি হারিয়েছে তাতে তারা দুর্বল। চাষীরা গোপনে আবার ধান চাষ করে মুকুন্দকে না জানিয়েই। রসময় মুকুন্দকে চাষীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু মুকুন্দ অন্য ধাতে গড়া :

'যা বলেছে রসময়—সে লোকচরিত্র বোঝে—শুধু ভিটের মাটি নিয়েই পড়ে থাকবে ওরা। ভীরুর দল। আড়ালে আবডালে মুকুন্দর কাছে এতদিন অনেক বীরত্ব জাহির করেছে,—আবার তারই চোখের সামনে রসময়ের পা দুটো জড়িয়ে ধরতে লজ্জা-লজ্জা করছে, তাই প্রকারান্তরে তাকে চলে যেতে বলে, কিন্তু কোনদিন কোথাও মুকুন্দ পিছু হটেনি—

যেতে হয় দল বেঁধে ডংকা মেরে বেরুব, ভাই সব। একলা যাব কেন? পিছু হটে একলা পালাবার মানুষ নই আমি।'[১৫]

তাই মুকুন্দই গভীর রাতে তাদের ঘরে আগুন দেয়। আসলে তাদের ভীরুতা, কাপুরুষতা যে পুড়ে গেল সেই আগুনে! মুকুন্দ বোঝে এভাবে পুরনো জীবনকে বিদায় দিতেই হবে। তা না হলে নতুন বলিষ্ঠ সবল সুস্থ জীবন গ্রহণ সম্ভব হবে না, গল্পের শেষের সিদ্ধান্ত তাই :

'এ কি রোমাঞ্চকর প্রত্যাশা। সব মানুষ কোমর বেঁধেছে। হাতিয়ারের লড়াই চলেছে পৃথিবী জুড়ে। পোড়া ঘরের দিকে চেয়ে চেয়ে কি হবে ভাই? দুঃখরাত্রির শেষে উজ্জ্বল দিনমান। নতুন পৃথিবী—তোমার আমার সকলের। চল, এগিয়ে যাই—'[১৬]

যুদ্ধ সমকালের গণ-বিক্ষোভকে এক নতুন ধরণের শিল্পমূল্যে মনোজ বসু এই গল্পে উপহার দিয়েছেন।

'দুঃখ নিশার শেষে' গল্পেও আছে গণবিক্ষোভের কথা এক শ্রেণীসংঘর্ষের চিত্রের মাধ্যমে। জমিদার ছোটকর্তা সীতানাথের সঙ্গে পুরনো চাষী মাদারের যে সংঘর্ষ তা গল্পের শেষে ক্রমশ ব্যাপক রূপ নেয়। সীতানাথের জন্যই মাদারের অধিকারের কালমোটা গাছ গেল, চিরকালের জন্যে চলে গেল তার মেয়েও। তার সমস্ত দুঃখের মূলে সেই জমিদারী অন্যায় আবদার ও শাসন। মাদার চাষী জমিদারের অনুগত ও দুর্বল। কিন্তু সেই মাদার বিশ্বাসই যখন গ্রামের বহু মানুষের সভায় বক্তৃতা দেয়, তখন তার আত্মার সংকটের কথাই অবচেতন লোক থেকে স্বতঃস্ফূর্ততায় বেরিয়ে আসে :

'ও বাবু, পিরথিমে দেখছি সব বেটা শয়তান। শুধু মানুষ কেন, পিবথিমের মালিক ভগবান সুদ্ধ শযতান।'[১৭]

মাদার বিশ্বাসের বক্তৃতায় আছে নির্দোষ শ্লেষ। কিন্তু এই মাদাব বিশ্বাসকে লেখক করেছেন চিরকালেব অবহেলিত চাষীদেরই প্রতিনিধি যেন। লেখকের কথাতেও তারই স্বীকৃতি। সভার মানুষের কাছে মাদার বিশ্বাসের আত্মভোলা মনের বক্তৃতা প্রশংসা পায়। চাষীরাই তাকে দেখে অবাক হয়, বাহবা দেয়। তাদের কাছে মাদার বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য :

'নিতান্ত সামান্য জীবন, বুদ্ধির পরিধি সংকীর্ণ, পঞ্চান্ন বছর এই একভাবে কেটেছে, কিন্তু ইতিহাস বিবর্তিত হচ্ছে, আর কেউ জানে না—তারই অংশ হয়ে কোথায় এগিয়ে এসেছে আমাদের মাদার বিশ্বাস।'[১৮]

'দুঃখ নিশাব শেষে' গল্পে মনোজ বসু আশাবাদী। মাদাব বিশ্বাস নামের এক চাষীর মধ্য দিয়ে তিনি আগামী দিনের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ও তাদের নেতৃত্বের মধ্য থেকে যে বিরাট বিক্ষোভের ভিত্তি রচিত হতে পারে, তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। চাষীদের যথার্থ নেতৃত্ব দেবে চাষীই, বুর্জোয়া সমাজের শিক্ষিত মানুষ—এই বিশ্বাসকেও লেখক যেন প্রতীক প্রতিম চরিত্র ও বক্তব্যে ওতপ্রোত রেখেছেন। যুদ্ধ-সমকালেব রাজনীতির নানান বিপরীত স্রোতে সাম্যবাদী, মার্কসীয় শ্রেণীতত্ত্বের যে শিক্ষা বুদ্ধিজীবী মহলে গৃহীত হচ্ছিল কখনো সচেতনভাবে, কখনো অবচেতনলোকে, মনোজ বসুর চরিত্র-ভাবনা ও গল্পের উপসংহার অংকনে তার স্বীকৃতি মেলে।

অন্নদাশংকর রায় তাঁর 'মন পবন' গ্রন্থের 'মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না' গল্পে নায়িকা নোটনদির চরিত্র এঁকে দেশসেবা তথা দেশপ্রেমের এমন এক উদাহরণ দিয়েছেন—যাকে যুদ্ধের সময়ের দেশীয় মানুষদের সমবেত প্রতিবাদী গণমানসেরই

এক প্রতীক প্রতিনিধি বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। 'যে নোটনদি এক বেলা আহার করতেন, মাছ মাংস খেতেন না, ব্রহ্মচারিণীর মতো থাকতেন।'[১৯]—সেই নোটনদিই পরিবর্তিত মন ও জীবন প্রতিবেশে বিয়ে করে এমন এক যুবককে যে, ভারত সরকারের মার্জনা পেয়ে আন্দামান থেকে ফিরে-আসা এক সন্ত্রাসবাদী। কিন্তু নোটনদির জীবনের গতি ছিল সংসার ছাড়া। সেই নোটনদিই আবার স্বামীর মতবাদকে সহ্য করতে না পেরে বলে :

'এই মতবাদ আমার বিবেক বিরুদ্ধ। যতদিন পেরেছি সহ্য করেছি, কিন্তু ঘাতকের চেয়ে অশ্রদ্ধা করি বিশ্বাসঘাতককে। কী করে সে অশ্রদ্ধা চেপে রাখি? এই নিয়ে শেষকালে রাগারাগি হয়ে গেল। না হলেই ভাল হত।'[২০]

স্বামীকে ত্যাগ করে নোটনদি। সন্ত্রাসবাদ থেকে অহিংসবাদ, সমাজবাদ এবং সাম্যবাদী কৃষক মজুরে বিশ্বাস, এ সব থেকেও শেষে নোটনদির বিশ্বাস এসে দৃঢ় ভিত্তি পায় জাতীয়তাবাদে। ভারতীয় মিলিটারী অফিসারদের মধ্যেই দেশ স্বাধীন করার মহান ব্রতের স্পষ্ট ইঙ্গিত পায় :

'এরা আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি। এরাই আমাদের রক্ষী। দেশ কাদের? যারা রাখতে পারে তাদের। এরাই একদিন দেশকে জয় করে নেবে। স্বাধীন করে দেবে। এতদিনে আমার প্রত্যয় হলো যে ভারত সত্যিই স্বাধীন হবে, হবে এই উপায়ে।'[২১]

এমন বিশ্বাসে স্থিত হয়েই নোটনদি তাদের সঙ্গে ভাই-বোনের সম্পর্ক রচনা করে তাদের মন ও মনের মানুষ হিসেবে বেছে নেয়। আলোচ্য সময়ের উত্তাল দেশীয় আন্দোলনের পরিবেশে নোটনদির যে মহত্তম আত্মোৎসর্গ—তা সমকালের জাতীয় চেতনারই যথাযথ শিল্পীত বিম্বন।

নবেন্দু ঘোষ তাঁর 'এই সীমান্তে' গ্রন্থের অন্তর্গত 'অধিকার' গল্পে আগস্ট আন্দোলনের প্রতিবেশ রচনা করে এক চরম অভাবের কারণে চৌর্য্যবৃত্তিতে রত নীচের তলার মানুষ বুধনকে শহীদ করেছেন। বুধনের যে যন্ত্রণা তা যুদ্ধের সময়ে তৈরী-হওয়া অন্নাভাব থেকে কিছু খেয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা। যুবতী স্ত্রী জানকীর ভালোবাসা তার মনের দিক থেকে সমস্ত রকম জীবনযাপনের একমাত্র শক্তি ও পাথেয়। কিন্তু অভাবে সেই স্ত্রীর সমস্ত রকম অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধু কৈলাসের ঘরে রাত কাটাতে পাঠায় কিছু অন্নের জন্য। বুধনের যন্ত্রণা তখন অন্তমুখীন। শহরে আগষ্ট আন্দোলনের প্রবল ঢেউ, উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ, চাপা উত্তেজনা, সংঘবদ্ধ প্রতিবাদী শক্তির তৎপরতা। সাম্রাজ্যবাদী শাসক শক্তি সমস্ত রকম প্রতিরোধ ব্যবস্থায় কঠিন, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। বুধন একের পর এক চুরি করতে গিয়ে বিফল হলেও ক্রমশ অস্ত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে :

'রাত্রে স্বপ্নাবিষ্টের মত বাড়ী ফিরিয়া সেক্রেটারিয়েট প্রাঙ্গণে জনতার উপর পুলিশের গুলি বর্ষণের কথা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিয়া সে জানকীকে বলিল—"উঃ, জানকী, কত খুন পড়েছে।—"

'খুন।'—জানকী চমকিয়া উঠে।

'হাঁ—উঃ—কত লোকের খুন আজ দেখলাম, হোরী খেলার খুন-খারাবি রংয়ের মত লাল খুন।'[২২]

লেখক আগষ্ট আন্দোলনের মত যুদ্ধ-সমকালের পটে এমন এক সর্বহারা শ্রেণীর মানুষকে নায়ক করেছেন 'অধিকার' গল্পে, যে ব্যক্তির যন্ত্রণা থেকে, অভাব-অভিযোগ থেকে ক্রমশ সার্বিক ও জাতীয় মানস-যন্ত্রণার অনুপন্থী হয়ে উঠেছে কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্রের ন্যায়ে। বুধন চরিত্রটি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক গল্প ও উপন্যাসের নায়কের কথা মনে করিয়ে দেয়। গল্পের শেষে বুধনকে লেখক করেছেন শহীদ। রাইফেলধারী গোরা সৈনিকদের গুলিতে মৃত্যুর আগে সে চীৎকার করে বন্দেমাতরম ধ্বনি করেছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদী কণ্ঠে এবং তার স্ত্রী জানকীর একটা আশ্রয় করে দিয়েছে প্রকারান্তরে কৈলাসের ঘরে। কিন্তু তার এই মানস-পরিণতির ন্যায়সঙ্গত রূপান্তর-চিত্র গল্পের মধ্যেই যথাযথভাবে এঁকেছেন লেখক :

'সহরের আন্দোলন তাহার চিন্তাকে বদলাইয়া দিয়াছে, সেক্রেটারিয়েটে নিহত দেশভক্তদের রক্তস্রোত অহরহ তাহার মাথায় ঘুরিয়া বেড়ায়। হাঁ, স্বরাজ চাই, তাহা না হইলে এই অচলায়তন সমাজের শিকড় নড়িবে না, তাহার চুরি করা শেষ হইবে না। মানুষ হিসাবে তাহার কতকগুলি আবিষ্কার আছে। সকলের মত বাঁচিয়া থাকা তাহাদের মধ্যে একটি।

সেদিনও সে সারাদিন উচ্ছৃঙ্খল জনতার সহিত সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইল, টেলিগ্রাফের লাইন কাটিল, রাস্তা খুঁড়িল, গাছ কাটিল, সাহেব বেশধারী লোকদের অপমান করিল। দিনের বেলায় সে আর বাড়ী ফিরিল না।'[২৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম আগষ্ট বিপ্লবকে কথাসাহিত্যে ব্যবহার করতে বসে একাধিক লেখক শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ নয়, সর্বহারা শ্রেণীর মানুষকেও চরিত্র করেছেন। 'অধিকার' গল্পের বুধন তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ভেজাল' গল্প সঙ্কলনের 'বিলাসমন' গল্পে শাসক-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিস্বরূপ 'জাতবেনে' স্টিফেন এফ. বিলাসমনের ও তার পরিবারের চিত্র এঁকে সাম্রাজ্যবাদী মানুষের কূট কৌশল, ধূর্তামি, শক্তিমদমত্ততা, সমস্ত শাসনভার গ্রহণ করার চাতুর্য ইত্যাদিকে এঁকেছেন। সেই সংগে ভিতরে ভিতরে ধূর্জটির মত ছেলেদের

বিজাতীয় শাসকের প্রতি ক্রোধ ও সেই সূত্রে সমস্ত মানুষের মনে গণজাগরণের স্ফুলিঙ্গটিকে স্পষ্ট করেছেন। বিলাসমন নগরগড়ের মহীধন রায়ের সমস্ত জমিদারী ও কারখানার ওপর স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্ব করতে শুরু করে মহীধরের বন্ধুত্ব, আতিথেয়তা সূত্রে ম্যানেজার পদটি গ্রহণ করার পর। বিলাসমনের যাবতীয় ক্রিয়া-কর্ম যেন বিরাট ঔপনিবেশিক শাসন যন্ত্রেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ভারতের বুকে যুদ্ধ-সমকালে শাসকরা যে শোষণ পীড়নের যন্ত্র চালায় নির্বিবাদে, নির্বিচারে, বিলাসমন তারই প্রতীক চরিত্র। গল্পের শেষে মালিক এবং তার একদা-আশ্রয়দাতা ভদ্র অথচ ক্রুদ্ধ মহীধরকেও স্বভাবসিদ্ধ কৌশলে নিজের দলে রাখতে সমর্থ হয় :

'বিলাসমন নিজে উঠে গিয়ে আলমারি খুলে বোতল নিয়ে এল, গ্লাসে ঢেলে মহীধরের সামনে ধরে দিয়ে বলল, 'খেয়ে দ্যাখো খাসা জিনিস। তারপর এসো আমরা মাথা ঠাণ্ডা করে পরামর্শ করি। কর্তব্যের চেয়ে বড় কিছু নেই রায়। আদর্শের জন্য দরকার হলে প্রাণও দিতে হয়। ঈশ্বর যে নির্দেশ আমায় দিয়েছেন আমাকে তো মানতেই হবে।'[২৪]

ভারতের বিখ্যাত মুসলমান সম্রাট মুঘল ঔরংজীব ও বৃটিশ বিলাসমনের কৌশল একই। দেশীয় গণজাগরণ যার চাপে মহীধর ছিল বিপর্যস্ত, আড়ষ্ট, তাকে কিভাবে নেশা দিয়ে দমন করা যায়, অস্বীকার করা যায়, গল্পের 'সিদ্ধান্ত'-চত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তা-ই দেখিয়ে দিয়েছেন।

তিন

মনোজ বসুর 'সৈনিক' উপন্যাসে কাহিনীর স্বাভাবিক গতিতেই এসেছে আগষ্ট আন্দোলন প্রসঙ্গ। নায়ক পান্নালাল কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে শুনল গান্ধীজির চরম নির্দেশ—ঐতিহাসিক আগষ্ট আন্দোলনের উদাত্ত অথচ কঠিন আহ্বান 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'—'ডু অর ডাই।' এই আন্দোলনে ভারতের সর্বস্তরের মানুষ—বুঝিবা একই মায়ের নাড়ীর সূত্রে সামিল। পান্নালাল সঙ্গী রমেশকে নিয়ে ট্রামে যেতে যেতে মুখোমুখি হয় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের :

'ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার বিদীর্ণ করে মাথার উপরে অকস্মাৎ আগুনের গোলা লোফালুফি শুরু হল। বর্মার পাহাড়ে জঙ্গলে যে কাণ্ড চলছে, এই কলকাতার বুকের ওপর এ-ও প্রায় তেমনি। বড় বাড়ির দোতলার বারান্দা—কংক্রিটের বেষ্টনী। তারই আড়াল থেকে অগ্নিপিণ্ড একের পর এক এসে পড়ছে অবিরল ধারায়। ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের দলগুলি ছুঁড়ছে—কিন্তু মানুষ দেখা যাচ্ছে না দেওয়ালের বালি খসিয়ে গুলি নীচে পড়ছে।'[২৫]

বস্তুত আগষ্ট আন্দোলন সমকালের এক বিশেষ রাজনৈতিক আন্দোলন। মনোজ বসু সেই সময়ের উত্তেজনা ও রাজনৈতিক তাৎপর্যকে পটভূমি ও কাহিনীর মধ্যে চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন শিল্পের যথাযথ দায়িত্ববোধ থেকেই।

এই আন্দোলন শুধু সাধারণ মানুষকেই স্বদেশী সৈনিকের মহান ব্রতের মত উদ্বুদ্ধ করেনি, সত্যিকারের যারা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত সেইসব রাইফেলধারী সৈনিকদেরও নানাভাবে প্রভাবিত করে—কখনো পরোক্ষে, কখনো প্রত্যক্ষে :

'৯ই আগষ্ট ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে যে আলোড়ন আনল, তার প্রতিঘাত সৈনিক জীবনে বিরাট এক সমস্যার সৃষ্টি করল। জাতীয় নেতৃবৃন্দকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করায় সৈনিকদের মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু সংগঠন তাদের মধ্যে নেই, অত্যাচারে, নিষ্পেষণে তাদের জীবনকে দলে পিষে দিয়েছে সামরিক কর্তৃপক্ষ, সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গেও তাদের কোন যোগাযোগ নেই। তাই পথ তারা জানে না তাদের বিক্ষোভকে প্রকাশ করার। জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এই মানুষের দল রুদ্ধ ক্রোধে জ্বলে ওঠে, নিষ্ফল আক্রোশে ঠোঁট কামড়ে ধরে, হতাশায় মুহ্যমান হয়ে যায়।'[২৬]

আগষ্ট বিপ্লব মিলিটারীদের সংঘর্ষকে তীব্র করে তোলে। সৈনিক জীবনকে যারা ব্রত হিসেবে নিতে বাধ্য হয়েছে পেটে অন্ন জোটানোর আশায়, তাদের মধ্যে এই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন রকম। এখানেও একদল দেশকে মুক্ত করার জন্য মনে মনে তৈরী, আর একদল—যারা বৃটিশ শাসকের আজ্ঞার তল্পিবাহক, তারা যে কোন উপায়ে হোক, সৈনিকদের এই মনোবল ভাঙতে বদ্ধপরিকর। যেহেতু দেশপ্রেমী সৈনিকদের সংগঠন নেই, তাই তাদের সমস্ত কথায়, প্রতিবাদে চাপা ক্রোধ আছে, প্রকাশও সন্তর্পিত :

'এদিক ওদিক একটু দেখে নিয়ে জমাদার সাহেব চাপা গলায় বললেন, 'শুনেছ, কোলকাতায় ভীষণ কাণ্ড হচ্ছে। কংগ্রেসীদের সঙ্গে মিলিটারীদের রীতিমত লড়াই শুরু হ'য়ে গেছে। এই ভাবে আর কিছুদিন চলে, তাহলে আর জাপানকে ঠেকায় কে। কিন্তু জাপান যে কেন বর্মা দখল ক'রে চুপচাপ ব'সে রয়েছে, বুঝি না, এইতো মৌকা। এই মৌকায় চট্‌পট্ এসে ঢুকে পড়ুক—তাহলে তো সব ঝামেলাই চুকে যায়—'

জয়ন্ত কি একটা বলার জন্য মুখিয়ে ওঠে, পাঁচকড়ি তার হাতটা চেপে ধরে। জমাদার সাহেব বললেন, 'আজ তোমাদের আট জনের নাইট ডিউটি। ভাল করে ডিউটি দিও কিন্তু—এখানকার হালচাল তেমন ভাল নয়—অনেকরকম সন্দেহজনক খবর এসেছে—'

শিষ দিতে দিতে জমাদার সাহেব বেরিয়ে গেলেন। পাঁচকড়ি জয়ন্তকে বললে, 'তুমি চট করে অমন মাথা গরম কর কেন। ও শালা কুত্তাকে ওসব কথা বলে লাভ কি।

জয়ন্ত ফুঁসে উঠল, "দেখ একবার মজাটা। এখানে দেশ শুদ্ধ লোক জাহান্নমে যাক, তাতে ওঁর কিছু এসে যায় না। ওঁর যত ভরসা জাপানের ওপর। জাপান যেন শ্রীগৌরাঙ্গের চেলা হয়েছে, আর মালয়, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, বর্মায় প্রেম বিলিয়ে বেড়াচ্ছে। এদেরই মত সব লোক আজ আমাদের মত মানুষের বৃটিশ বিদ্বেষের সুযোগ নিচ্ছে। ও ভাবছে, জাপান ভারতে ঢুকলেই মোসাহেবি করে একটা মেজর কি কর্নেল হয়ে যাবে।"[২৭]

কলকাতার বুকে, তথা সারা ভারতের বুকে মিলিটারীদের অত্যাচারের কারণে যে তীব্র বিদ্বেষ তৈরী হয় ভারতীয় সাধারণ মানুষের মনে, তা সৈনিকদের ব্যারাকের দিকে এগোয়। সেখানেও ঘৃণা, ক্রোধ, আক্রোশ, আগুনের দাহ নিয়ে আঘাত করতে চায়। বরেন বসুর উপন্যাসে সেই চরম অগুনের সামনে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত হানতে বসে বাঙালী সৈনিকদের মধ্যে যে বিপ্লবজনিত সুস্থ প্রতিক্রিয়ার জাগরণ ঘটে, তার সুন্দর চিত্র আছে :

'ওয়াগনের পেছনে সেই চাপা স্বর হঠাৎ চিৎকারে ফেটে পড়ল। পাঁচকড়ি রাইফেল কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে ট্রিগারে আঙুল রাখলে। ব্যাক্সাইটের মধ্যে দিয়ে ফোরসাইটের নক্ এবার সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। অনেকগুলো লোক গোটা কুড়ি মশাল হাতে জমা হয়েছে। তাদের রণধ্বনি ফেটে পড়ল, "বৃটিশ ভারত ছাড়ো।"

পাঁচকড়ির হাত কেঁপে ওঠে। 'গুলজারিকে বিচেবিচ্ ছে বজে' থেকে রাইফেলের মুখ সরে যায়—তার শিথিল হাতের ওপর রাইফেলটা কাৎ হয়ে যায়। কেমন করে এদের ওপর সে গুলি চালাবে। এরা যে দেশভক্ত, ভারতের স্বাধীনতার জন্যে মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—প্রতিটি ভারতবাসীর শত্রু বৃটিশকে উচ্ছেদ করতে।

আবার চিৎকার উঠল, "বৃটিশ ভারত ছাড়ো—" লোকগুলি জলন্ত মশাল উঁচু করে দুরন্ত বেগে দৌড়ে আসছে। উন্মত্তের মত মশালগুলো মাথার ওপর তুলে ধরে বন্ বন্ করে ঘোরাচ্ছে।"[২৮]

যুদ্ধের সময় বিদেশী সৈনিকদের বিরুদ্ধে যে প্রবল গণবিক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তা যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেখা দেয়, তেমনি রাজনীতির সঙ্গে দেশসেবার ও ইংরেজ রাজত্বের অবসানকামী মানুষের অদম্য উৎসাহের মধ্যেও ধরা পড়ে। মনোজ বসু 'সৈনিক' উপন্যাসের নায়ক পান্নালাল—যে একাধিকবার দীর্ঘ সময়ের মাপে কারাযন্ত্রণা ভোগ করেছে, তার সঙ্গে ধনী হরিহর রায়ের কন্যা সুপ্রিয়ার কথোপকথনে সেই সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরুদ্ধে আক্রোশ ও ঘৃণাকে তীব্র করে দেখিয়েছেন। পান্নালাল সুপ্রিয়াকে বলে :

'......সাদা চামড়া হলেই লাটসাহেব হয় না। পরাধীনের পায়ের শিকলের খবরদারি করে বেড়ায়—ওদের জব্দ করবার সুযোগ পেলে কিছুতে আমি ঠিক থাকতে পারি না।

সুপ্রিয়া বলে, গোটা জাতের বিরুদ্ধে আক্রোশ? কিন্তু ইংরেজ কেবল তো লিওপোল্ড আমেরি নয়, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজও—

পান্নালাল বলে, সেইটে মনে থাকে না। দু'শ বছরের গোলামি স্মৃতি-ভ্রংশ করে দেয়।'[২৯]

বাঁকাবড়শি গ্রামে কৃষক সভার যখন আয়োজন করতে ব্যস্ত সুপ্রিয়ারা, তার মধ্যেকার উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে, চরিত্রগুলির আত্মগত চিন্তা-ভাবনার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিবাদকে অগ্নিগভ করেছেন মনোজ বসু:

'ভলান্টিয়ারের দল মার্চ করে যাচ্ছে মাঠের ওদিক দিয়ে। শুনতে পেল চীৎকার করছে তারা—

জাপানকে—রুখতে হবে।

সুপ্রিয়ার চোখ জলে উঠল। আগুন জ্বালাতে হবে শহরে গ্রামে সর্বত্র মানুষের মধ্যে। সাম্রাজ্যলোভীদের রুখব এক হাতে, আর এক হাতে ঘাড় ধরে বিদায় দেব সাম্রাজ্যভোগীদের।'[৩০]

লেখক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে উপন্যাস লিখতে বসে দেশের মানুষের সব প্রতিবাদী সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণবাদ-বিরোধী কণ্ঠস্বরকে যে অস্বীকার করতে পারেন নি তাঁর শিল্প চেতনায়, 'সৈনিক' উপন্যাসে তার স্পষ্ট প্রমাণ রেখেছেন। সে সময়ে দেশসেবার অর্থই ছিল ইংরেজবিরোধিতা, সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শোষণবাদী সমস্ত রকম অত্যাচারের রথচক্রকে প্রতিহত করা। 'সৈনিক' উপন্যাসে বউডুবির হাটবারের দিন রাতে গ্রামের মানুষ প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করবার জন্য যুদ্ধের মহড়া দেয় হরিহর রায়দেরই 'সেকেলে বাগিচা'য়। এমন মহড়া বস্তুত কার্তিক, জগদীশ প্রভৃতি গ্রামের অশিক্ষিত কৃষক-মানুষের পক্ষে যুদ্ধ-প্রতিরোধের সঙ্গে দেশ-সেবার ব্রত গ্রহণেরও:

'রাত্রে গেরিলা যুদ্ধের মহড়া। এক ছোকরা পাঞ্জাব না কোথা থেকে ওস্তাদ হয়ে এসেছে। রাতের অন্ধকারে যুদ্ধের অভিনয়। মনে হচ্ছে, সত্যিই বুঝি এসে পড়েছে কোন নির্মম নিদারুণ শত্রু। তাদের উৎখাত করতে হবে দেশ থেকে, বাঁচাতে হবে জাতির ইজ্জত। মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো ট্যাঙ্ক-এরোপ্লেন নেই, দেশপ্রেম আর প্রাণের প্রতি নিস্পৃহতা—এই হল আসল অস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের। ...আজকে নূতন উপলব্ধি হল। যুদ্ধের এই অভিনয়ের মধ্যেই তার বীরহৃদয় নেচে ওঠে। শত্রুকে নাস্তানাবুদ করব,

এই দেশের মাটিতে পা রেখে স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলতে দেব না তাদের। ন্যায় অন্যায় মানব না, দয়াধর্ম নেই—আমার দেশকে যারা নিগড়ে বাঁধবে তারা কোন রকম মানবিকতার প্রত্যাশা করতে পারে না আমাদের কাছ থেকে। এমনি এক ভয়ানক সংকল্প কাত্তিক এবং আর সকলের মনে মনে। জগদীশ…মন্তব্য করলেন, শোধ তুলব আমরাও—প্রতিজ্ঞা করে আছি। শত্রু-মানুষকে মেরে শেষ করে নয়, আদিকালের এই বিজীর্ণ-হিংস্র মতবাদটাকেই নিঃশেষ করে মেরে।'[৩১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশ তথা সারা ভারতের যে রাজনীতি, তা ছিল গান্ধীজি নির্দেশিত অহিংসবাদে দীক্ষিত। কিন্তু সে মতের বিরুদ্ধতাও ছিল নানাক্ষেত্রে। অহিংসা নয়, হিংসাও চাই। যারা শোষক, তাদের যেভাবে হোক ভারত ত্যাগে বাধ্য করার জন্য হিংসার দরকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ক্রমশ সন্ত্রাসবাদীরা তৎপর ছিল সারা দেশে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ ধীরে ধীরে সরে গিয়ে সমাজবাদী ভাবনার সূত্রে আসে নব সাম্যবাদ, আবার গান্ধীবাদ তথা অহিংসবাদও সারা দেশের মানুষকে আবেগে দীপ্ত ও উতরোল করে। মনোজ বসু তাঁর 'সৈনিক' উপন্যাসে নায়ক পান্নালাল ও তার বন্ধু রঞ্জনের সংলাপ-বিনিময়ের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, উপনিবেশবাদকে ধ্বংস করার উপযোগী নানাপথের অবলম্বন প্রসঙ্গে সন্ত্রাসবাদ ও অহিংসবাদের যোগটি দেখিয়েছেন। বন্ধু রঞ্জনের বাড়ি আত্মগোপন করেছে পান্নালাল। সেখানে আছে এক-কালের দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদী বৃদ্ধ পঙ্গু নেতা সূর্যকান্ত। রঞ্জনকে পান্নালালের ঈষৎ শ্লেষাত্মক কথা :

'কিন্তু চোখ ধাঁধানো আলো যে ওদের। ভুল পথে নিয়ে চলেছিলেন।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে রঞ্জন বলে, ছি-ছি—কি বলিস তুই পান্নালাল?

তা ছাড়া আর কি? সূর্যকান্ত—যিনি ডাকাতি করেছেন, গুপ্ত সমিতিতে নিয়ে এসে ছেলেদের মাথা ঘুলিয়ে দিতেন, মনিহারি দোকানের আড়ালে অস্ত্র যোগাতেন দলের মধ্যে—

রঞ্জন বলল, ওদেরই পথে আজও চলেছি আমরা।

অহিংসবাদী নৈষ্ঠিক গান্ধীভক্ত এই রঞ্জনেরা—নির্মম নির্যাতনের মধ্যে কি প্রশান্তি পান্নালাল কতদিন স্বচক্ষে দেখছে। অবাক হয়ে সে রঞ্জনের কথার পুনরাবৃত্তি করে, ওদেরই রক্তাক্ত পথে?

রঞ্জন বলল, স্বাধীনতা অস্ত গেছে রক্তের সমুদ্রে। উদয়-পথও তার রক্ত-সমুদ্রে ভাই।

তোরাও চাস। দেশের লক্ষ লক্ষ ঘর-গৃহস্থালী রক্ত বন্যায় ভেসে যাবে?

শান্ত কণ্ঠে রঞ্জন বললে, আমরা চাই, লক্ষ লক্ষ মরা গৃহস্থালী রক্তস্পন্দনে নেচে উঠবে।

একটু স্তব্ধ থেকে বলে, সেই রক্ত ধারার ভগীরথ হলেন সে-যুগের সূর্যকান্ত থেকে আজকের গান্ধীজি এবং যাঁরা যাঁরা আত্মবলি দিচ্ছেন সকলে। হিংসা থেকে অহিংস নীতিতে পৌচেছি, কিন্তু পথ একটাই—সাহস ও বীরত্বের পথ, দুঃখ ও লাঞ্ছনার পথ।'[৩২]

লেখক সন্ত্রাসবাদ থেকে অহিংসবাদের রাজনীতিতে একটা ধারাবাহিক দেশপ্রেমের স্রোতকে লক্ষ্য করেছেন। গণজাগরণেও গণবিক্ষোভের একটি ঐতিহাসিক ক্রমকে পান্নালাল-রঞ্জনের সংলাপে ধরতে চেয়েছেন। উপন্যাসের শেষে নায়ক পান্নালাল বুর্জোয়া স্বার্থসর্বস্ব, জোতদার-মজুতদার শ্রেণীর চক্রান্তে আবার জেলবন্দী হয়। কিন্তু সে সময়ের একজন দেশকর্মীর তো জেলকে ভয় নেই, তার মধ্যে দেশসেবার আবেগই বড়। গণবিক্ষোভকে বিচ্ছিন্ন করে যে সব ছোট বড় নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হত, তারা তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করত। কারণ এমন তুচ্ছতাচ্ছিল্যের অন্তরালে থাকে দীপ্ত আবেগ, সমগ্র ভারতবর্ষকে শোষিত রূপে দেখে মুক্ত করবার উজ্জ্বল শপথ। জেলের বাইরে সুপ্রিয়ার একটি প্রশ্নের উত্তরে পান্নালালের কণ্ঠে সেই ফ্যাসিবাদী অত্যাচারের স্বরূপ তুলে-ধরা, ফ্যাসিবাদের প্রতি ঘৃণা যেমন প্রকট, তেমনি স্পষ্ট হয় শোষকদের অন্যায়ভাবে অত্যাচার করার প্রতি ধিক্কার দান :

'বিরাট বন্দী-শিবির ভারতবর্ষ , সমুদ্র আর হিমালয়ের পাঁচিলে বিংশ শতাব্দীকে আটকে রাখা হচ্ছে। কোটি কোটি মানুষ নিষ্কর্মা এই সংকট সময়ে। দেশকে ভালবাসা এখানে অপরাধ। অসওয়াল্ড মোসলের মতো ফ্যাসি-বন্ধু ও দেশে মুক্তি পায়, আর নেহেরু এখানে পচে মরেন কারাগারে। বাইরের জেল বেশি ভয়ংকর বলে ছোট্ট জেলে শামুকের মতো মাথা গুঁজে ঢুকতে আর লজ্জা পাইনে।'[৩৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা তীব্র হয়ে দেখা দেয়। দেশের যেসব মানুষ সৈন্যদলে যোগ দিয়ে বৃটিশ শাসককে সাহায্য করতে গিয়েছিল, তারাও একসময় বৃটিশ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সামিল হয়ে ওঠে। যুদ্ধ যখন আন্তর্জাতিকভাবে শেষ হয়ে যায়, জার্মানীর নাৎসীবাহিনী বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে, আত্মসমর্পণে বাধ্য হয় যখন জাপানও, তখন সচেতন ভারতীয় সৈন্যরা সমবেত ধ্বনি তোলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আন্দোলন তীব্র করার। এর চিত্র 'রঙরুট' উপন্যাসের শেষে লেখক সাহসের সঙ্গে উপস্থিত করেছেন :

'তিন নম্বর ব্যারাক থেকে আওয়াজ উঠল, "বৃটিশ—ভারত ছাড়ো।"

সঙ্গে সঙ্গে বাকী সবকটি ব্যারাক থেকে আওয়াজ ফেটে পড়ল, "বৃটিশ—ভারত ছাড।" প্রত্যেকটা ব্যারাক থেকে আওয়াজ উঠেছে, ছেলেরা উল্কার মত দৌড়চ্ছে প্যারেড গ্রাউণ্ডের দিকে। মাঠের মাঝখানে সমস্ত কোম্পানিটা বজ্রনিনাদে ঘোষণা করল, "বৃটিশ—ভারত ছাড।"

উন্মত্ত ছেলেরা রহমানকে ঘিরে ধরেছে, তুলে ধরেছে তাদের বুকের ওপর, চেপে ধরেছে তাদের গরম বুকের মাঝখানে, হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে দড়িটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে, সকলে মিলে দিয়েছে তাতে আগুন লাগিয়ে। গোল-পোষ্টের বাঁশগুলো টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়েছে। রহমানের সংজ্ঞাহীন দেহটাকে বুকের ওপর নিয়ে মাঠময় ছুটোছুটি করছে, লাফাচ্ছে, নাচছে, হাসছে-কাঁদছে, চেঁচাচ্ছে, চিৎকার করছে.........'[৩৪]

'উনপঞ্চাশী' উপন্যাসে গোপাল হালদার গান্ধীজির নেতৃত্বে জ্বলে-ওঠা বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলনের সূচনায় যে সারা দেশের রক্তিম বিদ্রোহের ছবি, তা আঁকতে বসে নায়ক ডাক্তার বিনয় মজুমদারের মনের তীব্র প্রতিক্রিয়ার সূত্রে কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন। এমন তথ্যচিত্রের উপন্যাস-সম্মত পরিবেশনে আগষ্ট আন্দোলনটি শিল্প-যাথার্থ্য লাভ করেছে। বিনয় গান্ধীজির আন্দোলন সম্পর্কে উত্তেজিত, আশান্বিত এবং তীব্রভাবে উৎসুক। কলকাতার বড চাকুরে মিষ্টার মিত্রের বোন, কলেজের তরুণী ছাত্রী বিনয়কে খবর দেয়:

'ডাক্তার খাঁ গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করেছিলেন, অনেক কথা হয়। সেসব তিনি বললেন। গান্ধীজি বলেছেন, 'ডাক্তার খাঁ আমি জেলে যাচ্ছি, এবার শেষ যুদ্ধ। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'।

বিনয়ের উত্তেজনা গোপন করা সম্ভব হল না, বলেছেন গান্ধীজি 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে?'

তাই বললেন খাঁ—গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে।

মিষ্টার মিত্তির বললেন, কিন্তু করেঙ্গে তার মানে কি?

বিনয় বললে—স্বাধীনতা।

কি করে তা হবে?

তাই তো বললেন তিনি—বোম্বাইর ওরা জানে।

বললে নাকি ডাক্তার খাঁ?—মিষ্টার মিত্তির জিজ্ঞাসা করলেন।

চিত্রা বললে, আমি তো শুনি নি, তবে ডাক্তার খাঁ বলেছেন, বোম্বাইতে ট্রাম

পুড়িযে দিচ্ছে। লাইন উপড়ে ফেলছে। রেল বন্ধ হওযা চাই এখন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বন্ধ হওয়া চাই। কলকাতার ছাত্ররা যদি তাদের মানুষ্যত্বের প্রমাণ না দেয় তবে গান্ধীজির অনশনে মৃত্যু হলে তারাই হবে সে জন্য দায়ী।'[৩৫]

চিত্রার বর্ণনায় আছে আগষ্ট বিপ্লবের সূচনার ছবি। সারা ভারত জুড়ে এই বিপ্লব যে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে, তার ইঙ্গিত, সেই আন্দোলনের উত্তেজনার ভূমিকাও এমন মন্তব্যে স্পষ্ট। এমন আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া আর এক রূপ নিয়েছে কলকাতার বুকে। আগষ্ট আন্দোলনের সর্বগ্রাসী আগুন মুহূর্তের মধ্যে কলকাতার যুবকদের করে তুলেছে প্রমত্ত, সজীব, সবুজ। বিনযের সামনে আছে কংগ্রেসীদের ডাকে সাড়া দেওয়া আগষ্ট আন্দোলনের বাস্তব রূপ, আর পাশাপাশি কমিউনিষ্টদের ভিন্ন-জাতীয় তৎপরতা। এই দুয়ের মাঝখানে বিনয়ের দৃষ্টি দিয়ে লেখক যে আন্দোলনের অন্তস্থ রূপ এঁকেছেন, তা যেমন সমসাময়িক রাজনীতির ছায়াপাত ঘটায়, তেমনি বিনয়ের নিজের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বাড়ায় :

'বিনয় জানে না কোন দিকে সে যাচ্ছিল—সমস্ত মন তার উষ্ণ ও বিক্ষুব্ধ। হঠাৎ খেয়াল হল ট্রাম থেমে গেছে। সামনে অনেক ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে। কি ব্যাপার? সামনে মারামারি হচ্ছে। একটা ট্রামে কে আগুনও লাগিযে দিচ্ছে। উত্তেজিত কণ্ঠে একজন ছাত্র যেতে যেতে বললে, 'বোম্বাই কলকাতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না কলকাতার ছাত্র মরেনি।' 'সভায় চলো, সভায় চলো' একটা চীৎকার।...

কিন্তু ছুটছে কেন এরা? সবাই ছুটছে। ছেঁড়া চপ্পল, হাতের বই পথে পড়ে রইছে, ফিরে তাকাচ্ছে না—কেন ছুটছে এই যুবকের দল?

সার্জেণ্ট এসেছে—তাড়া করেছে—মাথা ফেটে গেছে কারো কারো।

ছুটছে এইজন্য? বিনয় দাঁড়িয়ে রইল। ডাক্তার সে, এগিযে যেতেও ইচ্ছা করল না তার আজ। শুধু এইজন্য কলকাতার ছাত্র পালায়?—যারা ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দেয় বলে বিনয় জানে। সমস্ত সম্মান যেন তার এক নিমেষে আবার ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। এমন করে কি পালায় তারা? পালাত নীরদ? কিন্তু নীরদরা কমিউনিষ্ট। তারা এখানে এভাবে আসতই না, ট্রাম পোড়াতে, গাড়ী ভাঙতে তারা আসত না। কে জানে ভালো করত কিনা না এসে, কিন্তু পালাত না।'[৩৬]

গান্ধীজি প্রবর্তিত উনেশ শ' বিয়াল্লিশের ঐতিহাসিক আগষ্ট আন্দোলনকে গোপাল হালদার সমকালীন রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করেছেন 'ঊনপঞ্চাশী' উপন্যাসে। নায়ক বিনয় নিজেই বলে সে কমিউনিষ্ট নয়, সে দেশসেবক, সে ভারতীয়। তার দৃষ্টিতে এবং কমিউনিষ্ট কর্মী নীরদ, অমিত, সুধা গুপ্তা—এদের মধ্যে

দিনের অধিকাংশ সময় কাটালেও এদের সাহচর্যের অভিজ্ঞতায়, নানান তর্কের মধ্যে দি· এমন বিশাল জাতীয় আন্দোলনকে বার বার যাচাই করে নেয় নিজের মনের মধ্যে অমিতের বাড়ি অসুস্থ অমিতকে দেখতে এসে জটিল রাজনৈতিক তর্ক শুরু হয়ে যায়। ও মধ্যে লেখক খবর দিয়েছেন উত্তাল কলকাতার আন্দোলন-আক্রান্ত চারিত্র্যের এ সেই সঙ্গে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘর্ষেরও :

'দেখেছে সে, কাল রাত্রি থেকে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের আলো আর নেই—সব ভ হয়ে গিয়েছে, বিজলীর তার কাটা হয়ে গিয়েছে—সমস্ত পাড়াটা নাকি একেবা অন্ধকার। সাহেব পাড়ায় কেউ এ চেষ্টা করে নি, এ চেষ্টা দক্ষিণ কলিকাতায়ও এত· সামান্য, তবু অমিতের কথা বলতে ভালো লাগল না। অমিত বলছে, বুঝেছ জনতা হয় উন্মাদ, কিন্তু নেতারাও জনতাকে পথ দেখিয়ে যান নি।

পথ নিজে নিজে বেছে নেবে সবাই।

—তা নিতে পারলে 'নেতৃত্ব' শব্দটাই থাকত না। ছেড়ে দাও দৈবের ওপর— আপসে হবে—স্পোণ্টেনিইটি, তাতে যা হবার তা হচ্ছে। এর পরে তাই নেতৃত্ব তুল নেবে চোরা নেতার দল তারা কংগ্রেসের নামের সুযোগ ও গান্ধীজির নামের স্ব·· নিয়ে 'লড়াই'র ব্যবসা খুলে বসবে। 'জাপানী খদ্দর' এসেছিল এক সময়ে বাজারে— জানো? এবার 'জাপানী সত্যাগ্রহ' ও দেখা দেবে আমাদের পলিটিক্যাল হাটে। ম· যে কংগ্রেস সবচেয়ে সেরা ফ্যাসিস্ত বিরোধী প্রতিষ্ঠান তারই নামে হতাশার দিনে ম· খাওয়া কর্মীরা ফ্যাসিস্তদের আক্রমণ ওদিক থেকে প্রত্যাশা করবে।'[৩৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালের প্রেক্ষাপটে উপন্যাস লিখতে বসে লেখক যে সে সময়ের জটি· রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তকে বিস্মৃত হননি, তার দ্বান্দ্বিক চারিত্র্যকে কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র ও প্রতিপাদ্যের ন্যায়ে সম্পৃক্ত করার সুযোগ হারান নি, 'ঊনপঞ্চাশী' উপন্যাসের মধ্যে গোপাল হালদার তার প্রমাণ দিয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক জটিল স্রোতে গোপাল হালদারের নায়ক বিনয় মাঝে মাঝে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। একদিকে কংগ্রেসের উত্তা· আন্দোলনের ডাক আর একদিকে নবোদ্ভূত কমিউনিষ্ট তৎপরতা—এই দুয়ের মধ্যে বিরোধকে লক্ষ্য রেখে বিনয় চিন্তা করে দেশের কথা, ইংরেজকে দেশ থেকে বিতাড়ি· করার কথা। গান্ধীজির সর্বব্যাপী আগষ্ট আন্দোলনের ডাকে বিনয় কংগ্রেস ও কমিউনি· —উভয় পক্ষের আন্দোলনে অংশ গ্রহণের স্বভাবগত তারতম্যে একটা স্পষ্ট পার্থক দেখে :

'নিশীথনাথের কথায় সে বুঝেছে সাধারণ লোক কংগ্রেসকেই সম্মান করে বলে তার আদেশ মেনে নিয়েছে। কংগ্রেসের আদেশকে মেনে নেয়নি বরং বড়লোকেরা—যা'র

সবচেয়ে বেশি কংগ্রেসের নামে বড় বড় কথা বলে, শচীদা, মথুরাদাস, ডাক্তার খাঁ ও মল্লিক, আর দেশের সংবাদপত্রের কর্তারা—সুবারী সেনও। সেদিক থেকে দেখলে বিনয় অমিত সুধাদের দায়ী করতে পারবে না, তারা কংগ্রেসকে ছলনা করেনি, 'কংরেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' বলে নিজেদের প্রতারণা করে নি।...বিনয় আবার ভাবে, তবু গবর্ণমেণ্টের থেকে যারা টাকা নেয়—বিনয় তাদের মনে মনে সমর্থন করতে পারে না।'[৩৮]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে দেশের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে নায়ক বিনয়ের ক্রমশ এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, সুধা প্রভৃতির মত কমিউনিষ্টরা বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাচারী, কপট নয় আদৌ। সুধাকে বলা তার ধারণা :

'... দেশের প্রতি জাতির প্রতি যদি কেউ আজ বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে তবে তা করেছে কে, তা আমি দেখেছি। করেছে তা দেশের ধনিকরা—যারা কংগ্রেসকে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঠেলে দিয়েছে, আর নিজের একটা যুদ্ধের কন্‌ট্রাক্টও ছাড়ে নি, একটা কল বন্ধ করে নি। করেছে কাগজওয়ালারা—যারা জাতীয়তার ব্যবসা ফেঁদেছে, আর 'নিরুপায়' বলে অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধ ও যুদ্ধ ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনে ও মুনাফায় ফেঁপে উঠছে। করেছি আমরা—অধ্যাপক, চাকরে, শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা, যারা দুবেলা চলেছি 'যুদ্ধং দেহি' কিন্তু একটি পাও এগিয়ে যাইনি। করেছি কংগ্রেসের সেই ছোট নেতারাও—যারা নেতৃত্বের থেকে দেশকে বঞ্চিত করে অসহায় জনসাধারণের মাথায় চাপিয়ে দিলাম প্রথম এই বিপ্লবের দায়, তারপর এই অত্যাচারের বোঝা।'[৩৯]

গোপাল হালদার 'ঊনপঞ্চাশী' উপন্যাসে সমকালীন রাজনীতিকে করেছেন উপন্যাসটির প্রাণকেন্দ্র। এই রাজনীতি ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ—এসবের বিরোধী এক সুস্থ রাজনীতি। সোনাপুরের পুরনো কংগ্রেসম্যান মীর শাহেদুদ্দীন বিনয়কে সেই রাজনীতির সত্য রূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে :

'তার সহজ নাম এদেশে 'স্বদেশী,' ব্যবহারিক নাম পলিটিকস।'[৪০]

আর রাজনীতির এই বৃহৎ সত্যেরই স্বাদ অন্বেষণ করতে গিয়ে প্রবীন শাহেদুদ্দীনের যে পরিণতি চিত্র এঁকেছেন লেখক নায়ক বিনয়ের দৃষ্টি দিয়ে তা যেমন করুণ, তেমনি লেখকের সুস্থ রাজনীতি-বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠাও :

'নিঃস্ব, সকলের পরিত্যক্ত শাহেদুদ্দীন বড় একা—হিন্দু তাকে নেয় না, মুসলমান তাকে ত্যাগ করেছে,—সংগ্রামশ্রান্ত দেহ, তিনি এই জীর্ণ গৃহের মত, দারিদ্র্যের ছায়ায় সকরুণ হয়ে ওঠে তাঁর চোখের সকৌতুক দৃষ্টি। চারিদিকে তাঁর নিষ্ফলতার সাক্ষ্য—তবু কেন শাহেদুদ্দীনকে মনে হয় সুন্দর—মানবীয়তায় সুন্দর।

পলিটিক্‌সেরই কি এই পরিণতি? মানুষকে সে নিঃশেষ করে—আর করে সুন্দর?'[৪১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে নবগঠিত কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল দেশীয় রাজনীতিধারার একটি প্রধান আলোচ্য ও লক্ষনীয় বিষয়। কমিউনিষ্ট সম্পর্কে ছিল অহেতুক ভীতি, রাগ, তাদের সম্বন্ধে গুজবজাত অপবাদ দেওয়ার আপ্রাণ প্রয়াস। সাম্যবাদী রাজনীতি সম্পর্কে যে সাধারণ ও শিক্ষিত মানুষের ধারণা ছিল, তার আলেখ্য এঁকেছেন লেখক মিষ্টার দাশগুপ্তর সঙ্গে নায়ক বিনয়ের সংলাপ বিনিময়ের মধ্যে। অভাবী মানুষগুলির জন্য বিনয় কেরোসিনের তদ্বির করতে আসে মিঃ নির্মল দাশগুপ্তর কাছে। মিঃ দাশগুপ্ত সেই বিষয়েরই ভারপ্রাপ্ত অফিসার তখন, কেরোসিন সংকটের সব কথা বিনয় বলে মিঃ দাশগুপ্তকে:

'সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, আমি এ সব সমিতি-টমিতির হাতে কেরোসিন দেব না, সমিতি আপনাদের কমিউনিষ্টদের ধাপ্পাবাজি।

বিনয় বললে, আমরা তো কমিউনিষ্ট নই।

দাশগুপ্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

বিনয় বলল, আমি কমিউনিষ্ট হব কেন?

দাশগুপ্ত দাঁড়িয়ে উঠে হ্যাণ্ড শেক করলে, বললে, খুশি হলাম শুনে। আশ্চর্য হচ্ছেন? আমি এই কমিউনিষ্টদের দেখতে পারি না। কারণ কি? কারণ আমি কমিউনিজম কাকে বলে জানি, আমি কমিউনিজম চাই।

কমিউনিজম চান?

নিশ্চয়ই, আমি সায়েন্টিস্ট এণ্ড আই এ্যাম্ এ সায়েন্টিফিক সোস্থালিষ্ট।

বিনয় কথাটা বুঝতে পারল না। তার কাছে কথাটা অদ্ভুত ঠেকল। শৌরীন সোস্থালিষ্ট, সেও কমিউনিজম চায়, মোসলেম লীগের লোক জাহেদ বলে সেও কমিউনিজম চায়, সরকারী চাক্‌রে এই দাশগুপ্ত, সেও বলে সে কমিউনিজম চায়—কিন্তু কমিউনিষ্টদের কেউ চায় না তবু। তবে কমিউনিজম্ কি জিনিস!'[৪২]

'ঊনপঞ্চাশী' উপন্যাসের শেষে গোপাল হালদার তাঁর নায়ক বিনয়ের এমন এক মানস পরিণতির চিত্র এঁকেছেন সমগ্র উপন্যাসের নায়ক চরিত্র-অভিজ্ঞতার ন্যায়ে—যা নায়কের মহৎ নতুন বিচিত্র দেশসেবার ব্রতকেই স্পষ্ট করে। দেশের বুকে প্রবলতম গণবিক্ষোভ। সেই বিক্ষোভের মধ্যে বিনয়ের উপলব্ধি শুধুমাত্র দেশের স্বরূপ চেনার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে নি, সে উপলব্ধি নায়কের এক মহান আত্মোপলব্ধিও। এমন আত্মোপলব্ধির মধ্যে আছে

দৃঢ় প্রত্যয়, আছে স্বচ্ছ শপথ, আছে আগামী দিনে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার দীপ্ত পদশব্দ :

'নিজেকে বিনয় শুধু বাইরের আর ভিতরের নানা ঝড়ের মুখে উড়িয়ে দিচ্ছে—এক তালহারা, ছন্দোহারা ঊনপঞ্চাশী ঘিরে ধরেছে দেশকে,—সকলকে,—বিনয়কেও অন্তরে বাহিরে।—বিনয় তার কাছে পরাজয় মানবে না, না কিছুতেই না। বিনয়—বাঁচবে, বাঁচাবে মানুষকে, দেখাবে সকলকে সে দেশকে ভালোবাসে, ভালোবাসে তার দেশের দরিদ্র-দুর্ভাগ্যদের। দেখাবে অমিতকে সুধাকে—তাকে ডাক দিয়েছে সোনাপুর।'[৪৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে যখন ব্যাপক গণবিক্ষোভ দুর্বার হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যলিপ্সুদের অন্যতম দোসর ইংরেজদের বিরুদ্ধে, যখন দেশীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজ নিজ মত প্রয়োগে কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে, তখন নবোদ্ভূত ও সবচেয়ে সক্রিয় কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা সাধারণ মানুষের কাছে কিছুটা বিভ্রান্তি আনে। রাশিয়া তখন যুদ্ধে লিপ্ত। সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী শাসক হিটলার ও মুসোলিনী বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়াকে আক্রমণ করার কারণেই রাশিয়ার দিক থেকে যুদ্ধে নেমে পড়ার কারণ ঘটে। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি তখন আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদে শপথ নিয়ে সবেগে চলমান। এমন যুদ্ধে জাপানীদের আক্রমণের সামনে বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের কি সম্পর্ক হবে তা-ই ছিল দেশীয় রাজনীতির পক্ষে জটিলতম অধ্যায়। আবার কমিউনিষ্ট পার্টির অবস্থাও অত্যন্ত জটিল তখন। গোপাল হালদারের নায়ক বিনয় মজুমদার দেশের এই অবস্থায় যথেষ্ট হতভম্ব এবং ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ দেশের নেতা গান্ধীজির নির্দেশের বিরুদ্ধে, প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্টদের পক্ষ থেকে জাপানের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করার প্রস্তাব নিয়ে। কংগ্রেসকে বেআইনী করে নেতাদের জেলে পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা না করায় বিনয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। মিছিলে যোগ দেওয়ার কথা সুধা বিনয়কে জানালে বিনয় বলে ওদের পার্টির সহযোগী কর্মী হিসেবে সিম্প্যাথিটুকুও আর নেই :

'শ্রদ্ধা রাখতাম আপনাদের কর্মীদের ওপর। কিন্তু তাও আর রাখা সহজ হবে না বুঝছি। বিনয় গম্ভীরভাবে বললে, পরিহাসের লেশমাত্র নেই তার কণ্ঠে।

সুধা এবার পরিহাস ছেড়ে দিলে। —কেন বলুন তো?

বিনয় বললে : আমি বুঝছি না—এতে আপনাদের গৌরব বেড়েছে কি কমেছে—আপনাদের পার্টি বেআইনী না থাকায়।

—সে তো প্রত্যক্ষ—আমাদের অস্তিত্ব আর স্বীকার না করে আজ সাম্রাজ্যবাদীরা পারে না, তাই আমাদের আইনসঙ্গত করতে হল।

—প্রত্যক্ষ এই ভারতবর্ষের অস্তিত্ব, জনসাধারণের অস্তিত্ব, তারা অস্বীকার করতে চায়, তাই আজ আপনাদের অস্তিত্বে তাদের আপত্তি নেই।

—জনসাধারণের অস্তিত্ব তারা অস্বীকার করতে পারে নাকি?

—তার প্রমাণ তো ওইখানে নীরদকেই দেখছেন। শিবুদাই বলুন তা।

সুধা বললে: কেমন?

—দেশের সিপাইকে বলেছিল দেশের লোকদের তাদের ভাই বলে ভাবতে। এই তো তার পেল পুরস্কার।

সুধার মুখে উত্তর ছিল না।'[৪৪]

কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা দেশের জটিলতম সময়ের প্রেক্ষিতে গোপাল হালদারের নায়ককে জিজ্ঞাসু ও ভিতরে ভিতরে বিস্মিত করে। বিনয় মজুমদার যা মানতে পারেনি, তা তার মত আরও অনেকের কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসারই অন্যতম দিক। সুধা গুপ্তার কাছে বিনয়ের তাই বার বার সংশয়সূচক প্রশ্ন:

'আপনারা করবেন তবু যুদ্ধে সাহায্য?

—জনশক্তিকে সংগঠিত করবার জন্য।

—জনমতের বিরুদ্ধে

—না। জন স্বার্থের স্বপক্ষে, তাই আসলে জনমতেরও স্বপক্ষে।

বিনয় এক মুহূর্ত থামল—অপরিসীম ক্ষোভে। তারপর যথাসম্ভব শান্ত-স্বরে বললে: এজন্যই তো বলি, আমি পলিটিক্যাল লোক নই।

সুধা বললে: কি জন্য বুঝলাম না।

—এমন মিথ্যাকে সত্য বলবার ওজর আমি চাই না।

আমরা তাই করছি নাকি? —মিথ্যাকে সত্য বলছি?

বিনয় বললে: মিস গুপ্তা, আমি আমার দেশে বেশি দিন আসিনি। কিন্তু একটা কথা বুঝেছি এ কয় মাসে। এ দেশের মানুষ আজ আপনাদের শাসক বন্ধুদের বিষে বিষে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। আপনাদের রুশিয়া আছে, তার বন্ধু বলে এদেরকেও যুদ্ধে আপনারা সাহায্য দেবেন। দিন। কিন্তু জনতার নাম করবেন না, বলবেন না এ জনস্বার্থে দিচ্ছেন, জনমতের নামে দিচ্ছেন।

সুধা বুঝাতে চেষ্টা করলে: আপনি দেখছেন না অন্য দিক। বানচাল আজ বুরোক্র্যাসি, বানচাল সাম্রাজ্যবাদীরা। যত বুঝছে জনমুক্তি নিকটে, তত তাদের জনাতঙ্ক বাড়ছে—মূঢ়ের মত, উন্মাদের মত ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে—এলোপাতাড়ি মারছে।

—ক্ষিপ্ত হোক, জনাতঙ্কে ভুগুক—কিন্তু তাদের এলোপাতাড়ি যুদ্ধ চেষ্টায় জনতাও

আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ক্ষিপ্ত তারাও হয়ে পড়ছে। তারা আর পারে না—অসহ্য এই মার, অসহ্য এই ভার, অস্থির আজ জনসাধারণ, জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে তারা। যুদ্ধে আপনারা যত খুশী সাহায্য করুন, কিন্তু বলবেন না জনতা তাই চায়. তা জনগণের মত—ভারতবর্ষের মত। সেইটাই মিথ্যাচার—মানে, পলিটিক্স।

—কিন্তু সেইটাই যে সত্য,—এই কথাটা ঠিক মত বোঝা, বোঝানো, বুঝে কাজ করা তা'ই আমাদের পলিটিক্স।

—হোক, কিন্তু আমার নয়—দেশের অন্য কারুরই কিনা, এই সাতুই আগষ্টেই তা দেখ্‌তে পাবেন। ততক্ষণ আপনাদের এ জলুশ যেন একটা ঔদ্ধত্য। আমি যোগ দোব কি? শ্রদ্ধাই রাখতে পারছি না আপনাদের সুবুদ্ধিতে।'[৪৫]

ধীরে ধীরে কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ছে। যারা কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিল, তারাই ক্রমশ নতুন সমাজতন্ত্রবাদে দীক্ষা নিতে শুরু করে। দেশপ্রেম উভয়েরই ভিত্তি। কিন্তু পথ স্বতন্ত্র। কংগ্রসীরাও বিপ্লবী, কমিউনিস্টরাও সমান। কিন্তু নবসৃষ্ট কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের ছিল অন্য মন, অন্য শক্তি, অন্য মতে বিশ্বাস, অন্য পথে চলা। তাই 'তেরশ পঞ্চাশ' উপন্যাসে অমিতের সঙ্গে বিনয়ের তর্কের মধ্যে গোপাল হালদার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের একটি রাজনৈতিক পরিবেশে নতুন দলের জট খুলতে সচেষ্ট হন। দলকে, তার মতকে আদৌ অস্বীকার না করে তার ভিত্তিকে যুক্তি তর্কে বোঝানোর জন্য তৎপর হন। বিনয় যখন, অমিতকে,—সে কংগ্রেসের সভ্য থাকা সত্ত্বেও কি করে কমিউনিস্ট বলে নিজেকে,—জানতে চাইল:

'অমিত হাসল, বললে—বিনয়, আমরা এ দেশের বিপ্লববাদের সন্তান, সান্‌স এণ্ড ডটারস্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়ান রিভোলুশন। দেয়ালে দেয়ালে চল্লিশ বছর মাথা ঠুকেছি, কিন্তু মাথা ঠুকে ঠুকে পথও বের করে নিয়েছি। মাথা থেকে রক্ত ঝরে পড়েছে বার বার—কিন্তু তবু বিপ্লবী প্রেরণাকে অস্বীকার করিনি। এ মাটির সেই প্রেরণারই পরিণতি আমরা। বিপ্লবী ঐতিহ্য তো মিথ্যা হয় নি, তাই আমরা আজ কমিউনিষ্ট—শ্রেষ্ঠ পরিচয় একালের বিপ্লবীর।

বিনয় অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—তবু কেন দেশের শিক্ষিত লোক এত বিরোধী তোমাদের অমিদা?'

অমিত ম্লান হাস্যে বললে—কারণ, বিনয়, আমরা জাত খুইয়েছি।

বিনয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

অমিত বললে—আমরা 'ভদ্রলোক' নই, 'স্বদেশী' নই—কমিউনিস্ট। ভদ্রশ্রেণী ত্যাগ করেছি, ভদ্রলোকেরা আমাদের এ স্পর্ধা সইবে কেন?'[৪৬]

'পঞ্চাশের পথ' উপন্যাসে গোপাল হালদার গান্ধীজি ও যুদ্ধ-সমকালীন পরিবেশে অন্যান্য মতের বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে বিরোধের দিকগুলি সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কে উপস্থাপিত করেছেন। কংগ্রেসের তরফে একসময়ে গান্ধীজি জানান, ফ্যাসিস্ত দলভুক্ত জাপানকে বাধা দেওয়া হবে না তার ভারত আক্রমণের সময়ে। এ বিষয়ে কীন্-এর মন্তব্য,—'সমস্ত কংগ্রেসকে বিপথ-চালিত করেছেন মিষ্টার গান্ধী।'[৪৭] এই সূত্রেই ক্রমশ সারা দেশে গান্ধীজি সম্পর্কে মুসলমান ও ইংরেজ উভয় পক্ষই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে শুরু করে। গোপাল হালদার নায়ক বিনয়ের পক্ষে একটি যুক্তি রেখেছেন,—'এই ভুলের বেসাতিই পলিটিক্স—তাই বিনয় তার দিশে পায় না।'[৪৮]

উত্তাল বিপ্লবের তলে যে মতবাদের সংঘর্ষ, তা সে সময়ের দেশের মানুষকে নানাভাবে দ্বিধাগ্রস্ত ও ভ্রান্ত করে। কংগ্রেস জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানে সম্মত নয়, অন্যদিকে কমিউনিষ্টরা চায় জাপানকে রুখতে। এই মতের 'ক্রস কারেণ্টে,' যখন দেশে যুদ্ধ পরিস্থিতির 'ক্লাইম্যাক্স' অবস্থা—সেই সময়টিকে গোপাল হালদার তাঁর নায়ক ও অন্যান্য চরিত্রদের কথোপকথনের ন্যায়ে এইভাবে এনেছেন :

'বিনয় বললে : বেশ। তা হলে এই শিবুদাকে ধরে আনলে কেন ? —তোমার পুলিশেরা ভালোই জানে—সে সত্যই 'জনযুদ্ধে'র সমর্থক, হয়ত কমিউনিস্টও।

—তুমি ঠিক জানো—সে যুদ্ধ বিরোধী নয় ?

—যুদ্ধ বিরোধী নয় নিশ্চয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী।

কীন ভেতরে গেল। ফাইল নিয়ে এল, খুলে দেখ্‌লে। পরে বললে : শিবু একটা আহাম্মক। কেন সে এই ভূতনাথবাবুর সঙ্গে গ্রেফ্‌তার হবার জন্য ব্যস্ত হল !

—সে তুমিই বলেছ, আহাম্মক বলে। মানে, সে খাশা মানুষ।

—আর তাই দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক। যাক বেশি গোলমাল না করে থাকলে সে খালাস পাবে।'[৪৯]

মতের যুদ্ধে সাম্যবাদী দলকে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। বিশাল গণবিক্ষোভের দিনে একদল কুৎসা রটনাকারী সমস্ত শালীনতা সৌজন্য বিসর্জন দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে নোংরা অপবাদ দেয় :

'বিনয় মজুমদার, সীতা রায় ইত্যাদিকে জড়িয়ে যেন এক ছাপানো বেনামা বিজ্ঞাপন শহরের পথে পথে আঁটা চোখে পড়ে তখন। জঘন্য ইতরতার জন্য বিনয় স্তব্ধ, মজিদ ক্ষুব্ধ, প্রমথ গম্ভীর। কিন্তু প্রমথই বলে—'এ ছাড়া ওদের পথ ছিল না। এই ছাপানো কাগজটা ওদের শেষ চেষ্টা। আমরা জিতব কাজের মধ্য দিয়ে, জবাব দেব হাজার মানুষের মুখ দিয়ে।'[৫০]

উপন্যাসের সব শেষে রাস্তার মিছিল দেখতে দেখতে বিনয়ের আত্মোক্তি :

'কাজের দিন এল দেশের। কাজের দিন এল এবার সকলের, ভারতবর্ষের সকল মানুষের প্রাণ ঘোষণা করছে –'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।'

বাড়ি ফিরতে হবে যে বিনয়? আজকের দিনে চিত্রার সঙ্গে তার বিবাহের পাকা কথা হবে—কথা দিতে হবে। যেতে হবে—যেতে হবে।

'করেঙ্গে করেঙ্গে করেঙ্গে—তুমি কি করবে, বিনয়?' আমি কি করব? আমি কি জানি এর? আমি সাধারণ মানুষ। আমি কি ধার ধারি পলিটিক্‌সের?

হঠাৎ বিনয়ের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল।...

...শুনেছি আবার সমস্ত ভারতবর্ষের নিবেদন—'ভগবান, আর কত সইতে হবে আমাদের।' শুনেছি তারপর তার জীবনের ডাক—'করেঙ্গে'। 'এই তো পলিটিক্‌স' —বলবে অমিত। পলিটিক্‌স? পলিটিক্‌স এই যদি পলিটিক্‌স হয় তবে পলিটিক্‌সকে অস্বীকার করাই মিথ্যাচার—আত্মপ্রতারণা—'

বিনয় পলিটিক্‌স চায না, তাই বলে প্রতারণা চায় না। সাধারণ মানুষ সে, এদেশের মানুষ সে, যা চায় দেশের মানুষ, তাই সে চায়।

বিনয়ের ভেতর থেকে কে যেন বলতে চাইছে, 'করেঙ্গে করেঙ্গে'।'[৫১]

'তেরশ পঞ্চাশ' উপন্যাসে লেখক ধীরে ধীরে একজন সচেতন নায়কের মানস পরিবর্তনের শেষতম অবস্থার চিত্র এঁকেছেন। যুক্তি-চিন্তা-মননের শেষে নায়ক বিনয় ক্রমশ এমন এক উপলব্ধির জগতে আসে যেখানে মননের সঙ্গে সেন্টিমেণ্ট নয়, দেশপ্রেমের আবেগ যেমন মিশেছে, তেমনি নতুন মতবাদকে বিপ্লবের উত্তরোলে মিশিয়ে রক্তের গভীরে গ্রহণের ক্ষমতাও লাভ করেছে। বিনয়ের কমিউনিষ্ট হিসেবে রূপান্তরের আত্মচিন্তা :

'হেনা তাকে বলেছিল,— 'কেবল ঘুরেছ আর ঘুরেছ। আর আজ দেখেছ তোমার চেহারা? রঙ পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, চোখের কোণে কালি পড়েছে, চুল উঠে যাচ্ছে, হাতগুলো পর্যন্ত শক্ত হয়ে যাচ্ছে—যেন মার্কামারা কমিউনিস্ট—সেই তোমার শিবুদার মত।'[৫২]

বিনয় সেই কথাই স্নান সেরে আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে ভাবে,—'সত্যি বলেছে হেনা—সেই ডক্‌টার বিনয় মজুমদার আর নেই, এ যেন কোন রৌদ্র-দগ্ধ, ক্ষুধিত, চির উত্তেজিত রাজনীতিক কর্মী। ...তুমি রাজনীতিক কর্মী বিনয়? ......এই এক বৎসরের মধ্যে—১৩৫০-এর মধ্য দিয়ে—মুনাফার নূতন কাণ্ডারীই জন্মে নি শুধু? তোমার মত চেতনাশূন্য কর্মীদেরও নবজন্ম হয়েছে তবে?... [৫৩]

'মন্বন্তর' উপন্যাসে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় গোপাল হালদারের মতই রাজনীতিকে

ওতপ্রোত করতে পারতেন, কিন্তু লেখক তা করেন নি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মত বাংলাদেশের বুকে মহামন্বন্তরের ছায়াকে অবধারিত ঘন নিবিড় করার মূলে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের যে রাজনীতি কাজ করেছিল, তা শুধু দেশীয় রাজনীতি নয়, ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর স্বার্থপরতার রাজনীতি, তারই শিকার হয় দেশের অতি সাধারণ বুভুক্ষু মানুষ। গোপাল হালদার তাঁর 'ঊনপঞ্চাশী,' 'পঞ্চাশের পথ' ও 'তেরশ পঞ্চাশ' উপন্যাসত্রয়ীতে তা বিশ্লেষণ করেছেন। তারাশংকর সেই সমাজ ও রাজনীতি অর্থনীতি-ন্যায়ের গভীরে যান নি। তবু সে সময়ের কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট রাজনৈতিক দলের মতবিরোধ, চিন্তার মধ্যে বৈষম্য ইত্যাদিকে সব রাজনীতি-সচেতন কথাসাহিত্যিক কতকাংশে ভেবেছেন। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে সাম্য আছে বটে, কিন্তু তা কেবল যুক্তি-তর্কেই পর্যবসিত, সমগ্র উপন্যাসের মূল বক্তব্যে প্রোথিত হয় নি। উপন্যাসের অন্যতম দুই চরিত্র নীলা-নেপী নবস্পৃষ্ট কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী, মতাদর্শের সমর্থক। পিতা দেবপ্রসাদ সচেতনভাবেই তার ঘোরতর বিরোধ'। এই বিরোধটুকুকেই লেখক তাদের উভয়ের সাংসারিক কথাবার্তার মধ্যে প্রসঙ্গত রেখেছেন :

'দেবপ্রসাদ বললেন—নেপী কমিউনিষ্ট পার্টি মেম্বর। মনে হচ্ছে তুইও বোধ হয় যোগ দিয়েছিস। তোমাদের যুক্তি আমি মানি, কিন্তু কোন রকমেই অন্তরকে বোঝাতে পারিনে—ভুলতে পারিনে গান্ধীজির মত লোককে জাপানের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন বলে অপবাদ দিয়ে—তাঁকে বন্দী করে রেখে—তিনি অর্দ্ধপথেই চুপ করে গেলেন।

নীলার চোখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, সে বললে—এ অপবাদের প্রতিবাদ আমরা বোধ হয় সকলের চেয়ে করি বাবা। অন্তরে অন্তরে এর জন্যে দুঃখ পাই। নেতাদের মুক্তি আমাদের প্রধান দাবী। কিন্তু ওদিকে যে জাপান এসে আমাদের বর্ডারে থাবা গেড়ে বসেছে, অভিমান করে তাকে ঢুকতে দিলে যে সর্বনাশের ওপর সর্বনাশ হবে। বাবা, পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে রানী ভবানী বলেছিলেন—সায়রের রাঘব বোয়ালকে মারতে নদী থেকে খাল কেটে কুমীর এনো না।'[৫৪]

'মন্বন্তর' উপন্যাসে মহামন্বন্তর নেমে আসার কোন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা নেই। চরিত্রগুলিও বরং স্ব স্ব আদর্শে এবং আবেগে যতটা প্রাণিত, ততটা ইতিহাসের অমোঘ ন্যায়ে সক্রিয় হয় নি মতের ভাবনায়। অন্তত লেখক সেভাবে আঁকেন নি। কংগ্রেসী জাতীয় আন্দোলন ও নব্য সাম্যবাদী আন্দোলন—যাদের বিরোধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে চরম জটিল পরিবেশ রচনা করেছিল, যে প্রসঙ্গ আমরা আমাদের বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছুটা আলোচনা করেছি, তা একাধিক কথাসাহিত্যিক সমকাল-সচেতনায় গ্রহণ করলেও প্রত্যেকটি লেখক সমানভাবে গল্পে ও উপন্যাসে প্রতিচিত্রিত করেন নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে বসে মনোজ বসু তাঁর 'ভুলি নাই' উপন্যাসে উনিশ শ ছত্রিশ সাল পর্যন্ত প্রবাহিত দেশীয় রাজনীতির সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের চরিত্রকে স্মৃতিসূত্রে ধরে পুরনো বিপ্লবের বক্তব্য রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু 'ভুলি নাই' যথার্থ অর্থে রাজনৈতিক উপন্যাস হয় নি। কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী চরিত্রকে স্মৃতিসূত্রে ধরে ব্যক্তিগতভাবে তাদের কথা বর্ণনা করেছেন গল্প বলার ঢং-এ। তাদের দেশসেবা, সাহস, বীরত্ব, অস্থিরতা, শপথ, প্রতিরোধ—এগুলিকে লেখক নিজস্ব ধারণামত উপস্থিত করেছেন। ঘটনা, কাহিনী ও তার মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ আন্দোলনের চিত্র নেই। কুন্তলদা নায়ক হতে পারত, কিন্তু সে-ও নিছক একটি চরিত্র-চিত্রে পরিণত।

তবু 'ভুলি নাই' উপন্যাসে যে সব চরিত্র এঁকেছেন লেখক, তারা বাস্তবে থাকা কিছু সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত মানুষেরই কথা বলে। তাই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের একটি প্রচ্ছন্ন ছায়ার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। গোপন এই সহিংস আন্দোলনে কুন্তলদার মত মানুষদের রাজনৈতিক বক্তব্য স্বতন্ত্র ও স্পষ্ট। 'ডাকসাইটে' প্রিন্সিপাল নীলকান্ত রায়ের কাছে ছাত্র নেতা বিপ্লবী কুন্তলদার কথা :

'আপনার রাজনীতি আর আমার রাজনীতি একেবারে আলাদা স্যার। আপনার রাজনীতির মানে টাকাকড়ি, মোটর-গাড়ি, সরকারি খেতাব, সাহেবসুবোর কাছে প্রতিপত্তি, কাউন্সিলের মেম্বার হওয়া—আর আমাদের রাজনীতি হল অন্ধকার জেল, বেত খাওয়া, আপনার জনের সঙ্গ থেকে চিরবঞ্চনা, দ্বীপান্তর, হয়তো বা ফাঁসের দড়ি। আপনার ঐ বয়স অবধি টিকে থাকা কপালে নেই। যদি থাকে, তখন হয়তো আপনার রাজনীতিই করব।'[৫৫]

নায়ক কুন্তলের সঙ্গী জুটেছিল অনেকেই। রাণী অর্থাৎ উমারাণী তাদের মধ্যে একজন। দেশের প্রতি ভালবাসায় নির্বিবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে সে। তার চরিত্রেও ছিল অকাতরে মত ও পথকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, আঁকড়ে থাকার জন্য মরণপণ। তাই বাড়ীর সমস্ত বিরোধকে সমান শক্তিতে অস্বীকার করে তরুণী জীবনে উমা নিজেকে উৎসর্গ করতেও পিছপা হয় নি। মনোজ বসু সে রকম একটি চরিত্র এঁকেছেন সহজভাবেই :

'বাগানের ছায়ায় ছায়ায় ঘোমটা ঢাকা আবছা মূর্তি দ্রুতপদে আসছে। কাছাকাছি এসেছে এমন সময় কোন দিক দিয়ে হঠাৎ জন দুই তিন তার পথ আটকাল।

দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছ ?

আলো ফেলেছে মুখের উপর। আমার জায়গা থেকে যতটা দেখা যায়, দেখলাম — অতি নির্ভীক অপূর্ব উমারাণীর মুখ। বলল, ঘাটে যাচ্ছি।

কেন ?

ঝাঁঝালো সুরে রাণী জবাব দিল, একটু জিরোব বলে। বাবা বকেছে বড্ড। পথ ছাড়ুন।

তোমাকে থানায় যেতে হবে।

কিন্তু থানায় সে গেল না। তাদের পাশ কাটিয়ে চক্ষের পলকে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোটালের টানে সুতীব্র স্রোত চলেছে, তার উপর একই রকম অন্ধকার। আমি গাবতলা থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়লাম।'[৫৬]

'ভুলি নাই' উপন্যাসের উত্তমপুরুষ কথক শংকর যে স্বাধীনতার কথা বলে, তা সাম্রাজ্যবাদকে সমূলে উৎপাটিত করে দেশছাড়া করার শপথদীপ্ত স্বাধীনতার স্বরূপ। মল্লিকার সঙ্গে নানান তর্কের মধ্য দিয়ে সেই উজ্জ্বল স্বাধীনতার চিত্র লেখক এঁকেছেন শংকরের কথায়:

'সত্যিকার স্বাধীনতাই আনব আমরা। গ্রামে শহরে—সকলের মধ্যে। মিথ্যে ভয় থেকে স্বাধীনতা, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার স্বাধীনতা, মানুষের মতো বেঁচে থাকবার স্বাধীনতা, রাজ্যেশ্বর কোম্পানিকে এসেম্বলীতে পাঠিয়ে ইংরেজের বিপক্ষে কড়া কড়া বক্তৃতা করানো, আর তাঁর আত্মীয় পরিজনদের জন্য ভালো ভালো কতকগুলো চাকরি বাগানোর স্বাধীনতা নয়।

শোন, শোন, আমার সেই স্বাধীন সুখী ভাবী ধরিত্রীর স্বপ্ন। মানুষে মানুষে বিরোধ নিঃশেষ হয়েছে, শোষক-শোষিত হাত মিলিয়েছে, জনে জনের মুখে হাসি, চারিদিকের পঙ্গু উঠে বসেছে—ঐ দেখ। প্রাণে তাদের আশার বিদ্যুৎ।

গোরু ও মানুষ ছিল প্রায় এক ধরণের, প্রহার পীড়নে মাথা তুলতো না—নিঃশব্দে সয়ে যেত, অসহ্য হলে মুখ থুবড়ে পড়ত। জীবনের উন্মাদনা জেগেছে সেই সব মানুষের মধ্যে, মুখ তুলে উল্লাসে তারা ঐশ্বর্যবতী ধরণীর দিকে চাইছে।'[৫৭]

নবেন্দু ঘোষের 'ডাক দিয়ে যাই' উপন্যাসেও মনোজ বসুর 'ভুলি নাই' উপন্যাসের মত প্রত্যক্ষ গণবিক্ষোভের ছবি নেই, আগষ্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হলেও এর মধ্যে প্রসঙ্গত ঐতিহাসিক আগষ্ট আন্দোলন প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তার জলন্ত রাজনৈতিক ও প্রতিবাদী তৎপরতার চিত্র অনুপস্থিত। উপন্যাসটি সম্পর্কে লেখকেরও নিজস্ব মন্তব্য:

'১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম দিনে কতকগুলি বিভিন্ন মতাবলম্বীদের জীবন ও কর্মকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাস রচিত।'[৫৮]

এই উপন্যাসে মতবিরোধের ফলে একটি সুবিশাল গণজাগরণের ভিত্তি কি মোড় নেয়, বড় নেতারা নয়, দলগত কর্মীরা কিভাবে নানান প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয় এবং একতাবদ্ধ হওয়াই যেখানে অত্যন্ত জরুরী সেখানে মতবাদের নেতৃত্ব কতটা তার

অনুগামী হতে পারে বা হতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়, তারই চিত্র উপহার দিয়েছেন লেখক। তবু 'ডাক দিয়ে যাই' উপন্যাসটিও বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলনের মূল ভিত্তির এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট করে, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন বাংলাদেশ তথা কলকাতার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যার নাড়ী ধরেও টান দেয়। উপন্যাসের প্রথমেই এক বিপ্লবী কবি তপনের ক্ষয়রোগের মৃত্যু-ঘটনার সংবাদ। তার বন্ধু দিলীপের বন্ধু-সম্পর্কের অতীত-চিন্তায় তপনের একটি উক্তি—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকাল থেকে আবির্ভূত যে সব একাধিক রাজনৈতির আন্দোলনের ব্যর্থতায় ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ অথচ হতাশ যুবকের দলকে দেখি, তাদেরই উপযুক্ত উত্তরসূরীর স্বভাবানুগ, সমগোত্রীয়—'ইচ্ছে করে সব ভেঙ্গে চুরে ফেলি—সব বদলে দি—।'[৫৮]

আগষ্ট আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন গান্ধীজি। কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনই একে প্রাণ দেয়। যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিরাট প্রস্তুতি ও বেগের আবেগ এমন গণবিক্ষোভকে দিয়েছিল কঠিন মাটি, তার ভিতরে ছিল আন্দোলন পরিচালনায় সন্দেহ, অবিশ্বাস, মতবিরোধ কিছু বুদ্ধিমান রাজনৈতিক নেতারও। কংগ্রেসের ভিতরেই ছিল তীব্র মতবিরোধ। এককালের অহিংসবাদ থেকে সহিংসবাদ, আবার সন্ত্রাসবাদের জন্ম। সন্ত্রাসবাদ সরে গিয়ে আসে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী সমাজতন্ত্রবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তীব্র মত-পার্থক্য থাকাব কারণেই রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি নানাধরণের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে চলে। রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী শুধু নয়, সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন, 'It is only among the intellectuals that one find sharp divisions.'[৬০] নরেন্দ্র ঘোষ তাঁর উপন্যাসে এমন তীব্র মতবিরোধের চিত্র এঁকেছেন উপন্যাসের অন্যতম তরুণ রোমান্টিক নায়ক দিলীপ ও অপর রাজনৈতিক কর্মী শঙ্করের কথোপকথনে :

"আপনি দেশকে ভক্তি করেন শংকরবাবু?"

"কেন করব না?"

"শ্রমিকেরা ত আন্তর্জাতিকতায় বেশী বিশ্বাস করে।"

শংকর মাথা নাড়িল, "ভুল কথা বলছেন, জাতীয়তায় বিশ্বাস না থাকলে আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস কি করে হবে? তাছাড়া আমরা ত শূন্যের মধ্যে বাস করি না, আমরা দেশেই থাকি।"

"তবে কংগ্রেসের সঙ্গে আপনাদের মতবিরোধ কেন?"

"আমাদের দাবীর জন্য—কিন্তু স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের মতের পার্থক্য নেই।'[৬১]

কংগ্রেসের মধ্যেই যে তীব্র মতবিরোধ ইংরেজের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন তীব্র করার ব্যাপারে, তার চিত্রে লেখক কখনো কখনো প্রতিবাদী কংগ্রেসী কর্মীদের নবাগত সাম্য-বাদীদের চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেদের রাজনৈতিক ভাবনাকে সামিল করিয়ে দেখিয়েছেন। দিলীপের বন্ধু বিপ্লবী কবি তপনের মৃত্যু কখন যেন শংকরের মত কমিউনিস্ট বিরোধী কর্মীকেও সাম্যবাদীদের চিন্তার কাছাকাছি এনে দেয়। শংকর দিলীপের কাছে তপনের মৃত্যুর খবর শুনে বলে :

"আপনার বন্ধু মরে আমার ঈর্ষাভাজন হয়েছেন।……"

"কেন ?" দিলীপের মনে আঘাত লাগিল, সে উত্তরে প্রত্যাশায় শংকরের দিকে চাহিল।……

"কেন ?—কারণ ডাকাতদের অত্যাচারের হাত থেকে তিনি নিষ্কৃতি পেয়েছেন।"

"কোন ডাকাত ?"

"পৃথিবীতে ডাকাত ত এক রকমেরই।"

"কারা ?"

"নিজেরা না খেটে পরের খাটুনীর ফল যারা ভোগ করে, তারা।"

দিলীপ হাসিল। সাম্যবাদী কথা বলছে। সব মানুষ সমান হও। কিন্তু সমান হবে কেমন করে ? আগে মনকে তৈরী করতে হবে।'[৬২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে কমিউনিস্ট আন্দোলন যে জটিল এক অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিল, আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। একদিকে জাপানী আক্রমণ, অন্যদিকে সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকতার সূত্রে প্রথম রাশিয়ার সাম্যবাদী দলের নির্দেশ—এই দুয়ের সংঘর্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দোলাচল-চিত্ততার মধ্যে পড়েছিল। নবেন্দু ঘোষ সেই দোলাচলচিত্ততাকে উপন্যাসে চরিত্রগুলির সংলাপ-বিনিময়ে রেখে ব্যাপক গণবিক্ষোভে সাম্যবাদীদের সুস্থ সিদ্ধান্তের একটি দিক এঁকেছেন :

"গান্ধীজি, মৌলানা আজাদ—এঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আমরা কি করব ?"

"কাল ধর্মঘট করতে হবে।" (হ্যাঁ—একটা কাজ ঠিক করা হল—কিন্তু তারপর ?)

"আমরাও ?"

"নিশ্চয়ই—সব মজদুরেরাই করবে। কেন সেলিম, তুমি দেশকে ভালবাস না ?" (দিলীপ প্রশ্ন করেছিল)।

"কি যে বলেন কমরেড, যে মাটি আমার দাঁড়াবার জায়গা, রুটি আর পানি দিয়েছে তাকে না ভালবাসা মানে ত মাকে অপমান করা।"

"ঠিক বলেছ সেলিম। কংগ্রেস এবার লড়াই আরম্ভ করবে আর কংগ্রেসের এই

লড়াই আমাদেরও লড়াই কারণ, আমরাও স্বাধীনতা চাই। সুতরাং তৈরী থেক, আর তোমার লোকেদেরও তাই বলো। যদি পার তবে আজ সন্ধ্যাবেলায় মিটিং-এ এস।"

"আচ্ছা কমরেড।"[৬৩]

দিলীপের দাদা শেখর সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে কমিউনিস্ট কর্মী হয়ে দেশের সেবায় জীবন দেয়। আগস্ট বিপ্লবের দিনে তার চিন্তা সমস্ত দলীয় ধ্যান-ধারণার বিরোধী প্রতিবিপ্লবী প্রতিবাদ, প্রতিরোধের মধ্যেও সুস্থ জাতি, দেশ, মানুষ গড়ার আত্মচিন্তায় সম্পৃক্ত। বৃহত্তর মানবতার কাছে, বড় মানব জাতির কাছে যে কোন দেশ বা জাতির মানুষ কোথায় স্থান পাবে? শেখরের স্বগতোক্তি তাই :

'তুমি আর্য্য, অনার্য্য, মঙ্গোলিয়ান, না নিগ্রো? আমি মানুষ, আমার চামড়ার নীচে রক্ত আছে—টক্‌টকে লাল রক্ত। কারা বলেছে এসব কথা? কারা তারা? আমি, আমার সামনের ঐ লোকেরা, আমাদের মত কোটি কোটি লোকেরা। আমার মস্তিষ্কের কোটরে, হৃদয়ের নিভৃতে, কল্পনার কুঞ্জে এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে, সেই ভবিষ্যৎ যুগের মানুষেরা সব কথা বলছে। তখন নাজিবাদ, ফ্যাসিস্তবাদ, আর সাম্রাজ্যবাদের ফসিল যাদুঘরের এককোণে অনাদৃত হয়ে পড়ে থাকবে। ছুটির দিনে ছেলেমেয়েরা তা দেখে হাসবে।'[৬৪]

কলাবতী এক সর্বহারা শ্রেণী থেকে উঠে-আসা মহিলা কর্মী, সমব্যথী। তরুণী কলাবতী শেখরকে এক অন্য হৃদয়ের চোখে দেখে। তাকে সেই গোপন হৃদয়ে বড় মর্যাদা দেয় দেশের জন্য। সাম্যবাদী নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্তরিক উৎসাহ দেয়। এমন কলাবতীর কথাতেই শেখর নিজের মনের গভীরে ডুবে গিয়ে ব্যাপক গণবিক্ষোভের দিনে রাজনৈতিক দলাদলির কথা, তার মূল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে বিনাশ করার দিকের কথা নানা দিক থেকে বিচার করে :

'স্বাধীনতা চাই। কিন্তু দলাদলি? আমাদের এবার কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাওয়া উচিত। কিন্তু এই দুর্দিনে গভর্ণমেন্টের সঙ্গে আপোষের চেয়ে বিবাদ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু স্বাধীনতা ব্যতীত আমাদের মতবাদের প্রতিষ্ঠা হবে কি? আমাদের জয় ত' হবেই। কিন্তু যা সকলেরই চাই—সেই স্বাধীনতার জন্য আমাদের আগে এক হতে হবে। বড় মুস্কিল। বিরাট দেশের এই দুর্ভাগ্য। স্বার্থপর নেতাদের আত্মকলহ।'[৬৫]

প্রমথ শেখরের দাদা, কংগ্রেসের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে, তাকে রক্ত-সম্বন্ধে নিয়ে জীবনকে করেছে ছন্নছাড়া। সে রাজনৈতিক বন্দী, কিন্তু দেশের জন্যই সে বন্দী-জীবন থেকে পলাতক। সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর পুলিশ বাহিনী তাকে অন্বেষণ করে, তার

পিছনে গুপ্তচর ছায়ার মত লেগে থাকে। বিয়াল্লিশের আগস্টের প্রবল জোয়ারের মধ্যে সেও গোপনে পালিয়ে আসে কলকাতায়। নবেন্দু ঘোষ তার আত্মগোপনের মধ্যে থেকে পলায়নের চিত্রে এক গণিকার জীবন ও তার বড় জীবনে উত্তরণের ছবি এঁকে গণবিক্ষোভে ধনতান্ত্রিক সমাজ-অভিশাপে উৎপন্ন এক অবক্ষয়িত সমাজের মানুষকেও মহৎ মর্যাদা দিয়েছেন। এ চিত্র যুদ্ধ-সমকালেই দেখা গেছে—যেখানে উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও সর্বহারারা সমবেতভাবে এবং স্বতঃস্ফূর্ততায় আন্দোলনে সামিল হয়:

"আমি এখানে কিছুক্ষণ বসব?"

"কি যে বলেন, নিশ্চয়ই বসবেন? দুটাকা লাগবে।"

লোকটি দুইটি টাকা বাহির করিয়া দিল।

স্ত্রীলোকটি তাহা বাজাইয়া পরখ করিয়া লইল। পরে লোকটিব দিকে অগ্রসর হইতেই লোকটি হাত জোড় করিয়া বলিল, "আমায় মাপ কর, আমি ওজন্যে আসিনি আমি এখানে খানিকক্ষণ লুকিয়ে থাকতে চাই।"

"কেন?" স্ত্রীলোকটি ভয় পাইল।

"আমি একজন বিপ্লবী—আমায় পুলিশ বছর কয়েক ধরে খুঁজছে—এখন একজন পেছুও নিয়েছে—তাই।"

স্ত্রীলোকটি ভাবিতে লাগিল।·· ··

স্ত্রীলোকটি হাসিয়া বলিল, "আমিও দেশকে ভালবাসি মশায়।"

লোকটি বলিল—"তোমার কথা আমার মনে থাকবে, আমি অকৃতজ্ঞ নই।" সে দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

স্ত্রীলোকটি ডাকিল—"শুনুন—'

লোকটি দাঁড়াইল।

স্ত্রীলোকটি বলিল," যার মাথার দাম হাজার টাকা, তার দেশভক্তিকে একটা পেন্নাম করা উচিত।"

হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গলায় আঁচল দিয়া সে লোকটিকে প্রণাম করিল। পরে আঁচল হইতে টাকা বাহির করিয়া লোকটির পকেটে রাখিয়া বলিল—"আপনার কাজে লাগবে—নিয়ে যান।"

লোকটির চোখের জল আসিল, ক্ষণকাল পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম?"

"কেষ্ট—কেষ্টলতা—"

লোকটি তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিল, "বোন, মায়ের দুঃখ যেদিন দূর করতে পারব সেদিন তাঁকে আরতি করার পঞ্চপ্রদীপ তুমিও পাবে।"

"মা—কে আপনার মা ?"

"ভারতবর্ষ।"৬৬

'ডাক দিয়ে যাই' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র বিষ্ণুর সঙ্গে সদ্য-আগত প্রমথর লাগে ভিন্নধর্মী রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসজনিত সংঘাত। প্রমথ অহিংসবাদে বিশ্বাস করে। সেই বিশ্বাস দিয়েই বিয়াল্লিশের আন্দোলনে রক্তপাতহীন জয় ও রক্তাক্ত বিপ্লবের অসংখ্য বলির মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের জয়—এই দুয়ের দ্বন্দ্বকে বিষ্ণু ও প্রমথর সংলাপে স্পষ্ট করেছেন লেখক :

"তুমি অহিংসবাদ কতদূর মান ?"

"যতদূর আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়। তোমাদের কাছে অহিংসা ধর্ম্ম, আমার কাছে তা উপায়—নিরুপায়ের উপায়, আমার কাছে তা অস্ত্র। তবু বলছি—রক্তপাত হবেই।"

"কাদের ?"

"আমাদের।"

বিষ্ণু চমকিয়া উঠিল, "কেন ?"

"শত শত বৎসর পরাধীনতা সহ্য করা, মনুষ্যত্বকে তিলে তিলে হারিয়ে বেঁচে থাকা ঘোর অপরাধ—তার প্রায়শ্চিত্ত আমাদের রক্ত দিয়েই করতে হবে। এ প্রকৃতির প্রতিশোধ—মায়ের অভিশাপ।"

বিষ্ণু সায় দিল, "হ্যাঁ আজ থেকে নিউ মুভমেণ্ট আরম্ভ হল—কে জানে কি হবে।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "এবার রক্ত পড়বে—সে রক্তে স্বাধীনতার বীজ-বপন হবে।"

বিষ্ণুর সমস্ত দেহ শিহরিত হইয়া উঠিল।

"রক্ত। রক্ত পড়বেই। ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করো না বিষ্ণু ? স্বাধীনতার ইতিহাস রক্তাক্ত। স্বাধীনতা অর্জন এবং রক্ষণ দুয়ের জন্যই রক্ত দিতে হয়। স্বাধীনতা একটা অধিকার—তা আদায় করে নিতে হয়—ভিক্ষায় তা পাওয়া যায় না। সারা পৃথিবী অহিংস না হওয়া পর্যন্ত তোমার অহিংসা নিরর্থক। তাই বলছি—অহিংসবাদ ভাল কিন্তু তা যেন স্বাধীনতাকে গৌণ না করে। যে আত্মার বিকাশের জন্য অহিংসাব্রত পালন করা উচিত সেই আত্মা কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়া বাঁচতে পারে না। সত্যি, এবারকার মুভমেণ্টে কি হবে কে জানে—"

"কেন ?"

"সম্পূর্ণ অহিংস হওয়া মানে মৃত্যু বরণ করা—এমন দুর্জয় সাহস ক'জনের আছে ? দেশের লোকেরা ভয়ে অহিংস হয়েছে, আত্ম-প্রত্যয়ের ফলে নয়—তার মানেই যে

অধিকাংশের কাছে অহিংসা একটা উপায়—নিরস্ত্রের অস্ত্র। এবার তার পরীক্ষা হবে—"

"তারপর—?"

"জনসাধারণ যদি সত্যই অহিংস হয় তবে অসংখ্যের রক্তস্রোতে স্বাধীনতা আসবে। যদি না আসে তবে ব্যর্থ পৌরুষের প্রকাশ হবে অস্ত্রের আকারে তাতেও রক্তপাত। রক্ত আমাদের ঢালতেই হবে।"

"আমি তা বিশ্বাস করি না—(কিন্তু তবুও একি আশ্চর্য মন আমার !)

"না করলে—কিন্তু এই হবে। জনশক্তি একটা পথ বেছে নেবেই। যে পথই হোক—যেটা সকলের পথ, এবার থেকে আমারও সেই পথ।"৬৭

কংগ্রেসী অহিংসবাদ ও সাম্যবাদী মতাদর্শ—এই দুই মতের গোষ্ঠী তখন জাপানীদের ভারত আক্রমণ ও সেই সূত্রে ইংরেজদের প্রতিরোধী যুদ্ধে ভারতের প্রত্যক্ষ সাহায্য করা উচিত কি নয়—তা নিয়ে জটিল মত-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থপর শাসক তার সুযোগ নেয় রাজনীতিগতভাবেই। লেখক শংকর ও বিষ্ণুর আলোচনায় সেই জটিল চিত্রটিকে এঁকেছেন। গণবিক্ষোভের ভিত্তিই ছিল দেশসেবা, ছিল নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু আন্দোলন কি তা সম্ভব করবে—যখন দুই বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে রাশিয়াকে টানা হয়েছে, অন্যায়ভাবে? এই জিজ্ঞাসা ছিল কমিউনিষ্ট পার্টির। একদিকে মত, অন্যদিকে দেশ, একদিকে জাতিকতা, অন্যদিকে আন্তর্জাতিকতা—কোনটি গ্রহণযোগ্য? এরই মত-বিরোধের চিত্র এঁকেছেন লেখক উপন্যাসের শেষে :

"শংকর বলিল, "কম্যুনিষ্ট পার্টির সুমন্তের সঙ্গে দেখা হল।"

"তাদের কি মত?"

"তারা কিছুই খুলে বলছে না। তারা বলছে—মুভমেন্ট দ্বারা জাপানীদের সুযোগ দেওয়া হবে—তাছাড়া রাশিয়ার পরোক্ষ ক্ষতি করাও হবে।"

"বটে!" বিষ্ণু চুপ করিয়া ভাবিতে বসিল।

প্রমথ মৃদু হাসিয়া বলিল, "ওরা দেশের স্বাধীনতা কি চায় না?"

শংকর মাথা নাড়িল, "তা চায় বৈকি।"

"তবে?"

"নিজের মত বজায় রেখে।"

"দেশের স্বাধীনতা কি মতের উপর বা অন্য দেশের ক্ষতিবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে? মত, মত, মত—প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে যায়। স্বাধীনতা না হলে কারও মত টিকবে না। আর যে রাশিয়ার কথা ওরা বলে—যার আদর্শে ওরা পাগল—সেখানে বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল দেশ স্বাধীন ছিল বলেই। আমাদের সে অবস্থা নয়। আর এ কথাটাই বা ওরা ভাবে না

কেন যে স্বাধীনতার জন্য যাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ—সাম্যবাদের জন্যও তাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে হবে। আমরা ত একসঙ্গেই দুটো লাভ করতে পারি। কথার কূটনীতি দিয়ে স্বাধীনতা বা সাম্যবাদ কোনটাই হয় না। লেনিনের একটা কথা আছে নেপোলিয়নের কাছ থেকে ধার নেওয়া—First you enter a serious struggle then you see what happens, ওদেরও তাই বলো শংকর—।'[৬৮]

'ডাক দিয়ে যাই' উপন্যাসের শেষে শেখর ভিন্ন মতের রাজনৈতিক ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছে। দাদা প্রমথ আবার কারাবরণ করেছে অসহায়ভাবে। এমন একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মা, বাবা, বোন উমা, প্রতিবন্ধী বোবা ভাই গোরা, ছোটভাই রোমান্টিক দিলীপ—সকলেই গণবিক্ষোভের দিনে কখনো প্রত্যক্ষ কখনো বা পরোক্ষে আন্দোলনকে রসদ যুগিয়েছে। প্রমথ-শেখর-দিলীপের মা-ও আন্দোলনকে গভীর সমর্থন জানিয়েছে চরম ক্ষতি ও বিপদকে মেনে নিয়েই। ছোট ছেলে দিলীপকে মা আগামী দিনের জন্য কঠিন শপথে তৈরী হবার কথা বলেছে। লেখক নবেন্দু ঘোষ 'ডাক দিয়ে যাই' উপন্যাসের শেষে গণবিক্ষোভের মধ্য থেকে আগামী দিনের নিবিড় অমা তিমির ভেদকারী আলোর ও আশার প্রতীকী বাণী শুনিয়ে গণবিক্ষোভের সার্থকতাকে সমর্থন জানিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে যে প্রবল গণবিক্ষোভ, তার মূল লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করা। ঐতিহাসিক আগষ্ট আন্দোলনের ডাকে গান্ধীজি ও সে সময়ের সমস্ত কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদী নেতাদেরও লক্ষ্য ছিল তা-ই। এমন আগষ্ট আন্দোলনে যেমন গোপাল হালদার তাঁর 'পঞ্চাশের পথ' উপন্যাসের ডাক্তার নায়ক বিনয় মজুমদারকে ধীরে ধীরে জড়িত করেছেন, সে যোগ মূলত যুক্তি-চিন্তা-ন্যায়ে এক নিরপেক্ষ ব্যক্তির নির্দিষ্ট রাজনীতির শক্তিতে আসারই সামিল, তেমনি নায়কের সামনে সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রকেও নানা পরিবেশে ও অন্য চরিত্রের সংলাপে রেখেছেন। উপন্যাসটির আঠারো পরিচ্ছেদে লেখক রেখেছেন আগস্ট আন্দোলনের সূত্রপাতের সংকেত। আর সেই সঙ্গে আছে নায়ক বিনয়ের চিন্তা, রাজনীতির সূত্রে দেশকে দেখার, আন্দোলনের ভূমিকাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করার অন্তরঙ্গ শপথ ঘোষণা।

আবার সাম্রাজ্যবাদীদের স্বভাবকে লেখক প্রথম বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে ভোলেন নি। স্কুল শিক্ষয়িত্রী, রাজনৈতিক কর্মী সুধা গুপ্তার একটি জিজ্ঞাসায় তা ধরা পড়ে:

'এ দেশের ওপর সাম্রাজ্যবাদের বারো আনা অত্যাচারই তো হয় ইণ্ডিয়ানের সাহায্যে, কিন্তু সে ইণ্ডিয়ান তো যন্ত্রমাত্র। আসল দায়িত্ব কার?'[৬৯]

এই প্রশ্নের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদীর চরিত্র যেমন আছে, প্রশ্নকর্ত্রীর উত্তরও মিলে যায়।

এক ফেরারী রাজনৈতিক কর্মীও সাম্রাজ্যবাদ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন। সে বিনয়কে তর্কের মধ্যে বলে :

'সাম্রাজ্যবাদ তার স্বভাব বদলায় নাকি ?—দুনিয়া বদলে, পৃথিবীর 'ওলটপালট' হয়—আর সাম্রাজ্যবাদ মরে। স্বভাব তার বদলায় না, বদলালে সে সাম্রাজ্যবাদ থাকে না'[৭০] গোপাল হালদার গণবিক্ষোভের চিত্রে কেবল চিত্র এঁকেই স্থির থাকেন নি, তাঁর শৈল্পিক দায়িত্বের মধ্যে সমকালের রাজনৈতিক মতগুলির সংঘর্ষকেও সচিত্র করেছেন শিল্পীর সমবেদনায়। সাম্যবাদী রাজনৈতিক আদর্শ সে সময়ে তুমুল বিতর্ক, কোথাও বা গণবিক্ষোভের দিনে মহা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের মনে। কমিউনিষ্টদের বিরোধী ছিল জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস। নীচের তলার দলীয় বিশ্বাসে মানুষগুলির মধ্যে এই বিরোধ সেই বিক্ষোভের দিনগুলিতে কম ছিল না। গোপাল হালদার তাঁর সৃষ্ট চরিত্র শাহেদ সাহেব ও মজিদের মধ্যে মতাদর্শগত বিভেদ-বিতর্কের চিত্রে সেই পরিচয় দিয়েছেন কংগ্রেসী মুসলমান শাহেদ কমিউনিজম সম্পর্কে মতবিরোধে ক্ষোভ ও ক্রোধ পোষণ করে মনে মনে মজিদের ওপর। বলে :

'এই তোমাদের ব্যবস্থা বটে ? বিশ বছর ধরে আমরা ন্যাশনালিষ্ট মুসলমানরা কংগ্রেসকে ধরে রয়েছি—লীগের সম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছি—আজ আমাদের তোমরা এমনি ভাবেই করবে জাবেহ্ ?—এই তোমাদের ইমান ?—sense of honour, sense of shivalry ? থাশ। তোমাদের কমিউনিজ্‌ম আর পিপল্‌স ওয়ার ?'[৭১]

লেখক পরে দেখিয়েছেন শাহেদ সাহেব ঠাণ্ডা মাথায় পরিবর্তিত রাজনীতিকে স্বীকার করে এবং জাহেদকে প্রেসিডেণ্ট করার প্রস্তাব দেয় নায়ক বিনয়ের কাছে ? অর্থাৎ ব্যাপক গণবিক্ষোভের দিনে অন্তঃশীলভাবে দেশের দলীয় রাজনীতির মধ্যে যে মতাদর্শ ও সংঘাত ছিল, তা কিভাবে ধীরে ধীরে সংঘাত থেকে এক ঐক্যবোধে দীপিত হচ্ছিল, লেখক সেই বিষয়টিকে চরিত্র-গুলির যুক্তি তর্কের ন্যায়ে ও সিদ্ধান্তে রেখেছেন। সমকালীন বিপ্লবকে গ্রহণ করার পক্ষে লেখকের এই এক অভিনব শিল্প-পথ।

গণবিক্ষোভের ছবি রমেশচন্দ্র সেন এঁকেছেন তাঁর 'শতাব্দী' উপন্যাসে কাহিনীর আবহে চরিত্রগুলিকে সেই স্বদেশীয় বিক্ষোভের সঙ্গে রক্ত-মাংস-মজ্জা-আত্মার আত্মীয়তায় সমন্বিত করে। 'শতাব্দী' উপন্যাসে লেখক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের প্রেক্ষাপট গ্রহণ করেননি, নিয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভেরও আগের প্রায় একশ বছরের কাহিনী—যার মধ্যে স্বদেশ-চেতনার আন্দোলন ক্রমশ জাতীয়তাবাদ থেকে কংগ্রেসী মধ্য-পন্থী ও চরম-পন্থীদের মধ্যে পরীক্ষিত হতে হতে প্রবল সন্ত্রাসবাদে রূপ নিচ্ছে। গান্ধীজির অহিংসবাদ নানাভাবে আন্দোলনে প্রযুক্ত হলেও তারই অন্তস্থলে আছে হতাশ যুবমনের ক্রোধ ও

সন্ত্রাসবাদে তার চরম অভিব্যক্তি। আবার অহিংসবাদ, সন্ত্রাসবাদ থেকে জাতীয়তা চেতনা কিছু নবীন যুবকের প্রাণে এনেছে নবসৃষ্ট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়া-নির্দেশিত সাম্যবাদে বিশ্বাস। আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমে ও বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অহিংসবাদ থেকে সন্ত্রাসবাদ হয়ে সাম্যবাদে আন্দোলনের প্রবাহের কথা প্রসঙ্গত বলেছি। রমেশচন্দ্র সেন 'শতাব্দী' উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের উল্লেখিত ত্রিস্তর জাতীয় আন্দোলনের রূপান্তরকে গ্রহণ করে দেশীয় রাজনীতি-ভাবনা ও শোষক-শাসক শ্রেণীর চারিত্র্য উপস্থিত করেছেন।

উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র মহেশ্বর চাষার ছেলে। তার বাবা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজেশ্বরও চাষবাস থেকেই ক্রমশ আপন জীবন ও সততায়, নিষ্ঠায় হয়ে ওঠে ধনী, একাধিক কারখানার মালিক। লেখক বুঝেছিলেন আমাদের জাতীয় আন্দোলন বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দখলে, তবু তিনি তাদের এখানে নায়ক না করে সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে এনেছেন সর্বহারা শ্রেণীর মানুষদেরই—রাজেশ্বর, মহেশ্বর, নরেশ্বর, বীরেশ্বর প্রভৃতিকে—যারা ভবিষ্যৎ ভারতেব মুক্ত সমাজ জীবনের যথার্থ নেতৃত্ব দানের যোগ্য। লেখকের এই চেতনা নিঃসন্দেহে সুস্থ প্রগতিবাদের স্মারক।

ব্রাহ্ম ও মুক্ত মন ত্রিগুণার শিক্ষায় ও প্রভাবে প্রেসিডেন্সী কলেজের মেধাবী ছাত্র মহেশ্বর ক্রমশ রাজনীতি ও স্বদেশ চেতনায় নিজেকে জড়িয়েছে। এর ফলে তার মনের প্রসারিত রূপের মহৎ পরিচয় আছে নিজ কন্যা টগরের সঙ্গে মহেশ্বরের একসময়ের সংলাপ বিনিময়ের মধ্যে :

'স্বদেশী প্রশাসন দেখিলেই মহেশ্বর হৃদয়ে স্পন্দন অনুভব করে। জাতির জয়ধ্বনি শুনিলেই মন আনন্দে নাচিয়া ওঠে।...

একদিন মহেশ্বর বলিল, পরাধীন দেশের সবাই ছোট। বামুন, শুদ্দুর সব সমান।

টগর বলিল, ছিঃ বাবা, ও কথা মুখে আনতে নেই। বামুনরা হলেন দেবতা।

মহেশ্বর হাসিয়া বলে, জগতের চোখে সবাই আমরা পারিয়া।

পারিয়া আবার কি জিনিস ?

দক্ষিণ ভারতে একরকম জাত আছে তাদের ছায়া মাড়াতে নেই।

টগর বিস্মিত হইয়া গেল, মানুষের ছায়া মাড়াতে নাই, সে আবার কি রকম ?

মহেশ্বর বলিল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে তাদের তফাৎই বা এমন কি ? কথাটা শুনিয়া টগর গম্ভীর হইয়া গেল।'[৭২]

মহেশ্বরের এমন মুক্ত জীবন ও মনের ভাবনাই তাকে গৌতমশংকরের মত উগ্র সন্ত্রাসবাদী তরুণের সান্নিধ্য এনে দেয়। কংগ্রেসের মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী দলের মধ্যে ক্রমশ তার

চরমপন্থীদের দিকেই সহানুভূতি জাগে। সে হয় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের অন্যতম প্রধান। কিন্তু দেশসেবা, বিদেশীদের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি সম্বন্ধেই মহেশ্বরের নানা প্রশ্ন জাগে। তার প্রশ্ন উত্তর খোঁজে অবিরাম আপোষের আবেদন নিবেদনে নয়, তার উত্তর সে পেতে চায় কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার মধ্যেই :

'এর শেষ কোথায়, এই আবেদন নিবেদনের? মধ্যপন্থীই হৌক আর চরমপন্থীই হৌক কারও গঠনমূলক কোন কর্মসূচী নাই। জাতির যারা মেরুদণ্ড সেই শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নাই। কাজের মধ্যে শুধু সভা ডাকিয়া প্রস্তাব পাশ আর আবেদন। একদলের ভাষা উগ্র আর এক দলের নরম, এক দল নির্ভীক আর দল হিসাব করিয়া চলে। একদল বলে, আজই স্বরাজ চাই, আর একদল ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে পাইলেই খুশী। কর্মতালিকাহীন এই যে বিতণ্ডা এর মূলে সে শক্তি কোথায় যাহাতে স্বরাজ লাভ করা যাইতে পারে?'[৭৩]

দেশসেবার এমন উপায় সম্বন্ধে মহেশ্বরের দ্বিধাযুক্ত ভাব ভাবনাই তাকে কখনো আলো দেখায়, কখনো আবার হতাশ করে। ঢাকা জেলার হরিহরপুরে ডাকাতির সময় স্থানীয় জমিদারের গুলিতে গৌতমশংকরের মৃত্যুর খবর আকস্মিকভাবে পেয়ে মহেশ্বর স্তম্ভিত হয়ে যায়। সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে মহেশ্বরের মতের স্বল্প দূরত্ব থাকলেও মহেশ্বর এমন দেশসেবাকে শ্রদ্ধা করে। লেখক সন্ত্রাসবাদ থেকে ক্রমশ সাম্যবাদের শিক্ষার মাধ্যমে তাঁর চরিত্রগুলিকে রাজনৈতিক চেতনায় অন্য বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন। মহেশ্বরের তরুণ ভাই নরেশ্বরের মধ্যে সাম্যবাদী ভাবনার প্রথম উন্মেষ ঘটে। নরেশ্বর তার কলেজ-বন্ধু সুলেমানের কাছ থেকে কমিউনিজম-এর শিক্ষা ও পাঠ নেয়। পাঠচক্র গড়ে তারা :

'নরেশ্বর দলের কর্মী। সুলেমান তাদের দার্শনিক।··· সুলেমান বলিত, আমি চাষীর ঘর থেকে এসেছি কিনা তাই আমার পক্ষে কমিউনিষ্ট হওয়া সহজ ও স্বাভাবিক। তাদের দুঃখ মানেই যে আমার দুঃখ।

নরেশ্বর বলিত, চাষীর ছেলে আমিও ভাই। সেই হিসাবে আমি বরং উভয় কুল শুদ্ধ।

সুলেমান বলিত, তুমি যে ধনকুবের।

নরেশ্বর মাঝে মাঝে ভাবিত, তার পিতার ঐশ্বর্য কি সত্যই সাম্যবাদী হওয়ার প্রতিবন্ধক?'[৭৪]

এমন যুক্তি-চিন্তা ও প্রখর সচেতনা দিয়ে নরেশ্বর সাম্যবাদী দীক্ষা এমনভাবে জীবনরক্তে গ্রহণ করে, যেখানে সাধারণ জীবন তুচ্ছ হয়ে যায়, শ্রেণীহীন সমাজ-স্বপ্নই তার

একমাত্র জীবনাদর্শ হয়ে ওঠে। উপন্যাসের একেবারে শেষে সুলেমান ও নরেশ্বর—দুই কৃষক সন্তানকে সাম্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী করে লেখক নতুন কমিউনিষ্ট দল ও কর্মীদের যে যন্ত্রণাময় ভাগ্যচিত্র এঁকেছেন, তা যেমন দীপ্ত, তেমনি বলিষ্ঠ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগের এই নতুন সমাজত স্ত্রিক দলের শক্ত ভিত্তি রচনার অন্যতম প্রমাণ :

'পুলিশ অফিসার বলিলেন, আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চের গোপাল বিশ্বাস। · রাজেশ্বরকে বলিলেন, রায়পুর মামলার কথা শুনেছেন বোধ হয়? তারই দুজন আসামীকে সনাক্ত করতে হবে।

অরচার্ড ও দুজন পাহাবাওয়ালার সঙ্গে আসামীরা ভিতরে আসিলেন।

বিশ্বাস বলিলেন, বসুন শাস্ত্রীজি, বসুন মিঃ আজাদ। এদের চিনতে পারেন মিস রায়?

অমলা উভয়কে ভাল করিয়া দেখিয়া বিশ্বাসের দিকে চাইল, ইশারায় জানাইল, না চিনিতে পারে নাই।

বিশ্বাস একটু হাসিলেন। তিনি রাজেশ্বরকে বলিলেন, বিখ্যাত অনন্ত শাস্ত্রী ও আজাদ সাহেবের কর্মকেন্দ্র ছিল আপনার বাড়ীতে। এঁদের সহকর্মী ছিলেন মিস রায়। অবশ্য উনি আজ ওঁদের চিনতে পারছেন না।

আসামীদের দিকে একটুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রাজেশ্বর অনন্ত শাস্ত্রীকে ডাকিল, নরু, নরেশ।

নরেশ মাথা নীচু করিল। রাজেশ্বর বলিল, আর এই বোধ হয় তোমার বন্ধু সুলেমান? নরেশ সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল।

মিষ্টার বিশ্বাস বলিলেন, বড় বাপের ছেলে। তাছাড়া নিজেও শক্তিমান। নরেশ্বরবাবু নেতা হবেন এই ত স্বাভাবিক।

সে কথা রাজেশ্বরের কানে গেল কিনা সন্দেহ। পুত্রের প্রশান্ত ভাব ও দীপ্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখিয়া মনে মনে সে গর্ববোধ করিল।'[৭৫]

রমেশচন্দ্র সেন কাহিনীর শেষে এমন কয়েকজনকে কমিউনিষ্ট দলে যুক্ত করেছেন যারা প্রধানত কৃষক সন্তান। তাদের প্রধানতম সমর্থক রাজেশ্বর—যে নিজেও কৃষিকর্ম দিয়েই তার ভাগ্যকে এমন একাধিক কারখানার মালিকে পরিণত করেছে। কৃষক শ্রমিক—এই দুই শ্রেণীর সচেতনা দিয়েই লেখক দেশীয় কমিউনিষ্ট আন্দোলনের একটা ধাপে এসে সমাপ্তির রেখা টেনেছেন। এখানে প্রগতিশীল লেখকের দৃষ্টিভঙ্গও লক্ষ্য করার মত।

'তারাশংকরের' ধাত্রীদেবতা, 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাস তিনখানিতে দেশের

রাজনৈতিক আন্দোলন, বিপ্লবী ভাবনা, গান্ধীজির অহিংসবাদে দীক্ষা, গণবিক্ষোভ ইত্যাদি লেখকের নিজস্ব দর্শনের যাথার্থ্যে স্থান পেয়েছে। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে আমরা দেখেছি বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলনকে কাহিনী-অংশে গ্রহণ করার দিক। আলোচ্য তিন উপন্যাসে সমকালীন রাজনীতি আরও ব্যাপক আকার নিয়েছে। অবশ্যই একথা ঠিক, যে অর্থে গোপাল হালদার প্রমুখ গান্ধীজির ঐতিহাসিক আগষ্ট আন্দোলন ও অন্যান্য জাতীয় আন্দোলনের টীকা-ভাষ্য করেছেন তাঁদের উপন্যাসে, তারাশংকরের দৃষ্টি তার অনুগামী নয়।

'ধাত্রীদেবতা'র নায়ক জমিদারপুত্র শিবনাথের মধ্যে রাজনীতি চেতনা দেখা দিয়েছে যৌবন বয়সে এবং তা সন্ত্রাসবাদ, গ্রামসেবা, মানুষকে ভালবাসা, কারাবরণ এ সবের ঘটনাবহুল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসে শেষে পিসিমাকে মা হিসেবে প্রমাণ করেও দেশমাতৃকাকে ভালবাসায় নবরূপ পেয়েছে। 'ধাত্রীদেবতা'র রাজনীতি-চেতনা, গণজাগরণ, দেশসেবার যে প্রেক্ষিত তা তিনের দশকের পরবর্তীকালের দেশীয় রাজনৈতিক পটভূমির সংগে ওতপ্রোত। তখনো সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চলেছে, 'চার অধ্যায়ে' রবীন্দ্রনাথ তা নিয়ে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি ও মানবতা—এই দুই বিষয়ে একটা পরীক্ষায় মেতেছেন। তবে তারাশংকর 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথে এবং 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রামের' নায়ক দেবু ঘোষের মধ্যে গান্ধীজির রাজনৈতিক দর্শনকে সবেগে অভিনন্দিত করেছেন। শিবনাথের গ্রামসেবা, দেবু ঘোষের গ্রামের মধ্যে যাবতীয় জাতীয় সেবামূলক তৎপরতা—সবেরই মূলে থাকে গান্ধীজি নির্দেশিত গ্রাম-স্বরাজ ও গ্রামীণ অর্থনীতির ভাবনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস-ভাবনা যেখানে মার্কসবাদী সমাজ, শ্রেণী ও অর্থনীতি-ভাবনার অনুপন্থী, তারাশঙ্করের নায়করা তার ধারে-কাছে-থাকে না। এক আদর্শায়িত, ঐতিহ্যসম্মত প্রেম ও সত্যের কথা দিয়েই তারাশংকরের রাজনীতি-ভাবনা উপন্যাসে বাঙ্ময় হয়েছে। তাই শিবনাথ, দেবু ঘোষের যাবতীয় সংগ্রাম প্রকৃত অর্থে শ্রেণী সংগ্রামের অনুগত নয়, তা শ্রেণীর অধিকার বজায় রেখে আদর্শ-লালিত অনুভূতির মধ্যে ঐক্য এনে সমাজ ও মানুষের পরিবর্তনের কথাই ভাবে।

'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথ শপথ নিয়েছে গান্ধীজি প্রবর্তিত নীতিতে। সমাজতন্ত্রবাদ তার মূল কথা নয়, মূল লক্ষ্য জাতীয়তাবাদ ও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে স্বাধীনতার জন্য আ-মৃত্যু অহিংস সংগ্রাম। শিবনাথে ভয়ংকর আবেগ আছে, চেতনাদীপ্ত বিচার নেই। তারাশংকর শিবনাথের সামনে বিপ্লববাদী দাদাকে সন্ত্রাসবাদী দলের যুবককে দিয়ে হত্যা করিয়ে শিবনাথের মনে গান্ধীবাদ চিহ্নিত মানবতাবাদের মাটি আরও কঠিন করে তুলেছেন। 'গণদেবতা'র দেবনাথ ঘোষ 'পঞ্চগ্রামে' এসে গ্রামীণ স্বরাজকে একমাত্র

লক্ষ্য করেছে। নির্দিষ্ট অহিংসবাদ ও গান্ধীবাদকে একমাত্র সত্য ভেবেই লেখক রাজনীতি, গণ-আন্দোলন, কারাবরণ ইত্যাদির ছবি এঁকেছেন, যুদ্ধ-সমকালীন সময়ের গণ-আন্দোলন ও রাজনীতি-ভাবনাকে কাজে লাগিয়েছেন। তবে লেখক 'ধাত্রীদেবতা' শুধু নয়, 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রামে'ও যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়েছেন, তা যুদ্ধ-সমকালের ঘটনায় সীমাবদ্ধ নয়। তারও এক দশক আগের ঘটনা তাঁর উপন্যাসগুলিতে নানাভাবে সক্রিয়। তারাশংকর লিখছেন,—'উনিশ-শ-ত্রিশ সালের আইন অমান্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পঞ্চগ্রামেও উত্তেজনা জাগিয়াছে।'[৭৬] লক্ষ্য করার বিষয়, তারাশংকর যে গ্রামজীবনের পরিবেশে সমকালীন আন্দোলন-উন্মাদনাকে এঁকেছেন তা সামন্ততান্ত্রিক শাসনে অভ্যস্ত। আর এর মধ্যে নায়ক ও অন্যান্য চরিত্রের রাজনীতি-সচেতনা লক্ষ্য করার মত।

ছিরু পালের মত প্রবীণ প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই গ্রামে গণ আন্দোলনকে জীইয়ে রেখেছে, দীপিত করেছে। জমিদাররা নবাগত রাজনৈতিক চেতনা ও গণআন্দোলনের াবেোধী শক্তি। এক সমালোচক বলেছেন,—'গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে জমিদার নেই, কিন্তু জমিদারতন্ত্র আছে। এখানেই তারাশংকর জনগণকে তার স্বরূপে প্রকাশ করলেন।'[৭৭] তাঁর ছিরু পাল জাতীয় মানুষ সম্পর্কে উক্ত সমালোচকের বিচারণাই বোধ হয় সত্য,—'কঙ্কণার মুখুজ্জেরা অনুপস্থিত জমিদার আর ছিরু পাল নবোদ্ভূত মহাজন জমিদার।'[৭৮] দেবনাথ ঘোষের সমস্ত রকম অহিংস দেশসেবা, গ্রাম-স্বরাজ গঠনের ঐকান্তিক সনিষ্ঠ প্রয়াস এই মহাজন-জমিদারদের বাধা ভেঙেছে দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে গ্রামের পটভূমিতে সমকালীন ও অব্যবহিত পূর্বকালীন আন্দোলনের গণবিক্ষোভের প্রতিচিত্রণে তারাশংকর সামন্ততন্ত্র ও মহাজনতন্ত্র—একেই বড় করে এঁকেছেন।

প্রসঙ্গত এ কথাও বলি, এমন দেখা তাঁর একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বোধ ও বোধি থেকে উঠে-আসা বৈশিষ্ট্য। 'কল্লোলে'র কালে থেকেও 'কল্লোল' প্রভাবিত হন নি আপন তান্ত্রিক-ব্যক্তিত্বের কারণে। তাঁর যুদ্ধ-সমকালের উপন্যাসে গণবিক্ষোভের ছবিতে যে মিশাল, তা তাঁর স্বভাবানুগ। একালের এক প্রতিষ্ঠিত কথাকার-সমালোচক মন্তব্য করেছেন,—'সমকাল তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে লেখার, শিল্পনীতি গ্রহণ করার ও গড়ার রসদ ও অভীজ্ঞতার যোগান দিয়েছে, দেয়নি সেকালের কল্লোলকেন্দ্রিক কিছু তরুণের রোমান্টিক লোভন অভীপ্সার কাছে নতি স্বীকারের নিঃশর্ত মানস-আর্তি। সমকালে সচেতন থেকেই তারাশংকর স্ব-কাল রচনা করে তারই মধ্যে সাহিত্য রচনা করে গেছেন।'[৭৯] গণবিক্ষোভের প্রতিচিত্রণ প্রসঙ্গে গ্রামীণ জীবনের বৈশিষ্ট্য তাঁর উল্লিখিত উপন্যাস-ত্রয়ীতে মেলে, তার মূলে আছে এমন স্ব-কাল ভাবনাই।

বনফুল 'সপ্তর্ষি' উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে বিশ শতকের প্রথমার্ধের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগের রাজনৈতিক আন্দোলনের নানাবিধ বৈচিত্র্য ও সংঘাত, মতাদর্শের সংঘর্ষ, নূতন নূতন মতের জন্ম—এ সবকে মূল বক্তব্য করেই কাহিনীর প্রেক্ষিত রচনা করেছেন। এই উপন্যাসে গণবিক্ষোভের প্রত্যক্ষ রূপ নেই, তবে সামন্ততন্ত্র উত্তরাধিকার সূত্রে ক্রমশ পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হলেও যে যুগের দাবীতে পরিবর্তিত হয়ে অন্য আকার নেয়, তা বনফুল হংস-শুভ্র, সোম-শুভ্র, শশাঙ্ক-শুভ্র, মৃগাঙ্ক-শুভ্র, শঙ্খ-শুভ্র, রজত-শুভ্র, হীরক-শুভ্র—এই নামের সাতটি অধ্যায়ে স্পষ্ট করেছেন। উপন্যাসের প্রথমে হংস-শুভ্রের ভাই সোম-শুভ্রকে লেখা একটি পত্রে তার মানস পরিবর্তনের কথা বর্তমান :

'অতীত জীবন পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম, জীবনে অনেক ভুল করিয়াছি। ... ...পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এতকাল যাহা ঠিক বলিয়া মনে হইয়াছিল, সে প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া আজ তাহাই বেঠিক বলিয়া মনে হইতেছে।'[৮০]

বোঝা যায়, শাসককুলের সঙ্গে দেশীয় মানুষের সংঘাতই এমন চিন্তার মূলে সক্রিয়। কংগ্রেসী রাজনীতি করে মৃগাঙ্ক-শুভ্র—দুটি মেয়ে একটি পুত্রের পিতা হয়েও জেলে যায়। শঙ্খশুভ্র, মৃগাঙ্ক-শুভ্র হীরক-শুভ্র—এরা সকলেই রাজনৈতিক মতবাদে পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র। একটি মাত্র শুভ্র বংশের কয়েকটি পুরুষের কাহিনীকে গ্রহণ করে বনফুল পুরনো সামন্ততন্ত্রের অবসান, প্রাচীন আদর্শবাদের মূলে আঘাত, দেশসেবার নামে দানধ্যানে ও বেশ কিছু সুকাজের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির আত্মিক তৃপ্তি লাভের প্রবল লোভ—এসবের চিত্রই 'সপ্তর্ষি' উপন্যাসের রাজনীতির প্রধান ভিত্তি করেছেন। আমরা আগেও বলেছি, উনিশ শ পাঁচ সাল থেকে উনিশ শ উনচল্লিশ সালের মধ্যবর্তীকালে গান্ধীবাদ, কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদ, সহিংস আন্দোলনের সূচনা থেকে সন্ত্রাসবাদ, শেষে রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের শিক্ষায় সাম্যবাদের ভিত্তি রচনা—এসবই একে একে বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলনে দেখা দেয়। হীরক-শুভ্র সেই সাম্যবাদে দীক্ষিত এক আধুনিক তরুণ। 'সপ্তর্ষি' উপন্যাসে যে তৃতীয় পুরুষের ছেলেমেয়েদের কাহিনী ও চরিত্র এবং রাজনৈতিক জীবন ও ধ্যান-ধারণা অংকিত, হীরক-শুভ্র তার শেষ ব্যক্তিত্ব। সপ্তম অধ্যায়টি হীরক-শুভ্রের জেল থেকে চিত্রশিল্পী মেজদা রজতশুভ্রকে লেখা একটি মাত্র দীর্ঘ চিঠিতেই শেষ। চিঠিতে ফ্যাসিজম্, কমিউনিজম্ নিয়ে আলোচনা করেছে হীরক-শুভ্র নিজের মত করে :

'ফ্যাসিজম্ সোস্তালিজমেরই পরিবর্তিত বক্ররূপ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও জিনিস টিকবে না। ওটা ক্যাপিট্যালিস্টদের আত্মরক্ষার প্রয়াস, এবং আমার মনে হয়, শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ প্রয়াস হবে।'[৮১]

হীরকচন্দ্রের কঠিন আত্মদ্বন্দ্ব দিয়ে ও আত্মপ্রতিশ্রুতির ব্যঞ্জনা মিশিয়ে শেষ পরিচ্ছেদে তার মন্তব্য :

'আমার নিজেরই মাঝে মাঝে ভীত করে তোলে আমাকে। যে ক্যাপিটালিজমের বীজ রক্তধারায় সুপ্ত আছে, তা একদিন জেগে উঠে আমার এতদিনকার গড়া আদর্শের অট্টালিকায় ফাটল ধরিয়ে দেবে না কি, কে জানে।'[৮২]

সামন্ততন্ত্র থেকে সাম্যতন্ত্রে বনফুলের নায়ককে বিবর্তিত করে যুগের রাজনীতি ও গণচেতনার প্রমাণ রেখেছেন লেখক 'সপ্তর্ষি' উপন্যাসে।

চার

গণবিক্ষোভকে উপন্যাস ও ছোটগল্পে রূপ দিতে বসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক দশককে গ্রহণ করেছেন, কেউ আবার আরও আগের পঞ্চাশ কি একশ'-বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস ও জীবনকে চিত্রিত করেছেন। তবে অধিকাংশই সচেতন থেকেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের প্রখর গণচেতনার প্রেক্ষিতকে উপন্যাস ও ছোটগল্পে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। সুবোধ ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গি 'কর্ণফুলির ডাকে' গল্পের নায়কের সাম্যবাদী শ্রমিক চেতনায় ব্যক্ত যেমন, তেমনি তিনি আবার তীব্র সাম্যবাদ-বিদ্বেষ ও ঘৃণা-রূপে এঁকেছেন তাঁর 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসে। গোপাল হালদার তাঁর উপন্যাসে নিরাসক্ত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিকে সক্রিয় রেখেছেন। তিনি সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক চেতনার নিরিখে গান্ধীজির অহিংস আন্দোলন ও আগস্ট বিপ্লবের দৃষ্টিকে অন্য মূল্য দিয়েছেন। সাম্যবাদকে ইতিহাস ও সমাজতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশের ন্যায়ে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন।

'ভুলি নাই' উপন্যাসে মনোজ বসু যুদ্ধ-সমকাল থেকে পিছনে ফিরেছেন সন্ত্রাসবাদী তরুণ যুবক যুবতীদের দেশাত্মবোধের কথা বলতে গিয়ে। রমেশচন্দ্র সেন একশ বছরের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে কৃষকশ্রেণীর চেতনার রূপান্তর ও দেশীয় স্বাধীনতার ও বিপ্লবের জলন্ত পরিণামে তাদের অংশ গ্রহণের কথায় নিষ্ঠাবান লেখক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের বস্তুত গান্ধীজির আগষ্ট আন্দোলন, নবোদ্ভূত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া থেকে আগত সাম্যবাদী চেতনা, দেশীয় কংগ্রেসী আন্দোলন ও মতবিরোধ—এসব দিয়েই কথাকারগণ তীব্র স্বদেশ-চেতনাকে তথা দেশপ্রেমকে ব্যক্ত করেছেন গল্প-উপন্যাসে। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি, নিঃশর্ত স্বাধীনতা অর্জন—এসবই দেশপ্রেমের দৃষ্টিকোণে দেখানো হয়েছে। গণ বিক্ষোভের চিত্র তাই বাংলা কথাসাহিত্যে উজ্জ্বল হয়েছে মূলত স্বাধীনতা অর্জনের দাবী নিয়েই। নবেন্দু ঘোষ,

অন্নদাশংকর রায়, মনোজ বসু প্রমুখের গল্পে এ সবের পরিচয় মেলে। 'ডাক দিয়ে যাই' উপন্যাসে নবেন্দু ঘোষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের দেশীয় রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাতকে স্পষ্টতর করতে সচেষ্ট।

বস্তুত দেশীয় গণবিক্ষোভ-কথা বাংলা কথাসাহিত্যকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে অন্য মাত্রা দান করেছে। প্রত্যেকটি লেখকই কম-বেশী ঔপনিবেশিক শাসন-মুক্ত স্বাধীন দেশের কথা ভেবেছেন। আবেগ সেখানে প্রধান আশ্রয়, কেউ আবেগে ভেসে গেছেন গণ বিক্ষোভের চিত্রে, কেউ বা আবেগকে যথেষ্ট সংযত করেছেন বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তিতে। গোপাল হালদারের নায়ক বিনয় সে রকম এক নিরাসক্ত নায়ক। তবু সেও 'তেরশ পঞ্চাশ' উপন্যাসের শেষে কর্মময় জীবনের অঙ্গীকারে নবদীক্ষিত সাম্যবাদী চেতনার আবেগে নিজেকে অন্য স্বভাবের নায়কে পর্যবসিত করেছে। গণবিক্ষোভ রক্তিম হয়েছে উগ্র জাতীয় চেতনা। জাতীয় চেতনা দীপ্ত হবার পথ পেয়েছে শাসক ইংরেজকে প্রবল ধাক্কা দেওয়ার লক্ষ্যে। লেখকদের দেশীয় কালচেতনা ও রাজনীতির ঐতিহ্য-চেতনাই বিশ শতকের প্রথমার্ধ-ব্যাপী উত্তাল গণ-ভাবনাকে মূর্ত করেছে কথাসাহিত্যে। এই গণচেতনার ও গণবিক্ষোভের সবল প্রতিচিত্রণই বাংলা কথাসাহিত্যের উত্তরকালে, স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে আরও প্রবল স্রোত গ্রহণ করে বেগবান ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

১, ২ 'মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির সংকট আর একটি দিক' প্রবন্ধ ৬ঃ নীহার রঞ্জন রায় আনন্দ বাজার পত্রিকা শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮৭ পৃ ২৪, ২৫

৩ Imperialism and Revolution (1969) David Horowitz Ch 3: 'Imperialism and Revolution' P 50

৪ The Between War-world J. H. Jackson P 84

৫ Edgell Rickword Literature in Society: Essays and Opinions (II) 1931-1978 (1978) Edited by Alan Young Part-II. Inside the Thirties 'Straws for the wary: Antecedents to Fascism (1934)' P 45

৬ Six Novelists Look at Society (1977) John Atkins Ch. I 'The English Social Scene, 1920-1970' Sub. Ch. 'Class Assimilation' P 30

৭ Post War British Fiction: New Accents and Attitudes (1968) James Gindin Ch. I P 8

৮ 'ক্ষুধা' প্রবন্ধ ইন্দিরা এয়েনবুর্গ অনুবাদ : বীণা মজুমদার দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রতিরোধ প্রতিদিন' গ্রন্থ পৃ. ১৬৬-১৬৭

৯ The Colonial Encounter M. M. Mahood Ch 'Conclusion' Sub. Ch 3 P 183

১০ পথে প্রবাসে অন্নদাশঙ্কর রায় পৃ. ৪৫

১১-১৪ 'পরশুরামের কুঠার' (১৯৪২) গ্রন্থ সুবোধ ঘোষ 'কর্ণফুলির ডাকে' গল্প পৃ. ৯৮, ১০১, ১০১, ১০১

১৫, ১৬ 'ঘরে আগুন' গল্প মনোজ বসু 'দুঃখনিশার শেষে' গ্রন্থ (১৯৪৪, মে) পৃ. ১৩১, ১৩২

১৭, ১৮ 'দুঃখ নিশার শেষে' গল্প ঐ পৃ. ১৪৬, ১৪৭

১৯-২১ 'মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না' (১৯৪২) গল্প অন্নদাশঙ্কর রায় 'গল্প ১৯২৯-১৯৫০' গ্রন্থ প্রথম সংস্করণ, ১৯৬০ পৃ. ১২৬, ১৩৯, ১২৯

২২, ২৩ 'অধিকার' গল্প নরেন্দ্র ঘোষ 'এই সীমান্তে' গ্রন্থ (১৯৪৫) পৃ. ৫৬, ৫৭

২৪ 'বিলাসমন' গল্প মানিক গ্রন্থাবলী (৫ম খণ্ড) পৃ. ৪৮১

২৫ 'সৈনিক' মনোজ বসু ষষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ পঞ্চম পরিচ্ছেদ-২ পৃ. ১২

২৬-২৮ 'রঙরুট' বরেন বসু প্রথম সংস্করণ, ১৯৪৫ পরিচ্ছেদ ৯ পৃ ২০৮, ২১০-২১১, ২১২-২১৩

২৯-৩৩ 'সৈনিক' মনোজ বসু প্রথম পরিচ্ছেদ ৬ পৃ ৩৭, তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২ পৃ ৬৮-৬৯, তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৪ পৃ ৭৫-৭৭, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ২ পৃ ১১১-১১২, একাদশ পরিচ্ছেদ ১ পৃ ২০৫

৩৪ 'রঙরুট' বরেন বসু পৃ ৩৬৮

৩৫-৪৩ উনপঞ্চাশী (প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৪৩) গোপাল হালদার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পৃ ৪৩-৪৪, ৫৩-৫৪, ৫৩-৫৪, পরিচ্ছেদ ৩ পৃ ১০৭, ১১১-১১২, পরিচ্ছেদ ৫ পৃ ১৫৮, ১৫৮, পরিচ্ছেদ ৮ পৃ ১৭৭-১৭৮, পরিচ্ছেদ ১২ পৃ ২৭৬-২৭৭

৪৪, ৪৫ পঞ্চাশের পথ গোপাল হালদার সতেরো অধ্যায় পৃ ২৯৫-২৯৬, ২৯৬-২৯৭

৪৬ তেরশ পঞ্চাশ ঐ পঁচিশ অধ্যায় পৃ ৪৩২-৪৩৩

৪৭-৪৯ পঞ্চাশের পথ ঐ পনেরো অধ্যায় পৃ. ২৫৯, ২৬০, ২৬০

৫০ তেরশ পঞ্চাশ ঐ ষোলো অধ্যায় পৃ ৩০৭

৫১ পঞ্চাশের পথ ঐ সতেরো অধ্যায় পৃ ৩১২-৩১৩

৫২, ৫৩ তেরশ পঞ্চাশ ঐ ছাব্বিশ অধ্যায় পৃ ৪৪৭, ৪৪৭

৫৪ 'মন্বন্তর' তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় সংস্করণ মে, ১৯৪৫ অধ্যায় চৌদ্দ পৃ ১৪০-১৪১

৫৫-৫৭ 'ভুলি নাই' মনোজ বসু মনোজ বসুর রচনাবলী (১) পৃ ৪, ১১-১২, ৮৪

৫৮, ৫৯ 'ডাক দিয়ে যাই' নরেন্দ্র ঘোষ তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৫৩ 'নিবেদন' অংশ পৃ. ১৪, ১৪

৬০ Six Novelists Look at Society (1977) John Atkins Ch I, The English Social Scene. 1920—1970, Sub. Ch. The Role of the Intellctuals P 47

৬১-৬৮ 'ডাক দিয়ে যাই' নরেন্দ্র ঘোষ পৃ. ৪০, ৪৩, ৫১, ৬২, ৮১, ১৪৩-১৪৬, ১৫৩-১৫৪, ১৫৮

৬৯-৭১ পঞ্চাশের পথ গোপাল হালদার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পৃ. ২৬, তৃতীয় পরিচ্ছেদ পৃ. ৭১, একাদশ পরিচ্ছেদ পৃ. ২০১

৭২-৭৫ শতাব্দী রমেশচন্দ্র সেন দ্বিতীয় ভাগ পৃ. ১৪০-১৪১, ২৩৬, তৃতীয় ভাগ ২৭৯, ৩২৩-৩২৫

৭৬ 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাস তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ৩৬৩

৭৭, ৭৮ 'গ্রাম বাংলার চালচিত্র' প্রবন্ধ ডঃ বিজিত কুমার দত্ত 'তারাশংকর : দেশ কাল সাহিত্য' গ্রন্থ (চৈত্র, ১৩৮৪) সম্পাদক : উজ্জ্বল কুমার মজুমদার পৃ. ২৩৪, ২৩৯

৭৯ 'তারাশংকরের আগে ও পরে' প্রবন্ধ বীরেন্দ্র দত্ত 'তারাশংকর : দেশ কাল সাহিত্য' গ্রন্থ সম্পাদনা উজ্জ্বল কুমার মজুমদার (প্রথম প্রকাশ চৈত্র, ১৩৮৪) পৃ. ৩১৪

৮০-৮২ সপ্তর্ষি (প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫) বনফুল অধ্যায় ১ক পৃ. ১৬, অধ্যায় ৩ পৃ. ২০৯, ২২৮

সপ্তম অধ্যায়

নবোদ্ভূত ধনিক শ্রেণী, সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য এবং অস্থিরতা-অবক্ষয়ের সকল রূপায়ণ

এক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে কত বড় সুবিধাবাদী স্বার্থসর্বস্ব যুদ্ধ, যুদ্ধলিপ্ত শক্তিগুলির প্রত্যেকের নিজেদের বিশ্বের অর্থনৈতিক বাজার ধরার দিক থেকে, তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে যুদ্ধ শেষ হওয়ার মুখে একাধিক শত্রুপক্ষের সঙ্গে আর এক শত্রুপক্ষের নির্লজ্জ আঁতাত[১] করার মধ্যে। এই যুদ্ধে ছিল ফ্যাসিবাদী শক্তির সদম্ভ পদক্ষেপ। উগ্রতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই বিকৃত রূপ ফ্যাসিবাদ—ইতালির মুসোলিনী যার প্রবক্তা। এই ফ্যাসিবাদের অর্থনীতি জনজীবনে আনে চরম দুর্ভোগ, দারিদ্র্য, সাহিত্যে পরায় বাস্তব-জীবন-সম্পর্ককে আবৃত করে মিথ্যে সৌন্দর্য ও অধ্যাত্ম ভাবনার মুখোশ,—'Since the economics of Fascism inevitably leads to want, the ideology of its literature is full of eulogies of the beauties of sacrifice (in a world over-stocked with everything) and the superiority of spiritual to material enjoyment.'[২] এমন যুদ্ধের সময়ে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ থেকে উদ্ভূত জটিল ধনবণ্টন-বৈষম্য বুর্জোয়া সমাজের বিভিন্ন স্তরে যেমন অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে, তেমনি সমাজের শ্রেণী-সচেতনার মধ্যে তৈরী করে নানান জটিলতা। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাতেই সৃষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যেমন বৈষম্য প্রকট হয়, তেমনি প্রকট হয়ে ওঠে অসহনীয় অস্থিরতা ও অবক্ষয়।

শ্রেণী গঠন সম্পর্কে 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র সংজ্ঞাকে বিস্তারিত করে এক বিদেশী সমালোচক[৩] শ্রেণীর পরিচয় দিয়েছেন যথাযথ। শ্রেণী হল সমাজেরই প্রায় একই মর্যাদা সম্পন্ন বেশ কিছু ব্যক্তির গোষ্ঠী। সমাজ হল এরকম কয়েকটি শ্রেণীর সমাহার—যাদের মধ্যে শ্রেণীর বাইরের রূপ ও ভিতরের স্বভাব দুয়ের যোগ নিবিড়। কিন্তু এমন সংজ্ঞা শ্রেণী-ভাবনাকে এক জায়গায় থামিয়ে রাখে। ক্রমশ শ্রেণীভাবনা আরও জটিল হয়ে উঠেছে সভ্যতার পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আছে ধনী-দরিদ্র, আছে মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্তদের মধ্যেও অর্থের বণ্টন-বৈষম্যে দেখা দেয় ভাঙন—কেউ হয় উচ্চবিত্ত, কেউ বা নিম্নবিত্ত। যারা সর্বহারা শ্রেণী, তারা

সমাজের সকলের নীচে। এই যে শ্রেণীচরিত্র, তা মূল অর্থ নৈতিক বণ্টন-বৈষম্যের ফল। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই বৈষম্য অবধারিত। মানুষের বৃত্তি ধরে, অর্থ ক্ষমতা ধরে এই বিভাজনকে জীইয়ে না রাখলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার শাসন ও শোষণকে শক্ত ভিত্তি দিতে পারবে না। অর্থ আনে সুখ, সমৃদ্ধি, অর্থই হল মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য, জীবনকে সুখী করার শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রত্যেকটি মানুষ এই অর্থের কারণে বাঁচার সংগ্রাম করে—অন্তত সাধারণ মানুষদের তা-ই প্রধান লক্ষ্য। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই মৌল বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করেই সাধারণ মানুষদের মধ্যে বিপুল ধনতন্ত্রের টোপ ফেলে। এরই মধ্যে আসে ধনী দরিদ্র। এই শ্রেণী-বৈষম্য আঠারো-উনিশ শতক থেকে ক্রমশ বিশ শতকে এসে আরও তীব্র হয়। এই তীব্রতার চরম রূপের কারণেই এক সমালোচক মন্তব্য করেছেন বিশ শতকের তৃতীয় দশকের ইংলণ্ডের সমাজ ব্যবস্থার কথা ভেবে,—'The bitterness between the rich and the poor during the thirties was immense and growing.'[৪] বস্তুত এমন মন্তব্য আমাদের দেশের ধনী দরিদ্র সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য। শুধু তাই নয়, মনস্তত্ত্বের বিচারে ধনীর প্রতি দরিদ্রের যে কি জাতীয় ঈর্ষাকাতরতা, তার যেমন পরিচয় মেলে, তেমনি আবার সম্পর্ক আরও গভীর জটিলতম অন্ধকার জগত রচনা করে, '......there is envy by the poor for the rich, but far more complex status of mind are evolved.'[৫]

একদিকে ধনী, আর একদিকে সর্বহারা দরিদ্র, মধ্যে থাকে মধ্যবিত্ত সমাজ। এই মধ্যবিত্ত সমাজ সর্বদেশে, সর্বকালে প্রায় একই বিশিষ্টতা নিয়ে বজায় থাকে। এদের যেন একটা ঐতিহ্যবাহী সূত্র স্পষ্ট থাকে। এরা সময় এলে স্বভাব বদলায়। এদের যেন একটা ঐতিহ্যবাহী সূত্র স্পষ্ট থাকে। এরা সময় এলে স্বভাব বদলায়। এদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সময়োপযোগী থেকে আর্ত হয়ে ওঠে। 'It is really the middle classes...are traditionally more fluid, more ambitious and more subject to the demands of fashion.'[৬]

সমাজে সংঘর্ষ তীব্র হয় মধ্যবিত্তদের সক্রিয়তার কারণে। সমস্তরকম চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, ভাঙন, অবক্ষয়, অর্থাৎ সুস্থ স্থিতাবস্থার যা কিছু বিরোধী—সে সবের অস্তিত্ব মধ্যবিত্ত সমাজই বহন করে। ধনতন্ত্রের সঙ্গে এই বুর্জোয়াতন্ত্রের যেমন গভীর নিবিড় যোগ—অনেকটা স্রষ্টা ও সৃষ্টির, তেমনি আবার বিয়োগ-বিচ্ছিন্নতার কারণে সংঘর্ষও কম নয়। আসলে ধনতান্ত্রিক শোষণ ও শাসন এই সম্প্রদায়কে লক্ষ্যে রেখেই এগোয়। যারা ধনী, তাদের স্বার্থপর অর্থগৃধ্নুতা কখনোই সীমিত থাকে না, থাকতে পারে না।

তা ক্রমশ অসীম অনন্ত হতে পারে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও তার পরিচয় আছে সারা বিশ্বের ধনী সমাজে। এদের পাশে মধ্যবিত্ত অর্থাৎ বুর্জোয়ারা নানাভাবে নিজেদের চালনা করে, নানাসূত্রে নিজেদের ভাঙে।[৭]

বস্তুত বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা থেকে উপজাত যে কোন শ্রেণীই সামাজিক অন্তর্নিহিত চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলিকে এমনভাবে রক্তের সম্বন্ধে ধরে রাখে যে, তারা উত্তরাধিকারীর অধিকারের মত বজায় থেকে যায় নির্দিষ্ট শ্রেণীর গড়া পরিবারে। ব্যক্তির থেকে পরিবারেব ঐতিহ্যে তাদের অবস্থান নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সমালোচকের ভাষায়,—'The social molecules that rise and fall within a class, and sometimes beyond the boundaries of a class, are families rather than individuals. Thus these movements are measured in generations.'[৮]

আলোচ্য যুদ্ধ-সমকালে যে মধ্যবিত্ত সমাজ নবোদ্ভূত ধনীদের সম্মুখীন হয়, তারা বিশ শতকের প্রথম দিকের মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে, এমন কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর থেকে চেতনায় ভিন্ন অভিজ্ঞতার ধারক ও বাহক। যেহেতু একেবারে প্রথমদিকে যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী শিবিরেরই দুই গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ, এবং পরে তা হয় ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্ররক্ষার যুদ্ধ—তাতে শ্রেণী-বৈষম্যে জটিল বিশ্ব-সমাজের সদস্য কোটি কোটি মানুষ ভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ধনতন্ত্রের তখন উগ্র-আধুনিক পোষাক। সে একদিকে যেমন মানুষের ঐহিক সচ্ছলতা দেবার জন্য আগ্রহী, সেই সঙ্গে লক্ষণীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও পরে উল্লেখ্য যৌন স্বাধীনতা দিতেও উৎসাহী।[৯] ধনী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও তাদের স্বার্থের লক্ষ্য দরিদ্ররা এই ধনতান্ত্রিক বিধির সুযোগ গ্রহণ করে নানা কৌশলে।

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে এমন শ্রেণীভাবনা জটিলতম রূপ নেয়। আগেই আলোচনায় বলেছি, ভারতবর্ষ ছিল একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। যুদ্ধ হয় ইউরোপে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকের উপনিবেশ থাকায় তারই নির্দেশে ভারত হয় যুদ্ধলিপ্ত। কিন্তু অন্যান্য দেশের মত ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক যুদ্ধজনিত প্রতিক্রিয়া এক নয়। এই প্রতিক্রিয়ার প্রকটতম রূপ পাওয়া যায় শ্রেণীবিভেদ-চিহ্নিত সমাজ-মানুষের জীবনে ও মনে। আমরা জানি, সতেরো শতকের শেষ ও আঠারো শতক থেকেই, ভারতের তথা বাংলাদেশের সমাজ-ইতিহাস বলে, শ্রেণীর সৃষ্টি ইংরেজ অধিকারের পর থেকেই স্পষ্ট হয়। নতুন শাসকের স্বার্থচকিত শাসন-ন্যায়েই শ্রেণী গঠিত হয়, বা বলা ভাল, স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত হয় ধীরে ধীরে। কলকাতা শহরের ইতিহাসকার একজন এদেশীয় বুদ্ধিজীবী সতেরো-আঠারো শতকের কোম্পানী শাসন প্রসঙ্গে বলেছেন,—

'কোম্পানির অন্য কর্মচারীদের মধ্যে ·····ছিল দালাল, পাইকার ইত্যাদি। দালালরা সাধারণত বেতন পেতেন না, পেলেও নামমাত্র। ·· ব্যবসায়ীরা দালালদের কাছে মালের অর্ডার দিতেন, সেই সঙ্গে আগাম। দালালরা আবার নিয়োগ করতেন পাইকারদের। পাইকাররা বন্দোবস্ত করতেন তাঁতীদের সঙ্গে। কখনও কখনও কোম্পানী সরাসরি মাল কিনত, সে কাজে নিয়োগ করা হত এক শ্রেণীর মাইনে করা কর্মচারী। তাদের বলা হত গোমস্তা।'[১০] ব্যবসায়ে অর্থ উপার্জন করার জন্য এমন বিধি থেকেই একে একে কেরানী, দালাল, ধনী ইত্যাদির জন্ম হয়েছে বাংলাদেশে ও সারা ভারতেও। অর্থাৎ অর্থ-উপার্জনই একমাত্র লক্ষ্য। এই অর্থ মূলত বৃটিশ শাসকদের ধনতন্ত্রবাদের কেন্দ্র থেকেই দেখা দিত। নবসৃষ্ট ধনতন্ত্রবাদের পুরোহিত ছিলেন আঠারো-উনিশ শতকে ইংলণ্ড থেকে নিছক ব্যবহারিক প্রয়োজনে আগত ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি-সাহেবরা। 'অষ্টাদশ-উনিশ শতকে কলকাতার বাঙালীটোলার এক স্লোগান···সাহেব ধর। ···কেননা সাহেব মানে দস্তরি। সাহেব মানে টাকায় দু'পয়সা। সাহেব মানে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। সুতরাং সাহেব ধর।'[১১] অর্থাৎ গ্রাম বাংলার ও নবসৃষ্ট আধা-শহুরে ও শহুরে মানুষের লোভ, বাসনা, জীবিকা যত হয়ে ওঠে অর্থনির্ভর ততই শ্রেণী বৈষম্য প্রকট হয়।

এমন সমাজ-বৈশিষ্ট্যকে আরও নিপুণ বিশ্লেষণে স্পষ্ট করেছেন আর এক বাঙালী জাতির ঐতিহাসিক,—'একদিকে গ্রামাঞ্চলে কৃষককুলের সর্বনাশা অধোগতি···আর একদিকে শহরে-নগরে এক নূতন সৌভাগ্যবান, অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্প্রসারণ। আর এই শহর-নগরগুলিই ইংরেজ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রপ্রভুদের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক প্রভুত্বের লীলাক্ষেত্র। সুতরাং খুব স্বাভাবিক কারণেই ঐতিহ্য বেয়ে এবং পুরুষানুক্রমে সমাজের যে-নেতৃত্ব ছিল গ্রাম বা গ্রামসমষ্টিরও আঞ্চলিক কেন্দ্রে, সে নেতৃত্ব চলে গেল শহরে-নগরে নবসৃষ্ট মধ্যবিত্তদের হাতে।'[১২] প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকে গড়িয়ে এসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে এই মধ্যবিত্তরাই নেতৃত্ব দানে আরও সচেতন ও উত্তাল হয়ে ওঠে। সে নেতৃত্ব রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতীয় প্রভু ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের হয়েই। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেমন ছিল এদের হাতে, তেমনি সমাজ-নীতির সুস্থ আদর্শকে বাঁচাবার ক্ষমতা ছিল না এদের। এরাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে সবচেয়ে বেশী মার খায়। এই প্রহার আসে নবসৃষ্ট ধনীদের কাছ থেকেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে তৈরী হয় এক নতুন শোষকশ্রেণী। তারা সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থারই অন্যতম ফসল। তারা হল মুনাফাখোর, মজুতদার-কালোবাজারী। 'মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ভারতে এত ব্যাপক মজুতদারী, মুনাফাবাজি ও

কালোবাজারি ছিল না। ভারতীয় সমাজ জীবনে এটা ছিল মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিশাপ।'[১৩] —এটি এক প্রখ্যাত ইতিহাসকারের মন্তব্য। যুদ্ধ আরম্ভের পর থেকেই এক এক করে অভিশাপ নেমে আসে ভারত তথা বাংলাদেশের বুকে। যুদ্ধের প্রস্তুতির কারণে শাসককুল সারা দেশে এক বন্ধ্যা অবস্থার পরিবেশ রচনা করে ব্ল্যাক-আউটের ব্যবস্থা করে, যুদ্ধের জন্য দেশীয় সৈনিকদের নিয়োগ করে, খাদ্য-ব্যবস্থাকে যুদ্ধের কাজে লাগিয়ে ও রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ সবের পর আসে একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামন্বন্তর। একদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে মহান গণ-আন্দোলন, ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা, আর একদিকে সমাজের অভ্যন্তরে অশুভ পেচকের নিরন্তর আত্মগোপন। সে সমাজ ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্তদের নিয়েই নির্মিত বুর্জোয়া সমাজ। এই সমাজ নীরবে নিভৃতে ভাঙতে থাকে, চোরা ঢেউয়ের মতো এই সমাজের অভ্যন্তরে থাকে কালো দুর্গন্ধ স্রোত। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবক্ষয়, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে বিরোধ, ধনী শ্রেণীর সুবিধাভোগী কর্মতৎপরতা—সবই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সমস্ত রকম পরিবেশে।

এমন শ্রেণী-সংঘর্ষ, সমাজ-ভাঙন ও তার অস্থিরতা-অবক্ষয়ের রূপ বাংলাদেশের লেখকরা আঁকতে ভোলেন নি। যে 'remarkable degree of sexual freedom'-কে বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থায় সমালোচক দেখেছেন আধুনিক ধনতন্ত্রের পরিবেশে, সেই যৌনতার মাত্রা বর্দ্ধিত হয়ে বাংলাদেশের সমাজে ক্ষয়রোগ সৃষ্টি করে। মনোজ বসু, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকরা সেই অবক্ষয়কে জীবন্ত করেছেন তাঁদেব উপন্যাসে গল্পে। সোমেন চন্দ, প্রবোধ কুমার সান্যাল প্রমুখ যেমন মধ্যবিত্ত অস্থিরতা-অসহায়তা, ক্লেদ ও গ্লানিকে এঁকেছেন তাঁদের গল্পে, মনোজ বসু তাঁর একাধিক গল্পে ও তাঁর 'সৈনিক' উপন্যাসে, তারাশংকর তাঁর 'মন্বন্তর' উপন্যাসে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁদের একাধিক গল্পে-উপন্যাসে সেই শ্রেণী-পরিচয়, শ্রেণী-সংঘর্ষ, শ্রেণীলোপকে জীবন্ত করেছেন শিল্পের যথাযথতায়। বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাসে সেই চিন্তাধারার শৈল্পিক ব্যবহার লক্ষ্য করার মতই।

দুই

প্রবোধ কুমার সান্যাল তাঁর 'অঙ্গার' গল্প-সংকলনের 'মুক্তিস্নান' গল্পে একটি অর্থনৈতিক দুরবস্থার চাপে ভেঙ্গে-পড়া পরিবারের আচার-আচরণ থেকে উঠে-আসা যাবতীয় ক্লেদ, গ্লানি, ভদ্রতাহীন সভ্যতাহীন লোভ-লালসার চিত্র এঁকেছেন। বাংলা-দেশের বাইরে একটি ছোট শহরের এ্যাসিস্টান্ট স্টেশন মাস্টার হারাধনবাবু ও স্ত্রী

নিভাননী এবং একমাত্র কন্যা গেনির মধ্যবিত্ত সংসারে একদিন অতিথি হয়ে আসে হারাধনের এককালের পরিচিতা সুলক্ষণা—তার বেকার স্বামী উমাপতি ও একাধিক কন্যা ও পুত্রদের নিয়ে। কিশোর বয়সে কলকাতায় চোরবাগানে সুলক্ষণাদের বাড়ি ভাড়াটে হিসেবে অবিবাহিত হারাধনের থাকার সময় কিশোরী সুলক্ষণার সঙ্গে তার খেলার ছলে হয়তো কিছুটা হৃদয়-বিনিময়ও হয়েছিল! সেই সুলক্ষণা, তার রুচিহীন অশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা, তার স্বামী উমাপতি মাত্র কদিন বেড়াতে এসে, ওদের বাড়ি থেকে, আশ্রয়দাতাদের ভদ্রতা ও সৌজন্যের সুযোগের মধ্যে যে স্বভাবের পরিচয় দেয়, তা এক সহায়-সম্বলহীন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে-পড়া বিত্তহীন পরিবারের করুণ ছবি। সুলক্ষণা ও উমাপতিদের মানসিকতা কত নীচে নামতে পারে একই সঙ্গে স্বভাব ও অভাবের কারণে, তার পরিচয় লেখক এঁকেছেন গল্পের শেষে—হারাধন ও নিভাননীর ওদের অত্যাচারে বাড়ি ছেড়ে কিছু সময় অন্যত্র থাকার কালে। স্টেশনে হারাধন অসহায় অবস্থার মধ্যে সুলক্ষণাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য স্ত্রীকে লুকিয়ে একদিন নিজের পয়সায় টিকিট কেটে এনে ওদের ট্রেনে তুলে দেয়। কিন্তু শেষতম চিত্র স্ত্রীর পক্ষে যেমন ভয়ংকর, হারাধনের পক্ষে তেমনি পরম মুক্তিসূচক। এসবের মধ্যে এক অর্থহীন পরিবারের ক্লেদাক্ত ও একান্ত গ্লানিজনক মানসিকতা স্পষ্ট হয়:

'ওদের গাড়ী ছেড়ে দিল।

হন্তদন্ত হয়ে হারাধন বাসায় এসে ঢুকলেন। বললেন, কি গো, কি হোলো, বলি হয়েছে কি তাই বলো না?

চিৎকার করে নিভাননী তখন কাঁদতে আরম্ভ করেছে, ওগো, আমার এক হাঁড়ি আমসত্ত্ব চুরি করে নিয়ে গেছে···আমার নতুন কম্বল, বিছানার চাদর···তোমার ঘড়িটা··· গেনির জামাগুলো···দুটো কাঁসার বাটি ··আমার পুজোর সময়কার দামী শাড়ীখানা ···ওগো, ওরা আমার সর্বনাশ করে গেছে··· মর, মর, মর, ওলাউঠো হোক আমসত্ত্ব খেয়ে ··

হারাধন বিঘূর্ণিত মস্তকে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর ধড়াচুড়ো খুলে ফেলে একখানা গামছা জড়িয়ে সোজা চলে গেলেন ইঁদারার দিকে। সামনে ছিল ভরা জলের বালতি। সেই জলে ঘটি ডুবিয়ে হারাধন হুড় হুড় করে নিজের মাথায় জল ঢালতে ঢালতে পরম তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, আঃ।'[১৪]

সোমেন চন্দ তাঁর 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের অন্তর্গত 'ইঁদুর' গল্পটিতে একটা ভেঙ্গে-পড়া দরিদ্র মধ্যবিত্ত সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাপনের অভ্যাসের মধ্যে

নানাবিধ সূক্ষ্ম অস্বস্তিবোধের প্রতীকী ব্যঞ্জনা রচনা করে মধ্যবিত্ত জীবনের গভীর সংকটকে তুলে ধরেছেন। ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থের বণ্টন বৈষম্যেই মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ইত্যাদি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। আবার এই বৈষম্যেই মধ্যবিত্ত পরিবারে দেখা দেয় একাধিক অশান্তি ও অস্বস্তির দিক। 'ইঁদুর' গল্পের প্রথমেই সোমেন চন্দ এমন অশান্তি ও অস্বস্তির কথা ইঁদুরের উৎপাতের প্রতীকে রেখেছেন :

'আমাদের বাসায় ইঁদুর এত বেড়ে গেছে যে আর কিছুতেই টেকা যাচ্ছে না। তাদের সাহস দেখে অবাক হতে হয়। চোখের সামনেই, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের সুচতুর পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার মতো ওরা ঘুরে বেড়ায়, দেওয়াল আর মেঝের কোণ বেয়ে তর তর করে ছুটোছুটি করে।'[১৫]

গল্পটির নায়ক লেখক স্বয়ং। গল্পে তার নাম সুকুমার, বয়সে তরুণ, সে সময়ের রাজনৈতিক কর্মী। গল্পটির এই উত্তমপুরুষ কথকের মা ইঁদুরে ভয় পান। এমন দৃশ্যের ফাঁকে ফাঁকে এই মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সামান্য কারণেই নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে কলহ, অশান্তি, অস্থিরতা, রাগ, আবার সেই সঙ্গে ছোট সুখ-সহাবস্থানের আনন্দ-বেদনা—এসব অন্তঃশীল থেকে গেছে স্বল্প কাহিনীর ভিতরে। সংসারে দারিদ্র্য অসীম, সুতরাং সুখ সেখান থেকে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হবারই কথা। কিন্তু তবু যেটুকু বাঙালী একান্নবর্তী পরিবারে সুখ থাকে, তাকে ধরে সোমেন চন্দ সুখ-দুঃখকে ইঁদুরের অক্লান্ত ঘুরে বেড়ানোর প্রতীকী ব্যঞ্জনায় শিল্পারূপ দিয়েছেন। ছোট দারিদ্র্য-পীড়িত মধ্যবিত্ত পরিবারেই ইঁদুর বাস করে, তারা তাদের সামান্য সম্বল-টুকুও ক্ষতি করতে দ্বিধা করে না। লেখক এমন দীনতা ও ক্ষুদ্রতার চিত্র নানা রঙে মিশিয়ে গল্পের শেষে একটি ইঁদুরকে মেরে সুকুমারের বাবার ক্ষণিক উল্লাসকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তা যেমন বেদনাদায়ক তেমনি শ্লেষাত্মক। ঘরে একাধিক ইঁদুর। সব মেরে ফেলা সম্ভব নয়। মেরে ফেললেও মধ্যবিত্ত বাড়িতে এত ছিদ্র, আবার সে আসবে। অর্থাৎ দারিদ্র্য আবার অশান্তি, হীনতা, নীচতা নিয়ে বাসা বাঁধবে। কিন্তু সুকুমার অর্থাৎ নায়কের বাবার যে নির্বোধ উল্লাস, তা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জাঁতাকল-চাপা ভাগ্যের পক্ষে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচার প্রয়াসের মত। লেখকের আঁকা ছবিটি এই রকম :

'কয়েকদিন পরে কোন গভীর প্রত্যূষে ইঁদুর মারা কল হাতে করে আমার বাবা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বোকার মত হাসতে লাগলেন। দারুণ খুশিতে নাক আর মন্টুও দুই আঙুলে ধরে বানরের মতে লাফাচ্ছিলো। কয়েক মিনিট পরেই আরও অনেক ছেলেপিলে এসে জুটলো।

একটা কুকুর দাঁড়ালো এসে পাশে। উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে যারা সাহসী তারা কেউ লাঠি, কেউ বড় বড় ইট নিয়ে বসলো রাস্তার ধারে।

ব্যাপার কিছুই নয়, কয়েকটা ইঁদুর ধরা পড়েছে।' [১৬]

মধ্যবিত্ত জীবনের এমন গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী চিত্র বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বিধিসম্মত বুর্জোয়া সমাজেরই প্রতিরূপ স্পষ্ট করে দেয়। বস্তুত 'ইঁদুর' গল্পের লক্ষ্য মধ্যবিত্ত মানুষের নিষ্ঠুর নিয়তিকে নির্দিষ্ট করা। এই সমাজ-ব্যবস্থায় তাদের সবরকম অসহায়তা কোনদিনই নিশ্চিহ্ন হবে না। একজন 'ইঁদুর' গল্পের আলোচনায় মন্তব্য করেছেন,—'এটির গড়ন একটু এলোমেলো। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। এটিতে তিনি আবিষ্কার করেছেন নিজের নিয়তি। শ্লেষ আর করুণা, মানবতা ও সংকল্প বহুবর্ণ করেছে এটিকে। গল্পটির পরিণতি Symbolic।' [১৭] নতুন ভাষ্যের মানবতা ও সংকল্পে দীপ্ত ভাবনা সুকুমারের চরিত্রে অন্তর্নিহিত থাকায়, গল্পটিতে মধ্যবিত্ত জীবন-ভাগ্যের মধ্যে কিছুটা আশার আলোক চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হওয়ায় সোমেন চন্দ এই গল্পে জীবন সম্পর্কে আশাবাদী লেখকের ভূমিকায় নিজেকে বসাতে পেরেছেন।

যুদ্ধ-সমকালে নতুন তৈরী-হওয়া ধনিক শ্রেণী, সে সময়ের সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য ও তজ্জনিত অস্থিরতা-অবক্ষয়ের ছবি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্পে যে গভীর ও দক্ষ সমাজ-বাস্তবতায় চিত্রিত হয়েছে, বোধ করি, বাংলা কথাসাহিত্যে সত্যিকারের বাস্তবতার রঙ চড়াতে তা এক সঠিক দিকদর্শক নিঃসন্দেহে। 'বৌ', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'ভেজাল'—এই তিনটি গল্প-সংকলনের একাধিক গল্পে আমাদের এই বক্তব্যের প্রমাণ মেলে। সমকালের সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত সংকলনভুক্ত গল্পগুলির বিষয়ে বস্তুভিত্তি দানে৹ সহায়ক। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখকজীবন শুরু করা থেকেই যে এই শ্রেণী-সচেতনার কথা ভেবেছেন লেখার বিষয়ে, তার প্রমাণ তাঁর কথাতেই,—'প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি দুটি স্পষ্ট তাগিদে, একদিকে চেনা চাষী মাঝি কুলি মজুর-কাহিনী রচনা করার, অন্যদিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মূর্চ্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার।' [১৮] লেখকের সে সময় থেকেই একান্ত এবং গভীরতম বিশ্বাস,—'সংকীর্ণ গণ্ডী ভেঙে বিরাট জীবন্ত সমাজে আত্মবিলোপ ঘটার মধ্যেই আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা।' [১৯] মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের গল্প সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্যে তাঁর প্রখর এবং প্রদীপ্ত সময় ও শ্রেণী-সচেতনার পরিচয় মেলে,—'পচা ভদ্রতার মিথ্যা খোলস খুলে সবাই ছোটলোক হোক এ পরিণাম যে কামনা করতাম আমার অনেক গল্পেই তা ঘোষণা করবার চেষ্টা করেছি।' [২০]

যদিও 'সমুদ্রের স্বাদ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এমন মন্তব্য, তবু এই রচনায় সমসময়বর্তী অন্য দুটি গল্প-সংকলনেও এই বক্তব্যের গভীর সাদৃশ্যের পরিচয় মেলে। 'বৌ' গল্প সংকলনের প্রথম গল্প 'দোকানীর বউ'-এর দোকানী শম্ভু ও তার স্ত্রী সরলার টাকা-পয়সা সংক্রান্ত হিসেব-নিকেশের চিত্রে গল্পের শেষে সরলার যে স্বার্থ-সর্বস্ব চতুর হিসেবী মানসিকতা এবং সচেতন ভবিষ্যৎ ভাবনার কারণেই অর্থ গোপনের কৌশলের পরিচয় মেলে, তার মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৌদের 'টাইপ' ভূমিকাটি স্বভাবী পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পে লেখক সার্থকভাবে চিত্র এঁকেছেন ধনিক শ্রেণী ও সর্বহারা শ্রেণীর সম্পর্কের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের। গল্পের নায়ক যতীন, নায়িকা স্ত্রী মহাশ্বেতা। যতীনের সমস্ত সম্পত্তি তার ধনী পিতার কাছ থেকে মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। কিন্তু যতীনের বাবার বড়লোক হওয়ার পিছনের ইতিহাস সর্বহারাদের শোষণের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের কথা সংক্ষিপ্ত ও শ্লেষাত্মক ব্যঞ্জনায় লেখক লিখেছেন গল্পের মধ্যেই,—'যতীনের বাবা অনন্যোপায় হইয়াই অনেকগুলি মানুষের সর্বনাশ করিয়া কিছু টাকা করিয়াছিল। সকলের উপকার করিয়া টাকা করিবার উপায় থাকিলে এমন কাজ সে কখনো করিত না।'[২১]

এই হল সামাজিক অর্থনৈতিক শ্রেণী বৈষম্যের মধ্যে গড়ে ওঠা ধনিক শ্রেণী। গল্পের মধ্যেই এই ধনিক শ্রেণীর স্বভাব বিশ্লেষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিবা পৌরাণিক পরশুরামের মতই শ্লেষ-ব্যঙ্গের ও বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি-দেওয়া বিশ্লেষণে নির্মম :

'এ কথা কে না জানে যে পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জন এবং এ কাজটা বড় স্কেলে করিতে পারার নাম বড়লোক হওয়া? ...বড়লোক যদি হইতে চাও মানুষকে ঠকাও, সকলের সর্বনাশ কর। তোমার জন্মগ্রহণের আগে পৃথিবীর সমস্ত টাকা মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দখল করিয়া আছে। ছলে বলে কৌশলে যেভাবে পার তাহাদের সিন্দুক খালি করিয়া নিজের নামে ব্যাংকে জমাও। মানুষ পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অভিশাপ দিবে।

ধনী হওয়ার এ ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই।'[২২]

যতীন এমনি এক ধনীর সন্তান হয়েও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়। পিতার পাপ পুত্র পায় উত্তরাধিকার সূত্রে। তার স্ত্রী মহাশ্বেতার সঙ্গে তার সম্পর্ক হল জটিলতম। মহাশ্বেতার মানবতাবোধের কাছে যতীন, তার রোগ সব তুচ্ছ হয়ে যায়। মহাশ্বেতা নেমে আসে সর্বহারাদের মধ্যে। কুষ্ঠরোগীদের নিয়ে আশ্রম করে। গল্পের শেষে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুই স্বামী-স্ত্রী চরিত্রের যে পরিবর্তন-চিত্র এঁকেছেন, তা যেমন

ধনিক শ্রেণীকে নির্মম প্রত্যাহার, তেমনি গরীব, অসহায় মানুষদের সাদর মানবিক অভিনন্দন—দুয়ের মিশ্রণে উজ্জ্বল জীবন প্রত্যয়ের, বলিষ্ঠ জীবন-বরণের ছবিও :

'যতীন একদিন কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল : তুমি খালি ওদের সেবা কর শ্বেতা। আমার দিকে তাকিয়েও দেখ না।

মহাশ্বেতা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু বলিতে পারিল না।

সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালবাসিত, ঘৃণা করিত পথের কুষ্ঠরোগীদের। স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠরোগাক্রান্তগুলিকে ভালবাসে।

এতে জটিল মনোবিজ্ঞান নাই। সহজ যুক্তির অনায়াসবোধ্য কথা।'[২৩]

'কুষ্ঠরোগীর বৌ' গল্পে লেখক মহাশ্বেতাকে যেখানে নামিয়ে এনেছেন, সেখানেই লেখকের শ্রেণীভাবনার শেষ প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি।

'সমুদ্রের স্বাদ' গ্রন্থে 'ভিক্ষুক' গল্পেও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক নিম্নবিত্ত মানুষ যাদবকে সহজে অতিরিক্ত অর্থ উপায়ের জন্য নামিয়ে এনেছেন ভিক্ষুক শ্রেণীর মধ্যে। ভিক্ষাবৃত্তি নিয়েছে যাদব নিজের সম্পূর্ণ মিথ্যে করে বলা দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে। যখন যাদব ঠিক করে আর কিছুদিন বাদে ভিক্ষায় বেশী উপার্জন হলে বাঁধা চাকরীটা ছেড়েই দেবে, তখনি তার বিস্ময়-চকিত অভিজ্ঞতার মধ্যে আসে এক অজানা পকেটমারের প্রয়াসে শেওড়াফুলির এক ভদ্রলোকের পাঞ্জাবীর ডানদিকের পকেট কেটে গোটা মানিব্যাগটাই মেরে নেওয়ার ঘটনাচিত্র। অর্থনৈতিক দুরবস্থার ও অর্থের লোভে নিম্নবিত্ত মানুষ কেন জটিল মানসিকতার শিকার হয়, 'ভিক্ষুক' গল্পের যাদব তার উজ্জ্বল উদাহরণ। 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পটির যে নায়িকা নীলা তার বাবার অসহনীয় দারিদ্র্যের কারণে কোনদিন সমুদ্র দেখতে পারেনি পরম ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও, সেই নীলা বাবার মৃত্যুর পর অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে স্বামী অনাদির ঘর করতে এসেও সেই সমুদ্র না দেখার দুঃখ ভুলতে পারেনি, কাঁদে অকারণে। এই কান্না তার অসুখ, এক বিকার। ভিক্ষুক গল্পের নায়ক নিম্নবিত্ত যাদবের মত 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পের নিম্নবিত্ত পিতার কন্যা নীলার এ-ও এক মানসিক বিকার, অসুখ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন ও মানুষের মধ্যে যে কোনভাবে হোক ওপরে ওঠার প্রয়াস ইত্যাদি থাকে, সে সবই লেখক 'কাজল' গল্পের বিকাশ-বাণী, 'আপিস' গল্পের মায়া, নরেন, বিমল, 'আততায়ী' গল্পের কৃত্তিবাস, 'বিবেক' গল্পের ঘনশ্যাম ইত্যাদি চরিত্রচিত্রে সার্থক শিল্পমূল্যে উপস্থাপিত করেছেন। বিভিন্ন শ্রেণী-নির্দিষ্ট ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সমস্ত মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনই নানাভাবে বিকারগ্রস্ত হতে বাধ্য। যুদ্ধ-সমকালে তা আরও প্রকট। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত জীবনচিত্রে সেই দিক বিস্মৃত হন নি।

'তেভাগা' গল্প-সংকলনের 'ধনজন যৌবন' গল্পেও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যুদ্ধ-সমকালে উদ্ভূত এক মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর অর্থলোভ ও নারীলোভকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্তের সংগে তার সম্পর্ক-চিত্রটি অবক্ষয়ের কালিমায় উপস্থিত করেছেন। স্পিনিং মিল, নারকেলের ছোবড়া ও তেলের কারখানার মালিক, শেষে চামড়ার ট্যানিং-এরও ব্যবসাদার নির্মলেন্দু সেই ব্যবসায়ী যে তারই কারখানার শ্রমিক রাঘবের স্ত্রী সুমতিকে গুলি করার ভয় দেখিয়ে ভোগ করার ক্ষমতা রাখে। এর পাশাপাশি সুমতির বড়লোক তোষণের ও তার অর্থ-সম্পত্তি ভোগের গোপন বাসনাচিত্ত লেখক উল্লেখ করতে ভোলেন নি। ক্রুদ্ধ রাঘবের কাছে সুমতির যুক্তি—

'কি জ্বালা, বেশ্যা নিয়েও তো কত মানুষ সুখে দিন কাটাচ্ছে। তোমার বুক জোড়া ধন বিয়ে না করা ইস্তিরিটি কি ছিল আগে? যা হয়েছে, হয়ে গেছে। অত বাড়াও কেন?'[২৪]

নির্মলেন্দু তাকে ভোগ করে যাওয়ার পর তার সম্পর্কে সুমতির ধারণা—যা রাঘবের কাছেই তার ক্রোধ দমন করার যুক্তি হিসেবে রাখে:

'আর তাও বলি, বদমাস গুণ্ডা তো নয়, লাখপতি বামুনের ছেলে। সেকালে মুনি ঋষি অতিথি হলে রাজারা যেচে রানীকে পাঠিয়ে দিত তার কাছে, ভাগ্যি বলে মানত। একটা রাজার বংশ থাকত নইলে?'[২৫]

এই হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রমণী যে সুযোগ এলে নিজের পক্ষে যথাযথ গ্রহণের জন্য যুক্তিও রাখতে জানে। এই গল্পে একদিকে নির্মলেন্দুর অর্থের দাপটে যাবতীয় অনর্থের অত্যাচার, উৎপীড়ন, আর একদিকে নারীলোভে মেয়েদের সুস্থ স্তর থেকে টেনে নামানোর প্রয়াস—সে প্রয়াস নিজের লোভ চরিতার্থ করার জন্যই। গল্পটির শেষে লেখক অদ্ভুত শিল্প ব্যঞ্জনায় নির্মলেন্দুর সুমতিকে পাওয়ার দিক এবং সেই সূত্রে সুমতির ক্রমশ 'হাফ গেরস্ত' হয়ে জীবন কাটানোর সিদ্ধান্তবাক্য ব্যবহার করেছেন:

'ঘরে আজ পচা ইঁদুরের গন্ধ ছিল না। শুধু সুমতির চুলে একটা সস্তা কেশ তৈলের গন্ধ আছে। রাঘব তাকে যে তেলের শিশিটা কিনে দিয়েছিল এখনো সেটা ফুরিয়ে যায়নি। নির্মলেন্দুর কারখানার নারকেল তেল গাঁয়ের মুদিখানায় বিক্রী হয়। সেই নারকেল তেলের সঙ্গে একটু একটু সুগন্ধি তেল মিশিয়ে সুমতি ব্যবহার করে।'[২৬]

ধনিক শ্রেণীর অর্থের, কাঙ্ক্ষিত বিলাসের কাছে মধ্যবিত্ত রমণীর আত্মসমর্পণ প্রয়াসের ঘটনা যুদ্ধ-সমকালের মন্বন্তর, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদির প্রেক্ষিতে সহজ ছিল। লেখক কথাসাহিত্যে সেই শ্রেণীরূপ ও বৈষম্যকেই ধরতে চেয়েছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'বীতংস' গল্প-সংকলনের অন্তর্ভুক্ত নামগল্প, 'তৃণ', 'নিশাচর', 'সৈনিক' গল্পগুলিতে এবং 'দুঃশাসন' গ্রন্থভুক্ত নামগল্প, 'পুতুল' ও 'ভাঙা চশমা' গল্পে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শ্রেণী-বৈষম্যের রূপ ও তার কারণে সর্বহারাদের অসহায়তাকে বিভিন্ন আধার ও দৃষ্টিকোণে ধরার চেষ্টা করেছেন। 'বীতংস' গল্পের খচ্চরের পিঠে চড়া সুন্দরলাল এক শৃগালের মত শয়তান মানুষ। শাল মহুয়া গাছের ছায়া-ঘেরা সাঁওতাল পরগণায় সে সাধু সেজে, শালবনের মাঝখানে সিঁদুর মাখানো কালো পাথরটাকে দেবতা বানিয়ে দেবতা, শিং-বোঙার আদেশ শুনিয়ে অশিক্ষিত সরল নিষ্পাপ সাঁওতাল পুরুষ-রমণীদের নিজের বশ্যতায় আনে। যুবতী বুধনীকে বাঁধে নিজের কামনায়। মড়কের ভয় দেখিয়ে তাদের ঘর ছাড়া ক'রে যেভাবে নিজের কার্যসিদ্ধি করতে চায়, তা তার ধূর্ত শোষক-মালিকের বৈশিষ্ট্যই স্পষ্ট করে। 'তৃণ' গল্পের নায়ক মুসলমানদের কাছেও অচ্ছুৎ ধাওয়া শ্রেণীর মুসলমান মাঝি বসিরের জীবনে যে গভীর ট্রাজেডি নেমে আসে জলের মধ্যে সাপের কঠিন কামড়ে, তার মূলে আছে হালিম শাহ ও তার বরকন্দাজ পীরু মিঞার যেমন জমিদারী অত্যাচার, তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে উদ্ভূত দালাল শ্রেণীর প্রতিনিধি মুসলমান পাইকারের ধূর্তামী ও বসিরের স্ত্রী রোসেনার প্রতি লোভ। চরম অভাবের দিনেও পীরু মিঞার হাতে মাছের নজরানা দিতে হয়। একদিকে সর্বহারা শ্রেণীর চরম দারিদ্র্য, অন্যদিকে তারই ওপর শোষক শ্রেণীর নির্বিচার শোষণ অত্যাচার। এ থেকেই পাইকারের যুক্তিতে বসির-রোসেনা রাতের অন্ধকারে নৌকায় চেপে বাস্তু ত্যাগ করে। পাইকার হল মধ্যস্বত্বভোগী দালাল :

'ধানের সময় সে দালালী করতে আসে, পাটের মরশুমে তাকে ঘুরতে দেখা যায়, এমন কি সাগরদীঘির মেলায় খোপরা পটি বা গণিকা পল্লীর বিলিবন্দোবস্ত করতেও সে হাঁটাহাঁটি করে বেড়ায়।'[২৭]

পাইকার রোসেনার লোভেই নির্মম হয় বসিরকে জলের মধ্যে সাপে কামড়াবার সময়। হালিম শাহ, পীরু মিঞা, পাইকার—এমন সব শোষক দালালরাই শোষিতদের অবনত, ধ্বংস করে কূট কৌশলে। 'নিশাচর' গল্পেও আছে এক শীতার্ত বিপরীত ছবি, যে শীতের রাতে হঠাৎ পুলিশ তার বাড়ি ঘেরাও করায় গোপনে বেরিয়ে প'ড়ে যুদ্ধ ভয়ে ভীত অন্ধকার কলকাতার রাস্তায় পালিয়ে বেড়ায়। রাস্তার সর্বহারা নিশাচরদের সে-ও একজন আত্মীয় হয়ে যায়। শ্মশান তার একমাত্র বাঁচার আশ্রয়। মৃত্যুর পাশে বেঁচে থাকার স্বাদ নিয়ে নায়ক আবার নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। 'সৈনিক' গল্পের হাওলী নীলবাহাদুরকে গল্পের প্রধান চরিত্র করে

লেখক বঙ্কিম ইন্দ্র চৌধুরীর মত জমিদারের প্রজার ওপর কঠিন অত্যাচার জনিত শ্রেণী সংঘর্ষকেই ব্যঞ্জনায় এঁকেছেন। যারা শোষিত তাদের ধ্বংস করে জমিদার তাদেরই প্রতিনিধি নীলবাহাদুরকে দিয়ে তাদের পাকা ফসলের ক্ষেতে ধ্বংসের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে। সামন্ততন্ত্রের কৌশলই তা-ই। প্রজাদের রক্তে বলীয়ান হয়ে আত্ম-আভিজাত্য রক্ষার প্রয়োজনে প্রজাদের ধ্বংস করা।

'দুঃশাসন' গল্পের কাপড়ের মজুতদার দেবীদাস যুদ্ধ-সমকালে জন্ম নেওয়া এক ধনী মানুষ। গ্রামের যাত্রার আসরে 'দুঃশাসনের রক্তপান'-এর অভিনয় দেখে তার মধ্যে আগামী দিনে তার অশুভ পরিণতির কথা ভেবে আতংকিত হয়। নতুন দিনের শ্রমিক-কৃষক সর্বহারারা তাদের মত মানুষকে কি চোখে দেখবে? তাদের বাঁচা সহজ হবে তো? এমন প্রশ্ন ভাইপো গৌরদাসকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের পথে চলতে চলতে দেবীদাসের মনে পড়ে। গল্পে লেখকের সর্বশেষ বর্ণনা তা-ই ব্যঞ্জনাগর্ভ মজুতদার শ্রেণী ও বঞ্চিত শ্রেণীর সংঘর্ষের ইঙ্গিতে:

'রাত্রিজাগরণে দেবীদাসের মুখটা অদ্ভুত বিষণ্ণ আর পাণ্ডুর। ওদিকে ফসলহীন রিক্ত মাঠ। তারই ভাঙ্গা আলের উপর দিয়ে একদল লোক কাজ করতে চলেছে—তাদের ধারালো হেঁসোগুলোতে সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠছে। অকারণে—অত্যন্ত অকারণে বড় বেশী ভয় করতে লাগল গৌরদাসের। অমন ঝক্‌ঝক্ করে কেন হেঁসোতে শান দেয় ওরা?'[২৮]

দেশে ধর্মের নামে পুরোহিত-তন্ত্রের আবির্ভাব। পুরোহিতদের দেবদেবী সেবার মাহাত্ম্য প্রচারের নামে সমস্ত রকম ভণ্ডামি, কপটতাকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'পুষ্করা' গল্পের সাঁওতাল পল্লীর পুরোহিত তর্করত্নের মধ্যে এঁকেছেন। পুরোহিত-তন্ত্র তো ধর্মতন্ত্র-পুষ্ট ধণতান্ত্রেরই আর এক কৌশল যা সাধারণ অশিক্ষিত মানুষদের নিদ্রিত, অভিভূত, অলস করে রাখা যায়। তাদের অশিক্ষিত দৈববিশ্বাসকে, ভয়কে সুকৌশলে স্বার্থের প্রয়োজনে নিযুক্ত করাই ধনতন্ত্রের লক্ষ্য। পুরোহিততন্ত্র তাই একটি উপযুক্ত উপায়। শ্মশান পুজোর নামে তর্করত্নের যাবতীয় ধর্মীয় ভড়ং ও তৎপরতা, আকালের মধ্যে স্বামী-পুত্র-হারা ডোম বধূর পাগল হয়ে যাওয়া—এসবই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিণাম।

'ভাঙা চশমা' গল্পের উত্তম পুরুষ কথক নিম্নবিত্ত স্কুল মাষ্টার যুদ্ধের দুঃখের দিনে আদর্শের চাকরী ছেড়ে বেশী মাইনের সরকারী হাকিম হয়। কিন্তু তার হাকিমী তাকে তার স্বার্থপরতার পথ ধরে নামিয়ে আনে এমন এক জায়গায়, যেখানে সে সম্পূর্ণ

বিধ্বস্ত। যে হেডমাষ্টার যুদ্ধের দিনে কোন ছাত্র স্কুলে না থাকলেও আদর্শকে আঁকড়ে ধরে স্কুল বাঁচিয়ে রাখে, সমস্ত রক্তবিন্দু তার স্কুল, সেই হেডমাষ্টারের কাছে একদা স্কুল মাষ্টার বর্তমানে হাকিম-নায়ক সম্পূর্ণ পরাজিত, বিধ্বস্ত হয়ে যায়, নিজেকে কুৎসিৎ শূন্য মনে হয় তার লোভ, স্বার্থপরতায় ভরা আদর্শহীন জীবনের সুখময় আয়নায় :

'যেন চোরের মতো পালিয়ে যাচ্ছি আমি। মনে হল, বিদ্যার এই তীর্থে আমার থাকবার অধিকার নেই, আমার ছোঁয়াতেও এখানকার শুচিতা মলিন হয়ে যাবে। আমি ব্রতচ্যুত, লোভী, স্বার্থপর।'[২৯]

অর্থের বণ্টন বৈষম্যের কারণেই এক অভাবী স্কুল শিক্ষক শিকার হয় প্রভূত অর্থ উপার্জনের স্বার্থসর্বস্ব, আদর্শভ্রষ্ট লোভের। তার আত্মসমীক্ষা ও আত্মসমালোচনা বস্তুত এক নিম্নবিত্ত অবস্থা থেকে উঠে-আসা উচ্চবিত্তের রোমান্টিক আদর্শভ্রষ্ট হওয়ার কারণেই।

'কাঠ' গল্পে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত স্পষ্টভাবে এক শ্রেণী-সংঘর্ষের ছবি উপহার দিয়েছেন। সিভিল সাপ্লাইয়ের নতুন ইন্‌সপেক্টর সুশীল সেই উচ্চবিত্তের প্রতিনিধি, যে নিজের স্বার্থে নীচের তলার মানুষকে তার যথোচিত মর্যাদা দেয় না। মঙ্গল তার চাপরাশি। উনুন ধরানোর জন্য কাঠ নিয়ে আসে সে মাঝিদের কাছ থেকে। মন্বন্তরের দিনে যুদ্ধের পরিবেশে চাল ডাল বস্ত্রের মত কাঠ ও কয়লারও আকাল। মাঝিরা কাঠের দাম নেবার জন্যে সুশীলের কাছে এলে তারা কাঠের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার প্রতিবাদ করে, সংঘবদ্ধভাবে এমন এক রাজনৈতিক দলের আশ্রয় নেয়—যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে নিম্নবিত্ত, শ্রমিক ও সর্বহারাদের হয়েই সংগ্রামরত ছিল। সুশীল আত্মস্বার্থে মূল্য শোধ না দিলে মঙ্গল তার মাহিনা ও রাগ্‌গীভাতা বাবুর কাছ থেকে নিয়ে সেই দাম মেটায়। তার খবর কিন্তু মাঝিরা জানে না। উচ্চবিত্ত মানুষের জন্য নিম্নবিত্ত গরীব মানুষ যে অত্যাচার সহ্য করে, যে অসহায় জীবনের শিকার হয়, লেখক সুশীলের পাশে মঙ্গলের চরিত্র এঁকে তার নিপুণ শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

যুদ্ধ-সমকালের রক্তাক্ত পটভূমিতে গল্প লিখতে বসে সুবোধ ঘোষ তাঁর 'ফসিল' গল্প সংকলনের নাম-গল্প ও 'গোত্রান্তর' গল্পে শ্রেণী বৈষম্যের ও শ্রেণীচেতনার সার্থক শিল্প স্বাক্ষর রেখেছেন। আমরা আগেও বলেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই সারা পৃথিবীতে রাশিয়ার নবোদ্ভূত সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা মার্কসীয় ব্যাখ্যায় নানাভাবে এদেশীয় বুদ্ধিজীবীদের ওপর—সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও প্রভাব বিস্তার করে ধীরে ধীরে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুদ্ধ-সমকালের তরুণ লেখক সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু

ঘোষ প্রমুখ এই ভাবনার পরিচয় দেন তাঁদের একাধিক গল্পে উপন্যাসে। মার্কসীয় যে শ্রেণী বিশ্লেষণ, শোষক-শোষিত সম্পর্ক-ভাবনা, সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পে তার নিপুণ ব্যবহার দেখা যায়। গল্পের শেষে চরম বিবদমান এদেশীয় 'মহারাজা' ও বিদেশী বনিকদের মধ্যে যে শেষ মুহূর্তে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার কৌশলে তৃতীয় গোষ্ঠীর নেতা দুলাল মাহাতোর জীবননাশে সিদ্ধি—তার ব্যাখ্যায় একালের এক কথাকার-সমালোচক এভাবে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন,—'এ যেন যুদ্ধের চরম ক্ষণে দুই বিবদমান ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ-সর্বস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে ১৯৪২-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবল গতির মুখে এক হয়ে যায় সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়াকে ধ্বংস করার জন্য! সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের পরিণতি যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধ-স্থান, লক্ষ্য বা দিক বদলেরই একটি ছোট সংস্করণ।'[৩০] সমালোচকের এই ব্যাখ্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের প্রেক্ষাপটে 'ফসিল' গল্পের লেখকের সময়-সচেতনা এবং গল্পটির কেন্দ্রীয় তাৎপর্য—যা শ্রেণী সংঘর্ষের কৌশলমাত্র – তা-ই প্রতিষ্ঠিত করে।

'ফসিল' গল্পের বিষয় একদিকে অঞ্জনগড় এস্টেটের মহারাজার শাসন-শোষণের দম্ভ অহংকার, আর একদিকে অভ্র-আসবেস্টসের খনির মালিক মার্চেন্ট গিবসন-ম্যাককেনার সম্পদ বাঁচানোর কূট কৌশল। মধ্যে আছে কুর্মি কুলিদের দল—যারা দৈনিক নগদ পাওনার ব্যবস্থায় ঠিকে কাজ করে। একদিন তারা ছিল চাষের কাজে ব্যস্ত মহারাজার খবরদারিতে। মিঃ মুখার্জী এক ইংরেজী আইননবীশ ল-এজেন্ট অঞ্জনগড় এস্টেটের। তারই চেষ্টায় মহারাজার এস্টেটের বিশাল উন্নতি, কিন্তু কুর্মীদের নিয়োগ নিয়ে যে বিরোধ দেখা দেয় দুই ধনী মহারাজা ও বিদেশী বণিকদের মধ্যে, শাস্তবুদ্ধি মিঃ মুখার্জী সেখানে অসহায়। দুলাল মাহাতো এক প্রবীণ কুলী— যে বাইরের জীবন কাটিয়ে অঞ্জনগড়ে ফিরে এসে ক্রমশ এস্টেটের কুলিদের সংঘবদ্ধ করে। কিন্তু সর্বহারাদের প্রতিবাদী, ন্যায্য দাবিদাওয়ার ভিক্ষার্থী সংঘচেতনা একদিন ধ্বংস হয়ে যায়। দুলাল মাহাতোর নেতৃত্বকে মদত দিয়ে যে বিদেশী মার্চেন্ট নিজের মুনাফা লুটছিল, অঞ্জনগড়ের এস্টেটের এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশানে চরম বাধা দিচ্ছিল, সমবেত শ্রমিক জাগরণের সময় তারাই মহারাজার সঙ্গে হাত মেলায় দুলাল মাহাতো ও তার সঙ্গীদের নিশ্চিহ্ন করতে। বোঝে, নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে সর্বহারারা মাথা তুলে তাদের স্বার্থকে চিরকালের মত ধ্বংস করে দেবে। পরস্পর বিবদমান ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ সব সময়েই তাদের নিজেদের মধ্যেকার বিভেদ দেয় ভুলিয়ে এমন অবস্থায় :

'অভূতপূর্ব দৃশ্য! মহারাজা, অমাত্য, আর চৌকিদার—গিবসন, ম্যাককেনা,

মুর আর প্যাটার্ন! সুদীর্ঘ মেহগনি টেবিলে গেলাস আর ডিকেন্টারের ঠোলাঠাসি।

সস্মিত বদনে মহারাজা মুখার্জীকে অভ্যর্থনা করলেন। —মাহাতো ধরা পড়েছে মুখার্জী। ভাগ্যিস সময় থাকতে বুদ্ধিটা দিয়েছিলে।

গিবসন সায় দিয়ে বলল—নিশ্চয়, অনেক ক্লামৃজি ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচা গেল। আমাদের উভয়ের ভাগ্য বলতে হবে।'[৩১]

ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শোষক শ্রেণীর এমনি কৌশল। সে কৌশলে ব্যক্তিক স্বার্থ, অর্থলোভ ও লাভের জন্য সমস্ত নীতির সম্যক বিসর্জনই একমাত্র সত্য। যুবক মিঃ মুখার্জীর গভীর মানবতাবোধে, সুস্থবোধে আঘাত লাগলেও সে নিরুপায়। এমন অসহায়তার মধ্যেই লেখক এঁকেছেন সর্বহারাদের বিপরীত অসহায়তার ছবি—যেখানে 'দরোয়ানেরা কম্বলে মোড়া দুলাল মাহাতোর লাস' গোপনে গভীর রাতে এনে চৌদ্দ নম্বর পীটের মধ্যে ফেলে, ফেলে ক্ষুধার্ত কীটের মুখে 'ঘোড়া নিমের জঙ্গল থেকে ট্রাকে বোঝাই লাস'। এমন কোন রক্তিম প্রতিশ্রুতি নেই সেই শবগুলির শহীদ হওয়ার মধ্যে—যা আগামী দিনের সূর্যকে ডেকে আনার মত ভরসা দিতে পারে। মিঃ মুখার্জীর চোখের সামনে গর্তে ফেলা লাসগুলি সম্পর্কে 'অনেকদিক পরের একটা কথা' মনে পড়ে যায় তার :

'লক্ষ বছর পরে, এই পৃথিবীর কোন একটা যাদুঘরে, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে, দেখছে কতগুলি ফসিল। অর্ধপশুগঠন, অপরিণতমস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাবহিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের প্রস্তরীভূত অস্থিকঙ্কাল আর ছেনি হাতুড়ী গাঁইতা—কতগুলি লোহার ক্রুড কিম্ভূত অস্ত্র-শস্ত্র, যারা আকস্মিক কোন ভূ-বিপর্যয়ে কোয়ার্টস্ আর গ্রানিটের স্তরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কতকগুলি সাদা সাদা ফসিল; তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোন দাগ নেই!'[৩২]

শেষ চিত্রে লেখকের যে তীব্র শ্লেষ ধনিক শ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণীর সংঘর্ষে জাত অসহায় শ্রমিক কুর্মীদের শবদেহকে কেন্দ্র করে, তা বিশ শতকের ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিষাক্ত শ্বাসকেই লক্ষ্য রাখে।

মার্কসের শ্রেণীভাবনা ও ব্যাখ্যায় যে তাত্ত্বিক তর্ক ও সত্য, সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পে তারই শৈল্পিক সত্য মানবভাগ্যের করুণ চিত্রে উপস্থাপিত। 'ফসিল' গল্প নিশ্চয়ই সমাজ-সমস্যার গল্প কিন্তু সে সমস্যা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বুকে শ্রেণী সংঘর্ষ থেকে উদ্ভূত রক্তিম সমস্যার গল্প। কথাকার-সমালোচকের মতে,—'এমন শ্রেণী-

ভাবনা সুবোধ ঘোষের চিন্তা-ভাবনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ—যে ভাবেই হোক, ছিল বলেই তিনি 'ফসিল' গল্পের মূল ভিত্তি করেছেন শ্রেণী বিভক্ত সমাজ-মানুষের উজ্জ্বল সংঘাতের ও অসহায় জয়-পরাজয়ের চিত্র। প্রচলিত শ্রেণীর ভূমিকা প্রায়ই ভারসাম্য বজায় রাখতে অক্ষম হয়, সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থায় ও শাসন-শোষণের এটাই লক্ষণ। যখনই এই লক্ষণ তীব্র হয়, তখনই সমাজ-ব্যবস্থা মাথা তোলে। কিন্তু তাকে তো পুরণো সমাজ সহজে মেনে নেয় না।

সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের মহারাজা ও অভ্রখনির বিদেশী মালিকরা ঠিক এই কারণেই দুলাল মাহাতো ও কুর্মিদের সংঘবদ্ধ হওয়াকে মেনে নেয়নি। তারই সকরুণ পরিণতির জীবন্ত চিত্র ও ন্যায় 'ফসিল' গল্পে বড় ব্যঞ্জনা আনে। 'ফসিল' গল্পে যে অন্তর্নিহিত সামাজিক সমস্যা, তা তাই 'উপরিতলভিত্তিক' (Superficial) নয়, তা সমাজ ইতিহাসের ধারা, ন্যায় ও পরিণামের সঙ্গে গভীর-সম্পৃক্ত।'৩৩

'গোত্রান্তর' গল্পেও সুবোধ ঘোষ এমন শ্রেণীসচেতনাকে অন্য বৈশিষ্ট্যে উপস্থিত করেছেন। এই গল্পে লেখক এক নিম্ন মধ্যবিত্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী নায়ক সঞ্জয়ের চরম বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী এনেছেন। সে বিশ্বাসঘাতকতা মামুলি নয়, শ্রমিক তথা সর্বহারা শ্রেণীর প্রতি চরম আঘাতের বিশ্বাসঘাতকতা। কমিউনিজম্-এর প্রবক্তা মার্কস সমাজে মধ্যবিত্ত অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীকে স্বীকার করেন নি, তার সম্পূর্ণ বিলোপ চেয়েছেন। সঞ্জয় এমনি এক মধ্যবিত্ত যুবক এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, যে প্রকারান্তরে ধনতন্ত্রের স্বার্থের শিকার হয়ে তার সমস্ত মানবিকতা, গণচেতনায় দীপ্ত মুখকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। রতনলাল সুগার মিলের তিরিশ টাকা মাইনের ক্যাশ মুন্সী কেরানী থেকে সে বড় হওয়ার জন্যে শ্রমিক নেমিয়ার ও তার পিছনের বিরাট শ্রমিক জনতার জাগরণকে তুচ্ছ করে। একদিন তাদের জাগরণকে সেই মদত দিয়েছিল। মালিকের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত প্রেরণা, শক্তি দিয়েছিল সে-ই। নেমিয়ার বোন রুক্মিনীকে ভোগ করে তার মধ্যে আত্মসুখের পরিণাম অবৈধ সন্তানের জন্ম দিতেও তার কুণ্ঠাবোধ হয় নি। সবই মধ্যবিত্ত এক যুবকের আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার উপায় মাত্র। সে নিম্নবিত্তের সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে রতনলাল সুগার মিলের চাকরী নিয়ে মূলত নিজেকে গোত্রান্তর করার জন্যই। কিন্তু মিলের শ্রমিকদের মধ্যে তার যে দ্বিতীয় বৃহৎ ও মহৎ গোত্রান্তরের সম্ভাবনা, তাকে ধ্বংস করে সে উচ্চবিত্তের গোত্রে আসার পথ করে। শ্রমিক চেতনার, প্রতিবাদের রক্তিম অধ্যায়ে সঞ্জয় ক্যাশ-বাক্সের চাবি নেমিয়ারের হাতে দিয়ে রায়বাহাদুরকে খবর দেয় নেমিয়ার ক্যাশ চুরি করার মতলব জানিয়ে। এর ফল—রায়-বাহাদুরের মুনিবজীকে আদেশ :

'বাবুজী স্টেশনে যাবেন। এখনি একটা ভালো ঘোড়ায় গদি চড়িয়ে দাও। আর আমার সিন্দুক খোল, বকশিস দিতে হবে। বড় ইমানদার ছেলে···কটা দিন বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম কর। তারপর এস আমার গোরখপুর মিলে—শয় রূপেয়া তন্‌খা।'[৩৪]

এক নিম্নবিত্ত যুবক হলো উচ্চমধ্যবিত্ত—একাধিক শ্রমিকের হৃদয়, রক্ত, জীবন, শ্রম ও সবল সুস্থ সংঘবদ্ধ প্রতিবাদী গণচেতনার সম্পূর্ণ-বিধ্বংসী শ্মশানরূপের মধ্য থেকে। এই গল্পের সব শেষেও সুবোধ ঘোষ সেই তীব্র ব্যঙ্গের চাবুক বসিয়েছেন :

'সঞ্জয় ঘোড়া থেকে নেমে স্রোতের ধারে বসে আঁজলা ভরে জল খেল। গেরস্থের মুরগী চুরি করে খেয়ে একটা শেয়াল ভেজা বালির ওপর বসে গোঁপের রক্ত চাটছিল। সেও এসে জল খাবার জন্ম স্রোতে মুখ নামালো।'[৩৫]

মধ্যবিত্ত মানুষ স্বার্থসর্বস্ব শ্রেণীর উচ্চ আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় কখনোই নীচে নামে না, সর্বহারাদের মধ্যে আসে না, বরং তাদের পায়ের মাটি শক্ত করে ওপরে উঠে ধনিকদের কোলেই আশ্রয় নেয়। নীতিহীন, অর্থলোলুপ, তথাকথিত আদর্শবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এটাই সহজাত ললাট-লিপি।

তিন

যুদ্ধের পরিবেশে কলকাতায় তখন নতুন ধনিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটছে অবলীলায়—এদের পৃষ্ঠপোষণা করে শাসককুল। এই ধনিকরাই নিজেদের স্বার্থে মধ্যবিত্তদের মধ্যে থেকে নিয়ে আসে তাদের দালালী করার মত বশংবদ মানুষ। আবার সর্বহারা শ্রেণীর অসহায়তার সুযোগকে সর্বদিক থেকে নিজের ভোগ-সুখের উপযোগী করে গ্রহণ করতেও পিছপা হয়-নি। একদল তৈরী হয়েছিল যারা ধনীর মোসাহেবী করে বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করত। তারা লজ্জাহীন, মানবতাবোধহীন ধনীদের মতই। আর একদল ছিল যারা ধনীর দাবার চালের শক্তি হয়ে নিজেদের ক্ষমতায় অর্থ উপায়ের পথে থেকে যেত। যুদ্ধ-সময়ে দালাল শ্রেণীর সৃষ্টি মজুতদার-মুনাফাখোর -চোরাকারবারীদের প্রধান অস্ত্র। এদের পরিচয় রেখে গেছেন একাধিক উপন্যাসে বাংলা দেশের সে সময়ের কথাসাহিত্যিকরা।

'তেরশ পঞ্চাশ' উপন্যাসে গোপাল হালদার নায়ক বিনয় মজুমদারের নানান বিস্ময়চকিত চিন্তার মধ্যে নতুন গড়ে-ওঠা ধনিকদের সম্পর্কে ভাবনাকেও স্পষ্ট করেছেন। একালের কমিউনিষ্ট কর্মী বর্তমানে যুদ্ধের জিনিসের প্রয়োজনে বড় কন্ট্রাকটার নীরু-

সেনকে যখন বিনয় দেখে, তখন তার নিজের ভগ্নীপতি বিরাট ধনী শৌরীনকেও মনে পড়ে যায়। বীরু সেন আর শৌরীন—এরা সবাই একই শ্রেণীর :

'বিনয়ের কি জানি কেন মনে পড়ল আবার শৌরীনকে—এমন স্বাচ্ছন্দ্য আর শক্তি নেই তার গতিতে। সুপ্রতিষ্ঠিত শৌরীনও স্বার্থ-সচেতন—যেন নতুন দিনের মুরারি সেন সে।··· · বীরুও চতুর হয়ে উঠতে চায়। সেই বীরু সেন—যাকে বিনয় একদিন সোনাপুরে প্রথম দেখেছিল—রৌদ্রেপোড়া মলিন দেহ—কিন্তু স্বাস্থ্যবান—কমিউনিষ্ট কর্মী, আর আজ দেখছে, সুপুষ্ট সুদৃঢ় যুবক, পুষ্টিকর আহারে পালিত সৌন্দর্যময় দেহ—কর্মিষ্ঠ ব্যক্তিত্ববান মানুষ—যেন শচীপ্রসাদের সগোত্র। তেমনি গতি, তেমনি কর্মিষ্ঠ। ······এই একটা বৎসরের মধ্য দিয়ে—এই যুদ্ধের ঠিকাদারী, মন্বন্তর, মহামারীর মধ্য দিয়ে—জন্মলাভ করেছে এক নূতন ধনিক, নূতন মালিক—শৌরীন দত্ত, বীরু সেন···'[৩৬]

এমন বীরু সেন, শৌরীনদের সঙ্গে পরিচয় করান তারাশংকর 'মন্বন্তর' উপন্যাসে—ধনী অমলবাবু যুবক নায়ক কানাই চরিত্রের মাধ্যমে। অমলবাবু কানাইকে নিজের ব্যবসায়ে লাগাতে চায়, যে ব্যবসা মূলত কালোবাজারীর। যুদ্ধের বাজারে এই ব্যবসা এক সর্বনাশা সমাজ-অভিশাপকেই ডেকে আনে। সচেতন নায়ক কানাই সেই দালালী করে একদিনে বেশ কিছু টাকা পেলেও যখনি সে বুঝতে পারে তার আশ্রিতা গীতার সমস্ত রকম সামাজিক মর্যাদা, সতীত্ব ধ্বংস করেছে এই অরুণবাবুই, তখনই ঘৃণায় সে অর্থ ফেলে দিতে দ্বিধা করেনি। তারাশংকর নায়কের আদর্শকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বটে, কিন্তু উপন্যাসে মজুতদার ও কালোবাজারিদের সক্রিয়তা ও দালালী করে পয়সা উপায়ের যে চিত্র রচনা করেছেন তা যেমন তথ্যের দিক থেকে সত্য, তেমনি শিল্পের মানে উন্নত। গুঁই অমলবাবুদের কালো ব্যবসার একজন সাহায্যকারী বশংবদ, এক ঝানু ব্যক্তি। নানা কথায় অমলবাবু গুঁইকে সহজ ক'রে তার কাছে কানাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা করার গোপন কথাটি প্রস্তাবাকারে রাখে :

'বললে—হ্যাঁ, "একশো মণ চালের একটা বিক্রী রসিদ করে আন দেখি স্ট্যাম্প দিয়ে—রসিদ লিখে দেবে—এই রসিদ দেখালেই আমাদের দু'নম্বর গো-ডাউন থেকে মাল ডেলিভারী পাবে। মাল আমরা কানাইবাবুকে বেচছি।

গুঁই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—একশো মণ? পঞ্চাশ বস্তা?

হেসে অমলবাবু—হ্যাঁ। কানাইবাবুর জন্যে ওটা বাবার স্পেশাল পারমিশন।

গুঁই তবুও বললে—খুচরো কাজে বড় অসুবিধে বাবু, একেবারে হাজার মণ করে দিলেই হত।

—না, না। একশো মনই করে আন তুমি।

রসিদ নিয়ে অমল কানাইকে বললে—আসুন, চালটা বিক্রী করতে হবে। গুঁই, এস। অমলের গাড়ীতেই তারা রওনা হল—জিতু বোস, গুঁই, সে এবং অমল। আশ্চর্যের কথা—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গুঁই চালটা আড়াই টাকা বেশী দরে বেচে ফেললে বাজারের একটা দোকানে। মায় টাকাটা এনে সে কানাইয়ের হাতে তুলে দিলে। অমলবাবু হেসে বললে—মণ-করা আড়াই টাকা রেখে বাকীটা আমাকে চালের দাম হিসেবে দিয়ে দিন। তারপর অতি মৃদুস্বরে কানে কানে বললে—গুঁইকে দিয়ে দিন মণ করা চার আনা হিসেবে—পঁচিশ টাকা। আমার সামনে নয়, ওদিকে ডেকে দিয়ে দিন।

কানাই গুঁইকে দিল পঁচিশ টাকা। গুঁই তার পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করে চুপি চুপি বললে—একশো মণটাকে অন্তত পাঁচশো মন করে নিন স্যার। আর ক্রেডিটের কড়ারটা এক হপ্তা করে নিন। দেখুন না, কি করে দি।

কানাই একটু হাসলে—চেষ্টা করে টেনে আনা কৃত্রিম হাসি। কাল থেকে আজ পর্যন্ত দুটো দিন সে যা দেখেছে, তাতে তার জীবনের সহজ স্ফূর্তি যেন আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে, মাথায় খাটো ওই অমলবাবুটি তার চোখে এক বিরাট মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। জুয়াখেলার মধ্যে যেটা অন্যের কাছে অদৃষ্ট, সেটা তার কাছে জুয়াচুরি ছাড়া কিছু মনে হচ্ছে না।'[৩৭]

অমলবাবু ও গুঁইদের গোপন ব্যবসা এবং তাতে জড়িত হয়ে কানাই-এর প্রতিক্রিয়ার চিত্রে লেখক বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে নতুন ধরণের দালাল শ্রেণী সৃষ্টির পদ্ধতিটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সে সময়ে একাধিক যুবক ও মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষ অসহায় অভাবের মধ্যে এই নতুন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

'উদয়ের পথে' উপন্যাসে লেখক স্পষ্ট করেই ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে সর্বহারা দরিদ্রদের সংঘাত-সংঘর্ষকে শ্রেণী-বৈষম্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব বৈশিষ্ট্যে রূপ দিয়েছেন। অবশ্যই এই বৈষম্য-চিত্র তেতাল্লিশের মন্বন্তর—যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বাংলাদেশের অন্যতম দুষ্ট ক্ষত—তারই পটভূমিকায় তাৎপর্যমণ্ডিত করেছেন জ্যোতির্ময় রায়। লেখক-নায়ক অরূপ সে সময়ের ধুরন্ধর মজুতদার ধনী ব্রজেন্দ্রনাথের মতই অনুরূপ স্বভাবের—'অর্থবান শখের সাম্যবাদী নয়, নয় শুধু গ্রন্থ গেলা মার্কসীয় তত্ত্বের তোতাপাখী, এমন কি, ঊনতি-লিপ্সু সুবিধাবাদীও নয়।'[৩৮] এই অরূপ একদিকে, আর একদিকে ব্রজেন্দ্রনাথের অবর্তমানে তার পুত্র সৌরীন্দ্রনাথ। সৌরীন্দ্রনাথের মধ্যে সদ্য তৈরী-হওয়া জাতের অর্থাৎ মুনাফাখোর মজুতদার কালোবাজারি সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। সৌরীন্দ্রনাথকে হঠাৎ দেখার পর সুস্মিতার লোকটিকে চমৎকার মনে হলে অরূপের বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠ,—

'ওদের চমৎকার গুণ—স্বার্থের পেছনে অন্ধ হয়ে ছোটা। বাস্তব জগতে বড় হওয়ার জন্যে মাথার চেয়ে এই গুণটারই প্রয়োজন বেশী।'[৩৯] অনুপ ঠিকমতই চিনেছে সৌরীন্দ্রনাথকে। কারণ অনুপকে দিয়েই সে বক্তৃতা লিখিয়ে সভায় যশ কুড়োয়, লেখার জন্য ওদের সমাজে প্রশংসা পায়।

সৌরীন্দ্রনাথ বিশাল ধনী। এমন সময়ে তাদের ধনবৃদ্ধি—যখন বাংলাদেশের বুকে মন্বন্তরের চরমতম হাহাকার ধ্বনি পরিবেশকে বিষণ্ণ, ভারি করে রেখেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে নতুন জাতের সৃষ্টি স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু মজুতদার-মুনাফাখোরদের, তারই উপযুক্ত প্রতিনিধি সৌরীন্দ্রনাথ। তার প্রমাণ পায় অনুপ সৌরীন্দ্রনাথের অফিসে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে,—'অনুপ কামরায় ঢুকেই দেখতে পেল একটা লোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বিদায় নিতে। সে তার আলোচনার জের টেনে বলছে, 'আর একবার ভেবে দেখুন স্যার—দেড় লাখ মন চাল, সোজা কথা নয়। এমন ধরে রাখাটা খুবই রিস্‌কি—আবার যদি ইভাকুয়েশন শুরু হয় তো ঝপ করে দাম পড়ে যাবে।'

'ঐ তো বললাম, এখন ছাড়বো না। বাজার আমিই কি কারুর চেয়ে কম বুঝি। কেনা দামের আটগুণ চড়ুক তো তখন বোঝা যাবে—'[৪০]

অনুপ মাথা নত করেনি সৌরীন্দ্রনাথের কাছে, এমন কি তার রাশভারী পিতা ব্রজেন্দ্রনাথের সামনেও। অনুপের লেখা বই নিজের নামে ছেপে সৌরীন্দ্রনাথ তথাকথিত সংস্কৃতিবান মানুষ হতে চায়। অনুপকে বেশী বেতনে চাকরী দিয়ে কিনে নিতে চায়, অনুপদের মত গরীবদের অর্থের ও মেকী আভিজাত্যের গরিমায় হাতে রাখতে চায়। অনুপ এ সবের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে উপন্যাসের শেষে বাইরে থেকে ঘুরে আসা ব্রজেন্দ্রনাথকে :

'আমাকে জাতে তুলতে চাইছেন—' অনুপের ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি। 'এই জাতে তোলার লোভ দেখিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভালো-ভালো মাথাগুলো আপনারা কিনে রেখেছেন। শিল্প প্রতিষ্ঠান আমাদের গড়তে হবে—গড়বোও, কিন্তু আর আপনাদের পায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নয়—গড়বো নিজেদের হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে—আমি আমার জাত ছেড়ে এক তিলও ওপরে উঠতে চাইনে।'

'কোনটা তোমার জাত ?'

'কোটি কোটি লোকের যে জাত আমারও তাই—আপনারা যাকে বলেন শ্রমিক—দরিদ্র—'[৪২]

অনুপ শ্রমিকদের নিয়ে ট্রেডইউনিয়ন করে। শ্রমিকদের চারিত্র্য তার অজানা নয়। তাই শ্রমিক ধর্মঘটের সময় ঘনিষ্ঠ তারাপদই যখন মালিকের কাছে অর্থের

লোভ পেয়ে অন্য শ্রমিকদের বিরুদ্ধে গুণ্ডা এগিয়ে দিতে সাহায্য করে এবং তার অন্যতম বলি হয় অনুপ স্বয়ং, তখন সে অবাক হয় না। নবোদ্ভূত ধনীশ্রেণীর বৈশিষ্ট্যই হল অর্থের লোভ দেখিয়ে দরিদ্র অসহায় অশিক্ষিত শ্রমিকদের ভিতরের ব্যক্তিস্বার্থের দুর্বলতাকে শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টির ব্যাপারে কাজে লাগানো। অনুপদের মত নেতাদের কাছে,—'এ সব অন্যায়, মূঢ়তা, লোভ আর শ্রেণীদ্রোহিতাকে তারা স্বাভাবিক বলেই জানে।'[৪২]

'উদয়ের পথে' উপন্যাসে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ আছে, নবোদ্ভূত ধনী ও মজুতদারদের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটে, কিন্তু কোন বড় গণজীবনের ভিতরের ছবি আমরা পাই না। একটি নির্দিষ্ট মামুলি গল্প বলার ছক ও রীতিতে বাঁধা কাহিনী ও ঘটনা সংস্থাপনের মধ্য দিয়ে লেখক কখনো মেলোড্রামাটিক সিচুয়েশান সৃষ্টি করে, কখনো বা কুশলী, সহজ চিত্তগ্রাহী সংলাপ প্রয়োগ করে বক্তব্যের উপরিতলেই উপন্যাস-লক্ষ্যকে সচল করতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা' রচনা করে নায়ক অমিত-লাবণ্যের সংলাপে যে বিশুদ্ধ বুদ্ধির প্রখর দীপ্তি দিয়েছেন, পরবর্তীকালে প্রবোধ সান্যাল তাঁর 'প্রিয় বান্ধবী', 'আঁকাবাঁকা' ইত্যাদি উপন্যাসে সেই সংলাপের এক মনোহর রূপাবয়বে এ্যাভারেজ পাঠক-মন হরণে সফলকাম হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে জ্যোতির্ময় রায় 'উদয়ের পথে' উপন্যাসে সেই সংলাপের ধারাকে আরও সহজ, জনপ্রিয় করে ধনী-দরিদ্রের সংঘর্ষকে যেভাবে আমাদেব সামনে এনেছেন, তাতে মিষ্টি-মধুর সংলাপের আকর্ষণই বড় হয়, মূল সংঘর্ষের ভিত্তি ও বৈজ্ঞানিক ন্যায় তীব্র রক্তিম জীবনযন্ত্রণার যথার্থ সামিল হয় না। তবু এই উপন্যাসে যুদ্ধ সমকালের দুর্ভিক্ষ চিত্র, মজুতদার শ্রেণীর উদ্ভব ও চারিত্র্য, মালিক-শ্রমিক বিরোধ প্রসঙ্গ, ধনিক শ্রেণীর কন্যা গোপাকে তার দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে বের করে এনে শ্রমিকদের মধ্যে ও অনুপের মত অবহেলিত দরিদ্র মানুষের পাশে বসানো—এসবের মধ্যে যুদ্ধ-সমকালীন পরিবেশকে কিছুটা তথ্য ভিত্তিক করেছেন, শিল্পমূল্যে তার যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা এবং ব্যাপক জীবনাগ্রহের প্রেক্ষিতে তার মূল্য কিছু কম থাকলেও। উপন্যাসের একেবারে শেষে গোপা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে সৌরীন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ হতাশ কণ্ঠে বলে,—'নিজেদের রক্তেই ধ্বংসের বীজ দেখা দিয়েছে সৌরীন, এ ভাঙনকে আর ধরে রাখা যাবে না—।'[৪৩] এমন উক্তির মধ্যে ধনিক শ্রেণীর অবধারিত ভাঙনের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে আগামী দিনের নতুন সূর্য ও শপথের ইঙ্গিত। উপন্যাসের নিটোল কাহিনী-ঘটনার সিদ্ধান্তে মুখ্য বিষয় ও লক্ষ্যের এমন পরিণতি স্বাভাবিক।

অস্থিরতা-অবক্ষয়ের চিত্র আঁকতে বসে যুদ্ধ-সমকালের অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের মত তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর 'মন্বন্তর' উপন্যাসে এমন সব কাহিনীর অংশ-বিশেষ

রচনা করেছেন, যার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অ-সম শ্রেণী বিন্যাসের মানুষগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় সহজেই। একদিকে নতুন বড়লোক অমলবাবুদের গোষ্ঠী, আর একদিকে নিম্নবিত্ত বস্তির অধিবাসী গীতাদের পরিবার। পরিবারকে বাঁচানোর তাগিদে গীতার মাকে বাধ্য হয়ে পাঠাতে হয় যুবতী কন্যা গীতাকে ঘোট্কীর সঙ্গে ধনী অমলবাবুদের বাড়ি। গীতা ও গীতার বাবা-মার সহজ, সরল বিশ্বাসের সুযোগেই প্রৌঢ়া ঘোট্কী নিয়ে আসতে সক্ষম হয় গীতাকে। আর এরই সূত্রে আসে গীতার জীবনে চরম বিপর্যয়।

'মন্বন্তর' উপন্যাসে তারাশংকর গীতার পরিবারের গোটা অধঃপতনের চিত্রে দেখিয়েছেন যুদ্ধ সমকালের চরম অবক্ষয়ের অসহায় নৈতিক পতনের একটি ধাপ। মদ্যপ পিতাকে দেখার পর, অভাবের মধ্যেও তার মার পিতাকে মদের যোগান দিয়ে সাহায্য করার প্রত্যক্ষ চিত্র দেখার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে কানু দেখা পায় ক্রন্দনরতা গীতার। শহরের অন্ধকারের মধ্যেই সেই এক নিষ্পাপ তরুণীর কান্না। কানু শোনে গীতার সদ্য-অতীত করুণ অসহায় পতনের কাহিনী। বিস্ময়ে, দুঃখে, ক্ষোভে বিমূঢ় কানুর সামনে গীতার যে বাঁচার জন্য জিজ্ঞাসা, আর্তি, তা যুদ্ধ-সংকটে বিপর্যস্ত গোটা নারী সমাজেরই আর্তি :

'গীতা আবার বললে—কেমন করে আমি বাঁচব কানুদা ?

কানু বললে—ছি-ছি, তোমার মা—

মুখের কথা ছিনিয়ে গীতা বললে—মা জানে—কানুদা, মা জানে।

—জানে !

—জানে। নিশ্চয় জানে। নইলে যাবার সময় আমায় কেন সে বললে—বামুন-দিদি যা বলবে, তাই শুনিস মা। তোর দৌলতে যদি দুটি খেতে পরতে পাই, নইলে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও পৃথিবীর এক অদ্ভুত মূর্তি ভেসে উঠেছিল তার চোখের সম্মুখে। সর্বাঙ্গে দুষ্টক্ষতময়ী পৃথিবী। সুখময় চক্রবর্তীর রক্ত কি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে ? পৃথিবীর পথে পথে কি চক্রবর্তী বাড়ীর নোনাধরা ইট ছড়িয়ে পড়েছে ?

গীতা বললে—নইলে, মা কাপড়গুলো নিলে কেন ? শুধু মা নয় কানুদা, বাবাও জানে। সে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কানাই নির্বাক।

—আমি কি করব কানুদা ?'[৪৪]

গীতার কণ্ঠের সুদূর অনিশ্চয়তা, দীর্ঘশ্বাস, ভয় সবই তারাশংকর এমনভাবে ধ্বনিত করেছেন তার শেষতম সংলাপটিতে, যা বস্তুত রূঢ় বৈষম্যের সমাজের সমস্ত নারী-জাতির নিয়তিকে যেন গভীরতম শিকড়টি ধরে নাড়া দেয়। কানু এক সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়া পুরনো ধনীর আধুনিক শিক্ষিত সন্তান। তার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে, আত্মিক সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয় গীতা—নিম্নবিত্তের পরিবার থেকে উঠে-আসা এক নারী। সমাজ ভাঙছে, ধনতান্ত্রিক সমাজের দস্তুরী বস্তুত তা-ই। যুদ্ধের সংকটে, যে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, তাতে ধনতন্ত্রের বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার সৃষ্ট ঘুণধরা সমাজ-আদর্শে, ন্যায়-নীতি ভাঙতে বাধ্য। অমলবাবুরা তো ধনতন্ত্রের ধারক-বাহক, পোষক। কিন্তু ছাড়া ছাড়া চিত্র আছে নতুন এদেশীয় শ্রেণী-উদ্ভবের। তারাশংকর যেমন মজুতদারের উপযুক্ত ছবি এঁকেছেন অমলবাবু-জিতুদের মধ্যে, তেমনি সর্বহারা শ্রেণী কিভাবে সৃষ্ট হয় ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থায়, তারও ছবি উপহার দিয়েছেন :

'ধর্মতলায় রাস্তার ফুটপাতে সারিবন্দী ছেলের দল বসে গেছে জুতো পালিশের সরঞ্জাম নিয়ে। যুদ্ধের বাজারে এই একদল বালক ব্যবসায়ীর উদ্ভব হয়েছে। বিদেশী সৈনিকের দল চলছে ভিড় করে। তাদের জুতো পালিস করে দিয়ে তারা জীবিকার্জন করছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের অপঘাত—সমাপ্তি, বোধ করি, এই মহাযুদ্ধেই সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এই ছেলেদের মধ্যে অবশ্য হিন্দুস্থানী মুচি এবং মুসলমানের সংখ্যাই বেশী—কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলে বাঙালীর মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেও মধ্যে মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।'[৪৫]

মধ্যবিত্ত সমাজ সবচেয়ে বেশী আত্মিক।সংকটে।ভোগে। তারা তাদের শ্রেণী সম্পর্কে সচেতন, শ্রেণীগত শিক্ষা দিয়ে, অর্থের মাপে জীবনযাপনকে যেমন মূল্য দেয়, তেমনি অন্যের শ্রেণীকে বিচার করে। নীলা কমিউনিষ্ট। সে শ্রেণীহীন সমাজে বিশ্বাস করে, যদিও সে নিজেই এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জন্ম-নেওয়া মানুষ। সেই নীলা কলকাতার বুকে গাঢ় হয়ে বসা মহামন্বন্তরের হা-অন্নের পরিবেশে গুণদাবাবুর স্ত্রীকেও দেখে দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হতে। গুণদাবাবুর স্ত্রী শত অভাবেও স্ব-ক্ষেত্র থেকে নামতে পারছেন না। সেই মধ্যবিত্তের দ্বিধা, সংকট! নীলার মধ্যেও দ্বিধা। কিন্তু যারা যুদ্ধের কারণে, যুদ্ধের পরিবেশে ক্রমশ সর্বহারাদের দলে নেমে আসছে তাদের প্রতি মমতা নীলার কম নয়। তাই একদিকে গুণদাবাবুর স্ত্রীর যুক্তি, আর একদিকে তার সর্বহারা ও নিম্নবিত্তদের প্রতি সহমর্মী মনোভাব—এরই দুয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লেখক এঁকেছেন সার্থকভাবেই :

'স্থির দৃষ্টিতে নীলার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন গুণদাবাবু গৃহিণী, তারপর বললেন—

ওরা আমার মত ভদ্রলোকের মেয়ে নয়। নইলে পেটের দায়ে ছোটলোকের সঙ্গে অমন করে গিয়ে দাঁড়াত না। ভিখারীর অধম।

নীলা বললে—ভিখিরী! ওদের আপনি এমনভাবে ঘেন্না করছেন কেন বলুন তো?

তার মুখের দিকে চেয়ে গুণদাবাবুর স্ত্রী হঠাৎ হেসে ফেললেন, বললেন—ও, যারা সবাইকে পৃথিবীতে সমান করতে চায় তাদের দলের বুঝি?

—হ্যাঁ। তাদেরই দলের আমি। এমনভাবে কথা বলার আপনার অধিকার নেই। ওরা আপনার চেয়ে ছোট নয়।

—তা বেশ তো। ওদের আমার সঙ্গে সমান করে দাও। আর ছোট বলব না, তবে ওদের সঙ্গে সমান করবার জন্যে আমাকে যদি ভিখিরী হতে বল—তাতে আমি রাজি নই। মরে গেলেও না।

নীলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

—বড়লোক ঢের আছে, গাড়ী ঘোড়া বাড়ী ঢের লোকের আছে, আমি তাদেরও সমান হতে চাইনে। ওই ভিখিরী ছোটলোকদের সমানও হতে চাইনে। দুনিয়াশুদ্ধ যদি ভিখিরী ছোটলোক করে তুলবে—তবে তো তোমাদের খুব স্বদেশী। খুব স্বাধীনতা!'[৪৬]

বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালের পরিবেশে কথাসাহিত্য রচনা করতে বসে সমকালের প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্যের জীবনের প্রেক্ষিতে সচেতন লেখকরা নানাভাবে শ্রেণীগত সংঘর্ষের ও অসহায়তা এবং অবক্ষয়ের দিককে গ্রহণ করেছেন। শ্রমিক মালিক বিরোধের কথা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মোহানা' উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন। যুদ্ধের সময়ে ভারতের সর্বত্র এমন শ্রমিক-মালিক বিরোধ তীব্র হতে দেখা যায়। ধূর্জটিপ্রসাদের নায়ক খগেনবাবুর সঙ্গে বিজনের কানপুর স্টেশনে সাক্ষাৎ হওয়ার পর ক্রমশ সফিকের দলে খগেনবাবুর নিবিষ্ট হয়ে যাওয়ায় উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে এই বিরোধ-চিত্র প্রধান প্রেক্ষিত হয়ে ওঠে। বিজন খবর দেয় খগেনবাবুকে মজদুর সভার একজন মজুরকে অকারণ মালিকের পক্ষ থেকে ছাটাই করার বিষয়ে। সেই সূত্রে একদল স্ট্রাইকের জন্য তৈরী হচ্ছে, অপরপক্ষ অর্থাৎ বিজনের ভাষায়,—

'মালিক জন কয়েক নিজেরাই লক-আউট করেছে। এটা অসহ্য!'

'ব্যাপারটি স্ট্রাইক না লক-আউট?'

'দুই-ই, যেভাবে দেখেন, আসল কথা বাইরের লোক দিয়ে কল চালানো বন্ধ করা চাই, ধর্মঘট জোরে চালাতে হবে।'[৪৭]

মজুরদের এই অধিকার চেতনা, একতাবদ্ধ হওয়ার বাসনা বাড়ছে। ধর্মঘট রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এমন এক আন্দোলনের মধ্যে লেখক খগেনবাবুকে জড়িত করে নায়িকা রমলার থেকে নায়ককে বিচ্ছিন্ন করার পথ তৈরী করেছেন। সমকালের শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ কাহিনীর কৌশলে, চরিত্র ও ঘটনার ন্যায়ে শিল্পমূল্যে ওতপ্রোত হয়ে উঠেছে। 'মোহানা' উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে রমলার সামনে খগেনবাবুর সঙ্গে সফিকের আলাপ-আলোচনার মধ্যেও আছে মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ প্রতিবেদন।

বাংলাদেশে পুরনো ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক মানুষের মধ্যে জাতপাতের বিভেদ বৈষম্য বজায় রেখে নিজেদের স্বার্থটুকু—প্রভুত্ব ও অধিকারকে সম্যকভাবে বজায় রাখা। এরই কারণে সৃষ্টি হয় বর্ণভেদ এবং তা বৃত্তিভেদেই আরও প্রকট হয়। 'শতাব্দী' উপন্যাসে রমেশচন্দ্র সেন নায়ক করেছেন নমঃশূদ্র শ্রেণীর মানুষকে। উপন্যাসটির প্রথম অংশে লেখক সেই শ্রেণীর মানুষের নীচুজাত বলে নিজেদের মধ্যেকার হীনমন্যতা, সরল অসহায়তা, ব্রাহ্মণে কারণহীন সংস্কারাচ্ছন্ন অকপট শ্রদ্ধা ইত্যাদিকে জীবন্ত চিত্রে উজ্জ্বল করেছেন। কিন্তু এই শ্রেণী থেকেই যেমন একাধিক বড চরিত্র এঁকেছেন, তেমনি এদের উঁচু জাতের চরিত্রে মহান শিক্ষিত মানবীয়তার জাগরণ ঘটিয়ে জাতপাতের উঁচুনীচু ভেদকে দূর করার উপযোগী পরিবেশ ও ঘটনাকেও সংযোজিত করেছেন। ত্রিগুণা শিক্ষিত, মঞ্জরী গ্রামেরই ছেলে। ত্রিগুণা এম. এ. পাশ করেও, যেহেতু নবাগত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত, তাই সহজেই নেপালপুরের বিলে এসে পঞ্চাশ টাকার মাস্টারী নেয় শুধু দেশের মঙ্গলের জন্যই। আর তার তৎপরতার মধ্যে লেখক এঁকেছেন উচ্চ উদার মানবতার ছবি। যে স্কুলে সে পড়ায়, সেই স্কুলের ব্রাহ্মণ ছাত্র নীচু জাতের ছাত্রকে জাত নিয়ে অপমান করলে ত্রিগুণা ব্রাহ্মণ ছাত্রকে চরম শাস্তি দিতে ভয় পায় না, কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ ও গ্রামের উচ্চ ক্ষমতার মানুষ যখন ত্রিগুণার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, সে নিজেই স্কুলের হিতৈষীদের সভা ডেকে সেখানে পদত্যাগপত্র পেশ করে বলে :

'আমি মনে করি জাত তোলা আর বাপ-মা তুলে গালাগালি, দুইই সমান। সেদিন এইজন্য কোন ব্রাহ্মণ ছাত্রকে আমি শাস্তি দেওয়ায় অনেকেই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তাঁদের জাত্যাভিমানে আঘাত লেগেছে। তারা চান যে আমি পদত্যাগ করি। সেইজন্যই আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি। আপনারা আমাকে মুক্তি দিন।'[৩৮]

ত্রিগুণা চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখকের এই বক্তব্য সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের বিরুদ্ধে সবল বিদ্রোহই বটে। জাতপাতের শ্রেণী বিন্যাস বাংলাদেশের সমাজের বুকে আর এক

দুরারোগ্য দুষ্ট ক্ষত। রমেশচন্দ্র সেন কাহিনীর প্রথম অংশে যেমন সর্বহারা মানুষের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন, তেমনি তাদের অসুস্থ সংস্কারাচ্ছন্ন শ্রেণীচেতনাকে তীব্রভাবে আঘাত করেছেন ত্রিগুণার মত চরিত্রের মধ্য দিয়ে—যার শিক্ষায় ও প্রভাবে উপন্যাসের পরবর্তী অংশে একে একে রাজেশ্বর, তার ছেলে মহেশ্বর প্রভৃতি সকলেই নবজীবন-চেতনায় আলোকিত হয়।

এমন নীচুজাতের কারণে নমঃশূদ্র জাতির মেরুদণ্ড যে কত দুর্বল ছিল, ব্রাহ্মণরা ও তাদের সংস্কার যে তাদের কত অসহায়ভাবে ব্যক্তিত্বহীন করে তোলে, লেখক ত্রিগুণাকে লেখা রাজেশ্বরের একটি পত্র এবং সেই পত্র পাঠ প্রসঙ্গে ত্রিগুণার কাছে শিক্ষা-পাওয়া পুত্র মহেশ্বরের সঙ্গে রাজেশ্বরের কথোপকথনের যে চিত্র এঁকেছেন, তাতেই প্রমাণ মেলে :

'ত্রিগুণাকে লিখিল,—

পূজনীয় ভাই, মহেশের মার অসুখ আবার বাড়িয়াছে। ...ভারী দুর্বল। বোধ হয় ইহা আমার পাপের ফল। জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে অন্য কিছু পাপ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তবে কলিকাতায় ব্রাহ্মণদের পর্যন্ত নিজের ছোঁয়া খাওয়াইয়াছি, অনেকের জাতি মারিয়াছি, হয়ত সেইজন্যই একটু ভাল হইয়া বউর অসুখ আবার বাড়িল।......'

'..... কি মহেশ, কিছু বলবে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বামুনকে ছুঁলে পাপ হবে কেন ? আগে ত বামুনরা অন্যজাতের মেয়ে পর্যন্ত বিয়ে করতেন।'

'সে হল ত্রেতা দ্বাপরের কথা। কলির ধর্ম অন্য রকম। যাক, তুমিও ছোঁয়াছুঁয়ি কর নাকি।'

মহেশ্বর বলিল, রঞ্জনঠাকুর, মনাই গুপ্ত এদের সঙ্গে একই বাসনে সে রসগোল্লা খাইয়াছে। শুনিয়া রাজেশ্বর গম্ভীর হইয়া গেল।'[৪৯]

আমরা জানি, ইংরেজ শাসক বাংলাদেশে এক ধরণের দালাল শ্রেণী তৈরী করেছিল। তাদের দিয়ে তারা দেশ শাসনে নিবিষ্ট হত। এই দালাল সম্প্রদায়ই ক্রমশ সমাজে এমন এক শ্রেণী চিহ্নিত করে, যার প্রভাব সমাজে নানা ব্যাধির উৎস ঘটায়। 'শতাব্দী' উপন্যাসে রমেশচন্দ্র সেন সেই দালালদের চরিত্র ও স্বরূপটিকে নমঃশূদ্র ।শ্রেণীর মধ্যেই একদল স্বার্থান্বেষী, সুবিধাভোগী মানুষদের প্রসঙ্গে স্পষ্ট করেছেন। যখন গ্রামের বাড়েদের প্রায় সমস্ত জমি বন্ধক পড়ে, এক নম্বর ফৌজদারীও হয়ে যায়, তখন নবসৃষ্ট শহরে মামলাবাজদের পক্ষে বাঁধা কয়ালী। কয়ালী যে পক্ষে, থানায় তাদের খাতির। কারণ থানা

ইত্যাদি শাসকদের প্রধান কেন্দ্রগুলি তখন শহরে মানুষদের স্বার্থভোগের কারণে তাদের দখলে। করালীরা মাঝখানে থেকে দারোগা-হাকিমদের খুশি করতে গিয়ে দু'পক্ষ থেকেই টাকা নেয়। ঘুষখোর এই দালালদের সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন :

'দারোগা যত পায়, এই দালালরা পায় তার চেয়ে ঢের বেশী। এর উপর জুটিল দীন দাস। জমি বন্ধক রাখিয়া সে টাকা দিল। পঞ্চাশের জায়গায় দিল দশ।

দীন বলিত, তোমাদের জমি ত' বিশ বাঁও জলের তলায়, এর বেশী দেই কি করে ?

উকিল, মোক্তার, পেস্কার, মুহুরীদের ন্যায্য ও অন্যান্য পাওনার টাকা যোগাইতে গিয়া উভয় পক্ষেরই অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে মামলায় জিতিলেও কাহারও আর জমি ভোগের সম্ভাবনা রহিল না।

রাজেশ্বর নির্বাক সাক্ষীর মতন সব দেখিল। পঞ্চায়েতের মধ্যে মধ্যে যে অবিচার হইত না এরূপ নয় কিন্তু বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষকেই শোষণের এমন সুন্দর উপায় পঞ্চায়েতের লোকেরা জানিত না।

রাজেশ্বরের রাগ হইল থানায় ঐ দালাল শ্রেণীর উপর। সচ্ছল সরল চাষীকে এরা ধ্বংসপথে লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু উপায় কি ? বিদেশী বণিকের শক্তিশালী এই শাসনযন্ত্র চলিবেই—আর তার চলার পথে এই দালালদের প্রয়োজন। কলকব্জা বল্টুর মতন ঐ শাসনযন্ত্রের তারাও এক একটা ক্ষুদ্র অংশ।'[৫০]

লেখক সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় দালাল শ্রেণীর উদ্ভব এবং এই ব্যবস্থায় সামাজিক-অর্থনৈতিক শোষণের উপায় ও অভিশাপকে এখানে তুলে ধরেছেন। ভারত তথা বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে মানুষ যে শ্রেণীবিন্যাস দেখে, তা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থারই একান্ত অনুগ, বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র এরই ধারক ও বাহক। লেখক সচেতনভাবেই নিম্নশ্রেণীর সমাজে এই শাসনের স্বরূপটি এঁকেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের সমাজের এই শ্রেণীবিন্যাস নয়, কিন্তু যুদ্ধ-সমকালে যেসব মজুতদার, মুনাফা-খোর, কালোবাজারিরা জন্ম নিয়ে টাকা করে, তাদেরই পূর্বপুরুষ যে এই লেখক-কথিত দালালশ্রেণী,তা বোঝা যায়। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শাসকরা যখন শোষক হয়েই শাসনদণ্ড চালনা করে, তখন এই পরিণতি সমাজ বিবর্তনের অন্তিম রূপ ছাড়া কিছুই নয়।

বাংলাদেশের বুকে নতুনভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শে শ্রেণী-সচেতনা জাগায় নবরূপে কমিউনিষ্ট পার্টি। যে সমাজতান্ত্রিক শ্রেণীহীন সমাজে বিশ্বাসী রাশিয়া, যে কৃষক-শ্রমিক নির্ভর জাতীয় চারিত্র্যকে আন্তর্জাতিকতায় সূত্রবদ্ধ করতে নবরূপে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী সোভিয়েট রাষ্ট্র সক্রিয়, বাংলাদেশে সেই কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর [illegible]

ঐতিহাসিক দিককে রমেশচন্দ্র সেন তাঁর 'শতাব্দী' উপন্যাসের কাহিনী-ঘটনা ও চরিত্র-ন্যাসে যথাযথ শিল্পমূল্য দিয়েছেন। মহেশ্বর-নরেশ্বরদের পিতা রাজেশ্বর তখন কলকাতা ও তার উপকণ্ঠের একাধিক কারখানার মালিক। সেসব কারখানায় যেসব শ্রমিক শ্রম দেয়, নরেশ্বর তাদের নেতা। নরেশ্বর ও অন্যান্য সম-মতাবলম্বী কর্মীদের দিয়ে শ্রমিক-সংঘ গঠন ক'রে, ধনী, বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে সরে এসে সর্বহারা কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল অধিকার-চেতনা জাগ্রত করে লেখক নবসৃষ্ট ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির যে ভিত্তির কথা উপন্যাসে বলেছেন, তা আমাদের গণচেতনা, গণ-বিক্ষোভ ও সুস্থ, পরীক্ষামূলক জাতীয় চেতনা ও আন্দোলনেরই প্রমাণ দেয়:

'বাংলার শ্রমিকদের মধ্যে নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। মিলে মিলে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হইতে লাগিল, তারা দাবি করিল, আমরাও বাঁচিয়া থাকিতে চাই, বাঁচিতে চাই মানুষের মতন।

একদল বিশিষ্ট যুবক এদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল, তারা দেশকে শুনাইল এক নতুন বাণী। দেশের মুক্তি এই পথে। মুক্তি শ্রমিক ও চাষীকে দিয়া। তুমি পাতিবুর্জোয়া, তোমাকে দিয়া নয়। ঐ ধনীকে দিয়া ত নয়ই।

এই যুবারা তখন সংখ্যায় নগণ্য। প্রভাব প্রতিপত্তি তাহাদের কিছুমাত্র নাই। ছিল শুধু আদর্শ।

একদিকে শ্রমিকের দাবি আর একদিকে ধনিকের ক্রোধ ও ত্রাস। সরকার ধনীদের পক্ষে। কোন মিলে ধর্মঘট হয়, কোথায়ও লাঠি চলে। দেশের অবস্থা তখন এই।'[৫১]

রমেশচন্দ্র সেন 'শতাব্দী' উপন্যাসে রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামকে প্রকৃত একজন ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়ে ইতিহাসের তথ্যে ও সত্যে উপস্থাপিত করেছেন। অহিংস জাতীয়তাবাদ থেকে সন্ত্রাসবাদ, তা থেকে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদে যে দেশীয় কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রগতিমূলক চেতনার ও অস্তিত্বের স্বাভাবিক বিবর্তন হবেই ভারত তথা বাংলাদেশের মাটিতে, উপন্যাসটির সামগ্রিক কাহিনী বিন্যাস, ঘটনা সংঘটন, চরিত্র পরিকল্পনা ও ন্যাস, লেখকের উদ্দেশ্য তা প্রমাণ করে।

বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজের ছবি নিপুণ শিল্পীর কলমে আঁকতে তোলেননি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের প্রেক্ষাপটে উপন্যাস লিখতে বসে। লেখকের এই শ্রেণীসচেতনার তীব্রতা উনিশ শ' সাঁইত্রিশ সাল থেকে উনিশ শ' একচল্লিশ সাল পর্যন্ত ভারতে যে একাধিক বিশাল শ্রমিক আন্দোলন ও উত্তাল বিক্ষোভ এবং যুদ্ধ-সমকালের ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ ও দেশীয় সাম্যবাদী গণ আন্দোলনে দেখা দেয়,

সে সবেরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। 'সহরতলী', 'প্রতিবিম্ব', 'দর্পণ'—এই তিনটি উপন্যাসে শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে বিভক্ত শ্রেণীর মানুষগুলির স্বভাব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। 'সহরতলী' উপন্যাসের প্রথম পর্বে আছে একদিকে সত্যপ্রিয় মিল্‌স ও অন্যান্য একাধিক ব্যবসার মালিক সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী, শ্রমিকদের ওপর তার স্বার্থসর্বস্ব অত্যাচার, অন্যান্য সীমাহীন শোষণ, পীড়ন, অন্যদিকে তার প্রতিপক্ষ যশোদা নামে এক বস্তিবাসিনী সর্বহারা শ্রেণীর কঠিন রমণী। যশোদা তার বাড়িতে এমন একটি হোটেল গড়ে যেখানে ভদ্রশ্রেণীর মানুষ নয়, সব নিম্নবিত্ত, শ্রমিক, সর্বহারা শ্রেণীর মানুষরাই একতাবদ্ধ হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে লেখা 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় হোসেন মিঞাকে দিয়ে যেমন এক ভূমিহীন, সব-রকম জাতিভেদহীন উদার মহামানবিক অভিনব সমাজের কথা ভেবে ময়নাদ্বীপের মত এক 'ইউটোপিয়া'র কথা চিন্তা করেছিলেন, 'সহরতলী' উপন্যাসে তেমনি চাঁদের মা যশোদা ও তার নীচুতলার মানুষ ও বিত্তহীন শ্রমিকদের নিয়ে শহরের উপান্তে এক হোটেলের পরিকল্পনায় যেন তারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণে এক শহুরে সর্বহারা সমাজের 'ইউটোপিয়া' ভেবেছেন।

যশোদা যে দুটি বাড়ি নিয়ে হোটেল চালায়, মিলের শ্রমিকদের যাবতীয় সমস্যার জটিলতা যে বাড়িতে বসে মীমাংসা করে, সত্যপ্রিয় সেই বাড়ি অধিকার করতে চায়, যশোদার শ্রমিকদের ওপর দাপট চূর্ণ করতে চায় :

'বাড়ি দুটিতে যশোদা যদি কেবল গরীব ভদ্র গৃহস্থদের ভাড়াটে রাখিত, তবে কোন কথা ছিল না। প্রথমে কিছুকাল ঐ রকম ভাড়াটেই যশোদা খুঁজিত, মাল সরকার, ট্রামের কণ্ডাক্টর, প্রেসের কম্পোজিটার এই শ্রেণীর ভাড়াটের ভীড়ে সে [illegible] তারপর সমস্ত বাছ-বিচার সে ভুলিয়া গিয়াছে। ভদ্রলোকেরা [illegible] ছোটলোক, যারা পুরা ভদ্রলোকও নয় খাঁটি ছোটলোকও নয়, তারা নাকি একটা অদ্ভুত অপদার্থ জীব। তার চেয়ে কুলি-মজুরও ভাল।'[৫২]

যশোদার সমস্ত শক্তি এই কুলি-মজুররা, কুলি মজুরদেরও দৈনন্দিন জীবনের কঠিন মাটি হল যশোদা। সত্যপ্রিয় যথার্থ ধনিকের স্বভাবেই ছলে বলে কৌশলে যশোদাকে সমস্ত শ্রমিকদের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী করে তোলে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, যেখানে অর্থনৈতিক বণ্টনবৈষম্যই একমাত্র সত্য ও লক্ষ্য, সেখানে যশোদার মত রমণীকে ধনিকের স্বার্থসর্বস্ব কৌশলের জালে ফেলায় অসুবিধে থাকে না। একদিকে ধনিক শ্রেণীর চতুর চাল, আর একদিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন যশোদা-কেন্দ্রিক শ্রমিক-সর্বহারাদের ঐক্য—এতেই সত্যপ্রিয় জিতে যায়। ধনিক-শ্রমিক সংঘর্ষে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী 'লোকাল স্টিয়ার'

রাষ্ট্রে তা-ই যথার্থ। 'সহরতলী' উপন্যাসে প্রথম পর্বের শেষ যশোদার শ্রমিক-হিতৈষী সমস্ত রকম প্রয়াস বানচাল হয়ে যাওয়ার মধ্যেই চিহ্নিত।

'সহরতলী'র দ্বিতীয় পর্বে যশোদার ধনীদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অনেক ব্যাপক ও গভীর। শ্রমিকদের প্রতি মমতা অন্য খাতে দেখা দেয়। ব্যক্তিগতভাবে যশোদা কিছু কুলি-মজুরকে মানবতায় বেঁধে ছিল তার হোটেলে প্রথম পর্বে, দ্বিতীয় পর্বে সেই ব্যক্তিগত ভাবনা রূপ নিয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী-সচেতনায়। সত্যপ্রিয় যশোদার বাড়ি কিনতে চায়। তার আগে সহরতলীতে প্রচুর জমি কিনে বড় বড় ভদ্রলোকদের বাড়ি তৈরী হয়ে গেছে। যশোদা বাড়ি বিক্রী করবে না। শ্রেণী হিসেবে ভদ্রলোক সম্বন্ধে যশোদার স্পষ্ট ধারণাটি সই কুমুদিনীর স্বামী রাজেনকে কথা প্রসঙ্গে শুনিয়ে দেয়:

'চাষা মজুরকে যারা ঘেন্না করে, বড়লোকের পা চাটে, ন্যাকা কথা কয়, আধপেটা খেয়ে দামী দামী জামা-কাপড় পবে, আরাম চেয়ে চেয়ে ব্যারামে ভোগে, খালি নিজের সুখ খোঁজে. মান অপমান বোধটা থাকে টনটনে কিন্তু যত বড় অপমান হোক দিব্যি সয়ে যায়, কিছু না জেনে সবজান্তা হয়,'[৫৩]—তারাই ভদ্রলোক। এই শ্রেণী ব্যাখ্যাতেই সত্যপ্রিয় রায় হল—'মানুষেব রূপ ধরা দৈত্য কিংবা দানোয় পাওয়া মানুষ।'[৫৪] মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্যাওলা ধরা জীবন'-এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যথার্থ প্রতিনিধি করেই এঁকেছেন যশোদার পাশাপাশি বনলতা, অনুরূপা, প্রভা, অমলা, অতসী ইত্যাদির সংসার ও জীবনভাবনা। তাদের মিথ্যা আত্মসচেতনা ও অহংকার, প্রতিবেশিনীদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে স্বার্থসর্বস্ব আত্মপ্রচার ও দম্ভ, যে [illegible] করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। [illegible] মজুরদের বৌরা এ হিস্টিরিয়ার ধার ধারে না। অভাবের চাপে আর ঝাঁঝালো নিষ্ঠুর বাস্তবতার তাপে তারা শুকাইয়া যায়, এদের মত পচিতে শুরু করে না।'[৫৫]

লেখক ধনিক শ্রেণী, নিম্নবিত্ত শ্রমিক ও সর্বহারাশ্রেণী সম্পর্কে নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন 'সহরতলী' উপন্যাসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে, অন্তত 'সহরতলী' দ্বিতীয় পর্ব রচনার কাল পর্যন্ত দেখা যায়, ভারতে যেমন শ্রমিক আন্দোলনের সংঘবদ্ধ তীব্রতা, তেমনি রাশিয়ার শ্রমিক জাগরণের মহান বিপ্লবের মন্ত্রও ভারতের সাম্যবাদী মানুষের কণ্ঠে সোচ্চার। তারই পরিচয় আছে 'সহরতলী' দ্বিতীয় পর্বে। রাজেন শ্রমিক নেতা বিধুবাবুকে নিয়ে আসে যশোদার কাছে। পরিচয় হয় যশোদার। যশোদা তার এতদিনের শ্রমিক-বিচ্ছিন্ন জীবনে আবার নতুন করে শ্রমিকদের সংস্পর্শে আসতে শুরু

করে। যশোদা যায় শ্রমিকদের সভায়। সেখানে তার নকলৰ অভিজ্ঞতা নানা প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত হলেও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের কালের শ্রমিক চেতনার আন্তর্জাতিকতাকে যশোদার মধ্যে প্রথম প্রোথিত করতে পেরেছেন :

'এরা সমস্ত জগতের শ্রমিকদের অবস্থা জানে, শ্রমিক সমস্যা এরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়াছে, এদের সমস্ত তর্ক বিতর্ক পরিষ্কার বুঝিবার মত জ্ঞান সে কোথায় পাইবে? তার মত ঠেকনো দিয়া দশ-বিশ জন শ্রমিককে কোন রকমে খাড়া রাখিবার ব্রত এদের নয়, ধনিকতন্ত্রের চোরাবালির গ্রাস হইতে সমস্ত শ্রমিককে বাঁচাইয়া শক্ত মাটিতে তাহাদের দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা এদের কাজ।

সে কাজের বিরাটত্ব কল্পনা করিয়া যশোদার মাথা ঘুরিয়া যায়। কুলি মজুরের সংগে সে মিশিয়াছিল, তাদের কয়েকজনকে ভালবাসিয়াছিল, একটা শ্রেণী হিসাবে তাদের কথা কখনো ভাবিয়া ছাখে নাই। আজ সকলের আলোচনা হইতে শ্রমিক সমস্যার স্বরূপ তার কাছে যতটুকু প্রকট হইয়া উঠিল তাতেই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।'[৫৬]

উপন্যাসে যশোদার এই বিস্ময়চকিত উপলব্ধি এলেও যশোদাকে শেষ পর্যন্ত সত্যপ্রিয়র ধূর্তামি ও কূটকৌশলের অনিবার্য শিকার হতে হয়। তার বাড়ি বিক্রী করতে হয়, বাধ্য হতে হয় বাস্তুত্যাগ করতে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন ভাবাবেগ নয়, ঐতিহ্যসম্মত কোন আদর্শবোধ নয়, প্রখর প্রতপ্ত সামাজিক-অর্থ নৈতিক চেতনার আলোয় ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণী, মধ্যবিত্ত ও সর্বহারা শ্রেণী—এদের নিপুণ বিচার করে হোসেন মিঞার জাতিভেদহীন, শ্রেণীহীন সমাজ ও কৃষককুল গড়ার মতই যশোদার চিন্তার মধ্যে সুস্থ শ্রমিক সচেতনার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে, বৈজ্ঞানিক জীবন-বিশ্লেষণে রেখেছেন 'সহরতলী' উপন্যাসের দুটি পর্বে। বাংলা কথাসাহিত্যে এই প্রয়াস প্রথম।

'সহরতলী' উপন্যাসের দুই পর্বে আছে ধনিক-শ্রমিক শ্রেণী-সংঘর্ষের কথা, 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসে আছে মধ্যবিত্ত নায়ক তারকের আত্মিক সংকটের কথা :

'মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত জাতীয়তাবাদী সাধারণ কর্মী যুবকের মনে নবযুগের নতুন ভাবধারার প্রভাবে কি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, ভাবপ্রবণতা ও বাস্তববোধের দ্বন্দ্ব কি রূপ নিয়েছে, সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা উচিত এই নিয়ে যে দ্বিধা ও সংশয়ের ভারে সে ব্যাকুল হয়েছে······ তারকের মত ছেলেদের মধ্যে যুগপরিবর্তনের সূচনা কি রূপ নিয়েছে 'প্রতিবিম্ব' তারই একটা দিকের রূপ-দেবার চেষ্টা।'[৫৭]

বেকার তারক চাকরীর জন্য কলকাতায় এসে পার্টির মানুষদের মধ্যে বাস করে। সেখানে শিক্ষিকা মনোজিনী—যার অধ্যাপক স্বামী জেলে গেছে রাজনৈতিক কারণে, তার সঙ্গে পরিচয় হয়। পার্টি অফিসেই সে দেখে সীতানাথকে মনোজিনীর কাছে প্রেম নিবেদন করতে। একের পর এক অভিজ্ঞতার সিঁড়ি অতিক্রম করে তারক বোঝে, তার চাকরী না নেওয়াটা ঠিক হয়নি পার্টির চোখে। তার কুলি-মজুর সম্পর্কে ধারণাও ভুল, ভাসা-ভাসা বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিজাত। তারক গ্রামে ফিরে আসে, স্ত্রীর পাশে থেকে গ্রামের মানুষের সংগে পরিচিত হতে চায়। তারকের যে রাজনৈতিক পার্টি-প্রীতি, কর্মতৎপরতা—সবই মধ্যবিত্ত আবেগ ও ভাবপ্রবণতায় নরম। 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাস তাই লেখক কথিত 'মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত জাতীয়তাবাদী সাধারণ কর্মী যুবকের মনে' 'ভাবপ্রবণতা ও বাস্তববোধের দ্বন্দ্ব'-এর কাহিনী।

অন্যদিকে 'দর্পণ' উপন্যাসে আছে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ছবিকে আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার প্রয়াস। বীরেশ্বরের মেয়ে রম্ভা কলকাতায় এসে ঘটনাচক্রে বিয়ে করে রামপালকে, বাস করে নোংরা বস্তীর মধ্যে। বস্তির যে চিত্র মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁকেছেন তা নিপুণ। এই ক্লেদাক্ত-পরিবেশে রম্ভার জীবন-অভিজ্ঞতা তাকে ক্রমশ অন্য দিকে নিয়ে যায়। যুদ্ধের বাজারে কণ্ট্রাকটারি ক'রে বড়লোক হেরম্ব চক্রবর্তী। হেরম্ব ক্রমশ ধর্মের, তান্ত্রিক সাধুর ভড়ংকে নামাবলী করে ভিতরে নিজের স্বার্থে যে শাসন ও শোষণের যন্ত্র চালায়, অত্যাচার করে শ্রমিকদের স্বার্থ ধ্বংস করে, তারই বলি হয় রম্ভার বাবা বীরেশ্বর। পুলিশী নির্যাতন হয় যারা অন্যায় করেনি তাদেরই ওপর। স্বদেশী নেতা কৃষ্ণেন্দু, রাজনৈতিক কর্মী আরিফ প্রভৃতির প্রচণ্ড মানসিক শক্তির পক্ষে সাহস সঞ্চয় করে রম্ভা সমস্ত রকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ঝুমুরিয়ার গ্রামবাসী-দের নিয়ে সে বিশাল সভা করে। হেরম্বের মৃত্যু ঘটে আগুনে দগ্ধ হয়ে। রম্ভাকে যেতে হয় জেলে। ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নীচু তলার মানুষের সবল বিদ্রোহের স্বচ্ছ আয়না 'দর্পণ' উপন্যাস। ধনীর ছেলে হীরেন, মধ্যবিত্ত মেয়ে মমতা, রাজনীতির সূত্রে দেশসেবায় সম্পূর্ণ উৎসর্গীকৃত প্রাণ আরিফ, বীরেশ্বরের বড় ছেলে শ্যামলাল—এদের মধ্য দিয়ে লেখক বিভিন্ন শ্রেণীর চেতনা ও বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। লেখকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি শ্রেণীর ভিন্নতা বিচারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে, অবশ্যই বৈজ্ঞানিক শিল্পসম্মতভাবে 'সহরতলী' (১ম, ২য়), 'প্রতিবিম্ব' ও 'দর্পণ' তিনটি উপন্যাসেই।

তারাশংকরের 'কালিন্দী', 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম'—এই চারখানি উপন্যাসে গ্রাম সমাজে মানুষের শ্রেণী চরিত্র ও নতুনভাবে উদ্ভূত শ্রেণীর ছোট ছোট পরিচয় রেখেছেন। একথা স্মরণে থাকা দরকার, ঔপনিবেশিক শাসকদের আওতায়

সব সময়ে দেশীয় ব্যবসায়ীরা তেমন গুরুত্ব ও সুযোগ পায় না। তবু তারাশংকর, 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে নায়ক শিবনাথের যে ব্যবসায়ী শ্বশুর চরিত্রের পরিকল্পনা করেছেন, 'কালিন্দী' উপন্যাসে এঁকেছেন বিমল মুখুজ্যের মত ব্যবসায়ী চরিত্র—তারা তারাশংকরের শ্রেণী সচেতনার স্বাক্ষর দেয়। অর্থাৎ নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণী যে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে ধীরে ধীরে এবং গৌণভাবে হলেও ইতিহাসের স্বার্থেই দেখা দিচ্ছে, তার চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন এদের মধ্যে। এই নব-উদ্ভূত ব্যবসায়ী শ্রেণীর সংগে গ্রামের জমিদারদের সংঘর্ষ বাধতে শুরু করেছে, এবং সংঘর্ষ আজ হোক, কাল হোক—অবধারিত হবেই—এই ব্যাখ্যা প্রচ্ছন্ন থাকে সেই চিত্রে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে মুসলমান চাষীদের এনে লেখক তাঁর শ্রেণী-ভাবনার মহত্তম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। অন্যদিকে যথার্থ শিল্পীসুলভ সমাজ-ন্যায়ের জ্ঞানেই তারাশংকর 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে দেবু ঘোষের মত কৃষক সন্তানকে নায়ক করেছেন, যেখানে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য আদৌ অস্বীকার করার মত ছিল না তখনো। ছিরু পালের শ্রীহরি ঘোষে রূপান্তরে সমাজে নতুন শ্রেণী গড়ে ওঠার দিক স্পষ্ট করেছেন লেখক। তারাশংকরের সময়ে বাঁকুড়া-বীরভূম অঞ্চলের সামন্তশাসিত গ্রামগুলিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু যথার্থ অর্থে শ্রেণী হয়ে ওঠেনি। তারাশংকর সমাজ ও ইতিহাসজ্ঞানের তীক্ষ্ণতায় অদ্ভুত নিরাসক্তি দিয়ে সেই ভবিষ্যৎ শ্রেণীরূপের বীজ বপন করেছেন শ্রীহরি ঘোষের শ্রেণী চরিত্র নির্ধারণে। কঙ্কণার ব্রাহ্মণবাবুরাও লেখকের হাতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর মর্যাদা পেয়েছে। 'গণদেবতা' উপন্যাসে তারাশংকর নায়ক দেবু ঘোষকে, শ্রীহরি ঘোষকে বার বার পঞ্চায়েতে এনেছেন। এই পঞ্চায়েত যেসব তর্ক-বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেগুলি গ্রামীণ পুরনো অর্থনীতিকে বিদায় দেয়, নতুন অর্থ নৈতিক জীবনের সূচনা ঘটায়। আর এই ইঙ্গিতবহ নতুন অর্থ নৈতিক বিধিব্যবস্থায় জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন শ্রেণী সেই ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের কালে গ্রামজীবনেও—এটাই তারাশংকরের উপন্যাসে ক্ষমতাবান নিরাসক্তি দিয়ে উপস্থাপিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে 'সহরতলী' উপন্যাসে শহুরে অর্থনীতির কাঠামোয় ধনিক-শ্রমিকে সংঘর্ষ ও ধনিকের বিজয়ী দম্ভকে বৈজ্ঞানিক ন্যায়ে উপস্থিত করেছেন, তারাশংকর সেখানে গ্রামীণ অর্থনীতির কেন্দ্রে শ্রেণী-উদ্ভব ও সংঘর্ষকে এঁকেছেন। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ব্যবসায়ী ও নবোদ্ভূত শ্রেণীগুলিকে তারাশংকর তেমন বেশী উপন্যাসে ব্যবহার করেন নি। সে সব ছাড়িয়ে তাঁর নিজস্ব আবেগবান আদর্শবাদ বড় হয়ে উঠেছে।

'প্রতিশোধ' উপন্যাসে প্রেমেন্দ্র মিত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন পরিবেশে একটি গ্রামের জমিদারের দম্ভ ও অহংকার এবং নিষ্ফল বংশ-মর্যাদাবোধের প্রেক্ষিতে এক

অত্যাচারিতা বধূর কথা বলেছেন। জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণের ছেলে বিজয় জমিদারের পুরোহিত নিম্নবিত্ত উমানাথের মেয়ে নির্মলাকে পিতার প্রবলতম আপত্তিতে গোপনে বন্ধু পরিতোষের সহায়তা নিয়ে বিবাহ করে। সন্তান হয় নির্মলার কিন্তু বীরেন্দ্রনারায়ণ যখন জানতে পারে তখন তা গোপন ক'রে পুত্রের আবার বিয়ে দেয় কলকাতার এক বন্ধু কন্যা অনিমার সংগে। নির্মলার গ্রাম থেকে বিজয়কে পাঠানো সব চিঠি নষ্ট করে দেয়, বিজয়কে ভুল বোঝার ও বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলার ব্যবস্থা করে বীরেন্দ্রনারায়ণ। পুরনো সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় নির্মলার ওপর নেমে আসে গোপন অত্যাচারের ছায়া। গ্রামের কুৎসার কারণে নির্মলা পরিতোষের সংগে কলকাতায় আসে বিজয়ের খোঁজে। তার ক্রোধ ক্রমশ তীব্র করেছেন লেখক উপন্যাসের শেষে। শান্ত সরল নির্মলা একদিন পুত্র হারিয়ে বিদ্রোহিনী হয়ে ভাবে :

'যারা আমার সমস্ত জীবন ছারখার করে দিয়েছে, বিনা দোষে যারা আমায় শাস্তি দিয়েছে, তাদের জীবনও আমি অভিশাপে বিষিয়ে দেব।'[৫৮]

অনিমার গর্ভজাত সন্তান যখন মুমূর্ষু, পরিতোষের আশ্রয় থেকে গোপনে নির্মলা পাগলিনীর মত চলে আসে গ্রামে। জমিদার বাড়ির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে দারোয়ানের বাধা পেয়ে বলে :

'তা তো দেবেই না। আমি যে এই রাজপুরী ধসিয়ে দিতে বসেছি, আমি যে তোমাদের সর্বনাশ করতে এসেছি—আমি এ বাড়ির অভিশাপ।'[৫৯]

সবশেষে জমিদারও পুত্রের কাছে স্বীকার করে :

'সমস্ত অপরাধ আমার। মিথ্যে বংশের অভিমানে অন্ধ হয়ে আমি ওর সমস্ত জীবন ছারখার করে দিয়েছি। সব জেনেও ওর মিথ্যে কলংক রটনায় সাহায্য করে তোর মন ভেঙে দিয়েছি, জোর করে তোদের তফাৎ রেখে ওর সর্বনাশ করেছি।'[৬০] মেলোড্রামাটিক কিছু ঘটনা থাকলেও লেখক সামন্ততান্ত্রিক নিষ্ফল আভিজাত্যবোধের কারণে তাদেরই আশ্রিত নিম্নবিত্ত পরিবারের যে অসহায় অবস্থা দেখা দিতে পারে, এই বক্তব্যকেই শ্রেণী-বৈষম্যের আর এক দিক থেকে উপন্যাসে এঁকেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র যেখানে প্রাচীন জমিদার বংশের নিষ্ফল বংশ-মর্যাদা ও আত্মাভিমানবোধকে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু করে সামন্ততন্ত্রের কূটকৌশলকে নায়ক চরিত্রে দেখিয়েছেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সে সূত্রে যুদ্ধ-সমকালীন পরিবেশ ও সমাজ সচেতনাকে জমিদারতন্ত্র ও নব্য-উদ্ভূত বণিকতন্ত্রের সংঘর্ষে প্রোজ্জ্বল রেখে কাল পরিবর্তনের ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করেছেন তাঁর 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' উপন্যাসে। সোনাদীঘির মেলায় অধিকারকে কেন্দ্র করে একদিকে

ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের শেষ সন্তান বিশ্বনাথ রায়বর্মা, অন্যদিকে নব্য বণিক লালা হরিশরণ। এদের আভিজাত্যের সংঘর্ষের মধ্যে আছে সর্বহারা শ্রমিক কামাররা—যাদের দলনেতা প্রৌঢ় রামনাথ। আর লেখক সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক—উভয় সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার, প্রতিবাদী সমাজতন্ত্র ও সর্বহারাতন্ত্রের ব্যবস্থার কথা ভেবেই বিশ্বনাথ রায়বর্মার স্ত্রী শিক্ষিতা অর্পণাকে এঁকেছেন। অর্পণার চোখে তার স্বামী 'নির্বোধ বর্বরতার প্রতীক, সামন্ততন্ত্রের ঘুণ ধরা কংকাল।' [৬১] এমন স্বামী শেষ জমিদারী অভিজাত্য বাঁচিয়ে রাখার জন্যই লালা হরিশরণের কাছে সোনাদীঘির মেলার অধিকার ছেড়ে দিয়েও দাবার ঘুঁটির মত কামারদের উত্তেজিত করে লালা হরিশরণের নেওয়া সোনাদীঘির মেলা পুড়িয়ে তছনছ করে দিতে। লালা হরিশরণ জমিদার বংশেরই অন্ন খেয়ে মানুষ। সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের সদ্য-আবির্ভূত মজুতদার বণিকদের প্রতিনিধি। জমি নয়, অর্থলোভ তার তীব্র। সামন্ততন্ত্রের অত্যাচার, দম্ভ ভেঙে সে ধনতন্ত্রের গর্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কামার বৈজুকে পাঁচশ টাকা দিয়ে হাত করে হরিশরণ। তারই নির্দেশে বৈজু রামনাথের যুবতী স্ত্রী কামিনীকে জমিদারের ঘরে দিয়ে আসে। জমিদার যাতে পালাতে না পারে, পুরনো ঘোড়াটাকে নিজে হাতে খুন করে আসে। টাকার জোরে হরিশরণ জিতে যায়। কিন্তু ধনতন্ত্রকে হারতে হবে একদিন সমাজতন্ত্রের কাছেই। তারই ইঙ্গিত অর্পণার উপস্থাপনায়। অর্পণা হারতে চায় না। তারই নির্দেশে মেলার কামাররা হরিশরণকে তোলা দিতে অস্বীকার করে। সেখানে তারা একতাবদ্ধ। জমিদারের প্রাসাদ ঘিরে যখন কামারদের সমবেত চীৎকার বিশ্বনাথের কামিনীকে নিশীথ-সঙ্গিনী করার কারণে, তখন পাংশু-মুখ অর্পণা প্রতিবাদ করে বলে স্বামীকে :

'কেন তুমি একথা ভুলতে পারো না যে তিনশো বছর আগেকার পৃথিবী আজ সম্পূর্ণ নতুন রূপ নিয়েছে? এ যুগ লালা হরিশরণের—কোন অস্ত্র, কোন রাজার ক্ষমতা নেই আজ তাদের হারিয়ে দিতে পারে। পৃথিবীর চারদিকে তারা মাকড়সার মতো জাল ছড়াচ্ছে, গ্রাস করে নিচ্ছে রাজাকে, গ্রাস করছে প্রজাকে। এদের লোভের মুখে কারো রক্ষা নেই—রাজারও নয়, প্রজারও নয়।' [৬২]

বস্তুত অর্পণার কথামতোই স্পষ্ট হয় সামন্ততন্ত্র অবলিত-প্রায় এবং ধনতন্ত্রের জয়গৌরব এখন সোচ্চার-কণ্ঠ। কালের নির্দেশেই তা ঘটছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বস্তুত ধনতান্ত্রিক শক্তি কায়েম করারই যুদ্ধ। বাংলাদেশে সেই ধনতন্ত্রই যেমন সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করতে উৎসুক, তেমনি শ্রমিক-কৃষক-সর্বহারাতন্ত্রকে একনায়ক-সুলভ শক্তির দম্ভে নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসুক। ধনতন্ত্র শোষিতদের মধ্যে বিভেদ আনে, তাদের সেইভাবেই

ধ্বংস করে। তাই বৈজুকে হরিশরণ বশ করতে পারে অবাধে, রামনাথের মত মানুষ নির্বীর্য হয়ে মারা যায়। ধনতন্ত্র মূলত সুরা, কামিনী ও কাঞ্চন তিন উপাসনা দিয়েই যে সাধারণকে চুম্বকের আকর্ষণে টানে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই উপন্যাসে তার নিপুণ চিত্র এঁকেছেন। সেই সংগে দুর্বল হলেও অর্পণার মধ্যে এনেছেন ভাবীকালের ইঙ্গিত—যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে সচেতন মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল—নতুন সমাজবাদ, সাম্যবাদের রূপ। তাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই নায়িকা জমিদার বংশের কঠিন আভিজাত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকেও একসময় নিজেকে ভেবে আত্মসমীক্ষা করেছে:

'পার্টি অফিসের অর্পণা, ভুখ মিছিলে অর্পণা নিজের মধ্যে বিদ্রোহের তাপ অনুভব করেছেন। কতবার ইচ্ছে হয়েছে সব ভেঙেচুরে তিনি বেরিয়ে যান, ঝাঁপিয়ে পড়েন নিজের কাজের মধ্যে, নিজের ব্রতের মধ্যে। কিন্তু তারপরেই মনের এই দুর্বলতাকে শান্ত করেছেন তিনি। এ স্বার্থপরতা—এ ফাঁকি। বিশ্বনাথকে—নিজের স্বামীকেই যদি তিনি জাগিয়ে তুলতে না পারেন তা হলে পৃথিবীকে জাগিয়ে তোলবার অধিকার তাঁর কোথায়? তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যলোভী সুলভ রোমান্টিক নোরা নন, আইরীন তাঁর আদর্শ নয়।'[৬৩]

এই অর্পণার মধ্যেই যে ধনতন্ত্রের প্রবলতম বিরুদ্ধ শক্তি ও তেজ নিহিত, লালা হরিশরণের সংগে তার সর্বশেষ সংলাপ-বিনিময়ে প্রমাণ মেলে। অর্পণার পক্ষে আছে, থাকবে জনগণ, কিন্তু লালা হরিশরণের পক্ষে তা না থাকলেও আছে কূট কৌশল। তার সংগে যুক্ত হয় তার আধুনিক অস্ত্রে অত্যাচারের বাসনা ও ধনলোভের টোপ। আর সেই কারণেই প্রতীকী ব্যঞ্জনায় হরিশরণের 'পকেটের মধ্যে রিভলভার আর গয়নায় ঝনঝন করে বাজছে।'[৬৪]

চার

লক্ষ্য করার বিষয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে রচিত যে সমস্ত উপন্যাস ও ছোটগল্পের আলোচনা সামাজিক শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীবৈষম্য প্রসঙ্গে করেছি, সেগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি নূতন প্রবণতা লক্ষিত হয়। শ্রেণীসচেতনার প্রশ্নে শ্রেণীবিরোধকে তুলে ধরার সপক্ষে একাধিক লেখক সাম্যবাদী রাষ্ট্রের শ্রেণীবিন্যাসের দিককে প্রচ্ছন্নভাবে লক্ষ্য রেখেছেন। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সহরতলী' উপন্যাসের দুই পর্বে, 'ধন জন যৌবন', 'কুষ্ঠরোগীর বউ', 'কে বাঁচায় কে বাঁচে' ইত্যাদি গল্পে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একাধিক গল্প ও 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' উপন্যাসে, রমেশ চন্দ্র সেনের 'শতাব্দী' উপন্যাসে, সোমেন চন্দের মধ্যবিত্ত জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথায় আমরা শ্রেণী-সংঘর্ষের ও সর্বহারাদের পক্ষে থাকার স্পষ্ট পরিচয় পাই।

শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সারল্য ও অসহায়তা, ধনিক শ্রেণীর দম্ভ, শোষণ ও মূঢ়তা, মধ্যস্বত্বভোগী দালাল শ্রেণীর তৎপরতা, মুনাফাখোর-মজুতদার-কালোবাজারীদের নির্লজ্জ অর্থগৃধ্নুতা—এসবকে নানাভাবে লেখকরা উপন্যাস ও গল্পে এনেছেন। সুবোধ ঘোষের নায়ক দুলাল মাহাতো ও সঞ্জয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কামার রামনাথ, দেবীদাস, তারাশংকরের কানাই, অমলবাবু, অরূপ, জ্যোতির্ময় রায়ের অনুপ ও সৌরীন্দ্রনাথ এবং রমেশচন্দ্র সেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ প্রভৃতির একাধিক নায়ক-নায়িকা বস্তুত লেখক-কল্পিত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যেকার বিভিন্ন শ্রেণীরই সকল অংশীদার। বাংলা কথাসাহিত্যে এদের চিত্রিত করে লেখকরা সাহিত্যের বিষয়ে, চরিত্রে ও বক্তব্যে নতুন দিকচিহ্ন নির্দিষ্ট করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালেই সারা দেশে কংগ্রেসী আন্দোলনের আবেগধর্মী দুর্বার স্রোতের মুখে আসে সাম্যবাদী ভাবধারার দীপ্ত আন্দোলন। সমাজতান্ত্রিক ভাবনা ও সাম্যবাদী আদর্শ চিন্তাই লেখকদের শ্রেণীভাবনাকে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ করে। উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত নয়, সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বই যে সুস্থ শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের ভিত্তি—এই বোধ ও বোধি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায় প্রধান। সংঘর্ষের চিত্রে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষক শ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী—তার নির্ভুল নিখুঁত ছবি এঁকেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন, তেমনি সুবোধ ঘোষও তাঁর 'ফসিল,' 'গোত্রান্তর' ইত্যাদি গল্পে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বিধি ও বণ্টনের বৈষম্যের মূলেই দেখা দেয় স্বার্থসর্বস্ব শ্রেণীবিন্যাস। এই শ্রেণী-বিন্যাস ক্যাপিট্যালিজম্-এর ধারক ও বাহক। এসবকে লক্ষ্যে রেখেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের কথাকারগণ শ্রেণীবৈষম্যের প্রধান মৃত্তিকাকে কাঠিন্য দানে কার্পণ্য করেন নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের শ্রেণীসচেতনা আরও ব্যাপক ও গভীর রূপ লাভ করে স্বাধীনতা-উত্তর কালের সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পরিবেশে। একালের শ্রেণীসচেতন কথাসাহিত্যের বিষয়ই 'চোরালণ্ঠন' হয় দেশবিভাজনে ম্রিয়মাণ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরবর্তী কালের কথাসাহিত্য ধারায়। লেখকদের সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্টতা উত্তরকালে স্বতন্ত্র শ্রেণীর লেখকদের জন্ম দেয়—যাঁরা কলাকৈবল্যবাদী হতে পারেন নি, বরং তার বিপরীত মেরুর অধিবাসী হন কথাসাহিত্যে—তাঁদের।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

১'...the close of the Second World War witnessed an abrupt. dissolution of tha wartime coalition, a dramatic and unprecedented reversal of alliances in the West—with the former enemies becoming intimte allies—and a new, even more bitterly engaged international conflict', Imperialism and Revolution (1969) David Horowitz Ch. 10 'War and Cold War' P 181.

২ Edgell Rickword · Literature in Society, Essays and Opinions (II) 1931-1978 (1978) Edited by Alan Young Part-II Inside the Thirties 'Straws for the Wary Anticedents to Fascism (1934)' Essay P 42.

৩ A class, it says, an aggregate of persons, within a society, possessing approximately the same status. The class system, or the system of stratificaion of a society, is the system of classes in their internal and external relationships. It is the set of relationships constituted by the granting of difference to individual roles and institutions in the light of their place in the system of power, poverty, occupation and other factors...This is a static definition; the complexity is increased greatly when one considers the fringes of these social areas John Atkins Six Novelists Look at Society (1977) Ch. 1 The English Social Scene, 1920-1970 Sub Ch. The Class Structure P 17

৪—৬ Ibid Sub ch. The Division of Wealth P 13, 12, Sub Ch. The Class Structure, P21

৭ Ibid The typical bourgeois is rapidly losing faith in his own creed. This is verified by the manner in which he behaves when facing direct attack; he talks or pleades, or hires people to do it for him; he snatches at every chance of compromise; he is always ready to give in; he never puts-up a fight under the flag of his own idealsand interests,' Sub Ch 'Alienation' P 35

৮ Ibid Sub Ch. 'Alienation' P 89

৯ Modern capitalism claimed that it could deliver the goods. By and large, it has done so. It has also managed to accompany this achievement with considerable political freedom and in its later stages, with a remarkable degree of sexual freedom. Yet they would in the middle of the twentieth century seems to be mentally sicker that it was a century earlier.' Sub Ch, 'Alienation' P 41-42

১০, ১১ 'সাহেব ধরা' প্রবন্ধ শ্রীপান্থ আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয়া, ১৩৮৭ পৃ ৩৩, ২৯

১২ 'মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির সংকট : আর এক দিক' প্রবন্ধ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ঐ পৃ, ১৪

১৩ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস (২য় খণ্ড) বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ষষ্ঠ পর্ব দ্বাদশ অধ্যায়: 'মহাযুদ্ধ ও ভারতের দুর্ভোগ' পৃ. ১৮৬

১৪ 'মুক্তিস্নান' গল্প প্রবোধকুমার সান্যাল 'অঙ্গার' গ্রন্থ (দ্বিতীয় প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২) পৃ. ৯৯-১০০

১৫, ১৬ 'ইঁদুর' গল্প সোমেন চন্দ 'সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ' সম্পাদনা: দিলীপ মজুমদার পৃ. ২০১, ২১৯

১৭ 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' সমালোচনা লীলাময় রায় (আসল নাম অন্নদাশংকর রায়) 'প্রতিরোধ' পত্রিকা, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩, ১লা ফাল্গুন, ১৩৪৯

১৮-২০ সমুদ্রের স্বাদ (গল্পসংকলন) মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৫০ 'লেখকের কথা' পৃ. ১

২১-২৩ 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্প মাণিক গ্রন্থাবলী (৪র্থ খণ্ড) পৃ. ৪৫৩, ৪৫৩, ৪৬৮

২৪-২৬ 'মনজন যৌবন' গল্প মাণিক গ্রন্থাবলী (৫ম খণ্ড) পৃ. ৪২১, ৪২১, ৪৩০

২৭ 'তৃণ' গল্প নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'বীতংস' গ্রন্থ (১৯৪৫) পৃ. ৬৬-৬৭

২৮ 'দুঃশাসন' গল্প নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'দুঃশাসন' গ্রন্থ (১৩৫২) পৃ. ১৪

২৯ 'ভাঙা চশমা' গল্প নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঐ পৃ. ৬০

৩০ 'সুবোধ ঘোষের গল্প: 'ফসিল' প্রবন্ধ বীরেন্দ্র দত্ত শারদীয়া 'অঙ্গীকার' পত্রিকা জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ পৃ. ৬৯

৩১, ৩২ ফসিল' গল্প সুবোধ ঘোষ 'ফসিল' গ্রন্থ (১৯৪৫) পৃ. ১৭, ১৮

৩৩ 'সুবোধ ঘোষের গল্প: ফসিল' প্রবন্ধ বীরেন্দ্র দত্ত শারদীয়া 'অঙ্গীকার' পত্রিকা জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ পৃ. ৭০

৩৪, ৩৫ গোত্রান্তর' গল্প সুবোধ ঘোষ 'ফসিল' গ্রন্থ পৃ. ১৬০-১৬১, ১৬১

৩৬ 'তেরশ পঞ্চাশ' গোপাল হালদার অধ্যায় ছাব্বিশ পৃ. ৪৪৬

৩৭ 'মন্বন্তর' উপন্যাস তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় সংস্করণ, মে, ১৯৪৫ অধ্যায় বারো পৃ. ১২২-১২৩

৩৮-৪৩ 'উদয়ের পথে' প্রথম প্রকাশ ২৯ ভাদ্র, ১৩৫১ ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ জ্যোতির্ময় রায় পৃ. ১৬৮, ৮৬, ৬২, ১৫১, ১৪০, ১৭৬

৪৪-৪৬ 'মন্বন্তর' তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় সংস্করণ, মে, ১৯৪৫ অধ্যায়-আট পৃ. ৭৭, অধ্যায় চোদ্দ পৃ. ১৪৬-১৪৭, অধ্যায় আটাশ পৃ. ৩১৬-৩১৭

৪৭ 'মোহানা' ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পৃ. ৩১

৪৮ ৫১ 'শতাব্দী' রমেশচন্দ্র সেন প্রথম ভাগ পৃ. ৮৩, ১১৩-১১৪, ৯৪

৫২ সহরতলী (১ম পর্ব) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মাণিক গ্রন্থাবলী (২য় খণ্ড) পৃ ১৮৪

৫৩-৫৬ সহরতলী (২য় পর্ব) মাণিক গ্রন্থাবলী (২য় খণ্ড) পৃ. ৩১৫, ৩১৫, ৩২৪, ৩৪২

৫৭ 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাস লেখকের বক্তব্য মাণিক গ্রন্থাবলী (২য় খণ্ড) পৃ ৩৭২

৫৮-৬০ 'প্রতিশোধ' উপন্যাস প্রেমেন্দ্র রচনাবলী (২য় খণ্ড) পৃ ৩৫৩, ৩৬৬, ৩৬৯

৬১-৬৪ 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' (১৯৫৫) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অধ্যায় তেরো পৃ ১৫১, অধ্যায় বারো পৃ ১৪৮, অধ্যায় তেরো পৃ ১৫১-১৫২, ১৫৯

অষ্টম অধ্যায়

প্রেমভাবনা, দেহসর্বস্বতা ও উৎকেন্দ্রিক হৃদয়ভাবের উজ্জ্বল রূপ

এক

মানব সমাজে বয়সের দিক থেকে কিশোর-কিশোরী স্তর এবং পরবর্তী কালে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে প্রেমের যে আকাঙ্ক্ষা, তার মৌল ভিত্তিই হয় রোমান্টিক বিশুদ্ধি-নির্ভর মানসিকতা। এমন বিশুদ্ধ প্রেমভাবনার প্রকাশ দ্বিমুখী হতে পারে—এক, মনের বিশুদ্ধি থেকে গভীরে প্রাণকেও অতিক্রম করে তা হয় এক অপরূপ অধ্যাত্ম-জগতের বিষয়। রোমান্টিক বিশুদ্ধতার চরম অবস্থায় কখনো তা হয় সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, কখনো হয় দেহ-সম্পর্ক থেকে অনেক দূরে ধূসর জগতের প্লেটনিক প্রেম। বিদেশী জীবনে ও সাহিত্যে যেমন এর স্বপক্ষে প্রচুর উদাহরণ আছে, তেমনি আছে আমাদের সমাজে ও সাহিত্যেও। বিল্বমঙ্গলের প্রেম, রামী-চণ্ডীদাসের প্রেম ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত। প্রসঙ্গত লয়লা-মজনু, শিরীন-ফরহাদের কথাও মনে পড়ে। দুই, প্রাথমিক বিশুদ্ধ প্রেম নেমে আসে দেহে। দেহসর্বস্বতা থেকে আসে বিকৃতি, অবক্ষয়। বিকৃতি রূপান্তরিত হয় দেহবৃত্তিতে—প্রেমিকা নারী হয় গণিকা, প্রেমিক পুরুষ হয় কামসর্বস্ব, লম্পট, ঘৃণিত যে কোন সমাজের পক্ষে দুষ্ট ক্ষতের মত।

এমন দ্বিমুখী প্রেম-প্রবাহের অন্তর্নিহিত মৌল স্বভাবটি হল চিরকালের মনস্তত্ত্ব-সম্মত। এই প্রেমকে নিয়ে যে বিচিত্র সাহিত্যকথার উদ্ভব, তা 'deals with the internal field in which dangers are mental and often delightful.' প্রেমের এই ব্যাখ্যা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে সভ্যতার স্বাভাবিক বিবর্তনের মধ্যেই। যখনি কোন যুগ বদলায়, সমাজ রূপান্তরিত হয়, কালের বিচারে মানুষ হয় জটিল, তখনই নরনারীর সম্পর্ক হয়ে ওঠে আরও জটিল। আর এদের কথা লিখতে বসে কথাকারগণ নানা চিন্তায় নিবিষ্ট হন। সভ্য মানুষের সম্পর্ক আদম-ইভ-এর কাল থেকে স্বতন্ত্র। আর যত বেশী সভ্যতার ভদ্র আবরণ পড়েছে নর-নারীর পরস্পরের আকর্ষণজনিত সম্পর্কে, ততই তা আরো অন্ধকারের জগতে দৃষ্টিকে করেছে নিমজ্জিত। তাই ফ্রয়েড প্রমুখ দার্শনিক দেহ-সম্পর্ক ও যৌনতার উৎস খুঁজতে বসে অনেক বেশী অন্ধকারকে আলোকিত করলেও সঙ্গে সঙ্গে আরো গভীর অসীম অন্ধকারের দিকে আমাদের অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

সাহিত্যিকরা এই প্রেম ও দেহসর্বস্বতা—সমস্ত দিক নিয়ে যখনি কোন সাহিত্য রচনায় বসেছেন, তখনি দেখেছেন নিজেদের কালকে, সমাজকে। সমাজ ও সময়ের রূপান্তরে মানুষ ও তার মন কিভাবে বদলাচ্ছে, তা ধরতে গিয়ে প্রেমকে করেছেন কষ্টিপাথর। তাতে যেমন প্রেমের আংশিক স্বভাব ধরা পড়েছে, তেমনি বিশেষ একটি কালের ও তার রূপান্তরের মৌল বেগটিও মাপা হয়ে গেছে। যুগধর্মই কথাসাহিত্যিকদের একমাত্র নিয়ন্ত্রণীশক্তি। 'যুগধর্ম বলতে যুগ কথাটার অর্থও বুঝতে হবে; সেজন্য কাল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর করে তুলতে হবে। তারপর ধর্ম, সেটা নির্ভর করছে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধের ওপর। অর্থাৎ একধারে পার্সন্যালিটি, অন্য ধারে কাল।'[২]

বস্তুত এই সমাজ-মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সময়—এই দুইকে লক্ষ্যে রেখেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন সচেতন ক্ষমতাবান কথাসাহিত্যিকরা তাঁদের গল্প ও উপন্যাসে প্রেমভাবনাকে ধরতে চেষ্টা করেছেন। যুদ্ধ-সমকাল বাংলা দেশের পক্ষে এক কঠিন কাল। এই সময়টা ছিল অনড় এক পাথরের মত। আর যেহেতু 'পাথরকেও রূপায়িত করা যায়, এবং রূপায়িত হলেই শিলা হয়ে ওঠে শিল্প,'[৩] —তাই এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন দুঃসময়ের, কান্নার মধ্যে বসেও বাংলাদেশের গল্প ও উপন্যাসকারগণ প্রেমকথাকে মহত্তম শিল্পের রূপ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল চতুর্দিক থেকে পরিবর্তনের কাল। এদেশের অধিকাংশ সতর্ক, সচেতন লেখক তা থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখতে পারেন নি। তাঁরা যথার্থ অর্থেই বুঝেছিলেন,—'সমাজ ও ধর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির সূক্ষ্মপুরুষটি না বদলালেও তার মানসিক অভ্যাসগুলি বদলে যাচ্ছে। সেই পরিবর্তনের বিবরণ চাই। সেই বিবরণই ভবিষ্যৎ-সাহিত্যের বিষয়বস্তু হবে। তারপর অ-সাধারণ ব্যক্তির কথা—আর্টিস্টের কাজ।'[৪]

এই সময়ে লেখকরা প্রেম নিয়ে যে সাহিত্য রচনা করে গেছেন, তা সব সময়েই যে জীবন-মানুষ-সমাজ-অর্থনীতি ইত্যাদি মিলিয়ে জীবনাত্মগ হয়েছে, তা বলা যায় না। গতানুগতিক লেখকদের কথা আগেই বলেছি। তাঁরা কথাসাহিত্যে প্রেমকে নিছক সময় কাটানোর বিলাস ও মিষ্টি গালগল্প করেছেন। কিন্তু যাঁরা সচেতন লেখক, নিপুণ দক্ষ শিল্পী, যাঁরা এই সময়ের সমাজ ও জীবনকে দেখেছেন সভ্যতার রূপান্তরের ন্যায়ে নিরপেক্ষ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, তাঁরা অবশ্যই এমন ভাঙনের দিনে প্রেম নিয়েও গভীর ব্যথার সাহিত্য রচনা করেছেন। 'যেমন প্রেম শেষ হবার সময় সাহিত্য সম্ভব হয়, রাগ থামলে ব্যঙ্গ রচনা সার্থক হয়, তেমনি শবের দুঃখে কান্না বন্ধ হলেই ব্যথার সাহিত্য সম্ভব হয়।'[৫] লেখকরা চোখের সামনে দেখেছিলেন জগতের সত্য—সমস্ত রূপের

দুর্যোগ, নির্বাতনের অসহনীয় দুঃখ, কান্না। সে সবকিছুকে গভীরভাবে গ্রহণ করেই প্রেমের কথায়, নর-নারীর হৃদয়-সম্পর্কের বেদনায়, কখনো তার ঊর্ধ্বায়িত রূপাবয়বে, আবার কখনো নিম্নমুখী অবশ্যম্ভাবী অবক্ষয়ের কথায় নিরাসক্তিকে বজায় রেখেছিলেন বলেই যুদ্ধ-সময়ে প্রেমের ব্যথার সাহিত্যও আমরা পেয়েছি।

উনিশ শতকে রেনেসাঁ-উচ্চকিত বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নেই এই শিল্পের প্রাথমিক রূপের অন্যতম শর্ত ছিল নিষিদ্ধ, সমাজ-বিগর্হিত-প্রেম। বঙ্কিমচন্দ্র এই সত্যটি তাঁর সমস্ত উপন্যাসে নিষ্ঠার সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ এবং বিশ শতকের তিরিশের দশকের আগে শরৎচন্দ্র এই বিষয়ে নিজেদের জীবন-ভাবনামত প্রেমের একটি চেহারা দিয়েছেন। এক সমালোচকের এ বিষয়ে একটি মন্তব্য গ্রহণীয়,—'বাংলাদেশে প্রেম নামক পদ্ধতিটি আবিষ্কার করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কর্তাদের বারণ কেউ মানল না। তারপর এলেন রবিবাবু। তিনিই আমাদের সকলকে প্রেমে পড়তে শিখিয়েছিলেন। তাঁরই ভাষা দিয়ে আমরা প্রেম করি, তাঁরই ভাব দিয়ে আমরা প্রেমে পড়ি—গুরুদাসবাবুর বাধা সত্বেও।'[৬] বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকে এবং রবীন্দ্রনাথ বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত, তার সঙ্গে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্র-অনুগ থেকে যে প্রেমের পথ রচনা করেছেন, এসবের মধ্যে কল্লোলীয়রা বিদেশ থেকে নবপ্রাণে উদ্বুদ্ধ অবস্থায় আর এক পথগামী করতে সচেষ্ট হন প্রেমে। কিন্তু তাঁদের প্রয়াস নতুন করে বেগ পায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর কিছুকাল পরেই। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র ক্রমশ বাংলা সাহিত্যে প্রেমভাবনায় দিয়েছিলেন প্রবলতম বেগ, কল্লোলীয়রা দেন প্রতিবেগ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে সেই বেগ ও প্রতিবেগে এক নতুন ধরণের প্রেমভাবনার ও ব্যাখ্যার, সর্বোপরি বিচারের প্রয়োজন বোধ করেন সমকালীন কথাসাহিত্যিককুল।

প্রেম দেহবিচ্ছিন্ন থেকে নিজস্ব একটি 'অচলায়তন' রচনা করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের হাতে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গোবিন্দলালের বসন রাঙা করে, শ্রী-শান্তির তপস্যা দিয়ে যে 'অচলায়তন' গড়েন, রবীন্দ্রনাথ তাকে চারুলতার অবরুদ্ধ কান্নায় দীপ্ত করে শেষে সোহিনীর সাধনায় আর এক গভীরতম তাৎপর্য দেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমেরই ভাবনার সংস্কৃত (Refined) অনুসারী। কল্লোলের লেখকরা সেই অচলায়তনের একটা জানলা হঠাৎ খুলে দেন রবীন্দ্রনাথের পঞ্চকের ভূমিকায় থেকেই। একালের একজন আধুনিক প্রবন্ধকার বলেছেন,—'কল্লোলে'র বিদ্রোহ অচলায়তনে প্রবেশাধিকার দিয়েছিল, কিন্তু চল্লিশের কথাসাহিত্যে নিষিদ্ধ ফলের সন্ধানে আরো দুর্গম পথযাত্রীর সাক্ষাৎ মেলে। তার কারণ এই যুগসন্ধির সাহিত্যকে (শুরুতে যায় মহাযুদ্ধ এবং শেষে দেশবিভাগ নামক

দারুণ রাষ্ট্র বিপর্যয়) অনেক অভিজ্ঞতায় পথ পার হতে হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক বিশ্বাস ভেঙেছে, অনেক মূল্য বোধের বদল ঘটেছে।'[৭]

বাস্তবিক অর্থেই যুদ্ধের সময়টা বাংলাদেশের পক্ষে এক উৎকেন্দ্রিক সমাজ-উদ্ভবের সময়। মন্বন্তর, যুদ্ধ, নৈতিক অবক্ষয়, মজুতদারদের অবিরল আবির্ভাব, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক সমূহ বিপর্যয়—এসবই যেমন জীবনকে করেছে পঙ্গু বাইরের বাঁচার অর্থে, তেমনি নীতি, আদর্শ—এসবও, যা সমাজ ও মানুষের গভীর চরিত্র-স্নায়ে ওতপ্রোত ছিল এতকাল—সে সবের মধ্যে এনেছে বিনাশ। এক গভীর সংকট দেখা দেয় মানুষের সমাজে, মনে। তা হল আত্মিক সংকট। এমন সংকট কবি জীবনানন্দের ভাষায় আঁকা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সম্ভবত আরো স্পষ্ট হয়: 'চাঁদ ডুবে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে/যেন তার জানালার ধারে/উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।/তবুও তো পেঁচা জাগে, /গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে/আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।/......রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি ; / সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কতো দেখিয়াছি।'[৮] কবির এই চিত্রের ব্যঞ্জনায় ধরা পড়ে যুদ্ধের সময়ের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। এমন বৈশিষ্ট্যের রূপকার সমকালের কথাসাহিত্যিকরাও। প্রেম ও যৌনতা মিলে-মিশে যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের কথাসাহিত্যে প্রেমভাবনায় মিশ্র-বক্তব্য এনেছিল, তেমনি আবার প্রেম সরে গিয়ে যৌনতা, দেহ-সর্বস্বতাও প্রধান হয়েছিল কোন কোন রচনায়। বস্তুত এসবই সমকালীন সমাজ ও জীবনের প্রভাবের কারণে, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও সংকট দেখা দেওয়ার কারণে অবধারিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালের বাংলাদেশের এক প্রখ্যাত কবি-কথাকার, চিত্রশিল্পী ও চলচ্চিত্র-পরিচালক বর্তমান চলচ্চিত্রে নরনারীর যৌনতার সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে যে দুটি প্রশ্ন তুলেছেন, আমরা মনে করি, তা শুধু একালের কোন সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রশ্নমাত্র নয়, তা অতীত যুদ্ধ-সমকালীন দেশীয় সর্বাবয়ব সংকট থেকে জাত এক গভীর-জটিল জিজ্ঞাসাও। এবং সেই জিজ্ঞাসা আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনায় নিশ্চয়ই উদ্ধারযোগ্য। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন,—'অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন দেশ দরিদ্র হলে তার নৈতিক অবক্ষয় কি অবশ্যম্ভাবী? আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ, উন্নত, সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের অক্ষমতা কি এই অবক্ষয়কে বিষ-কৌড়ার মতো পাকিয়ে তোলে দ্রুত ?'[৯] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে ভারতবর্ষ একটি দরিদ্র দেশ এবং এই দারিদ্র্য ছিল বৃটিশ শাসকেরই স্বেচ্ছায় অর্পিত আশীর্বাদ! তার শাসন ও শোষণে যে অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের অভিশাপ পুঞ্জীভূত হয় পরিবেশে, সেখান থেকেই দেখা

দের সামাজিক ও নৈতিক জীবনে চরমতম অবক্ষয়। তাই নর-নারীর প্রেম-সম্পর্ককে কেন্দ্র করে চরম নৈতিক অবক্ষয়ের কালো ছায়া রুদ্ধশ্বাস চেপে বসে। বাংলা কথাসাহিত্যে সেই অবক্ষয়ের ক্লেদাক্ত রূপও যুদ্ধ-সমকালের গল্প-উপন্যাসে দুর্লক্ষ্য নয়।

প্রেমের কথায় এই সময়ের সমাজ ও তার অবক্ষয়ই প্রধান হয়েছে গল্পে-উপন্যাসে। প্রবোধ কুমার সান্যাল মন্বন্তরের কথায় যে 'অঙ্গার' গল্পের রুদ্ধশ্বাস রূপ এঁকেছেন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'রতনবিবি' গল্পে যে প্রেম-চারিত্র্যের রূপ দিয়েছেন, 'পরশুরামের কুঠার,' 'গরল অমিয় ভেল', 'সুন্দরম্' ইত্যাদি গল্পে সুবোধ ঘোষের যে মানসিকতা বা তারাশংকরের 'কবি', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'নীলাঙ্গুরীয়' ইত্যাদি উপন্যাসে প্রেমের যে অভিনব বৈশিষ্ট্য—সে সবের মধ্যেই যুদ্ধ-সমকালের লেখকদের জটিলতম প্রণয়-বিষয়ক চিন্তার উজ্জ্বল প্রমাণ মেলে। এই সময়ের লেখকদের প্রেম-মানসিকতার বৈশিষ্ট্য এক সমালোচক সুন্দরভাবে বলেছেন অল্পকথায়,—'মহাযুদ্ধের প্রভাবে আমাদের সব মূল্যবোধই অস্থির—সংশয় এবং আশ্বাস, সন্দেহ এবং নির্ভরতার মাঝখানে আমাদের লেখকেরা প্রেম সম্পর্কেও সন্দিহান। এই অবিশ্বাসের জন্য কারো কারো লেখায় প্রেম সম্পর্কে ব্যঙ্গ এবং তির্যক দৃষ্টিই প্রধান। আবার কেউ বাইরের জীবনে নির্ভরতা না পেয়ে মনের গহনে আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু সেখানেও ক্লেদ আর গ্লানি। এর চরম প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই প্রেমের দেহসর্বস্বতার বিকৃতিতে।'[১০]

বাস্তবিক অর্থেই যুদ্ধ-সমকালে প্রেম ক্রমশ দেহভাণ্ড ধরে বিকৃতিতে এসে পৌঁছয়। সেই বিকৃতি মেয়েদের ঠেলে দেয় গণিকাবৃত্তিতে, পুরুষরা হয় লোভী, লম্পট, সুবিধাভোগী, আর গোটা সমাজ হয় দুষ্টক্ষতে বিব্রত, বিষাক্ত, তার অবক্ষয় তখন অবধারিত। সমকালের কথাশিল্পীরা তারই রূপকার। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের সময়-সীমায় প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পগ্রন্থ পাই—'তিনসঙ্গী'। রবীন্দ্রনাথ তখনো জীবিত। তিনিও যুদ্ধজনিত প্রতিক্রিয়ায় তীব্রভাবে যে আক্রান্ত তা তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ পড়লে বোঝা যায়। কিন্তু 'তিনসঙ্গী'র তিনটি গল্পে যুদ্ধের ছায়া নেই। কারণ বাংলাদেশের বুকে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাতও তখন সুদূরে। এই গ্রন্থের তিনটি গল্পই প্রেম-বিষয়ক। সে প্রেম সমাজ-অবক্ষয়ের নয়, গল্প তিনটির বিষয় প্রেমকে নিয়ে চিরকালের এক মহত্তম পরীক্ষার সম্মুখীন। বাংলা ছোট গল্পের প্রথম পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথের এই একেবারে শেষ জীবনের লেখা সর্বশেষ তিনটি গল্প তাঁর নিজস্ব ছোটগল্প-ভাবনায়, চরিত্র-সৃষ্টির ও জীবনদর্শনের উপযুক্ত এক ছোটখাটো গবেষণাগারও বটে। 'ল্যাবরেটরী' গল্পের 'সোহিনী' সেই প্রেম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক চিরকালের নারীব্যক্তিত্ব।

দুই

যুদ্ধ শুরু হওয়ার মুখেই সামান্য সময়ের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ দুটি গল্প লেখেন—'রবিবার' (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) ও 'শেষকথা' (নভেম্বর ১৯৩৯) এবং প্রথম গল্পের সময় থেকে প্রায় এক বছর বাদে লেখেন আর একটি গল্প 'ল্যাবরেটরি (সেপ্টেম্বর ১৯৪০)। তিনটি গল্প সংগ্রথিত হয়েছে 'তিনসঙ্গী' গ্রন্থে—রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই। তিনটি গল্পেরই মূলভিত্তিতে আছে নর-নারীর প্রেম। যদিও 'শেষকথা' লেখার পর রবীন্দ্রনাথ মন্তব্যটি করেছিলেন, তবু 'তিনসঙ্গী'র গল্পগুলি সম্পর্কেই কথাটি সমান প্রযোজ্য,—'এখনকার গল্পগুলো গল্পগুচ্ছের মত নয়—এগুলো বড় বেশি সাইকোলজিক্যাল হয়ে পড়ে।'[১১] গভীর-জটিল মনস্তত্ত্বকে প্রেমের সঙ্গে মিশাল দিয়ে প্রখর বুদ্ধির আলো ফেলে অতি-আধুনিক যুবক-যুবতীর সম্পর্ক ও বিবাহ, সতীত্ব, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, স্বামী-আদর্শের স্বরূপ, উগ্র আধুনিক-মনস্কতার স্বরূপ ইত্যাদিকে বুঝতে চেয়েছেন লেখক। যে বয়সে এই তিনটি গল্প রচিত, তা এক পরিণত-বয়স্ক প্রাজ্ঞদৃষ্টি, ঔপনিষদিক চেতনায় পরিশীলিত কবির মননের উপযুক্ত স্বাক্ষর বহন করে।

রবীন্দ্রনাথ জাত রোমান্টিক। রোমান্টিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল—যা কিছু অনড়, প্রথাবদ্ধ, সংস্কারলালিত, স্থির, সীমা দিয়ে বাঁধা—তার বিরুদ্ধে সবল বিদ্রোহের শক্তিমান আঘাত হানা এবং একেবারে নতুন কিছু সৃষ্টিকে তুলে ধরা। সমালোচকের ভাষায়,—'রোমান্টিকদের দূরায়ণবাসনা, অসন্তোষবোধ সামাজিক সংস্কারকে অস্বীকার করার চেষ্টা এবং যুক্তির বাইরে কল্পনার রাজ্যকে স্বীকার—এই বৈশিষ্ট্যগুলি রবীন্দ্রনাথের মানসিকতাতেও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে, আমাদের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহ্যকে অস্বীকারের ইচ্ছা থাকলেও তাকে ব্যঙ্গ করেছেন, এই পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত রোমান্টিকদের যথেচ্ছাচারকে মেনে নিতে পারেন নি তিনি।'[১২] আমাদের কথা হল, সমালোচক কথিত 'সামাজিক সংস্কারকে অস্বীকার করার চেষ্টা' এবং 'ব্যঙ্গ'-বাসনা 'তিনসঙ্গী'র তিনটি গল্পে স্পষ্টত দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ এখানে পরিণত বয়সে রোমান্টিকতার চূড়ান্ত স্বরূপকে তুলে ধরেছেন ছোটগল্পের শিল্পরূপে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভেই আমরা প্রেম সম্পর্কে এক আদর্শান্বিত ভাবনা ও প্রাচীন আদর্শকে ভেঙে নারীপ্রেমের নব-আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখি 'তিনসঙ্গী'র গল্পে। পুরুষ ও রমনী—উভয় দিক থেকে প্রেমের নতুনরূপ ধরার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'রবিবার' গল্পে নায়ক 'অাল্ট্রা-মডার্ন' অভীক যন্ত্রের কারিগর ও চিত্রশিল্পী। নায়িকা বিভার সঙ্গে তার কলেজের সহপাঠিনী হিসেবে আলাপ। লীলা প্রাচুর্যের

মত বহু মেয়েই অভীকের হৃদয়ের স্পর্শ চায়, কিন্তু নাস্তিক অভীক চায় ভগবানে বিশ্বাসী বিভার ভালবাসা। বিভাকে শীলার কথা বলতে গিয়ে অভীক তার জীবনে মেয়েদের ভালবাসার মূল্যায়ণ করে :

'মেয়েদের ভালবাসায় যে মদটুকু আছে, সেটাতে আমার ইনস্পিরেশান। আমি আর্টিষ্ট। ও যে আমার পালের হাওয়া। ও নইলে আমার তুলি যায় আটকে বালির চরে। বুঝতে পারি, আমার পাশে বসলে শীলার হৃৎপিণ্ডে একটা লাল রঙের আগুন জ্বলতে থাকে, ডেনজার্ সিক্‌নাল, তারপর তেজ প্রবেশ করে আমার শিরায় শিরায়।—দোষ নিয়ো না তপস্বিনী, ভাবছ সেটাতে আমার বিলাস, না গো না, সেটাতে আমার প্রয়োজন।'[১৩]

বিভার প্রতি অভীকের আকর্ষণ কিন্তু অন্য ধরণের। বিভা সব মেয়ে থেকে আলাদা। অভীকের চোখে তার সীমা আছে আস্তিক্য ভাবনায়, আর সেখানেই ভালবাসা হয়ত অভীককে হারিয়ে দিতে পারে। অভীক বলে :

'আশ্চর্য, তুমি আশ্চর্য, আমি বলছি, তুমি আশ্চর্য। আমি তোমাকে দেখি আর আমার ভয় হয় কোনদিন ফস করে মেনে বসব তোমার ভগবানকে। শেষে কোনো-কালে।আর আমার পরিত্রাণ থাকবে না। তোমার ঈর্ষা আমি কিছুতেই জাগাতে পারলুম না। অন্তত সেটা জানতে দিলে না আমাকে। অথচ তুমি জানো—"

"চুপ করো। আমি কিছু জানি নে। কেবল জানি অদ্ভুত, তুমি অদ্ভুত, সৃষ্টিকর্তার তুমি অট্টহাসি।"[১৪]

অভীক-বিভার ভালোবাসার মধ্যে গভীর মনস্তত্ত্বকে গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। একদিন মনীষা গভীর ভালোবেসে অভীককে যে হাতঘড়ি দেয়, তা-ই বিক্রী করতে আসে বিভার কাছে। বিভার বিস্ময় সেই ভালোবাসা সম্পর্কে অভীকের যুক্তি ও ভাবনায় :

"আশ্চর্য করেছ তুমি। এই কমাস হল সে টাইফয়েডে—"

"এখন সে তো সুখদুখের অতীত।"

"শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে এই বিশ্বাস নিয়ে মরেছিল যে তুমি তাকে ভালোবাসতে।"

"ভুল বিশ্বাস করে নি।"

"তবে?"

"তবে আবার কী? সে নেই, কিন্তু তার ভালোবাসার দান আজো যদি আমাকে ফল দেয় তার চেয়ে আর কী হতে পারে।"

বিভার মুখে অত্যন্ত একটা পীড়ার লক্ষণ দেখা দিল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "এত দেশ থাকতে আমার কাছে বেচতে এলে কেন।"

"কেন না জানি তুমি দর কষাকষি করবে না।"

"তার মানে কলকাতার বাজারে আমিই কেবল ঠকবার জন্তে তৈরী হয়ে আছি?"

"তার মানে ভালোবাসা খুশি হয়ে ঠকে।"[১৫]

বিভার অত্যদ্ভুত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, বুদ্ধি, অভীকের মত পুরুষকে চেনায় অন্তর্দৃষ্টি, চারিত্রিক সংযম ও সৌজন্য-শালীনতাবোধই তার প্রেমিকা স্বভাবের মূল্যবান অলংকার। এমন জহরতের সন্ধানীই তো বেপরোয়া বোহেমিয়ান পুরুষরা। এরা ওই নারীকে বাঁধতেও ভয় পায়, না বেঁধেও অনন্ত অস্থিরতায় ও জ্বালায় শূন্যবোধ করে। জাহাজের স্টোকার হয়ে বিলেতে যাওয়ার পথে অভীক যে চিঠি লেখে বিভাকে, তার মধ্যেই জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রেমের অন্য ট্রাজিক আস্বাদ মেলে :

'বী, আমার মাধুকরী, জগতে সবচেয়ে ভালোবেসেছি তোমাকে। সেই ভালোবাসার কোনো একটা অসীম সত্য ভূমিকা আছে যদি মনে করা যায়, আর তাকেই যদি বল তোমাদের ঈশ্বর, তা হলে তাঁর দুয়ার আর তোমার দুয়ার এক হয়ে রইল এই নাস্তিকের জন্যে। আবার আমি ফিরব—তখন আমার মত, আমার বিশ্বাস, সমস্ত চোখ বুজে সমর্পণ করে দেব তোমার হাতে⋯ ⋯এতদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে।'[১৬]

'শেষকথা' গল্পের নায়িকা অচিরার অন্য অভিজ্ঞতা। বিভার মত একজন মাত্র পুরুষের প্রেমের অভিজ্ঞতায় স্থির সে নয়। অচিরা প্রথম ভালোবেসেছিল বাবার পছন্দ করা, বাবারই পয়সায় বিলেত ঘুরে আসা ভবতোষকে, যে আবার দেশে ফিরে অচিরাকে ছেড়ে ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের উচ্চপদস্থ একজন মুরুব্বির মেয়েকে বিয়ে করে বসে। এর পরেই পরিচয় হয় জিওলজিষ্ট নবীনমাধবের সঙ্গে। অচিরার পক্ষে দ্বিতীয় ভালোবাসা কোন মতেই প্রথম ভালবাসার সমান continuation নয়, হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ অচিরা-নবীন মধ্যেকার প্রেমের বিকাশে গভীর মনস্তত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন বটে, তবে অচিরার ভালবাসার ব্যাখ্যায় আছে সচেতনা, সতর্কতা ও আত্মগত ভাবের দীপ্তি। প্রতারক ভবতোষের ভালবাসায় অচিরার এতটুকু শ্রদ্ধা নেই, বস্তুত ভবতোষকে অচিরা ভালোবাসতে পারে না। ভবতোষকে নির্ভর-করা-ভালবাসা আর অচিরার ভালবাসা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রেমিকা অচিরার ব্যক্তিত্বই তাকে আলাদা করে দিয়েছে। আগে জন্ম নেওয়া ভালবাসার আশ্রয় আর তার দরকার নেই এখন। নৈর্বক্তিক ভালোবাসা—যা শ্রেয় ও প্রেয় পূজার আদর্শের মত—তাকে রক্ষা করাই অচিরার প্রেমের সাধনা, সেই প্রেম আর সতীত্ব একেবারে সমপর্যায়ের।

অরণ্য-প্রকৃতির পরিবেশে নবীনমাধবের প্রতি যে প্রেমের জাগরণ অচিরার, মানসিক

সম্পর্কে তা অবশেষে শুদ্ধি রক্ষা করতে অক্ষম বলেই অচিরা সরে যায় নবীনমাধবের কাছ থেকে। নবীনমাধবের সঙ্গে অচিরার প্রেমধারণা ও প্রেমের ব্যক্তিত্ব তথা সতীত্বের অকপট পরিচয় আছে :

"আমি সায়ন্টিষ্ট, যেটা বলতে যাচ্ছি, সেটা ইম্পার্সোনাল ভাবে বলব। আপনি ভবতোষকে অত্যন্ত ভালোবেসেছিলেন। আজো কি আপনি তাঁকে তেমনি ভালোবাসেন।"

"আচ্ছা, মনে করুন, বাসি নে।"

"আমিই আপনার মনকে সরিয়ে এনেছি।"

"তা হতে পারে, কিন্তু একলা আপনি নন, বনের ভিতরকার এই ভীষণ অন্ধশক্তি। সেইজন্য আমি এই সময়ে আমাকে শ্রদ্ধা করি নে, লজ্জা পাই।"

"কেন করেন না।"

"দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শকে গড়ে তোলে, প্রাণশক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে। আপনার দিকে আমার যে ভালোবাসা, সে সেই অন্ধশক্তির আক্রমণে।"

"ভালোবাসাকে আপনি এমন করে গঞ্জনা দিচ্ছেন নারী হয়ে।"

"নারী বলেই দিচ্ছি। ভালোবাসার আদর্শ আমাদেব পূজার জিনিস, তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ, এ জিনিসটা বনের প্রকৃতির নয়, মানবীর। এ নির্জনে এতদিন সেই আদর্শকে আমি পূজা করেছিলুম সকল আঘাত সকল বঞ্চনা সত্বেও। তাকে রক্ষা করতে না পারলে আমার শুচিতা থাকে না।"

"আপনি শ্রদ্ধা করতে পারেন ভবতোষকে?"

"না।"

"তার কাছে যেতে পারেন?"

"না। কিন্তু সে আর আমার সেই জীবনের প্রথম ভালবাসা, এক নয়। এখন আমার কাছে সেই ভালবাসা ইম্পার্সোনাল। কোনো আধারের দরকার নেই।"[১৭]

'ল্যাবরেটরি' গল্পে এসে রবীন্দ্রনাথ নারীপ্রেমের এক উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। 'রবিবার' গল্পে নারীর নিজ ব্যক্তিত্বে প্রেমের উচ্চরূপ, 'শেষকথা' গল্পে নারীর দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্বে প্রেমের 'ইম্পার্শোন্তাল' অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক রূপ—যার অন্য নাম প্রেমিকা নারীর সতীত্ব, 'ল্যাবরেটরি' গল্পে নারীর প্রেম, নৈর্বক্তিক প্রেম তথা সতীত্ব ভাবনা থেকে সতীত্বকেই নারীত্বের সঙ্গে যুক্ত করে ব্যক্তিত্বের মহত্তম ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিভা-অচিরার মত সোহিনী নয়, সে বিবাহিতা। বিবাহিতা

রমনী গভীরতম প্রেমিকা হলে, স্বামীর অবর্তমানে সতীত্ব কি ভাবে রক্ষিত হবে—যদি সে নারী আধুনিকা ও চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী হয়? নারীসত্তার প্রথম ও শেষ মূল্যায়ণ প্রেমেই। সোহিনী তেমন প্রেমে এক শ্রেয়া নারী হলেও তার প্রেম স্বতন্ত্র। বিধবা সোহিনী, জাতে পাঞ্জাবী। বৈজ্ঞানিক নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরি রক্ষা করতে, তার আদর্শকেই চরম ও পরম ভেবে প্রেমের অন্তস্থলে অন্তঃসংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজের প্রেমিকা-ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে সমগ্র গল্পে সোহিনীর যে তৎপরতা তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত প্রথাকে ও বিশ্বাসকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। বিধবা সোহিনী সমস্ত রকম সংস্কার থেকে মুক্ত এক প্রেমিকা। অধ্যাপক চৌধুরীর সঙ্গে প্রণয়েও তার আপত্তি নেই। সব কিছুর মূলে আছে স্বামীর প্রতি ভালবাসা ও তার বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্য আত্মসংগ্রাম। গবেষণাগারটির জন্য সোহিনীর নিজের মেয়ের পিতৃপরিচয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতেও যে নিজ সতীত্বে কালিমা লেপন প্রয়াস—তা-ও সেই মহত্তম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রেমের জন্যই :

'নীলা বললে, "তা সত্যি কথা বলব। বাবার অতখানি টাকায় তার মেয়ের কোনো শেয়ার থাকবে না, এটা অস্বাভাবিক। তাই সবাই সন্দেহ করে—"

সোহিনী চৌকি থেকে উঠে দাঁড়াল। বললে, "আসল সন্দেহের মূল আরো অনেক আগেকার দিনের। কে তোর বাপ, কার সম্পত্তির শেয়ার চাস। এমন লোকের তুই মেয়ে এ কথা মুখে আনতে তোর লজ্জা করে না?"

নীলা লাফিয়ে উঠে বললে. "কী বলছ, মা?"

"সত্যি কথা বলছি। তাঁর কাছে কিছুই গোপন ছিল না, তিনি জানতেন সব। আমার কাছে যা পাবার তা তিনি সম্পূর্ণ পেয়েছেন, আজও পাবেন তা, আর কিছু তিনি গ্রাহ্য করেন নি।"

ব্যারিষ্টার ঘোষ বললে, "আপনার মুখের কথা তো প্রমাণ নয়।"

"সে কথা তিনি জানতেন। সকল কথা খোলসা করে তিনি দলিল রেজেস্ট্রি করে গেছেন।"[১৮]

সোহিনী প্রেমে দৈহিক শুচির থেকেও বড় করে দেখেছে মানসিক প্রেমের শুচিকে। মানসিক প্রেমের আদর্শকে রক্ষা করতে প্রয়োজনে দৈহিক সম্পর্ককে যথেচ্ছ অভিনন্দিত করতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই তার। সতীত্ব আছে মানসিক প্রেমের শুচিতেই। অচিরার শেষতম পরীক্ষা ও সিদ্ধি সোহিনীতেই।

'তিনসঙ্গী'র গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নায়ক-নায়িকাদের প্রখর বুদ্ধিচেতনার সঙ্গে প্রেমের মনস্তত্ত্ব যোগ করে এক অভিনব প্রেম-ব্যক্তিত্বের চিত্র উপহার দিয়েছেন। তিন গল্পের

স্বভাব বৈশিষ্ট্য এ গল্পের 'মডার্ন' নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে নিহিত। সোহিনী চরিত্র 'তিনসঙ্গী' গ্রন্থের সর্বোত্তম প্রেমিকা নারীর মর্যাদাপ্রাপ্ত। এক আধুনিককালের প্রতিষ্ঠিত সমালোচক একালের আধুনিকতম জটিল মনস্তত্ত্বের কথায় উপসংহার টেনে রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনা ও প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যায় মৌলিক কথা বলেছেন,—'তিনসঙ্গী'র গল্পগুলি গল্পগুচ্ছের শেষ পর্যায়। ইতিমধ্যে আমাদের সাহিত্যে নারীর রূপ পাল্টে গেছে। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েরা এই গল্পগুলিতে পুরুষের বন্ধু সমালোচক, প্রেমিকা। ...... সোহিনী বুঝিয়ে দিয়েছে, দেহের সতীত্ব শিক্ষা সংস্কার-সাপেক্ষ, সতীত্বের অভাবে দৈহিক শুদ্ধি যে হারিয়েছে, সে শুধু মনের জোরেই স্বামী বা ভালোবাসার পাত্রের ওপর নিষ্ঠা রেখে সতীত্বের উঁচু আদর্শ বজায় রাখতে পারে। সোহিনী ভালবাসার জন্যে প্রাণ দিতে পারে, প্রাণ নিতে পারে। স্বামীর ল্যাবরেটরি তার বুকের কলিজা তার মাঝখানে থাকে ঝিলিক-দেওয়া ছুরী।

নারী ব্যক্তিত্ব এখানে সুতীক্ষ্ণ শিখর-চূড়ায়। এরও ওপরে কিছু আছে বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু এর ওপারে যে অতলস্পর্শী খাদ তা আমাদের সকলেরই জানা।'[১৯]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে রবীন্দ্রনাথের গল্পে যে প্রেমের বুদ্ধিদীপ্ত আদর্শের পরিচয় পাই, যুদ্ধ যখন আমাদের দেশের দ্বারপ্রান্তে এসে রক্তবেশে দাঁড়ায়, তখন তার অভিঘাতে সেই প্রেম বুদ্ধির ভাবনা থেকে সরে এসে কঠোর সমাজ-বাস্তবতার সম্মুখীন হয়। রবীন্দ্র-নাথ প্রেমকে পরিণত বয়সের বুদ্ধিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা ও চেতনা দিয়ে এমন এক রূপে উজ্জ্বল করেছেন, যা তত্ত্বে ও শিল্পের সত্যে উচ্চ মর্যাদা পায়। কিন্তু যুদ্ধ-সমকালের প্রেক্ষিতে কল্লোলের কালের লেখকদের মধ্যে অন্নদাশংকর রায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, তারাশংকর, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ যেভাবে প্রেমকে এঁকেছেন, নবাগত সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, যুদ্ধের উপান্তে আবির্ভূত রমাপদ চৌধুরী প্রমুখ যে অর্থে প্রেমের স্বরূপকে ভেবেছেন, 'তিনসঙ্গী'র প্রেমভাবনা তার সঙ্গে সূত্রবদ্ধ হয় না। চারপাশের মহামন্বন্তর, কান্না, গণবিক্ষোভ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কৃষক-শ্রমিকের দুরবস্থা, উৎকেন্দ্রিক জীবনস্বরূপ, নৈতিক অবক্ষয়, ধনিক শ্রেণীর দুর্মদ লোভ-লালসা-স্বার্থপরতার মধ্যে প্রেম নামক বস্তুটি তার 'প্লেটনিক' স্বভাব ত্যাগ করে ক্রমশ সমাজ ও ব্যক্তির চরিত্র-স্নায়ে, মনস্তত্ত্বের আলোয় অন্য রূপ নেয়। প্রেম, যৌনতা, দেহভোগ থেকে ক্রমশ নৈতিক অবক্ষয় দিয়ে সমকালের লেখকরা প্রেমকে শিল্পের শরীরে যাচাই করতে বসেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন কোন উপন্যাস ও গল্পের নায়কদের যৌন ভাবনা ও প্রেম-সম্পর্ক যেমন জটিলতা

খানে, প্রবোধ কুমার সান্যালের প্রেমিক-প্রেমিকারা, বা অন্নদাশংকরের প্রেম-ব্যাখ্যা প্রেমের কথাসাহিত্যে অন্য মাত্রা যোজনায় জন্য তৎপর হয়।

যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে প্রেম প্রধানত ভিত্তি পেয়েছে মনস্তত্ত্বে। জীবনে পোড়-খাওয়া মানুষ প্রেমকে নিছক বিলাস হিসেবে গ্রহণ করেনি। এ সময়ের কথাসাহিত্যে প্রেম হয়েছে প্রয়োজন। অবশ্য বিলাস-বাসন দিয়ে, রোমান্টিক অনুভাবনায় রাঙিয়ে প্রেমের কথা বলতেও একাধিক লেখক ব্যস্ত থেকেছেন নানাভাবে। তবে প্রেম যে অর্থে জটিল হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'তিনসঙ্গী'-তে তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধ চেতনার আলোয়, যুদ্ধ-সমকালের অন্যান্য লেখকদের রচনায় সে অর্থে প্রেম আলোকোজ্জ্বল হয়নি। কখনো জটিল চরিত্র এঁকে, কখনো মনস্তত্ত্বে নিবিষ্ট থেকে, কখনো পরিবর্তী সমাজ ও ব্যক্তিমনের ছায়েই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের লেখকরা প্রেমের সাহিত্য রচনা করে গেছেন।

যেমন প্রেমের গল্প লিখতে বসে অন্নদাশংকর রায় একটানা গল্প বলে প্রেমের মনস্তত্ত্ব-সম্মত জটিল রূপের সঙ্গে বিস্ময়কর সব প্রেমিক প্রেমিকার চরিত্রকে আমাদের সামনে এনেছেন। 'মন পবন' গল্প-সংকলনের অন্তর্গত 'দুকানকাটা' (১৯৪৩) 'যৌবনজ্বালা' গল্প-সংকলনের অন্তর্গত 'হেঁয়ালি' (১৯৪৪), 'মনপবনে'র অন্য দুটি গল্প 'হাসনসখী' (১৯৪৫) ও 'বনের ঘরের পিসী কনের ঘরের মাসী' (১৯৪৫) গল্পগুলিতে সেইসব চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়।

'দু'কানকাটা' গল্পে সুকুমার কিশোর বয়সে বৈষ্ণবীয় বাউল-দরবেশদের সাহচর্যে এসে তার গুরু মজনু ফকিরের কাছে জীবন ও প্রেম সম্পর্কে মন্ত্র শোনে:

'তুমি সুখের সন্ধান ছেড়ে রাধার সন্ধানে যাও। সে যদি সুখ দেয় নিয়ো। যদি দুখ দেয় নিয়ো। কিছুতেই 'না' বোলো না। তার ছলাকলার অন্ত নেই। তেই তোমার বলি, কাঁদতে জনম গেল রে মোর কাঁদতে জনম গেল।'[২০]

তার থেকেও যে বয়সে বড় সেই সুন্দরী, সুকণ্ঠী সারীকে নিয়ে সে অনেক ঘুরেও সারীর দূরে দূরে থেকেই ভালবেসে গেল সুকুমার। বর্তমান সভ্যতার জটিল জীবনে সারী হয়ে গেল চিত্রতারকা, বিয়ে করল বিরাট ধনীকে। কিন্তু সুকুমার তার সেই পুরনো প্রেমের বিশ্বাসেই সারীর কাছে থেকে যায় সমস্তরকম হীনমন্যতাকে মাথা পেতে নিয়েই:

'হাওড়ায় শেষ দেখা। বিদায়ের আগে সুকুকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। 'তোর পৌরুষ বিদ্রোহী হয় না? তোর আত্মসম্মান নেই?'

সুকু উত্তর দিয়েছিলো, 'ও যে রাধা।'[২১]

সুকুমারের যে প্রেম, তা ব্যক্তিত্বহীন—তাতে ধর্মের আবরণ থাকলেও লেখক

একালের জটিল সভ্যতায় সেই পুরনো প্রেমের বিশ্বাসকে রেখে সম্ভবত একটি গভীর শ্লেষকে প্রেম-মনস্তত্ত্বে সমন্বিত করেছেন।

'হেঁয়ালি' গল্পে জলধর ভট্টাচার্যের ছেলে সুধন্য ভট্টাচার্য—যে জ্যোৎস্না রায় ছদ্মনামে বিবাহিতা ও পুত্রহীনা যুবতী অনীতা, তার ননদ মল্লিকা, সুধা ইত্যাদির সঙ্গে অবলীলায় প্রেম করে শেষে সুধাকে বিয়ে করে এবং তারই প্রেমের ফাঁদে এসে একে একে মল্লিকা ও অনীতাও যেমন একান্ত ব্যক্তিক গোপন মনের জগতে সুখ, আশা, স্বপ্ন রঙিন করে সন্তুষ্ট থাকে—এ সবের জটিল রহস্যময় মনোজগতকে এঁকেছেন লেখক। মল্লিকা ও বৌদি অনীতার সংলাপ বিনিময়ে লেখক দুজনের প্রেম-মনস্কতায় যেমন জটিল দিককে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় ধরেছেন, তেমনি সুধন্য তথা জ্যোৎস্না রায়ের মত মস্ত কুলীন, বিয়ে করাই যাদের ব্যবসা এবং 'এখনো সুযোগ পেলে বার বার বিয়ে করে'—এমন মানুষদের স্বভাবটিকেও নির্দিষ্ট করেছেন :

'…"আমার সঙ্গে প্রেম করে ওর লাভ? বরং তোমার সঙ্গে বিয়ের আশা আছে।"

"তোমার বিশ্বাস লোকে একজনকেই ভালোবাসে ও বিয়ে করে?"

"সেইটেই তো উচিত।"

"যা হওয়া উচিত তাই বুঝি হয়ে থাকে?"

"কী জানি, আমি অত বুঝিনে।……"'[২২]

'হাসন সখী' আরও জটিল প্রেমের গল্প। এখানে প্রেম এসেছে কিশোর-কিশোরীর অসহায় অবস্থায় গড়ে-ওঠা বন্ধুত্ব থেকে। রুগ্ন চাঁপা ও সুস্থ নীলু—দুয়ের সম্পর্ক যৌবনে চাঁপার বিবাহ-বিচ্ছেদে ফিরে এসে একা থাকার পর এবং নীলুর বৌ-ছেলে নিয়ে সংসার করার পরও কেমন যেন জটিল হয়ে যায়। বন্ধুত্ব ক্রমশ সামাজিক অবস্থা থেকে অসামাজিক অবৈধ জটিল মানসিকতায় প্রেম ও কঠোর দায়িত্ববোধে অন্য ভিত্তি পায়। চাঁপা শেষবার শূন্যতা থেকে বাঁচতে অন্যত্র বিয়ে করলেও নীলু তার স্ত্রীকে জানিয়েই চাঁপার পালিতপুত্রদের জন্য খরচ যোগায় নিয়মিত। প্রেমের জটিল রূপচিত্রন ও পরিণতি সাধনে অন্নদাশংকর রায় এই গল্পে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

'বরের ঘরের পিসী কনের ঘরের মাসী' গল্পেও আছে আর এক জটিল প্রেমের ট্রাজেডি। রমা বক্সী ওরফে কাজল বিধবা হবার পরেও অদ্ভুত সম্পর্ক রাখে তার প্রাইভেট টিউটর রাখাল চৌধুরীর সঙ্গে—যাকে সে শেষ পর্যন্ত বিয়েই করল না। এ বিষয়ে গল্পের কথককে বলা রাখাল চৌধুরীর বক্তব্য :

'……তোমার দিদির দুঃখ যাকে ভাবছ সেটা একটা প্রচ্ছন্ন সুখ। তিনি নিজেই সেটাকে পুষে রাখতে চান যে। তুমি করবে কী।……বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা।

তবে শোনো বলি। কাজল এখনো তার স্বামীকেই ধ্যান করছে। পাচ্ছে না বলে বোধ করে বই পড়ছে! না, তার জ্ঞান পিপাসা নেই। সে জ্ঞানের জন্যে পড়ে না। এমন কি পাস করার জন্যেও পড়ে না। সে পড়ে স্রেফ আত্মপীড়নের জন্যে। এ যেন নিজের হাতে চাবকানো। শরীর তো ভেঙে যাচ্ছেই। ......তোমার কাজলদি হচ্ছে যাকে বলেmasochist—অর্থাৎ মর্ষকামী।'[২৩]

গল্পের উত্তমপুরুষ কথক তা প্রথমে বিশ্বাস করেনি। কাজল সারা জীবন বয়স নিয়ে মিথ্যে বানিয়ে এসেছে। তাতে তার বাধে নি একটুও। নিজেকে কথকের থেকে ছোট করে আনন্দ পেয়েছে অনেক বেশী, এমন কি গল্পের শেষেও তা দেখা যায়। তার লকেটে ইংরিজি 'আর' লেখা অক্ষরটি রাখাল দার নামে চালাতে ও নিজের প্রেমকে অমর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতেও বাধে নি একটুও। অবৈধ প্রেমকে সমস্ত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রেখে, আবার পাশাপাশি স্বামী প্রেমকে সমানে জীইয়ে রেখে কাজল তথা রমা বক্সী যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের প্রমাণ রাখে জীবনে, তা প্রেমের আর এক দুরারোগ্য ব্যাধি বা রহস্যই।

প্রবোধকুমার সান্যাল তাঁর 'অঙ্গার' গ্রন্থের অন্তর্গত 'গুহায় নিহিত' গল্পে প্রেমের আর এক 'সিচুয়েশান' সৃষ্টি করেছেন। গল্পের নায়ক প্রিয়কুমার। স্ত্রী প্রতিমা অত্যন্ত সহজ, সরল। স্বামীর প্রতি তার পরম বিশ্বাস, চরম নির্ভরতা। ওদেরই সংসারে কদিনের জন্যে আসে প্রতিমার বোনের অবিবাহিতা ননদ দেবী—শিক্ষিত, কালচার্ড। প্রতিমা এবং প্রিয়কুমারের পিসিমাও জানে না কলেজ জীবনে দেবীর সঙ্গে প্রিয়কুমারের পরিচয় ছিল। প্রিয়কুমারদের সংসারে কদিনের জন্যে এসে দেবী প্রিয়কুমারের সঙ্গে তার সম্পর্ককে অতি সংগোপনে জটিল করে তোলে। নানাভাবে প্রিয়কুমারের মধ্যে জ্বালা-যন্ত্রণা সৃষ্টির চেষ্টা করে দেবী। নিষ্পাপ, সরলা প্রতিমাকে সাজিয়ে প্রিয়র কাছে নিয়ে আসার মধ্যে তেমন প্রয়াসকে প্রিয় যখন ধরতে পারে, তখন তার এক প্রশ্নের উত্তরে দেবীরানী বলে :

'...নির্ভুল পথ কোনটা? কেমন করে যন্ত্রণা দিলে তোমার বুক ভেঙে দেওয়া যায়—বলে দিতে পারো?'[২৪]

গল্পের শেষে দেবী ধরা পড়ে যায় শুধু প্রিয়কুমারের কাছে নয়, প্রিয়র পিসিমার কাছেও। উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে দেবী সেই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেও তার মনের গহন গোপনে নিহিত প্রেমাকাঙ্ক্ষা এক জটিলতম অবস্থায় এসে স্থির হয়ে যায়।

'অন্ধ' গল্পেরও মূল বিষয় প্রেম। কিন্তু শুধুমাত্র প্রেম-বিষয় এতে নেই, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সমকালীন যুদ্ধের পরিবেশের অভিঘাত। যে-সাময়িক

মেয়ে রুপুর ভাড়াটে-প্রতিবেশী জিতুর সঙ্গে মেলামেশায় তীব্র প্রতিবাদ করত, প্রতি মুহূর্তে গভীর সন্দেহে ও ভয়ে দুই পরিবারের মধ্যে দূরত্ব তৈরীর জন্য উঠানে বেড়া দিয়ে আড়াল করতে সদা-সচেষ্ট হত, সেই শারদাই স্বামী ভুবনবাবুর হাত ধরে যুদ্ধভয়ে ভীতির কারণে দুর্দান্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও কলকাতা ত্যাগ করে যায়। এমন সিদ্ধান্তের সময় শারদা ও জিতেনবাবু জিতুদের সঙ্গে সম্পর্কে সহজ হয়ে যায়, সবচেয়ে বেশী নির্ভর করে, বিশ্বাসী হয়ে ওঠে তারই ওপর। তার থেকেও বড় কথা, যে জিতুর সঙ্গে রুপুর মেলামেশায় ভীষণ ভয়, সন্দেহ, রাগ, জ্বালা শারদাকে কুরে কুরে খেত, সেই শারদাই মেয়ে তাদের সঙ্গে গ্রামে না গিয়ে কলকাতায় পিসিমার বাড়ি থাকবে জেনে সহজেই ছেড়ে যায়। জিতুর রাণাঘাটের গ্রামে ছোটকাকার বাড়িতেই জিতুর কথামতো উঠতে চায় ওরা। জিতুর প্রতি তারা দুজনেই কৃতজ্ঞ। রুপুকে রেখে যাবার সময়ও তাকে উপদেশ দেয় জিতুদের বাড়ি একবেলা খেয়ে দেয়ে যেন বিকেলে পিসিমার বাড়ি চলে যায়। রুপুর বাবা-মার এই পরিবর্তন যেমন আড়ষ্ট সন্ত্রস্ত পরিবেশে স্বাভাবিক, কিন্তু গল্পের মূল লক্ষ্য গল্পের শেষে রুপুর মানসিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তায়। যখন স্বাধীনতা ছিল না জিতুর সঙ্গে মেশায়, যখন মা-বাবার তীব্র কঠিন শাসনে ছিল পরাধীনতার যন্ত্রণা, তখন রুপু লুকিয়ে জিতুর সঙ্গে যোগাযোগ করত। কিন্তু যখন চারপাশে কোন শাসন-তর্জন, ভয়-বন্ধন নেই, তখন রুপু কোথায় কিভাবে সামনে আসবে জিতুর, সেইটাই হল প্রেমিকের কাছে সচেতন প্রেমিকার বড় পরীক্ষা। এই পরীক্ষার সামনে রুপুর চিন্তায় আসে দুটি দিক—বাবার অর্থনৈতিক অসহায়তার চিন্তা, অন্যদিকে জিতুকে কাছে আনার এক অজ্ঞাত ভয়। ভয় যেমন জিতুকে, তেমনি নিজেকে আত্মশাসনে ধরে রাখার মধ্যেও। এমন শাসন-রূপের অদ্ভুত চিত্র উপহার দিয়েছেন প্রবোধ কুমার সান্যাল গল্পের শেষতম উপসংহার অংশে :

'শূন্য নির্জন ঘরের দরজায় খসখস করে এক সময়ে পায়ের শব্দ হোলো। জিতু ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালো রুপুর সামনে। কেউ কোথাও নেই, কেউ আসবেও না এ দিকে। জিতু রুপুর একটি হাত ধরে তুললো। বললে, ভয় কি? আমি পৌঁছে দেবো।

ভয়!—রুপু শান্ত ও নির্ভীক হাসি হাসলো, বললে, ভয় পেয়েছ তোমরা, পুরুষরা, তাই আমাদের বস্তাবন্দী করে নিয়ে জন্তুর মতন পালাচ্ছ পাড়াগাঁয়ের গুহাগহ্বরে। মানুষের এতবড় অপমান এদেশে আর কোনো যুগে ঘটেনি।

জিতু সচকিত বিস্ময়ে রুপুর মুখের দিকে তাকালো

রুপু পুনরায় বললে, ভয় নয়, কিন্তু ভাবছি বাবার কথা। চাকরী ছাড়লেন, সামান্য

পুঁজি যা ছিল নষ্ট করলেন। জানি জয় একদিন ওঁর আসবে, কিন্তু সেদিন ওঁর বাঁচার উপায় থাকবে না। মহামারী আর দুর্ভিক্ষকে একদিন না থেমে সবাইকে রুখতে হবে। এ যুদ্ধে পালানোই মৃত্যু! এই বলে সে অগ্রসর হোলো,—চলো যাই—

জিতু বললে, এখনই যাবে পিসিমার ওখানে?

না—বলে রুপু কিয়ৎক্ষণ থামলো। তারপর পুনরায় বললে, কিন্তু একটা কথা তোমায় বলে রাখি। স্বাধীনতা পেয়েছি বলেই সাবধান হবো মনে রেখো।

জিতু বললে, সে দায়িত্ববোধ আমার আছে রুপু, তুমিও মনে রেখো।'[২৫]

ব্যক্তিগত প্রেমভাবনা থেকে দুই যুবক-যুবতীর জীবনের বড় দায়িত্ব-বোধে উত্তরণ ঘটে প্রেমের বড় মর্যাদাদানের মাধ্যমে।

'উচলে চড়িনু' গল্পে সুবোধ ঘোষ অভ্র খনির ওভারম্যান দীনেশ ও মজুরনী বিলাসীর সাধারণ সম্পর্কের মধ্যে তেঁতুলিয়া মাঠে তাঁবু-গেড়ে-বসা ইরানী বেদের মধ্যেকার ইরানী যুবতী সারাকে নিয়ে এসে এক অস্বাভাবিক জটিলতা তৈরী করেছেন প্রেম মনস্তত্ত্বের। সামান্য মাইনের চাকুরে দীনেশকে যেখানে কেউই পছন্দ করে না, সেখানে বিলাসী তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, অথচ দীনেশ তাকে এড়িয়ে যায়, অবজ্ঞা করে। আসে সারা। গভীর রাতে চুরি করতে এসে দীনেশের ঠোঁটে চুমু খেয়ে সে কামনা জাগিয়ে দিয়ে যায়। আর সেই কামনায় দিনেশ সারাকে ক্রমশ কাছে আনতে চায় সারার ভালবাসার মোহে। সারা হাজার টাকা চায় বেদের দলের প্রধানের কাছ থেকে ছেড়ে আসার জন্য। প্রধানকে সেই টাকা দিলে ছেড়ে দেবে সে ওকে। দিনেশ ভাবে:

'টাকা চাই। কন্যা পণ। এই পরম নির্বন্ধের জন্যই তার নির্বাসিত যৌবন অপেক্ষায় বসেছিল শুধু। বর পণের দেশে তাই সে পুরুষের মর্যাদা পায় নি।'[২৬]

গল্পের শেষে বিলাসী তার নিজের জীবন বিপন্ন করে খনি থেকে দীনেশকে গোপনে অভ্রচুরি করে দিয়ে হাজার টাকার ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু সে কিছু পায়নি। তার অব্যক্ত প্রেম হয় অবহেলিত। আর চাপা খুশির মধ্যে নায়ক দিনেশ ভাবে:

'দুঃখ পেয়ে গেল বিলাসী, নিজের দোষে। ওর অন্ত্যজ অনুরাগের মধ্যে ছিল সহমরণের তৃষ্ণা। বিংশ শতাব্দীর রুচিবান দিনেশ চৌধুরী অত নীচে নামতে পারে না। নিশ্চিহ্ন হতে পারে না। বিলাসীর জন্যে দুঃখ হচ্ছে, অন্য সময় হলে বোধ হয় কান্নাও আসতো।'[২৭]

অথচ দিনেশও প্রবঞ্চিত হল গভীর রাতে অতি সুখকর তার নতুন ইরানী বেদেনী প্রেমিকা সারার জন্য অপেক্ষায় ঘোরের মধ্যে—তার কষ্টার্জিত হাজার টাকা চুরি হওয়ায়। বেদেনীদের প্রেমে চরম, তীব্র মদের গন্ধের মত মোহ আছে, আকর্ষণ আছে,—

মাদকতা আছে, কিন্তু নেই ঘর বাঁধার পরম আশ্রয় ও আশ্বাস। অন্যদিকে বিলাসীর তা-ই ছিল। নিম্নবিত্ত রুচিবান দিনেশের কাছে সোনার হরিণের মত মায়াই সত্য হয়ে ওঠায় তার প্রেমের প্রবঞ্চনা তাকে যে শূন্যতাই দেবে, তা স্বাভাবিক। সুবোধ ঘোষ বন্ধন ও বন্ধনহীন—এই দুই বিপরীত স্বভাবের প্রেমময় আকর্ষণের মধ্যে এক যৌবনদৃপ্ত পৌরুষের মোহজনিত নিষ্ফলত্ব ও প্রবঞ্চনাবোধকে দেখিয়ে প্রেম মনস্তত্ত্বের এক জটিল দিক উদ্ঘাটিত করেছেন 'উচলে চড়িনু' গল্পে।

'পরশুরামের কুঠার' গল্পে সুবোধ ঘোষ কোলিয়ারীর চারপাশে গড়ে-ওঠা ছোট-খাটো নতুন শহরের মধ্যে মানুষেরই গড়া সমাজের এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছেন। কোলিয়ারী শহর নয়াবাদের বস্তির চারপাশে দেখছিল কিছু ভদ্রলোকের বসতি, ক্যাথলিক মিশনের সুন্দর গীর্জা, দেশী খৃষ্টান মেয়েদের কনভেণ্ট, একটি অনাথালয়, একটি জেনানা হাসপাতাল। ভদ্র হয়ে ওঠে সমাজ ও শহর। এই শহর অবশ্য লেখক বাংলাদেশের বুক থেকে নেননি, এঁকেছেন বাংলার বাইরের শহর।

এমন নতুন শহরের চাকচিক্য, আভিজাত্য, জৌলুষ, তথাকথিত ভদ্র জীবন যাপনের গভীরে নিঃশব্দ ক্ষয়রোগের মত যে বিকৃত জীবন ও সমাজ গড়ে ওঠে সবার অলক্ষ্যে, লেখকের প্রধান লক্ষ্য সেই বৈপরীত্যেই। শহরের বাঙালীটোলা থেকে সামান্য দূরে দুর্গাবাড়ির পিছনে এক আমড়াতলায় মেটে ঘরে একটি ছাগল আর কিছু দূরে নালার ধারে আশী বছরের বুড়ো প্রসাদী ডোমকে সঙ্গী করে থাকে পূর্ণ যুবতী, স্বাস্থ্যবতী ধনিয়া। ভদ্রলোকের পাড়া ঘেঁষে থাকে ধনিয়া। সে এক অদ্ভুত চরিত্র। প্রতি বছর তার পেটে সন্তান আসে, এভাবেই তিলক ইত্যাদির মা হয় সে। একাধিক পিতৃপরিচয়হীন সন্তানকে ধনিয়া জেনানা হাসপাতালে জন্ম দিয়ে চলে আসে। শহরের ভদ্রলোকদের গৃহিনীরা রুগ্ন। তাদের সন্তানরা মায়ের দুধ খেতে পায় না। তাই ডাক্তারের কথায় তারা ধনিয়াকে নিয়োগ করে আয়া হিসেবে। ধনিয়া নিজের বুকের দুধ খাইয়ে এইভাবে ঘোষালবাবুর বড় ছেলে ও অন্যান্যদের বাঁচায়। বদলে পায় কিছু মাসকাবারি অর্থ ও প্রতিবারে সিধের চাল। ধনিয়ার পরিত্যক্ত ছেলেরা মানুষ হয় অনাথালয়ে। ধনিয়া সিধের চাল সেদ্ধ করে নিজের অন্ন জোটায়, বাঁচিয়ে রাখে বুড়ো প্রসাদী ডোমকেও। ক্রমশ শহরে আসে গুঁড়ো দুধ, ধনিয়ার প্রয়োজন ফুরোয় ভদ্রলোকদের কাছে। তবু ধনিয়ার স্বাস্থ্য অটুট। তার ক্রমশ বয়স হলেও এক সময়ে উধাও হয়ে যায়, সন্তান আনে পেটে, দিয়ে আসে জেনানা হাসপাতালে।

এই ধনিয়ার বিরুদ্ধেই একদিন ভদ্রলোকরা সোচ্চার হয় তাদের পল্লী থেকে তাকে উৎখাত করে বাজারে নাম লেখাবার ব্যাপারে। ধনিয়া হয় ভদ্রলোকদের পক্ষে

অদ্ভুৎ। যাদের শিশুপুত্রদের বুকের দুধ খাইয়ে ধনিয়া একদিন বাঁচায়, তারাই ধনিয়াকে চকবাজারের বেশ্যাপল্লীতে আশ্রয় নেওয়ার দাবী জানায় মিউনিসিপাল কমিশনারের কাছে। ধনিয়ার কাছে এ এক চরম আঘাত। তার একাধিক সন্তান যেভাবেই এসে থাকুক, তবু সে মা। এক বড়দিনের সকালে অনাথালয়ের ছেলেদের সারিবদ্ধ, সুসজ্জিত বেশে ব্যাণ্ড বাজানোর দৃশ্য দেখে নিজের পরিত্যক্ত শিশুগুলির কথা মনে পড়ে :

'ধনিয়ার চোখের দৃষ্টি তখন অদৃশ্য চুম্বনের মত প্রত্যেকটি ছেলের মুখের ওপর ছোঁ মেরে ফিরছে। এর মধ্যে অন্ততঃ ছটি তারই উপহার। কিন্তু কে তারা চেনবার উপায় নেই। ঐ ড্রাম বাজিয়ে দশ বছর বয়সের ছেলেটি, সার্টের আস্তিন দিয়ে মুখের ঘাম মুচছে। হয়তো সেই একজন। কিম্বা পাশেরটিও হতে পারে। কিন্তু কে নয়? মনে হচ্ছে সবাই।

বিভোর হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধনিয়া। জনতা কখন সরে গেছে। দূরে বনের মাথার কুয়াশা গেছে গলে। মাঠের মাঝ দিয়ে চলেছে শোভাযাত্রা। ধূলো উড়ছে। সকল পার্থিবং রজঃ মধুময় হয়ে উঠেছে।

গাছের ঠেস ছেড়ে দিয়ে অতি অবসন্নভাবে ধীরে ধীরে ধনিয়া ঘরের দিকে ফিরলো, অগাধ এক ক্লান্তি ও পুলকের বন্যা যেন সমস্ত শরীর ছেয়ে বয়ে চলে গেছে—প্রিয় সঙ্গ সুখের চরম ক্ষণে উচ্ছ্রিত সজলাসারের মত। বুকের ওপর আঁচলটা ভাল করে টেনে নামিয়ে দিল ধনিয়া। কাঁচুলি ভিজে গেছে।'[২৮]

মাতৃহৃদয়ের গোপন স্নেহ ও অভিমানে করুণ ধনিয়ার এ এক অপরূপ রূপ। আবার এই ধনিয়াই পরে যখন শোনে, তাকে শহরের বেশ্যাপল্লীতে যেতেই হবে, তখন তার অসহায়তার বুঝি কোন প্রতিতুলনা রাখেন নি লেখক। ধনিয়া বেশ কিছুদিন অন্তর্হিত হয়েছিল তার মেটে ঘর থেকে। প্রসাদী ছিল উপবাসী, অসহায়, ক্ষুধার্ত। আক্ষেপে, অনুশোচনায় সে চলে আসে প্রসাদীর কাছে :

'—প্রসাদী চাচা। ধনিয়া এসে ফুঁপিয়ে কেঁদে পড়লো। প্রসাদী তবু সাড়া দিল না। ধনিয়া বুড়োকে একবার জোরে ঝাঁকানি দিয়ে থুতনিটা টেনে ওঠালো। বুড়ো চোখ মেলে তাকাতেই আবার ডাকলো। —প্রসাদী চাচা।

ধনিয়া কাঁদছে, এ কান্নার বেদনা বিদ্যুতের ছোঁয়াচের মত প্রসাদীকে যেন আঘাত করলো। ধড়ফড়িয়ে উঠলো শরীরটা। —এ কি? তুই ধনিয়া!

—হাঁ চাচা। আমার জাত নেই, আমি নাকি রাণ্ডী।

—ছি ছি, এ কি বলছিস।

—হাঁ চাচা, আমাকে নাম লেখাতে হয়েছে। কাল থেকে বাজারে থাকতে হবে।'

—আরে বাঃ, তুই তো লছমী।

—না চাচা, আমার স্বামী নেই।

—গাই গরুরও স্বামী নেই। তারা কি লছ্‌মী নয়?

—তা বললে চলে না, আমি তো গাই নই।

ধনিয়া হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো—এবার চলি চাচা, আর দেখা হবে কি না জানি না।'[২৯]

যে শহর শিক্ষিত ভদ্র মানুষদের বসবাসে নতুন, সেই শহরেই এমন ধনিয়াকে হতে হবে বেশ্যা। লেখক ধীরে ধীরে তাকে পরিবর্তন করলেন বিকৃত রুচির সূচনা করে। যে এতদিন বুকের দুধ দিত রুগ্ন শিশুদের—যারা যীশুর মানব পুত্রের মতই পবিত্র, যাদের বাঁচাতো আপন মায়েরই অকৃত্রিম মমতা, স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে, সেই ধনিয়াই বয়সে নুয়ে-পড়া আশি বছরের বুড়ো প্রসাদী ডোমকে ক্ষুধার্ত দেখে এক বিকৃতির মধ্যে নামায় নিজেকে:

'দাঁড়িয়েছিল ধনিয়া। আনমনে মাথার কাপড়টা ফেলে দিয়ে চুলগুলি গুছিয়ে শক্ত করে একটা খোঁপা এঁটে নিল। আঁচল দিয়ে তেলা মুখটা মুছে নিল একবার। তারপর চিরকেলে সেই মিটিমিটি হাসি আবার সারা মুখে চিক চিক করে উঠলো।

—তুমি রাগ করেছ চাচা। ধনিয়া আস্তে আস্তে এগিয়ে এল, অসহায় অসাড় প্রসাদীর জরাজীর্ণ শরীরটাকে বেড়ালের ছানার মত কোলের ওপর তুলে নিল। কাঁচুলি খসিয়ে প্রসাদীর মাথাটা চেপে ধরলো বুকের কাছে। আঙুল দিয়ে বুড়োর মাথায় পাকা চুলের জটগুলি ছাড়িয়ে দিতে লাগলো আস্তে আস্তে।

একটি ঘন্টা পর। পরিতৃপ্তির আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রসাদী, ক্লান্ত সিক্ত চোয়াল দুটো এলিয়ে পড়েছে। প্রসাদীকে ধুনীর কাছে মাটিতে শুইয়ে দিল ধনিয়া।'[৩০]

চিরন্তন মাতৃসত্তা থেকে ধনিয়ার যে পতিতা নারীতে রূপান্তর, বস্তুত তা তথাকথিত ভদ্রসমাজের ভিতরে গোপন ক্ষয়রোগের আক্রমণের মতই। লেখক প্রচ্ছন্ন অথচ তীব্র শ্লেষে গল্পের যে পরিণতি এনেছেন তা আধুনিক বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও সভ্যতা দিয়ে গড়া শহরের মূল ভিতের অবধারিত ক্ষয়িষ্ণু দিকটিকেই স্পষ্ট করে। বেশ্যা হয়ে ধনিয়া বাজারের ঘরে রাতে দাঁড়ালে যারা সে পল্লীতে আসে ক্লেদাক্ত ফুর্তির মধ্যে ডুবতে, তারা সেই ভদ্র ঘোষালবাবুদের পুত্র—যাদের একদিন শিশুকালে ধনিয়া নিজের মাতৃস্তন্য থেকে খাদ্য দিয়ে রুগ্ন অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে ছিল:

'হোক রাত্রি, হোক নেশা আর গ্যাসলাইটের পোড়া জ্যোৎস্না। ওদের ঠিক চিনতে পারা যায়। লম্বা চেহারা ঘোষালবাবুর বড় ছেলেটা ঘন ঘন সিগারেটের ধোঁয়া

এমন-গোপন ঈর্ষা; এমন নিজেকে নিঃসঙ্গ ভেবে জটিল-যন্ত্রণায় কাতর হওয়া ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা যেন্নেই মালার জটিল মনটি অবলীলায় আত্মকলঙ্ক কালো পাথরের গায়ে লিখে ফেলেন :

'মালা বিশ্বাস, তোমায় দূর থেকে সেলাম করি। এক দুই তিন চার···থাক, বেচারাদের নাম আর করবো না। তোমার আলো ছুঁতে গিয়ে কত পতঙ্গের পাখা পুড়ে গেল। আর সংখ্যা বাড়িও না। তোমার চিঠির তাড়া রানীঝিলের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবার সুস্থির হও।'[৩৪]

এই মানস-বিকৃতি বস্তুত আধুনিক অনুকরণজাত শিক্ষা-দীক্ষারই প্রতিরূপ, আধুনিক অগ্রসরমান সভ্যতার পূতিগন্ধময় উপজাত অংশ। মালা বিশ্বাসের সমাজের বৈশিষ্ট্য বিচার করে এক সমালোচক যথার্থ ই বলেছেন,—'মিথ্যা-সম্ভ্রম-লোলুপ, আদর্শহীন সমাজের এক বিকৃত সাধনা মালা বিশ্বাসের অশালীন, অশ্লীল আত্মপ্রচারের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।'[৩৫]

'সায়াহ্ন' গল্প-সংকলনের দুটি বড় গল্প 'সায়াহ্ন' ও 'জহরীর জহর' রচনার মধ্যে প্রবোধকুমার সান্যাল যৌবন বয়সের যুবক-যুবতীদের প্রেম-ভাবনার জটিলতাকে রোমান্টিক বাতাবরণে রেখে প্রেম সম্পর্কে নিজস্ব একটি যুক্তি ও বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠায় তৎপর। 'সায়াহ্ন' গল্পের মূল নায়ক এককালের ধনী, বিলাসী জমিদার সোমেশ্বর বৃদ্ধ বয়সে মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আড্ডার মেজাজে তার অতীত জীবনের চারটি প্রেম-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার গল্প করেছে তার সমবয়সী আর এক বন্ধুর কাছে। বন্ধুটি গল্পের উত্তমপুরুষ কথক। সেও সোমেশ্বরের বৃদ্ধ বয়সের নিঃসঙ্গতার মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সঙ্গী।

অত্যন্ত কুরূপা বলে বিয়ের পরেই স্বামী-পরিত্যক্তা হয় মৃণাল—সোমেশ্বরের প্রথম বলা গল্পের নায়িকা। সোমেশ্বরের নিজের কথায় :

'দরিদ্র গৃহস্থ কন্যা, নাম তার মৃণাল। প্রচুর ঐশ্বর্যে ভরা তার দেহ, কিন্তু কুরূপা মেয়ে। দুঃখের জীবন, বিবাহের সম্প্রদানের পর বাসর ঘর থেকে স্বামীটা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, আর ফেরেনি। কুশণ্ডিকার সিঁদুর ওঠেনি মাথায়, বিবাহিত মেয়ে কুমারীই রয়ে গেল।'[৩৬]

এই মৃণালের সঙ্গেই যুবক রূপবান জমিদার-তনয় সোমেশ্বরের একদিন ঘনিষ্ঠতা হয়। সোমেশ্বর ভালবাসে তাকে। দেখতে 'সে কুরূপা, কদাকার, কিন্তু তার সুস্থ সবল দেহের এমন আসমান্ত ঐশ্বর্য ছিল যে, আমার প্রবৃত্তিতে কিছুই আটকাতো না।'[৩৭] এই হল সোমেশ্বরের ভালবাসার আকর্ষণের একদিক। কিন্তু মৃণাল ছিল অন্য জাতের মেয়ে, বাস্তব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তার আকর্ষণ অন্য জাতের। সোমেশ্বরকে সে বলে :

'তোমাকে যারা কাছে চায় তারাও আমার প্রিয়, সত্যি বলছি তোমাকে, তোমার প্রশংসা যারা করে তারা আমার বড় আপন।

সস্নেহে তার গায়ে হাত দিতে গেলুম, সে সরে দাঁড়ালো। বললে, ছুঁয়ো না, তুমি হাত বাড়ালেই ভয় করে, ছুঁলে তুমি ছোট হয়ে যাবে, তুমি সাধারণ মানুষ হয়ে গেলেই আমার কান্না পায়।'৩৮

লেখক ভালোবাসার একটা তত্ত্বকে সোমেশ্বর-মৃণালের প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে সংযুক্ত করেছেন শিল্পের কৌশলে। মৃণাল কুরূপা হলেও ভালবাসার অহংকার নিয়ে বিদ্রোহী প্রেমে তার মনের প্রেমিককে লালন করত রোমান্টিক স্বপ্নে। সোমেশ্বর বলে :

'আমি তাকে চুম্বন করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলুম।

মৃণাল গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, অমন করে চেয়ো না সোমেশ্বর, নির্ভয়ে আমাকে কাছে বসতে দাও।—কাছে বসে সে বললে, মাঝে মাঝে তোমাকে দেখলে আমার ভয় করে। তুমি কখনো দস্যু, কখনো বন্ধু। দেহ নিয়ে টানাটানি মানে কি জানো, নিজেদের ধ্বংস করা। যারা সংযত তারাই বুদ্ধিমান।'৩৯

প্রেম সম্পর্কে মৃণাল চরিত্রে প্রবোধকুমার সান্যাল যে তত্ত্বের কথা বলেছেন, তা যেন রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতার শেষতম স্তবকটিরই যেন প্রতিধ্বনি,—'ভালোবাসো প্রেমে হও বলী,/চেয়ো না তাহারে/আকাঙ্ক্ষার ধন নয় আত্মা মানবের।'৪০

মৃণালের মধ্যে ছিল মানুষের আত্মার অনুসন্ধান-প্রয়াস। সে আত্মা নিশ্চয়ই মানব দেহ ছেড়ে ঐশ্বরিক আত্মাকে সন্ধানেই শেষ হয়ে যায় মৃণালের কাহিনীতে যেখানে বিবাহিত, পুত্রের পিতা সোমেশ্বর দীর্ঘদিন ছাড়াছাড়ির পর হঠাৎ দেখা পায় কমলেশ্বর তীর্থের পথে চলার সময় চম্পারণের এক রেলওয়ে স্টেশনের ধারে :

'বাউলের বেশে গান গেয়ে ভিক্ষা করে ফিরছে। জীর্ণ মলিন বেশ, বিগত যৌবনা, তার কুরূপ আরও কিছু কদাকার হয়ে উঠেছে,—ধনাঢ্য এবং সুপুরুষ 'রাজপুত্র' আমি সমুখে গিয়ে দাঁড়ালুম।......

বললুম, কি জন্যে তুমি এমন করে সর্বস্বান্ত করলে নিজেকে মৃণাল? আমার কম্পিত উদ্বেলিত কণ্ঠে তার মুখে হাসি ফুটল, তপোবনের ঋষিকন্যার মতো জ্যোতিষ্মান হাসি তার। সোহাগের সুরে আমার কাঁধে হাত রেখে বললে, সর্বস্বান্ত হয়ে সর্বস্বকে পেয়েছি সোমেশ্বর।

চমকে উঠলুম? বললুম, কে সে? তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না মৃণাল? না?

তবে ?

যাঁকে ভালোবাসি তিনি আছেন আমার মনে—বুকে হাত রেখে মৃণাল বললে, তাঁর পথ আমার মহাপ্রাণের মহাবৃন্দাবনে, আমি কোনোদিন কারুকেই ভালোবাসিনি সোমেশ্বর।

সে কি, বঞ্চনা করে এসেছ আমাকে এতকাল।

না, আমাদের মিলনের তুমিই ছিলে দূত।—'[৪১]

মৃণালের ভিতরকার ভালোবাসাকে জাগিয়েছিল সোমেশ্বর। সত্ত-বিবাহিত জীবনে ব্যর্থ, অপমানিত মৃণাল সেই নব-জাগ্রত ভালোবাসাকে লালন করেছে নিজের মধ্যে সমস্ত ব্যক্তিত্ব, অহংকার, অভিমান, মর্যাদা দিয়ে সম্পূর্ণ নিজের মত করেই। সোমেশ্বরকে সে ভালোবাসত। কিন্তু সোমেশ্বর বিয়ে করার পর, তার স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করার পরও মৃণাল নিজেকে একা করে নিঃসঙ্গ থেকে দেশত্যাগ করে, কারণ তার মনের ভালোবাসার যে একমাত্র আশ্রয় সোমেশ্বর, সেই পুরুষ যে তখন অন্যের অধিকারে। ভালোবাসায়, তা সম্পূর্ণ দেহবিবিক্ত হলেও, তার অধিকার-বিচ্ছিন্ন মৃণাল ঐশ্বরিক ভালবাসায় তার সেই দীর্ঘদিনের লালন-করা ভালোবাসাকে অর্পণ করে। প্রবোধকুমার সান্যাল ভালবাসার এক ঐশ্বরিক আত্মিক মহনীয় বৈদেহী রূপকেই মৃণালের মত যুবতী রমণীর জীবন-কথায় ধরতে সচেষ্ট।

কিন্তু দ্বিতীয় প্রেমকথাটি সোমেশ্বরের বাল্যস্মৃতিসূত্রে ধরা। আট বছরের সঙ্গী বালিকা বাসুর মায়ের যে গোপন কাহিনী সূত্রে তার সমাজ-বিগর্হিত সূক্ষ্ম প্রেমের আভাস দিয়েছেন লেখক, তা রহস্যময় হলেও বাসুর মায়ের প্রেমিকা চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনে প্রেমের আর এক দিক তুলে ধরে। বাসুর মা যার রক্ষিতা, তাকে দেখা না গেলেও সে-ই যে বাসুর মায়ের শেষতম সমস্ত রকম প্রতিবাদী, গর্বিত অথচ অসহায় হতোদ্যম রূপের মূলে, তা সহজেই বোঝা যায়। জমিদারী বিলাসের পরিবেশে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে একটি মাত্র পুরুষের আশ্রিত লজ্জার দুঃখের অসহায় জীবনের অংশীদার হয়ে বাসুর মায়ের যে দৃঢ়তা, তা মূলত সামন্ততন্ত্র ও সর্বহারাতন্ত্রের সংঘর্ষকেও সোচ্চার করে। লেখক সেদিকটি প্রচ্ছন্ন রাখতে ভোলেন নি। তৃতীয় প্রেম উপকথাটি সোমেশ্বরের বড় বৌমার বান্ধবী সান্ত্বনার, দরিদ্র রুগ্ন, দুর্বল, খিটখিটে, অত্যাচারী স্বামীর প্রতি প্রেম ও সেবার এক নব-হিন্দু-সতীত্বের কাহিনী। সান্ত্বনার দৈনন্দিন দরিদ্র জীবনে অসহায় স্বামী নিয়ে সর্বংসহা থেকে বেঁচে থাকার সংগ্রাম-চিত্রটি প্রেমের সতীত্বের দিককে যেমন স্পষ্ট করে, তেমনি আর এক অভিনব প্রেম ও প্রেমিকার আস্বাদ দেয়।

সোমেশ্বরের চতুর্থ প্রেমের গল্পটি চারুবালা নামে এমন এক বিবাহিতা যুবতীর যে

বিবাহের কয়েকমাস পরেই চব্বিশ বছরের 'ভাক-বুকো ছেলে' স্বামীকে আকস্মিকভাবে মৃত্যুর কারণে হারায়। কিন্তু সে শ্বশুরবাড়িতে এসে সেকথা বিশ্বাস করে নি। সে তার স্বামীর অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে বাইরে। গৈবিনাথের দুর্গম পার্বত্য পরিবেশে চারুবালা অবাঙালী মহারাজের আশ্রয় পায়। নিশ্চয়ই আরও অনেকের সঙ্গে তার হয় পরিচয়। কিন্তু চারুবালা এমন এক জ্বলন্ত অগ্নিগোলক যার কাছে কারোর ঘেঁষা সম্ভব নয়। চারুবালা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অন্ধকার সাঁ সাঁ শীতের রাতে তাঁবুর মধ্যে নিজের বিছানা পেতে চারুবালা শোবার সময় মহারাজকে সে বুঝতে পারে। সোমেশ্বরের সেখানকার অভিজ্ঞতা :

'তাঁবুর ভিতরে সেই স্তিমিত আলোয় চারুবালার চেহারা দেখে আমার গা কেঁপে উঠল। বললুম, ও একটু প্রশ্রয় পেয়ে অমনি করছে। আপনি না হয় একটু সরেই যান না ?

থামুন আপনি, ঠিক এমনি করেই শোবো আমি, ভয় কিসের? সারারাত ও দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নায় জেগে থাকবে, আর আমি নাক ডাকাবো।—বলে চারুবালা চেপে শুলো।'[৪২]

চারুবালার এই চেহারা তার অন্যপ্রেমের–তার এক অলৌকিক স্বামীপ্রেমের, যেখানে সে অন্য পুরুষের সমস্ত রকম সান্নিধ্য, আকর্ষণ, লোভলালসা বাসনা-কামনাকে পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখতে পারে অবলীলায়। এ এক অন্য বিবাহিত প্রেমিকা রমণী। স্বামীপ্রেমের এক অদ্ভুত উন্মত্ত স্বভাবে দীপ্ত করেছেন প্রবোধ কুমার সান্যাল চারুবালাকে। সোমেশ্বরকে বলা মৃত স্বামী সম্পর্কে চারুবালার যুক্তি :

'যদি সে মরবেই, আমার কোলে তার মরণ হল না কেন ? তখনই ছুটলুম তার সেই মৃত্যুর পিছনে, যমের হাত থেকে তাকে ফিরিয়ে আনব। মন্ত্র পড়ে বিয়ে হয়েছিল, সে মন্ত্র কি এত বড় মিথ্যে। তাকে আমি ফিরে পাবই, একদিন না একদিন তাকে ধরে ফেলবই।'[৪৩]

প্রবোধ কুমার সান্যাল বিবাহিত প্রেমের বিশ্বাস, হিন্দু নারীর প্রেমের সতীত্ব, বিশ্বাস—এসবকে মৃনাল, চারুবালা, সান্ত্বনা চরিত্রে কাজে লাগিয়েছেন।

'সায়াহ্ন' গল্পটির শেষতম প্রেমকথার সঙ্গে বৃদ্ধ সোমেশ্বর ও তার বৃদ্ধ বন্ধু—কেউই যুক্ত নয়। তাদের দেখা একটি আধুনিক প্রেম-সম্পর্ককেই লেখক এঁকেছেন এক ডাক্তার ও তার ছলনাময়ী স্ত্রী প্রভার সম্পর্ক-চিত্রে। একালের মেয়ে প্রভা প্রকাশ্যেই অন্যপুরুষের প্রতি আসক্ত হয়। স্বামীর অকুণ্ঠ ভালোবাসা, স্ত্রীর অন্য আত্মদান সত্ত্বেও স্বামী স্ত্রীর মন পায় না। সেই নিয়ে দিনরাত ঝগড়া, সংঘর্ষ। মেয়েদের ইচ্ছার স্বাধীনতা,

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন পরিবেশে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তারই সূত্রে পারিবারিক সম্পর্ক ও শান্তি শুধু নয়, মেয়েদের মধ্যেকার একমিষ্ট অথচ জটিল বিশুদ্ধ ভালোবাসার স্বরূপও বদলাচ্ছিল। সোমেশ্বরের প্রতিবেশী প্রভা ও ডাক্তার রমেশের প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে লেখক এমন বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। মৃণাল, চারুবালা, সান্ত্বনা, অন্তত বাচ্চুর মা-ও প্রেমের যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, প্রভারা সেখান থেকে দূরে সরে গেছে। যুদ্ধ-সমকালে প্রেমের কথা বলতে গিয়ে প্রবোধকুমার সান্যাল স্পষ্টত এক প্রজন্মের ব্যবধানকে (generation gap) বোঝাতে চেয়েছেন।

'সায়াহ্ন' গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'জহরীর জহর'। গল্পটিতে আছে অস্বাভাবিকতা, যুবক-যুবতীর অদম্য রোমান্টিক উচ্ছ্বাস, আবেগ ও বাধাবন্ধনহীন প্রেমের স্বরূপ। শিলির বিবাহ উপলক্ষে গহনা তৈরীর জন্ত যে রতিপতি রায় কোম্পানির তরুণ মালিক রমাপতি আসে শিলিদের বাড়ি, তার রমনীলোভন রূপ ও যৌবনে মুগ্ধ হয়ে শিলি উন্মাদ হয়। উন্মাদ হয় প্রচ্ছন্ন প্রেমাকাঙ্খায় তার যুবতী ছোটপিসিও। রমাপতি কৌশলে দুজনকেই বশ করে কথায় ও আচরণে। শিলির বিবাহ পাকা, তবু সে নিছক মোহেই চলে আসে বড়বাজারে এক ঘরে—যেখানে রমাপতি তাকে আনলেও শিলি দেখে সবিতা নামে আর এক বিবাহিতা সন্তানের মা-হয়ে-যাওয়া রমনীকে, যে রমাপতির মোহেই স্বামী ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে সেই ঘরে। তরুণ বয়সে প্রেমের এমনই বেগ—যা সব কিছু ভেঙে-চুরে দুর্বার দুর্মদ গতিতে এগিয়ে যেতে চায়। ন্যায়-নীতি সে মানে না। সুন্দর পুরুষ এমনি এক অস্তিত্ব তরুণীর কাছে, যার আকর্ষণ চুম্বকের মত অমোঘ। যে শিলির কয়েকদিন পরেই বিবাহ হবে, যে শিলি জানে সে কোনদিন রমাপতির আশ্রয়ে থাকবে না, রমাপতির নির্জন ঘরে রমাপতির দ্বারা পরি'যুক্ত হয়ে 'শিলি তাহার উৎসুক চুম্বন-তৃষ্ণা লইয়া বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।'[৪৪] রমাপতির প্রতি শেফালি অর্থাৎ শিলি, তার বিধবা ছোটপিসি, বিবাহিতা সসন্তান সবিতা—এদের আকর্ষণের চিত্র এঁকে লেখক যেমন ভ্রান্ত প্রেমিকচরিত্র এঁকেছেন, তেমনি উপহার দিয়েছেন তরুণী রমণীদের তীব্র, যুক্তিহীন, আবেগসর্বস্ব, রোমান্টিক প্রেমের উন্মত্ত অভীপ্সা। 'জহরীর জহর' গল্পে লেখক অস্বাভাবিকতা অনেক বেশী গ্রহণ করেছেন কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র ও কাব্যময় সংলাপ ব্যবহারে। প্রবোধকুমার সান্যালের এক প্রেম-সম্পর্কিত রোমান্টিক, রবীন্দ্র-প্রভাবিত ধ্যান-ধারণা দুই গল্পে স্পষ্ট, তবু মনস্তাত্বিক জটিলতা স্বষ্টিতে তিনি বেশ কিছুটা নিজস্বতা এনেছেন।

সমকালে প্রেমের গল্প লিখতে বসে অবশ্যই মনেবে যে প্রবোধকুমার সান্যালের মত কোন প্রেমতত্ত্বকে সামনে রেখে প্রেমের অরূপরী কোন নায়কনায়িকা

থাকেন' শি তাঁর 'এই শীমান্ত' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মাঝি' ও 'রাত্রি' নামের দুটি গল্পে। তাঁর প্রেমিক নায়ক-নায়িকারা বুর্জোয়া সমাজের দুটি নিম্নবিত্ত ও সর্বহারা শ্রেণীর মানুষ। নিম্নবিত্ত দরিদ্র মানুষের প্রেম, পদস্খলিতা পতিতার প্রেমের অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, অস্থিরতা থাকতে বসে লেখক তাদেরই জায়গায় নিজেকে বসিয়েছেন।

'মাঝি' গল্প সাদামাটা, কোন বড় বক্তব্য এ গল্পে নেই যদিও, তবু প্রেমের সূত্রে চিরন্তন ঈর্ষা, জ্বালা, অস্থিরতা, মৃত্যু তথা আত্মহননকেই নায়ক-মাঝি ভৈরবের চরিত্রে উপস্থিত করেছেন যথাযথ শিল্পের মর্যাদায়। গতানুগতিক রীতিতে গল্পের চমক শেষে যেখানে সমগ্র গল্পপাঠের পর পাঠক মনে করে তার বন্ধ্যা স্ত্রী সদুই মারা গেছে, অথচ লেখক মৃত্যু-খবর দেন ভৈরবের :

'পরদিন সকালে সকলেই সদুকে জীবিত দেখিয়াছিল। যেমন অন্যান্য দিন দেখিয়া থাকে, সুতরাং তাহারা কিছুই ভাবে নাই। আরও তিন চার দিন পরে, ক্রোশ দশেক দূরে, বিশালাক্ষীর চরে একটি মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বিগলিত মৃতদেহ। তাহার পেটের দিকটা শিয়ালে খাইয়া ফেলিয়াছিল।'[১৫]

ভৈরবের মৃত্যুর কারণ বন্ধ্যা স্ত্রী সদুর গ্রামের অন্য পুরুষ সাধুচরণের সঙ্গে গভীর রাতে সহবাস। সদুর যৌবন ভৈরবকে বর্ষার পদ্মার মত আকর্ষণ করে। তার থেকেও বড় কথা ভৈরব সদুকে অসম্ভব ভালোবাসে। তার সরল, নিষ্পাপ দুরন্ত ভালবাসায় কোন খাদ নেই, কিন্তু সদু তার একাকীত্বের অভিশাপ সরাতে যে সাধুচরণের মত লম্পটের কাছে নিজেকে গোপনে দিয়ে দেয়, এতে ভৈরবের প্রেম-মানসিকতায় যে চরম সংকট, তাতেই তার আত্মহননের মত মৃত্যুবরণ। ভদ্র সমাজের মানুষ নয়, নীচের তলার সহজ সরল মানুষের প্রেমাকাঙ্ক্ষা যখন আহত হয় তখন বুঝি যুক্তিহীন এমন সিদ্ধান্তই জীবনের পক্ষে সহজগ্রাহ্য হয়।

এমন সহজগ্রাহ্য হয়েছে 'রাত্রি' গল্পের বেশ্যা নায়িকা টগরের পক্ষে বেশ্যার ছেলে শশীর প্রেমকে স্বীকৃতি দিয়ে নিষিদ্ধ পল্লী থেকে গভীর ঘন বর্ষণমুখর রাতে বেরিয়ে পড়া। 'রাত্রি' গল্পটি লেখকের একটি অসাধারণ প্রেমের গল্প। এই প্রেমকে লেখক যেখানে রেখে চিত্রিত করেছেন, সেই পটভূমি ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার গড়ে-ওঠা অন্যতম অবহেলিত স্থান। টগরের অতীত সুস্থ জীবনের এমন পরিণতি অতিপরিচিত এবং স্বাভাবিক, কিন্তু এই বিকৃত জীবনের যে অভিশাপে সে দিনের পর দিন [illegible] নাগিনী [illegible] মধ্যে কাটায়, তার প্রতিচিত্রণে লেখক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। 'টগরের [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible]

ক্রমশ সে বেশ্যার ছেলে শশীর প্রেমকেই স্বীকৃতি জানিয়ে আবার সুস্থ জীবন-যাপনে নিজেকে সত্যরূপে ধরতে চেয়েছে। টগরের ঘন অন্ধকার জীবনে শশী একটা আশা-নিরাশায় কাঁপা ক্ষীণ আলো। কিন্তু সে আলোকে টগর সহজে বিশ্বাস করে না। শশী বেশ্যার ছেলে হলেও এই বিশেষ অঞ্চলের বাইরের জীবনে সে ঘোরে, লোকজনের সঙ্গে মেশে। সেখানেই গণেশের কাছে এমন এক মানুষের জীবন সম্পর্কে অভিনব কথা শোনে, যা তার টগরের প্রতি গভীর ভালবাসার ভিত্তিকে শক্ত পাথরের মত করে। সেই লোকটির কথা প্রসঙ্গেই শশী টগরকে বলে :

'……একটা কথার উত্তর দে ত।'

'কি ?'

'এই জীবন কি তোর ভাল লাগে ?'

টগরের দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া আসিল, মাথা নাড়িয়া ধীরে ধীরে সে বলিল, 'না, কিন্তু বাঁচতে হবে ত, অন্য আর কি উপায় আছে ?'

শশী মাথা নাড়িল, 'লোকটি সেই কথাই বললে যে এমন একটা দিন আসবে যখন তাদের এ জীবনের আর দরকার হবে না, মানুষ আর সমাজ একদিন ভেঙে পিষে নতুনভাবে তৈরী হবে।'……'

ঠিক কথাগুলি বুঝিতে পারে না, তবু তাহা কেমন যেন ভাল লাগে। ……জোর করিয়া হাসিয়া সে বলিল—'আচ্ছা এবার নীচে চল্।'

শশী হঠাৎ তাহার দিকে আসিয়া দ্রুতকণ্ঠে, উত্তেজিতভাবে বলিল, 'টগর'—

'কি ?'

'চল্ না কোথাও বেরিয়ে পড়ি, এই কুকুরের জীবন, এই গলির ভ্যাপসা দুর্গন্ধ আর অন্ধকার ছেড়ে চল্ না কোথাও চলে যাই। যাবি ?'[৪৬]

শশী বাঁচতে চায়, কুকুরের জীবন থেকে টগরও। শশীর প্রেম বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষদের মত নয়। সে রাতে টগরের ঘরে একের পর এক বৃদ্ধ, যুবা, মাঝবয়সী লোক এনে দেয়। তার জন্য তার এতটুকু রাগ ক্ষোভও প্রকাশ করে না। কিন্তু সে চায় বাঁচতে এবং টগরকে নিয়েই। সেই বাঁচার মধ্যে কোন গলদ নেই, নিখাদ সোনার মত তার দাম। সে টগরকে ভালোবাসে বলেই টগরকে এই জীবন থেকে মুক্ত করতে চায়, অন্যত্র সংসার গড়তে চায়। যারা সর্বহারা, শোষিত, অবহেলিত, ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিকার, তাদের সত্যকার বন্ধু ও আত্মীয় তো ওপরতলার মানুষ হতে পারে না। শ্রেণীসংঘর্ষে নিজের শ্রেণীতেই তাকে বাঁচার মন্ত্র গ্রহণ করতে হবে। তাই শশী জীবন পায় যখন টগর, একই সঙ্গে দুই

কাবুলিওয়ালার সান্নিধ্যে রাত কাটানোর পর অসুস্থ দুর্বল রাধার অন্তিম পরিণতি দেখে গভীর রাতে তাকে ডেকে বলে :

'চল্।'

'কোথায় ?'

'এই না আজ সন্ধ্যাবেলা বলেছিলি কোথায় নিয়ে যাবি আমায়, এই কুকুরের জীবন থেকে আমায় না তুই মুক্ত করতে চাস্ ?'

শশীর ঘুমভরা চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠে, টগরের দিকে চাহিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে কিনা তাহাই সে কেবল ভাবিতে লাগিল।

'নিয়ে চল আমায় শশী—ও শশী—তুই না আমায় ভালবাসিস ?' টগরের কণ্ঠে ক্ষুদ্র বালিকার মত কাতরতা, সে যেন বড় অসহায় হইয়া পড়িয়াছে।

মুহূর্তে শশীর চেহারা বদলাইয়া যায়, গরুর মত ড্যাবডেবে ও নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটিতে মধ্যাহ্নের সূর্য জ্বলিয়া উঠে।

টগরের ডান হাতটা চাপিয়া সে প্রশ্ন করিল, 'সত্যি বলছিস টগর—না মিথ্যে কথা ?'[৪৭]

শশীর কাছে টগর তার জীবন, টগরের পক্ষে শশীও তার সমগ্র সুস্থ জীবনের আস্বাদ। অথচ দুজনেই পতিতালয়ের বাসিন্দা। দুজনে দুজনের জীবনকে স্বচ্ছ আকাশের মত চেনে, তাই কোথাও তাদের মধ্যে গোপনতা নেই। তারা বোঝে জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি এই শ্রেণীর মানুষদেরই একসঙ্গে, পাশাপাশি থেকে, জীবনে জীবন মিলিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে হবে। টগরের জীবনের যে সংকট তা তার অতীত বিমলার জীবন ও বর্তমান টগর জীবনের দ্বন্দ্বে দীপ্ত। শশীর জীবনের যে যন্ত্রণা তা বেশ্যার ছেলের জীবন ও মুক্ত সুস্থ সমাজ-জীবন গ্রহণের দ্বন্দ্বজনিত যন্ত্রণা। লেখক অসামান্য কৌশলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের প্রেক্ষিতে লেখনী ধরে আগামী দিনের বিধ্বস্ত ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ওপর নতুন সমাজের মানুষদের প্রেম ও প্রত্যয়কে, সংগ্রাম ও রক্তকে 'রাত্রি' গল্পের প্রতিপাদ্যে রেখেছেন। তাই গল্পের সমাপ্তিতে আছে মহৎ শিল্পের ব্যঞ্জনা :

'রাত্রি গভীর। কেহ জাগিয়া নাই। বৃষ্টি পড়িতেছে অবিরাম আর আকাশটা যেন কালো কালি। তবু—ভয় নাই, বৃষ্টি থামিবে, লোকেরা জাগিবে, রাত্রিও শেষ হইবে, বেশ্যা টগর আর বেশ্যার ছেলে শশীর জীবন নতুন দিনের আলোতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। এ আলো পশ্চাতে ফেলিয়া আসা গলিতে কোনও দিন ছিল না, থাকিবেও না, সেখানে ত চিরান্ধকার রাত্রির চিরন্তন বিলাস।'[৪৮]

'রাত্রি' গল্পের ভৈরব ও মঞ্জুর যে প্রেম ও যৌবন-ধর্মের যন্ত্রণা ও সংকট, তা ক্ষয়িষ্ণু মনের যন্ত্রণা এবং তা অবরুদ্ধ, 'রাত্রি' গল্পের টগর ও শশীর যে সংকট, তা মুক্ত হয়ে সবল জীবন গ্রহণে দীপিত। দুই গল্পের যুগল প্রেমিক-প্রেমিকা অবশ্যই নিম্নবিত্ত এবং সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিনিধি।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে প্রেম, যৌনতা—এসব সম্পূর্ণ জীবনের খণ্ডাংশ মাত্র। কিন্তু তিনি এই খণ্ডাংশকে 'ভেজাল' গ্রন্থের একাধিক গল্পে কেন্দ্রীয় বিষয় করে সুস্থ-জীবন-বিচ্ছিন্ন বিকারকে, সামাজিক অবক্ষয়কে দেখিয়েছেন যথার্থ শিল্পীর মত। 'ভয়ংকর' গল্পে বিরাট ধনী ব্যবসায়ী ভূষণ দত্তের স্ত্রী আশা ভূষণের এক কর্মচারী প্রসাদকে দেহদানে তৃপ্ত হয়ে তার বিকৃত কামনা মিটিয়ে নেয়। ধনীর যেখানে অর্থের অভাব নেই, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী, সেখানে সেই অনেক বেশী অর্থই হয় বিলাস, হয় বিকৃত জীবন-বাসনা, ভোগ। আশা সংসার জীবনে থেকেও সামান্য কর্মচারীকে সেই ভোগে লাগায়। আর প্রসাদ—যে স্বভাব-ভীরু, সে-ও সেই ভোগের জীবনে ঢুকে বোঝে—এই ক্ষণিক সুখ কত মেকী। তার মধ্যে তার নতুন করে সাহস আসে যদিও, তবু সে যেন আরও দুর্বল, নিরুত্তাপ, নিস্তেজ হয়ে যায় আশার আলিঙ্গনের মধ্যে:

'প্রসাদের মনে হল, আশাকে, আশার অবৈধ কামনাকে, আশার দেহকে সে চিনে ফেলেছে। এ যেন একটা রবারের মেয়েমানুষ, পুরাতন ও ফাঁপা। আশার এই দেহের মোহ কাটাবার জন্য দেবতার কাছে মাথা কপাল কুটে সে আর্তনাদ করত! ঘুমের ঘোরে পাশ বালিশকে আঁকড়ে ধরার মতো তাকে আশা জড়িয়ে ধরেছে, তার মধ্যে স্বর্গ মর্ত ধ্বংসকারী উন্মত্ত কামনা কল্পনা করে সে হাল ছেড়ে দিতে চেয়েছিল! আশার হৃৎপিণ্ডের ধীর অচঞ্চল স্পন্দন অনুভব করতে করতে প্রসাদের বুকের ঢিপঢিপানি শান্ত হয়ে গেল, ছেলেদের ভিজে চ্যাপসা রবারের বলের মতো তার দুটি স্তনের চাপে আগুন ধরা রক্ত তার হয়ে গেল শীতল'।[৪৯]

আশার বিকৃত যৌনতা ও প্রসাদের যৌবন বয়সের স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণ—দুই মিলে যে বিকৃতি-চিত্র এঁকেছেন লেখক, তা যুদ্ধ সমকালের প্রেক্ষিতেই স্বাভাবিক হয়েছে। নীতিহীন যৌন লালসা ও সম্পর্ক, প্রেমহীন দেহভোগ, অবক্ষয়িত সমাজের মধ্যবিত্তদের সুযোগ-সন্ধানী বিলাস-ভাবনা—এ সবই 'ভেজাল' গ্রন্থের অন্যান্য গল্পে প্রকট। 'রোমান্স' গল্পে নটবরের স্ত্রী সুখময়ীর সমস্ত বাড়ির বাধা অত্যাচার উপেক্ষা করে বিপত্নীক সুবলের সঙ্গে গ্রামের সস্তা-সিমেন্ট-বাঁধানো ঘাটে দেহভোগ, 'মৃতজনে দেহ প্রাণ' গল্পে কারখানার স্বামী ভূপতিকে ছেড়ে স্ত্রী প্রমীলার পলায়নের

সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপন, 'মুখে ভাত' গল্পে শশধর ঘোষের বড় মেয়ে বেলারাণীর প্রথম ছেলের মুখে-ভাত-দেওয়া উপলক্ষে রান্নার জন্য গগণ ঠাকুরের আগমন এবং তার সঙ্গে বেলারাণীর অবৈধ সম্পর্ক রচনা—এ সব চিত্রে সেই যৌন জীবনের বিকৃতি ও অবক্ষয়ের কথা—যা মধ্যবিত্ত মানুষের মজ্জাগত ছিল যুদ্ধ সমকালে—তারই প্রতিবিম্বন।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেদেনী' গল্পে প্রেমের বিকৃতির থেকে বড় করে দেখিয়েছেন প্রেমের প্রচণ্ড শক্তিকে যা সংসার গড়ে না, একজন প্রেমিকের প্রতি নিবিষ্ট থাকতে দেয় না, যা প্রতিক্ষণে সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দিয়ে এগোতে চায়। যৌবনের ধর্ম যেমন, তেমনি যৌবনদীপ্ত প্রেমের গরিমাও তা-ই। 'বেদেনী'র নায়িকা রাধিকার যৌবনমদদৃপ্ত হৃদয়ের যে প্রচণ্ড প্রেমার্তি, তা তার প্রথম স্বামী শিবপদর আধারে তৃপ্ত হয়নি, শান্ত থাকেনি কেষ্টো বেদেকে দেখার পর দ্বিতীয় স্বামী তার থেকে আঠারো বছরের বড় শম্ভু বেদের সান্নিধ্যেও :

'শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কোমল মুখশ্রী, বড় বড় চোখ।……অতি ধীর প্রকৃতির লোক শিবপদ…ছিল রাধিকার ক্রীতদাসের মত।'[৫০]

এই শিবপদ বেদেনী রাধিকার একদিন অতি প্রিয়তম ছিল। কিন্তু শম্ভুবেদের বাঘ পোষ মানাবার আকর্ষণীয়, দীপ্ত পৌরুষে একদিন—'শিবপদর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া শম্ভুর তাঁবুতে আসিয়া উঠিয়াছিল। চোখের জলে শিবপদর বুক ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে রাধিকার মমতা হওয়া দূরে থাক, লজ্জা হওয়া দূরে থাক, ঘৃণায় বীতরাগে তাহার অন্তর রিরি করিয়া উঠিয়াছিল।……রাধিকা সে সব গ্রাহ্যই করে নাই।'[৫১]

আবার কঙ্কালীর মেলায় তাদের প্রবল প্রতিপক্ষ কেষ্টো বেদের সঙ্গে গভীর রাতে চলে-যাওয়ার সময় কেষ্টো যখন নিজের তাঁবুর ব্যবস্থার কথা বলে, তখন রাধিকার উক্তির মধ্যে আছে সেই অপরাজেয় আদিম প্রবল শক্তিমান ও গতিপ্রাণ যৌবনের, প্রেমপিপাসার কারণে শম্ভুর প্রতি নিরাসক্ত ঘৃণা :

'থাক পড়্যা। উ ওই শম্ভু লিবে। তুমি উয়ার রাধিকে লিবা, উয়াকে দাম দিবা না?' সে নিম্নস্বরে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উন্মত্ত বেদিয়া, তাহার উপর দুরন্ত যৌবন, কিষ্টো দ্বিধা করিল না, বলিল—চল্।

চলিতে গিয়া রাধিকা থামিল, বলিল—দাঁড়াও।

সে কেরোসিনের টিনটা শম্ভুর তাঁবুর উপর ঢালিয়া দিয়া মাঠের ঘাসের উপর ছড়া দিয়া চলিতে চলিতে বলিল—চল্।

টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়া সিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল—মরুক বুড়া পুড়্যা।'[৫২]

রাধিকা বেদেনী এমন এক প্রেমিকা যার কাছে বাধক্য, চিরকালের অবজ্ঞেয়, যার প্রেমের স্বরূপ বুর্জোয়া সমাজের শিক্ষিত সংসারী মানুষের নীতি-নিয়ম-আদর্শ-মনস্তত্ব—এসবের ধারই ধারে না। এর প্রেম আদিম ঈর্ষার জন্ম দেয়, নতুন যৌবন-প্রাণ বরণে আরও বলিষ্ঠ হয়। বেদেদের আদিম যাযাবর জীবন-স্বভাবের সংগে এমন প্রেম রক্ত-মাংস-মজ্জা-প্রাণ গভীর-নিবিড় সম্পৃক্ত। যাযাবরী প্রেমাস্বাদ দানে ও সেই সূত্রে বেদেদের জীবন-স্বভাব চিত্রণে তারাশংকর 'বেদেনী' গল্পে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেমে বস্তুত এমন তীব্র মদের গন্ধ নেই, নেই বিকার, যৌন তত্ত্বের জটিল প্রয়োগ। বিভূতিভূষণ যুবক-যুবতীর প্রেম নিয়ে অল্পই ভেবেছেন, ভেবেছেন বেশী সর্বজনের মানব প্রেম ও তন্নিহিত মহিমা নিয়েই। তবু 'উপলখণ্ড' গ্রন্থের অন্তর্গত 'নসুমামা ও আমি' এবং 'বিধুমাষ্টার' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'বাক্সবদল' অবশ্যই প্রেমের গল্প। 'বাক্সবদল' গল্পে হালকা চালে মধুর রোমান্স মিশিয়ে প্রেমের প্রস্তাবনাকে দেখিয়েছেন লেখক। একদা বালুরঘাটের তরুণী কলেজ ছাত্রী অমিয়ার বাক্স আসাম মেলে যাবার সময় প্রতুলের বাক্সের সংগে বদল হয়ে যায়। সম্পর্ক তৈরী হয় এই সূত্রেই। সম্পর্কটি রোমান্টিক প্রেমেরই। প্রতুল তখন ছিল গ্রামের এক সরল যুবক ডাক্তার। ভাটিয়ালি চা বাগানের কোয়ার্টারে সে তখন ডাক্তারীর চাকরি নিয়েই আসে। গল্পের শেষ প্রতুল ও অমিয়ার বিবাহ বন্ধনে। মূল হল বাক্স বদলের ঘটনা। যুবক যুবতীর প্রেমের উৎসমুখটিকে ব্যাপক করেই লেখক গল্পের শেষে প্রতুলের মুখ দিয়ে অমিয়াকে বলা কৃত্রিম সহাস্য আক্ষেপ কথাটি যোগ করেছেন—

'হায়, হায়, বাক্স বদল তো পদে আছে, সেই গেঁয়ো লোকটার সংগে একদিন মালা বদল হয়ে যাবে তা কি আর তখন জানতে।'[৫৩]

'নসুমামা ও আমি' একটি সার্থক প্রেমের গল্প বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পাঁচী ওরফে নির্মলা এ গল্পের নায়িকা। নসুমামার প্রতি যে আকর্ষণ তা বাল্য-প্রেমের। কিন্তু বাল্যপ্রেমেরও বুঝি ভয়ংকর এক শক্তি আছে, আছে দাহ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের নায়ক প্রতাপ-শৈবলিনী সেই দাহে দগ্ধ হয় নিরন্তর, শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ', 'দেবদাস' ইত্যাদি উপন্যাসেও তাই। বিভূতিভূষণ যেন তারই উত্তরসূরী এ গল্পে। কিন্তু এ গল্পের প্রেমভাবনা ও তার অন্তর্নিহিত রিক্ততাবোধ পূর্বসূরীদের পথ থেকে সরিয়ে এনে গল্পটিকে সম্পূর্ণ অন্য পথে নিয়ে গেছে। তেরো বছর বয়সে নির্মলা অর্থাৎ পাঁচীর আড়ংঘাটার কাছে এক গ্রামে বিয়ে হলেও কালক্রমে একটি মৃত সন্তানের জন্ম

দিয়ে তার স্বামী কিছুকাল পরে মারা যায়। পাঁচী একা, বিধবা বধূ, শ্বশুর বাড়ীর একনিষ্ঠা সেবিকা। এমন জীবনযাপনের মধ্যেই সে নস্তুকে দেখে মাঝে মাঝে, নস্তুর পরিবর্তন দেখে, কিন্তু নস্তুকে কেন যেন ভুলতে পারে না। ওরই শ্বশুরবাড়ির কাছে গ্রামে কলুবাড়ীতে বাসনমাজার কাজ করতে এলে পাঁচী দেখে নস্তুমামাকে—'নস্তুমামার মাথায় বড় বড় চুল, পরনে শাড়ী, আধ ঘোমটা দেওয়া, হাতে কাঁচের চুড়ি, মেয়েলি বেশ, অথচ মুখে ঈষৎ গোঁফ দাড়ি।'[৫৪] নস্তুমামা পাঁচীর কাছে এক গভীর গোপন বিস্ময়। নস্তুমামা কোন কাজকে হীন মনে করে না। শীতের প্রথমে কলেরা শুরু হলে সে দ্বিধাহীনভাবে গ্রামের মানুষের সেবা করে যায়। পাঁচী নস্তুমামার এসব সেবার মধ্যে তার বিপদ ভেবে বিদ্রোহ করে, ঠিক করে নস্তুমামার সংগে সেই সেবা করে তাকে তার সেবা-কাজে সাহায্য করবে। কিন্তু নিরস্ত হতে হয় নস্তুমামার গ্রাম থেকে আবার হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার ঘটনায়। নস্তুমামা পাঁচীর কাছে আবার বিস্ময়। এই স্বভাবই পাঁচীকে, বিধবা বধূ হলেও, চুম্বকের মত মনের গভীরতম সম্পর্কে ধরে রাখে। তার খুড়শাশুড়ী অভিজ্ঞ, বোঝে, পাঁচীকে বলে :

'ভালোই হোল, চলে গেল, সুবুদ্ধি হয়েচে। বামুনের মুখ অমন করে হাসাতে হয়? ছিঃ ছিঃ—

তারপর মুখ টিপে বল্লেন—বৌমার বাপের বাড়ির লোক। খুব কষ্ট হয়েছে বৌমা তোমার—না? যখুন তখন দেখা হোত তো। অন্য গাঁ থাকতে এ গাঁয়ে এসেছিল সেজন্যেই হয়তো, তবুও তো দেশের ঘরের লোক আছে একটা।

ছিলে-খোলা ধনুকের মত সটাং সোজা হয়ে বলে উঠি—নিশ্চয়ই। আমার কষ্ট তো হবারই কথা।'[৫৫]

পাঁচী অর্থাৎ নির্মলার প্রেম কিছু চায় না, প্রেমিককে তার যে কোন অবস্থায় মানিয়ে নিতে অভ্যস্ত, কিন্তু প্রেমিকের দুরবস্থা তাকে কাঁপায়। তার অবর্তমান তাকে যে নিঃস্বতা রিক্ততার মধ্যে রেখে দেয়, তা তার নিজস্ব জগত, তাকে কেউ বুঝতে পারে না, তা কারণহীন রোমান্টিকতার অনুগামী। গল্পের শেষে বিধবা নির্মলার প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে তার মানব-অস্তিত্বের বৈপরীত্য ভাবনা তাকে এক অদ্ভুত শূন্যের মধ্যে স্থিত করে দেয় :

'আবার ফাল্গুনে বনে বনে ফুল ফুটেছে, আবার কোকিলের ডাক পথে পথে। মুচুকুন্দ চাঁপার সুগন্ধে ঘাটের রানা ভুরভুর করে। আমি একদিকে যেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। জ্যাঠামশায়ের বৈঠকখানায় যোগবাশিষ্ঠ শুনতে যাই রোজ বিকেলে। সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে রিক্ত হলেই বোধ হয় সেখানে পৌঁছুতে হয়।'[৫৬]

বিভূতিভূষণের প্রেমিকার প্রেম উপলব্ধি আলোর মত—আর মধ্যে আবেগ ছাড়া আর কিছু নেই।

প্রেমের গল্পে বনফুল কোন জটিল রহস্য ও মনস্তত্ত্ব, জীবনের কোন গভীর সমস্যার দ্বারা তাড়িত হননি। মনে হয়, গল্পের অত্যধিক আঙ্গিক সচেতনাই তাঁর প্রেম ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়ভাবনায় গল্পে গভীরতা ও জটিলতা আনতে দেয়নি। অবশ্যই কোন কোন প্রেমের গল্পে জটিল জিজ্ঞাসা না থাকলেও অতি সংক্ষিপ্ত কাহিনী-আভাসে বিস্ময়চকিত চমকের মধ্যে প্রেম-সম্পর্কের কিছু তত্ত্বকে সংকেতে ব্যঞ্জনায় বলতে সচেষ্ট থেকেছেন বনফুল। যেমন 'বিন্দু বিসর্গ' গল্পসংকলনের অন্তর্গত 'তপন' গল্প, 'বাহুল্য' গ্রন্থের 'যূথিকা', 'সামান্য ঘটনা' গল্প আমাদের এই মন্তব্যের সপক্ষের উদাহরণ বলে মনে করি। 'তপন' গল্পের নায়ক তপন স্বদেশী করে দশ বছর জেল খাটে। কিন্তু জেলে বসে সে প্রেমিকা চপলা ও তার প্রতীক্ষার কথা ভেবেই একদিন পালিয়ে আসে চপলার কাছে। জেলে বসেই শুনেছিল সে বিবাহ করেছে বিখ্যাত এক রায়বাহাদুরকে, তবু তপন প্রেমের বীরত্বে চপলাকে এখনো চায়, তাকে নিয়ে পালিয়ে যেতেও দ্বিধা করবে না। এমন কি যখন চপলার কথায় বোঝে রায়বাহাদুর তাদের পলায়নের পথেও বাধা হতে পারে, তখন তাকে খুন করার জন্য রিভলবার উদ্যত করে। কিন্তু চপলার সংগে সামান্য সংলাপ বিনিময়ে তপন বুঝতে পারে নারী চরিত্রের গভীরতম রহস্য :

'তপন · পকেট হইতে রিভলভারটা টানিয়া দেখাইল। তোমার স্বামী ক্লাব থেকে কোন পথে ফিরবেন তা জানি। ······বল, রাজি আছ ?

চপলা নির্নিমেষে তপনের মুখের পানে চাহিয়াছিল।

মৃদুকণ্ঠে বলিল, আছি।

এতদিন যার সংগে এত ঘনিষ্ঠভাবে একত্র বাস করলে, তাকে এত সহজে ছেড়ে যাবে ? যেতে পারবে ?'[৫৭]

এই তপনের শেষ কথাতেই গল্পের প্রেম-বিষয়ের চমক, যা নারী চরিত্রের নিষ্ঠা ও রহস্যে দ্বিধা আনে প্রেমিক তপনের মনে। গল্পের শেষে যে চমক তা কাহিনীর—তপন রিভলবার দিয়ে রায়সাহেবকে মারতে গিয়েছিল। কেবে তপন ফেরেনি, বরং রায়সাহেবই ফিরে আসে। 'যূথিকা' গল্পে প্রেমের যে সমস্যা তা যৌবনের বান্ধবী যূথিকার প্রেমিক-হৃদয়ের লজ্জাজনিত। প্রেমের লজ্জায় নায়ককে নিজের বাড়িতে অন্ধকার ঘরে ঘনিষ্ঠভাবে একা পেয়েও নিজেকে অকপটভাবে প্রকাশ করতে পারে নি, বরং লজ্জা নিয়েই নায়কের বাড়ি বান্ধবীর কাছে চলে এসেছে, নায়ককে

বুঝতে না দিয়েই। গল্পের চমক নায়ক যখন বাড়ি ফিরে দেখে যূথিকা সেখানেই এবং তার অনামিকার আংটি সে স্পষ্ট করে নায়ককে দেখাচ্ছে—সেখানে। 'সামান্য ঘটনা' গল্পে বনফুল প্রেমের বিরহ ও দীর্ঘশ্বাসকে নায়ক-নায়িকার ক্ষণিক দেখা হওয়ার মত সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুটা গভীরতা দিয়েছেন। প্রেম এখানে স্মৃতিসূত্রে ব্যক্ত। নরেন তার জীবনের প্রথম প্রেম কমলাকে ট্রেনের কামরায় বিধবার বেশে বসে থাকতে দেখে। নরেন এখন সুমিত্রার স্বামী। স্ত্রী তার পাশে। দুজনেই দুজনকে দেখে, চিনতেও পারে। কিন্তু কমলার কাছে শ্বশুর, নরেনের কাছে সুমিত্রা থাকায় প্রেম-বিরহের স্মৃতিটুকুই সত্য হয়, নতুন করে পরিচিত হওয়ার সুযোগ আর থাকে না। প্রেমিক-প্রেমিকার অসীম অনন্ত দীর্ঘশ্বাসই 'সামান্য ঘটনা' গল্পে সত্য হয়ে বাজে।

'কালকূট' গল্পটিতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেম, যৌনতা ও নারীর তীব্র দেহ-সচেতনা নিয়ে একটি সার্থক মনোবিকলনের গল্প লিখেছেন, যার কেন্দ্রস্থ বক্তব্য নীতি-সর্বস্ব আদর্শ-লালিত প্রেমচেতনা ও যৌন-বিকারযুক্ত দেহচেতনা—দুয়ের দ্বন্দ্ব। লেখক একটি জিজ্ঞাসা রেখেছেন 'কালকূট' গল্পের নায়িকা অধ্যাপক হীরেনের পত্নী কমলার মানস-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে :

'নারীদেহ যে পবিত্র, তাহার শুচিতা নষ্ট করিবার অধিকার যে তাহার নিজেরও নাই, এ ধারণা নারীর মনে কত বয়সে উদয় হয়? শৈশবে শুচিতা অশুচিতা কোনও জ্ঞানই থাকে না, কৈশোরে কিছু কিছু দেখা দেয়, পরিণত যৌবনে ইহা পরিপূর্ণ-রূপে বিকাশ পায়। তাই বুঝি যৌবনে নারী নিজ দেহকে অন্যের দৃষ্টি হইতেও রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা লজ্জায় সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে।'[৫৮]

কমলার বিবাহিত দিদি নির্মলাকে দুপুরের নির্জনতায় তেরো-চোদ্দ বছরের কমলার বয়ঃসন্ধি চেতনার খেলার সঙ্গী কুড়ি-একুশ বছরের প্রতিবেশী প্রভাস যখন গায়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করে, তখন তার দেহের শুচিতা নিয়ে যে জটিল ভাবনা, তা কিশোরী কমলার বয়ঃসন্ধি চেতনায় এমনভাবে গেঁথে যায় যে কমলা বিবাহিত জীবনেও তা ভুলতে পারেনি। তা তার গভীরতম এক যৌন 'অব্‌সেসান্‌'। কমলা প্রভাসের সঙ্গে কিশোরকালের সমস্ত গোপন খেলা প্রভাসের প্ররোচনায় করে যায় :

'এমন করিয়া শিশু যেমন অজ্ঞানে খেলাচ্ছলে মহামূল্য দলিল ছিঁড়িয়া ফেলে, কমলা তেমনই করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ সুখশান্তি নষ্ট করিয়া ফেলিল। কিন্তু অমূল্য বস্তু খোয়া গেলেও তৎক্ষণাৎ ক্ষতির জ্ঞান জন্মে না। কমলারও সে বোধ জন্মিতে দেরি হইল।'[৫৯]

দিদির সঙ্গে প্রভাসের ঘটনায় দিদির কথাতেই সে বোধ জন্মায়। বিয়ের পর স্বামী

হীরেন ছেলে-কোলে কমলাকে যখন প্রভাসের আগমনের কথা শোনায়, তখন কমলার যে প্রভাসকে ঘরে ঢুকতে দেওয়ার বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিবাদী বিদ্রোহিণী মূর্তি তা তার একদিকে যৌন অবদমন ও অন্য দিকে দেহশুচিতার কঠিন ভাবনা—দুয়ের প্রতিক্রিয়ারই জীবন্ত রূপ। কমলা অন্তের প্রাক-বিবাহপর্বের প্রেমের আহ্বান জানাতে পারত না, ভয় পেত। কমলা চরিত্রে যৌন-ভাবনা ও নারীর দেহশুচিতা সম্পর্কিত চিন্তার জটিল মনস্তত্ত্ব এনে প্রেম ও যৌনতায় দেহসম্পর্ক বিষয়ে এক নতুন কথা বলতে সচেষ্ট লেখক।

‘খাতার শেষ পাতা’ গ্রন্থের ‘দাম্পত্য আলাপ’ গল্পে বুদ্ধদেব বসু মূলত স্বামী-স্ত্রীর সংলাপ বিনিময়ের মধ্যে একদিকে যেমন লঘু প্রেমালাপের চিত্র এঁকেছেন, তেমনি আবার সূক্ষ্ম কাহিনীদেহে একটি ত্রিকোণ প্রেমাভাস ও তজ্জনিত প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার রেশটুকুকে রাখতে ভোলেননি। গল্পের বিবাহিত নায়ক সুমন কাগজে বন্ধু সুকুমারের স্ত্রী সরমার অকালমৃত্যুর খবর ও ছবি দেখে অতীতে ডুব দেয়। স্ত্রী সেই সূত্রে সুমনের মন থেকে যে হৃদয়-সংবাদ বের করে, তাতে স্ত্রীর ঈর্ষা করার মত কিছু থাকে না, কারণ সুমন সুরমার সঙ্গে সুকুমারের বিয়েটুকুই ঘটিয়েছিল, তার বেশী সুরমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না সাধারণ ভালো লাগা ও সংকোচ ভয়টুকু ছাড়া। স্ত্রী কিন্তু সূক্ষ্ম নারী মনস্তত্ত্ব বোঝার শক্তি দিয়েই বোঝে সুরমার একটা প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ ছিল সুমনের প্রতি। সুমনের বোকামি, অর্থাৎ স্ত্রী চরিত্র বোঝার পক্ষে চরম অজ্ঞতাই তাকে সুরমার জীবনের সঙ্গে জড়ানোর একমাত্র বাধা ছিল :

‘—কিছু মনে কোরো না, কিন্তু সত্যি তুমি বড্ড বোকা ছিলে।

—এখনো তা-ই আছি। শুধু একটা কাজে কিছু বুদ্ধির পরিচয় দিতে পেরেছিলুম।

—কি সেটা ?

—তোমাকে বিয়ে করা।’[৩০]

এমন শেষতম সংলাপগুলিতে গল্পের প্রচ্ছন্ন প্রেম-বক্তব্যের পূর্ণ নিরূপণ। স্ত্রীর কথায় সুরমার প্রণয়কে না বোঝা নিশ্চয়ই বোকামি, কিন্তু সুরমা অকালে মারা গেল, স্ত্রী জীবিত—এই অর্থে সুকুমারের মত সুমনের তো আর স্ত্রীর অকাল-মৃত্যুজনিত চরম আশ্রয়হীনতার মুখোমুখি হতে হল না—এটাই স্বামী সুমনের প্রধান লাভ। স্ত্রীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার এমন প্রচ্ছন্ন বাসনায় বুদ্ধদেব বসু প্রেমভাবনার গৌরব আরোপ করেছেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘অসমতল’ গল্পগ্রন্থের ‘ভোবাবাসি’ গল্পে নায়ক গৌরাঙ্গ প্রেমিকা বাসুর প্রেম পাওয়ার পর যে অমানশক্তি অর্জন করে, তা তার জীবনকে মূল

করে তোলার প্রেরণা দেয় বটে, তবে জীবনে বড় হওয়ার জন্য সে এমনভাবে আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়ে চলে, যাতে সে বড় হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেও তার প্রতিষ্ঠা তাকে আর অন্তরের কাছে হাসির পাত্র না করে বরং অন্তরের তার কাছেই টেনে নিয়ে আসে। এতেই গৌরাঙ্গের আত্মতৃপ্তি। গৌরাঙ্গ এমন এক চরিত্র যে সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পের শিল্পী অবিনাশের সৌন্দর্যের অন্বেষণ যখন সার্থক হয় কলকাতার এক অখ্যাত গলির মেয়ে এক কেরানীর কন্যা রেবার মধ্যে, তখনি তার প্রেম ও সৌন্দর্য-বাসনা নানাদিক থেকে সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়। রেবার অপরিণত মন প্রথম স্বামী অবিনাশের শিল্পী-সত্তার গভীরতাকে বুঝতে পারে না। অবিনাশ হয় ক্ষুব্ধ। যখন রেবা স্বামীর শিল্পীসত্তা-সহ স্বামীকে সঠিক বোঝে, তখন অবিনাশের মনে হয় রেবা তাকে ব্যঙ্গ করছে। রেবা-অবিনাশের ভুল বোঝার মধ্যেই রেবা বাইরের রূপের কদর্যতা থেকে বরং সৃষ্টির সৌন্দর্য ধ্যানে মোহবদ্ধ থেকে যায়। তন্ময় ধ্যানমগ্না রেবার এই রূপ-সৌন্দর্যে অবিনাশ অভিভূত। নতুন করে তার শিল্পবোধের জাগরণ যেমন ঘটে, স্ত্রীর প্রতি প্রেমের দুর্নিবার টানও দেখা দেয়। 'হলদে বাড়ি' গ্রন্থের 'মহাশ্বেতা' গল্পেও লেখক প্রেমসম্পর্কের তার এক জটিল চিত্র এনেছেন। বিধবা অমিতাকে চিন্ময়মোহন বিয়ে করে তার উদার মনের পরিচয় দিলেও তার সংস্কারবদ্ধ মন আহত হয় উগ্র প্রসাধনে সজ্জিতা অমিতা যখন রাতে তার শয়নগৃহে আসে। তার সংস্কার চায় বিধবা অমিতার মধ্যে প্রেমিকা মহাশ্বেতাকে। একদিকে চিন্ময়মোহন, অন্যদিকে অমিতা—দুজনের ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দুটিতে আসার পথে মনের জটিল কোণগুলিতে যে বাধা, যে শক্ত রজ্জুর বন্ধন—তাকে সরাতে না পারার জন্যই প্রেম জটিল, দুজনে গভীর শূন্যতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যায় কখন। 'রোগ' গল্পের ডাক্তার বিভূতি রুগ্ন স্ত্রী নীলিমার সেবা করে তার নবজন্ম দিলেও, তার মধ্যেই যেন সে নীলিমাকে আকাঙ্ক্ষিত রূপে পায়। আর যখন নীলিমা সতেজ, সবল, প্রাণ-মনের শক্তিতে সুস্থ, ভরপুর, তখন নীলিমা অরুণবাবুর সঙ্গে হাসিঠাট্টায় যুক্ত হলে বিভূতি নীলিমাকে যেন হারিয়ে ফেলে। নীলিমাও তা বোঝে। তাই তারও প্রচণ্ড অভিমানে স্বামীর কাছ থেকে পলায়ন ঘটে। প্রেম-মনস্তত্ত্বের এক জটিল রূপ আছে স্বামী বিভূতির চরিত্রে। প্রেম এক ধরণের রোগ, বিভূতির মধ্যে সেই রোগ সুস্থ হবার নয়, তা আরও দুরারোগ্য করে দেয়। তাই নীলিমার সঙ্গে তার নয়, যৌবনের বিদ্রোহই সত্য হয়ে ওঠে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'মহানগর' গল্প সংকলনের 'মুহূর্ত' ও 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী' গল্প দুটিতে প্রেম-মনস্তত্ত্বের অন্য এক জটিল সমস্যা উপস্থাপিত করেছেন। 'মুহূর্ত' গল্পের

বিপত্নীক শশাংক ও দ্বিতীয়া স্ত্রী মালতীর সম্পর্কের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম জটিল বিকর্ষণে স্তব্ধ হয়ে যায়। গল্পের শেষে ভূমিকম্পের কয়েক মুহূর্তের পরিবেশে যে কাছাকাছি হওয়া তা যেন চকিত বিদ্যুৎ আলোর মত। দরিদ্র শ্বশুরকে কন্যাদায়মুক্ত করতেই শশাংক মালতীর মত মেয়েকে বিয়ে করেছিল, কিন্তু আত্মস্থ অবিচলিত মালতীর অহংমুখ চেতনা কেবল দূরেই সরিয়ে রাখে শশাংককে। শশাংক ভিতরের প্রেম ও প্রেমহীনতার চেতনায়, জ্বালায় শূন্য হয়ে পড়ে মালতীর কাছে। মালতীর শীতল দৃষ্টি, সাংসারিক যাবতীয় ব্যবহার শশাংককে যেন অপমান করে। ভূমিকম্পের রাতের ক্ষণিক মিলনের পরেও মালতী ভাবলেশহীন। একদিকে শশাংকের প্রেম, আর একদিকে মালতীর প্রেমহীন কর্তব্যনিষ্ঠা—গল্পে প্রেমের অস্তিত্বকে অন্য আলোয় দেখায়। 'অনেক কাপুরুষের কাহিনী' গল্পের বিবাহিত, উত্তমপুরুষ নায়কের পূর্ব পরিচিতা করুণার সঙ্গে নায়কের যে প্রেম-সম্পর্ক তা দুই বিপরীত ভাবের সংঘাতে জটিল রূপ পায়। স্বামী-স্ত্রীর সংসারে পূর্বপ্রেমিক এলে প্রেমিকা করুণার যে চিত্তচাঞ্চল্য তা ক্রমশ বিদ্রোহে রূপ নেয়। তার বধূসত্তা ও প্রেমিকা সত্তার দ্বন্দ্বে সে প্রেমিকা সত্তাকে বলিষ্ঠ বিদ্রোহে বড় করে নায়কের চলে যাওয়ার মুহূর্তে স্টেশনে এসে সহজেই বলে :

'তোমার অনেক অসুবিধা, অনেক লাঞ্ছনা সইতে হবে জানি, কিন্তু আমিও ত তারই জন্যে প্রস্তুত হয়ে সমস্ত লজ্জা কলঙ্ক নিন্দা মাথায় নিয়ে এসেছি।'৬১

এই হৃদয় উন্মোচনের সময় নায়ক অহংমুখ হয়ে পড়ে। ভালবাসা তাকে সামনে টানে, কিন্তু যুক্তি তাকে পিছনে ধরে রাখে। করুণার প্রেমের আবেগের সামনে নায়কের যুক্তি আঘাতের মত শোনায় :

'কিন্তু সব কথা তুমি বোধ হয় ভাল করে ভেবে দেখনি করুণা। যে ঝড় এবার উঠবে তা কি তুমি পারবে সইতে? তার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ক্লান্ত হয়ে হয়ত আমরা পরস্পরকেই একদিন ঘৃণা করতে শুরু করব।'৬২

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমচিন্তা দুই মেরুগামী, কিন্তু বিবাহ-বন্ধন অসহায়তায় ছায়াচ্ছন্ন।

সুবোধ ঘোষ তাঁর 'ফসিল' গল্প সংকলনের 'সুন্দরম' গল্পে প্রেম নয়, এক যুবকের পূজার নামে যৌন-বিকৃতি ও তার বীভৎস পরিণামের ইঙ্গিত দিয়েছেন। নায়ক সুকুমার সুন্দরকে ভালবাসতে চায় বলেই ব্রহ্মচর্য ছেড়ে সে বিয়ের জন্য বাড়ির কথায় একাধিক পাত্রী দেখে, পছন্দ হয় না। গোপনে পছন্দ হয় রাস্তার ভিখিরিদের যুবতী সুন্দরী তুলসীকে। তাকে নিশীথরাতের গোপন ভোগের সামগ্রী করে একদিন অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সুযোগ করে দেয়। কিন্তু সামাজিক আভিজাত্যের, 'কৌলীন্য', ডাক্তারের

সন্মানের ক্ষতি করতে চায় না বলেই তুলসীকে বাবারই ডিসপেন্সারির বিষাক্ত ওষুধ খাইয়ে সে মেরে ফেলে। বাবা কৈলাস ডাক্তার পোষ্টমর্টেম করতে বসে অবাক হয়ে যায় তুলসীর অবৈধ সন্তান ও মৃত্যুর বীভৎসতা দেখে। শুধুমাত্র জৈবপ্রেমের কাছে সৌখীন মানুষের সুন্দরের পিপাসা বস্তুত বিকৃতিতেই শেষ হয়ে যায়। 'গ্রাম যমুনা' গল্পসংকলনের 'বারবধূ' গল্পে সুবোধ ঘোষ এক বেশ্যার বড়, সুস্থ জীবন-গ্রহণের তীব্র আর্তির কথা বলেছেন। সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি কলকাতার প্রসাদ রায় তারকেশ্বরের পক্ষীবিবিকে লতা নাম দিয়ে, টাকা দিয়ে বায়না করে বাইরে বেড়াতে যায় স্ত্রী বানিয়ে। বাইরের লোকের কাছে সে স্ত্রী, ভিতরে সে মূলত বাঈজী। এই অভিনয়ের মধ্যে থেকেই জন্ম নেয় লতার মনে সংসারে ফিরে আসার গোপনতম বাসনা, আর্তি। চেঞ্জারদের প্রশংসা, শিক্ষয়িত্রী বিধবা আভাকে প্রসাদের নতুন করে ভালোবাসার সূত্রে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা ইত্যাদির মধ্যে থেকে লতা আর পুরনো পক্ষীবিবিতে ফিরে যেতে চায় না। প্রসাদ লতাকে টাকা দিয়ে বিদায় করতে চাইলে একদিকে এই গোপন সংসার-বাসনা তথা সুস্থ জীবন-বাসনা, অন্যদিকে প্রসাদের প্রতি তীব্রতম ঘৃণা তাকে অন্য নারীতে রূপান্তরিত করে :

'উচুঁদরের প্রেমে রঙীন ঐ ভদ্র রক্তবীজের পাপযুক্ত পৌরুষের ওপর শেষবারের মত পক্ষীবিবির ভাষায় থুতু ছিটিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। ভদ্রয়ানার শিকলে বাঁধা জমিদার প্রসাদ রায় শুধু অপমানের যন্ত্রণায় ছটফট করবে, সহ্য করবে আর নীরবে তাকিয়ে থাকবে। এইটুকু প্রতিশোধের তৃপ্তি নিয়ে চলে যাবে লতা।' [৬৩]

'বারবধূ' গল্পের পক্ষীবিবি তথা লতার যে আত্মসমীক্ষা তা তার সংসার-প্রেম থেকে জীবনপ্রেমে উন্নীত হওয়ারই দর্পণ।

তিন

'মোহানা' উপন্যাসে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নায়ক খগেনবাবু ও নায়িকা রমলার প্রেম-সম্পর্কের জটিলতার মধ্যে উভয়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণের সূত্রে উভয়েরই মানসিক বিষাদ ও বিচ্ছিন্নতাকে নতুন ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছেন। লেখকের প্রেমের কথা ও কাহিনী বলার পদ্ধতি এখানে অন্যান্য প্রচলিত রীতির প্রেমের উপন্যাস থেকে পৃথক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে লেখা ধূর্জটিপ্রসাদের প্রথম উপন্যাস 'অন্তঃশীলা' ও দ্বিতীয় উপন্যাস 'আবর্ত'। এদেরই কাহিনীর শেষরূপ 'মোহানা'। 'মোহানা' লেখকের পরিকল্পিত ট্রিলজির তৃতীয় এবং শেষ খণ্ড।

'মোহানা' লিখতে বসে 'নিবেদন' অংশে লেখকের বক্তব্য,— 'প্রধান দুটি চরিত্র আমূল পরিবর্তত হয়নি। পরিণতির অর্থ যে উন্নতি নয় এটুকু অন্তত জানতাম

পরিস্থিতির মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত থাকে তাকে সুযোগ দেওয়া যেমন নেতার কাজ তেমনই লেখকেরও। বাকীটা সচেতনাসাপেক্ষ।' ৬৪ 'মোহানায়' নায়ক খগেনবাবু ও নায়িকা রমলার পরিণতি চিত্র আঁকতে বসে লেখক উপন্যাসটির বিষয়ের ভিন্নতা সম্পর্কে অতি-সচেতন। তাই তিনি জানিয়েছেন,—'বিষয় যদি ভিন্ন হয়, বদলায় তখন তাকে সাজাবার জন্য রচনা পদ্ধতির রীতিরও পরিবর্তন চাই।' ৬৫ এক অভিনব রীতিতে নায়ক-নায়িকার প্রেমচিত্র এঁকেছেন লেখক। সে প্রেম জটিলতম।

খগেনবাবু যে অত্যন্ত আত্মসচেতন এবং আত্মসমালোচক চরিত্র তার পরিচয় 'অন্তঃশীল' ও 'আবর্তে' আছে। প্রেম ও অধিকার চেতনার তীব্র বৈষম্যে খগেনবাবুর স্ত্রী সাবিত্রীর আত্মহনন, স্ত্রীর বান্ধবী রমলার সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রণয় সম্পর্ক, সেই সূত্রে টানা-পোড়েনেই অন্তঃশীলার কাহিনী শেষ হয়ে অন্য আধার নিয়েছে 'আবর্তে'। 'আবর্তে' খগেনবাবু-রমলার সম্পর্কের মধ্যে আসে মাসিমা, বিজন ও ছোটভাই-এর সম্বন্ধ পাতান সুজন এবং সেই সুজনই একসময় গভীর হৃদয়-রহস্যে হয়ে ওঠে রমলার আর এক প্রেমিক—যার এমন পরিণতির দায়িত্ব রমলাও অস্বীকার করতে পারে না। 'আবর্ত' উপন্যাস শেষ হয়েছে মাসীমার মৃত্যু দিয়ে।

'মোহানা' উপন্যাসে খগেনবাবু ও রমলাকে লেখক নিয়ে এসেছেন বাংলার বাইরে, কানপুরে। 'মোহানা' উপন্যাসে প্রেমের জটিল রূপ যেমন পরিণতিমুখীন তেমনি কাহিনীর স্রোতে খগেনবাবুর মানসিকতা প্রেম থেকে সরে গিয়ে বৃহত্তর রাজনীতির আদর্শমুখী হয়েছে। খগেনবাবুর মানসিকতাই রমলাকে ক্রমশ নিঃসঙ্গ করে নিক্ষেপ করেছে একাধিক পুরুষ-সঙ্গের দিকে। 'আবর্ত' উপন্যাসে খগেনবাবুর সঙ্গে রমলার প্রেমে ও কামনার মিলনে বাধা ছিল মাসীমা, এখানে সে বাধা নেই যদিও, তবু খগেনবাবুর সঙ্গে যখন তার সান্নিধ্যের দূরত্ব বেড়ে চলে, তখন রমলা নিজেকে মাসীমার সঙ্গে তুলনা করে ভাবে :

'যতদিন মাসীমার দাসত্ব ছিল, ততদিন তবু আশা ছিল, মেয়েতে মেয়েতে যুদ্ধ সম্ভব। মাসীমা কতটা দিয়েছেন—স্নেহ, মমতা, আশীর্বাদ, টাকা, আদর ? তার বেশী সে দিতে পারে, দিয়েছে সঙ্গ. রূপ, যৌবন। বেশ, রূপ না হয় নেই, যৌবন না হয় গেছে, তবু যা আছে তাতে ওর না হয় লোভ নেই, অন্যের সুজনের হয়ত লোভ আছে। কিন্তু, স্ত্রী-পুরুষের যুদ্ধ অন্যায়।' ৬৬

এই সঙ্গে রমলা, শফিকের দলে খগেনবাবুর ঘনিষ্ঠ হওয়াকেও ক্রমশ ঈর্ষার চোখে দেখতে থাকে। রমলার প্রতি ক্রমশ অনাসক্তি ও উদাসীনতা তীব্র হয়ে ওঠে খগেনবাবুর মনে। তার কারণ: তিনি তখন দেশীয় রাজনীতি ও তার মানব ব্যাখ্যার সূত্রে শফিক-

বিজনদের আদর্শের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছেন। এর ফলে রমলা বিজনের সাহায্যে ক্রমশ অধ্যাপকের সঙ্গে হৃদয়-সম্পর্ক গড়ে তুলে নিজের নিঃসঙ্গতাকে সরাতে উৎসুক। উপন্যাসের শেষে পার্টি থেকে ফিরে আসার পর রমলার করুণ উজ্জ্বল রূপ খগেনবাবুর দৃষ্টিতেই স্পষ্ট হতে দেখা যায়:

'আর্শিতে নিজেকে দেখছে, ভাবছে, বেশ করেছে, বেশ দেখাচ্ছে, সকলে ত তাই বলে, ভাবছে, কেন করবে না, কেন সেই বা একলা থাকবে, তার দায় পড়েছে, ঠোঁট ওল্টাল নিশ্চয় রমলা, অল্পবয়সী মেয়েদের মতন। কারই বা দায়? কারুর নয়, কিসের দায়? কিছুরই নয়।'[৬৭]

রমলা সম্পর্কে এমন ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে খগেনবাবু সুজনের সঙ্গে অধ্যাপকের তুলনা করে ভাবেন:

'এটা কে? একটা জঘন্য কীট এই অধ্যাপকটা, মুখে কপচায় কাকাতুয়ার মতন, বেশ হয়েছে এই কাকাতুয়া আর লালমনিটার মিলন।'[৬৮]

তীব্র ব্যঙ্গে খগেনবাবুও যেন নিজেকে রমলা ও তার নতুন প্রেমিকদের থেকে নিঃসঙ্গ করেন, স্থির করেন রমলাকে ত্যাগ করে তাঁর নতুন আদর্শের মধ্যে যাত্রা করার বিষয়।

'মোহানা' উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার পরিণতি-চিত্র সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন,—'খগেনবাবুর শেষ পরিণতি কাজের মানুষে, রমলার, রঙ্গিন পাখামেলা সচ্ছন্দবিহার প্রজাপতিতে। কিন্তু এই পরিণতি তাহাদের পূর্বজীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া মনে হয় না।'[৬৯] তিনটি খণ্ডের একত্র বিচার করেই সমালোচক একরকম মন্তব্য করেছেন। আমাদের আলোচ্য 'মোহানা' উপন্যাসটুকু অবলম্বন করে একমাত্র এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে এমন মন্তব্য মেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। তবে 'মোহানা' উপন্যাসে লেখক যে প্রেমের জটিলতাকে কাহিনীসূত্রে গ্রথিত করে নায়ক ও নায়িকার বিচ্ছিন্নতাকে দেখিয়েছেন তা খগেনবাবুর নতুন শ্রমিক-মালিক বিরোধের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পর অযৌক্তিক মনে হয় না কেবল 'মোহানা'র ক্ষেত্রেই।

'শতাব্দী' নামের বিরাট উপন্যাসটি প্রধানত প্রেমের উপন্যাস নয়, কিন্তু রমেশচন্দ্র সেন যুদ্ধ-সমকালে শিল্পে বিশেষ সময়ের দায়িত্ব পালন করতে বসে যেমন যুদ্ধ-পূর্বকাল থেকে প্রবাহিত বা সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ঘটনাকে গ্রহণ করেছেন, তেমনি আবার সেই ভিত্তিতে আঁকা নায়ক-নায়িকার হৃদয়ের গভীরতম ছবিগুলিকে সার্থক চরিত্র-ন্যায়ে শিল্পরূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসে তাই প্রেম-বিরহের যে গভীরতম মনস্তাত্ত্বিক চেহারা, তার শিল্পীত, ব্যঞ্জনাগর্ভ পরিচয় পাই উপন্যাসের অন্যতম নায়ক মহেশ্বরের সঙ্গে নায়িকা অমলার সম্পর্কচিত্রে। চাষীর

ছেলে বলে সত্যিকারের সুন্দরী বুদ্ধিমতী অমলা একদিন অত্যন্ত মেধাবী, রুচিবান ছাত্র মহেশ্বরকে, তার প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করে। বিয়ে করে মুকুন্দকে। কিন্তু তার বিবাহের প্রথম মোহ কেটে যাবার পর মুকুন্দ ভালবাসা ও জীবনের সমস্ত দিক থেকেই তাকে নিঃস্ব করে একদিন মারা যায়। ঘটনাচক্রে মহেশ্বরের ছোটভাই বীরেশ্বরের কাছে সে থেকে যায় বিধবা হবার পরও। বীরেশ্বর তাকে কামনা করে, কিন্তু অমলা বীরেশ্বরের মধ্যে সম্ভবত অতীতের সেই মহেশ্বরকেই খুঁজেছিল। বীরেশ্বরও মারা গেলে অমলাকে মহেশ্বরের বাবা রাজেশ্বরের স্নেহে আশ্রয় নিতে হয় কলকাতায় তাদের বাড়িতে। চোখের সামনে মহেশ্বরের বিবাহ হয়ে যায় সুপ্রভার সঙ্গে। একদিন তার সন্তানও হয়। নাম রাখে চন্দন। কিন্তু মহেশ্বর তবু ভালোবাসে অমলাকে। অমলার সেই অতীতের দূর থেকে সোজাসুজি তার ভালোবাসার প্রত্যাখ্যানজনিত অপমানবোধ যেন আরও তীব্রভাবে তাকে অমলার সান্নিধ্যের দিকে ঠেলে দেয়। এ এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্বকে সক্রিয় করেছেন লেখক মহেশ্বর-অমলার পরস্পরের কাছেও একান্ত গোপন অবদমিত হৃদয়াকাঙ্ক্ষার মধ্যে। লেখক উপন্যাসের শেষ তৃতীয় ভাগে ঝিলিকের চাঁদা আদায় করতে বেরিয়ে দুজনকে নিয়ে এসেছেন শহর থেকে দূরে এক সম্পূর্ণ গ্রামের পরিবেশে বেড়ানোর ছলে। সেই নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশে দুই দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীপিত, ভিন্নমতের বলিষ্ঠ চরিত্রের যে সংলাপ-বিনিময়, তা যুদ্ধ-সমকালে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রেম-বিরহ চিত্রের একটি সার্থকতম নিদর্শন হয়েই থাকবে:

'মহেশ্বর বলিল, জানো আমরা এই চাষী সম্প্রদায়েরই লোক? বাবা নিজের হাতে চাষ করতেন।

কিন্তু আজ তোমরা জমিদার।

মহেশ্বর বলিল, কিন্তু এই চাষীর ছেলে বলেই তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করেছ।

কথাটা মর্মান্তিক সত্য। অমলা তাই চুপ করিয়া রহিল। মহেশ্বর তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, ভুল আমিও কম করিনি, অমু।

অমলা বলিল, সে কথা তুলে এখন কোন লাভ নেই। তার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

মহেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, মনে পড়ে বালিগঞ্জের সেই রাত্রির কথা?

মনে খুবই পড়িতেছিল। মহেশ্বরের স্পর্শে অমলার বুকে তখন তীব্র স্পন্দন চলিতেছে।

মহেশ্বর বলিল, আমি তোমায় চাই, একান্তভাবেই চাই।

অমলা বলিল, চাওয়া অন্যায়।

চাই তবুও।

'কিন্তু কিভাবে তুমি আমায় চাও?

তা জানি না।

অমলা বলিল, একদিন আমরা পরস্পরের হতে পারতাম। কিন্তু এখন তা আর সম্ভব নয়। তোমার খেলার পুতুল হয়ে আমি থাকতে পারি না।

মহেশ্বর বলিয়া ফেলিল, একদিন ত বীরেশের পুতুল হতে পেরেছিলে।

ছিঃ—তুমি এত ছোট—অমলা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, ছিলাম, তার খেলার পুতুলই ছিলাম। সে আর তুমি।

মহেশ্বর তার হাতখানা জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, পাপিষ্ঠা, তারপরই তাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।'[৭০]

বিবাহিত মহেশ্বরের অমলার কারণে সম্পূর্ণ ভেঙে-যাওয়া প্রেম-হৃদয়ের আজও যে আকর্ষণ বিধবা অমলার প্রতি—তা যেমন গভীরতম জটিল মনস্তত্ত্বের বিষয়, তেমনি 'সে আর তুমি!'—অমলার এই বিস্ময়চকিত চীৎকারের মত উক্তিতে আছে প্রেম-মনস্তত্ত্বের আর এক গভীরতম হৃদয়-সংবাদ—চরম রোমান্টিক শ্রদ্ধা, প্রেমিকের ব্যক্তিত্বে অগাধ, অসীম বিশ্বাস, নিষ্ঠা। এ প্রেমবোধ সমস্ত দেহ-সম্পর্কের উর্ধ্বে এক অসীম আত্মার আলোয় আলোকিত বিস্ময়ই।

'প্রমীলার সংসার' উপন্যাসে প্রবোধকুমার সান্যাল প্রেমকেন্দ্রিক প্রচলিত সংসারের কোন ছবি আঁকেন নি, এঁকেছেন বিবাহিত প্রমীলার উদাসীন স্বামীর পাশে চরম নিঃসঙ্গতায়, অসহায়তায়, চাপা অসীম বাসনার পট। প্রমীলা জীবনকে ও সংসারকে দেখতো একভাবে এবং সেটাই স্বাভাবিক, সহ-জ, স্বামী বাসুদেবের চিন্তা তার ধারে-কাছে থাকে না। উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়েছেন লেখক, কিন্তু শ্রেণীর অর্থ নৈতিক সামাজিক কোন সমস্যায় না গিয়ে বাসুদেব-জহর-প্রমীলার কাহিনীসূত্রে কেবলমাত্র প্রত্যেকের মনগড়া হৃদয়-ভাবনার জটিলতাকেই ধরতে চেয়েছেন। বাসুদেব এমন একটি পুরুষ যে কোন সংসারের পক্ষেই উপযোগী নয়:

'সংসারে শিশু হয়ে সকলেই জন্মায় কিন্তু এমন অনেকেই আছে যারা চিরকাল শিশুই থেকে যায়। তারা বড হয়, মানুষ হয়, ঘর করে কিন্তু পৃথিবীর হাটে তাদের কাণাকড়িও মূল্য নেই। তারা না জানে নিজেকে না চেনে পরকে। সংসারে তারা দুঃখ নিশ্চয়ই পায়, কিন্তু দুঃখটা যে সত্যিই দুঃখ এ জ্ঞানও তাদের নেই। কথাটা বাসুদেবের সম্বন্ধে বেশ খাটে।'[৭১]

এই বাসুদেবের চঞ্চলা প্রেমিকা, সরলা স্ত্রী প্রমীলা। এর সঙ্গে যুক্ত হয় জহর—বাসুদেবের দূর সম্পর্কের ভাই—গভীর কোন বন্ধুর মতই। কিন্তু জহর জমিদারের ছেলে হলেও সে খোঁজে মেয়েদের প্রকৃত স্বভাবকে। প্রমীলা বন্ধুত্ব চায় জহরের,

জহর বহু মেয়ের সঙ্গে মিশেও মেয়েদের বুঝতে পারে না। যে বাসুদেব প্রমীলা সম্পর্কে উদাসীন, সেই একসময় প্রমীলাকে বলে :

'তুমি ত আমার সম্পত্তি নও! তোমাকে পাবার জন্য ত আটকে রাখবার দরকার হয় না। তোমার জন্যে কাঁদতে পারি কিন্তু তোমায় বাঁধতে পারিনে মীলা। কোন মানুষকে কোন মানুষ বেঁধে একেবারে নিজের করে রাখতে পারে না। না স্ত্রী, না ছেলেমেয়ে, না ভাইবোন!······তুমি নিজে থেকে পেতে দিলে তবেই তোমাকে পাবো—না হলে ভয় দেখিয়ে শাসন করে গহনা-কাপড়ের লোভেও কি পেতে পারি ?'[৭২]

অন্যদিকে জহর বিজয়া, মাধবী এমন সব মেয়েদের সঙ্গে থেকে যে অভিজ্ঞতা পায় এবং তা তাকে যে শিক্ষা দেয়, সে শিক্ষায় বরং বিপরীত ছবি আসে রাগিনীর সঙ্গে এক বিশেষ উত্তেজনাময় পরিবেশে :

'রাগিনীর অমন রূপ, অমন মাধুর্য্য, তেজস্বিতা, এ সব কথার আঘাতে যেন খোলসের মত খসে পড়লো। যৌবন-রূপ-লাবণ্যের খোলস খসে রাগিনীর যে মূর্তি প্রকাশ হয়ে পড়লো—তেমন মূর্তি সে রাত্রে রামচন্দরের সঙ্গে সেই অন্ধকার গলিপথে সার সার দেখেছিল জহর। সেই এক আকৃতি এবং একই ভাষা! শুনতে শুনতে জহরের দম বন্ধ হয়ে এল।'[৭৩]

একটা রোমান্টিক আদর্শবাদ, প্লেটনিক প্রেমের ভিত্তি জহর, বাসুদেব, প্রমীলা, মাধবী ইত্যাদি চরিত্রের মধ্যে থাকায় লেখক প্রেমের অশরীরী কল্পনাময় রূপটিকেই সত্য করতে চেয়েছেন, তার বাস্তব রূপ উপন্যাসের কোথাও নেই। দুর্বল কাহিনী সংযোজনে সার্থক প্রেমের কোন সত্য ছবি, মনস্তত্ত্বের কোন ন্যায়নিষ্ঠ প্রতিবেদন এ উপন্যাসের প্রেমচিত্রে অনুপস্থিত।

'ধরা বাঁধা জীবন' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেম সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব একটি ভাবনাকে তত্ত্বের আকারে রেখেছেন। তত্ত্ব অবশ্যই কাহিনী, ঘটনা, চরিত্রে হয়েছে সচল। নায়ক ভূপেন বসু প্রসন্নর বোন প্রভাকে ভালবাসে। প্রভা ডাক্তার, আবার প্রভাকে ভালবাসার আগে আসে সরমা। সরমা ও প্রভা দু'জনকেই ভূপেন হৃদয়-সম্পর্কে চিন্তা করত। ক্রমে সরমাকে বিয়ে করলেও, একদিন সরমা এবং তার দু'বছরের সন্তান মারা গেলে ভূপেনের প্রেমভাবনায় আসে জটিলতা। প্রভাকে সে চায় বাঁধা ধরা সংসার জীবনে। প্রভা, বিবাহিত জীবনের সংসারে তাদের ভালবাসা অটুট থাকবে কিনা সংশয় প্রকাশ করে। ভূপেন প্রতিদিনের জীবনে প্রেমকেই একমাত্র আরাধ্য ভাবে, প্রভা তার প্রেম ও কাজের জীবন এক করে নিয়ে চিন্তা করে। প্রেম নিয়ে ভূপেনের

আছে রোমান্টিক ভাবালুতা, প্রভার তাকেই ভয়। দু'জনের বিবাহ প্রস্তুতি তাই একটা জায়গায় থেমে যায়। ভূপেনের অস্থিরতা প্রায় অসুস্থতার পর্যায় আসে প্রভাকে ক্রমশ ভুল বোঝার মধ্যে দিয়ে। শেষে ঘটনার চক্রে উপন্যাসের শেষে দেখা যায় ভূপেনের প্রেম সম্পর্কে স্বচ্ছ আত্মোপলব্ধি :

'আরও তো অনেক কিছু আছে জীবনে, সে সব অস্বীকার করিবার কোন কারণ তো নাই। হাতের খেলনা কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে বলিয়া অবোধ শিশু ঘরের আসবাব ভাঙিতে আরম্ভ করে। সে তো শিশু নয়।'[৭৪]

ভূপেনের এই আত্ম-আবিষ্কার মূলত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই প্রেম সম্পর্কিত ভাবনা ও মনস্তত্ত্বের নব আবিষ্কার। প্রেম জীবনের খণ্ডাংশ মাত্র, সমগ্র অংশ বা একমাত্র অংশ নয়। প্রেমের যে মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ তা জীবনের সর্বদিককে গ্রহণ করেই। সরমা-ভূপেন-প্রভা—এই ত্রিকোণ সম্পর্কের প্রেমে ভূপেনের যে ধরা-বাঁধা জীবনের বাইরে প্রেমের বড় ব্যাখ্যায় জীবনকে যাচাই করার প্রয়াস, তা বাংলা কথাসাহিত্যে সুস্থ প্রেমভাবনায় নতুন আস্বাদ ও মাত্রা দেয়।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পুরুষ রমণীর প্রেম-সম্পর্কের জটিলতা আঁকতে সচেষ্ট 'ধরা বাঁধা জীবন' উপন্যাসে, তারাশংকর সেখানে তাঁর 'কবি' উপন্যাসে প্রেমের কথায় নিয়েছেন সমাজের নীচু স্তরের ডোমজাতির মধ্যেকার ঝুমুর দলের পুরুষ-রমনীদের—যারা আদৌ প্রেমের পোষাকী ভদ্রতা মানে না, মানে না বুর্জোয়া আদর্শে মাপা প্রেমের সংগে দেহ ও যৌনতার সীমারেখা। নায়ক নিতাই কবিয়াল তাই তার সমান স্তরের নায়িকা বসনকে ভালবাসায় ছুঁতে আগ্রহী হয়, আবার রাজনের বিবাহিতা শ্যালিকা ঠাকুরঝির প্রেমকেও দূর থেকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাতে বিরত থাকে না। তারাশংকর অবশ্য নিতাই-এর প্রেমকে কেবলমাত্র বিশেষ অঞ্চলের অন্ত্যজ কবিয়ালদের প্রেম-জীবন-সমস্যায় সীমাবদ্ধ রাখেননি, প্রেমের এমন এক জটিল আস্বাদ দিয়েছেন, যার মধ্যে দেহব্যবসা, যৌনাকাঙ্ক্ষা, পচা ভোগবিলাস থাকলেও আছে উত্তুঙ্গ অথচ অশরীরী মূল্যবান প্রেমের ঘ্রাণ। নিতাই-এর মনে প্রথম যে প্রেমের জাগরণ তার প্রথম আশ্রয়টি ঠাকুরঝি। পরে সে ঠাকুরঝিকে ছেড়ে বসনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তারাশংকর নিতাই-এর একদিকে বসন, অন্যদিকে ঠাকুরঝিকে এনে প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে তীব্রতম করেছেন। বসনের জন্য বসনের মৃত্যু, নিতাই-এর জন্য ঠাকুরঝির মৃত্যু—আর এই দুই মৃত্যুর মধ্যবর্তী ট্রাজেডীর চিরকালীন কান্না নিতাই-এর, সে কান্না যথার্থ অন্তর্দহন—রাবণের চিতার মত ঊর্ধ্বের আকাশের নীল শূন্যের মত। এই ত্রিভুজ প্রেম বাংলা কথাসাহিত্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে নিশ্চয়ই ছিল,

কিন্তু তারাশংকর রাঢ পরিবেশে, ঝুমুর দলের অশালীন দেহব্যবসায় মধ্যে অশিক্ষিত আবেগপ্রাণ নীচু শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে যেভাবে মরমীয়া করেছেন, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে রচিত কথাসাহিত্যের পরিবেশে নিশ্চয়ই বিস্ময়কর।

কথাসাহিত্যে প্রেমের কথায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন জটিলতায় মধ্যে যাননি। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষিদ্ধ প্রেম-কাহিনীর মধ্যে যে তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও নর-নারীর হৃদয়-সংকটের তীব্রতা, বিভূতিভূষণ সে সবের ধারে-কাছে যান নি। তাঁর বর্ণিত শান্ত প্রকৃতির মতই তা সুন্দর, কল্যাণসূচক, মঙ্গলময়। এ বিষয়ে সমালোচকের কথাই যথার্থ,—'বিভূতিবাবুর প্রধান ক্ষমতা এই যে, তিনি তাঁর জগত রচনা করেন এমনভাবে যেখানে বিশ্বাস্যতা বা অবিশ্বাস্যতার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সেখানে প্রেমের ঘটনার জন্য আসর সাজাতে হয় না।'[৭৪] 'বিপিনের সংসার' ও 'দুই বাড়ি' উপন্যাস দুটির প্রেমভাবনার ব্যাখ্যায় আমরা সমালোচকের মন্তব্যের সংগে একমত। নায়ক বিপিনের প্রেম বিবাহিতা মানী ও শান্তির সংগে একে একে গড়ে উঠেছে। মানী বিপিনের বাল্যসখী ছিল। বিপিনও বিবাহিত, স্ত্রী মনোরমা। বিপিনের প্রতি একে একে মানী ও শান্তির স্নিগ্ধ, কোমল, সহজ, সরল প্রেমাকর্ষণই সত্য ও মূল গতি দিয়েছে। অথচ এই প্রেমে নিষিদ্ধ সীমা অতিক্রান্ত হলেও সেই নিষিদ্ধ প্রেমে জ্বালা, দুর্বার বেগ, জটিল মনস্তত্ত্ব, যৌনকামনা কিছুই নেই। যেন বিভূতিভূষণ-বর্ণিত প্রকৃতির মতই তা সহজ, স্নিগ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত। যেটুকু আলোড়ন-আন্দোলন তা মানী, শান্তির কিছু সক্রিয়তার কারণে দেখা দিয়েছে। বিভূতিভূষণ প্রেমধারণায় শরৎচন্দ্রের মত কল্যাণাত্মিক পরিণতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই মানীর ভালোবাসা বিপিনের সংসার ভাঙে না। বিপিনকে শান্তির দিকে ঠেলে দেয়, মানীকেও তার নিজের জায়গায় ঠিক রাখে। মানীর কথাতেই নিম্নবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের বিপিন নায়েবী ছেড়ে হয় গ্রাম্য ডাক্তার। সেই ডাক্তারী করতে গিয়ে পরিচয় হয় বিবাহিতা শান্তির সংগে। কিন্তু সেই ভালোবাসায় সাবধান করে মানী। তাকে সংসারের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে মানী নিজের গোপন ভালবাসার যেনবা বিমূর্ত এক উপহার দেয়। 'দুইবাড়ি' উপন্যাসেও বিভূতিভূষণ রামতারণ চৌধুরীর বড় ছেলে মোক্তার নিধুর সঙ্গে জজের মেয়ে মঞ্জুর যে প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণের কাহিনী রচনা করেছেন, তার মধ্যে প্রেম-মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার থেকে এক রোমান্টিক মন্ময় বিলাসকেই বড় করেছেন। নিধু-মঞ্জুর প্রেমে যে জটিলতা নেই, এ সহজ সরল স্নেহ-বিচ্ছিন্ন হৃদয়ের আবেগই বড় হয়েছে, উপন্যাসে কোন কোন ভাষাচিত্রে তার প্রমাণ মেলে :

'সেদিন রাত্রে বাড়ী আসিয়া নিধুর আর ঘুমই হয়না।

মঞ্জু তাহাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। সে থাকিলে নাকি মঞ্জুর ভাল লাগে—মঞ্জুর মুখে এ কথা সে কোনোদিন শুনিবে, ইহা বহুদূর নীল সমুদ্রের পারে স্বপ্নদ্বীপের মতো অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব। তবুও সে নিজের কানে শুনিয়াছে মঞ্জুই একথা বলিয়াছে।'[৭৬]

'বিপিনের সংসার' উপন্যাসে বিকেলে শান্তির হাতের চা চণ্ডীমণ্ডপে বসে খেতে খেতে মাসীর কথায় উৎসুক এমন মনে শান্তি-মাসী সম্পর্কে যে ভালবাসার ভাবনা ভাবে, তার মধ্যেও একই জাতের রোমান্টিক বিলাস :

'তেমনি মেয়ে এই শান্তি। কোন দূর নক্ষত্রের দেবলোক হইতে শান্তির মত মেয়েরা, মাসীর মত মেয়েরা, পৃথিবীতে জন্ম নেয়।'[৭৭]

বস্তুত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেমের কথায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালের জটিলতা, সামাজিক-অর্থনৈতিক ন্যায়কে যেমন গ্রহণ করেন নি, তেমনি সভ্যতার অগ্রগমনের ফলে পুরুষ-রমনীর সম্পর্কের দ্বন্দ্ব, যৌনবিকার, দেহনির্ভর ভালবাসা—এসবও চিন্তা করেননি। তিনি প্রেমের সিদ্ধান্তে শরৎবাণীকে, তাঁর সমাজ দর্শনকে নিজস্ব রোমান্টিক আতি দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন।

'রাত্রি', 'মৃগয়া' ও 'জঙ্গম' উপন্যাস তিনটিতে বনফুল প্রেমের জটিলতা, রোমান্টিক বিলাস ও প্রেম এবং যৌনতা বিষয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ধারণাকে চিত্রিত করেছেন। 'রাত্রি' উপন্যাসের নায়িকা রাত্রির প্রতি আকর্ষণ তার পিতৃবন্ধু ধরণীবাবু থেকে শুরু করে স্বর্ণেন্দুর ভগ্নীপতি উকিল নিখিল চৌধুরী, জ্যোতির্ময় ইত্যাদি অনেকেরই। রাত্রির ভালবাসার কাহিনী ও জ্যোতির্ময়ের অন্য প্রেমিকা সবিতার প্রতি ঈর্ষা—এসবের শেষে জ্যোতির্ময়ের ঔরসে এক অবৈধ সন্তানের জন্ম দেয় রাত্রি। জ্যোতির্ময় তখন প্যারিসে। জ্যোতির্ময় যে রাত্রির মায়ের প্রেমিক পূর্ণেন্দুরই সন্তান—এ খবর উপন্যাসের শেষে মেলে। গুরুরূপী রাখাল ও রাত্রির মা প্রকৃত স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু রাখাল সব জেনে-শুনেও তার ভ্রষ্টা স্ত্রীকে নিয়েই বাকি জীবনের শান্তির আশ্রয় রচনা করে—এর মধ্যে যেমন জটিল ভালবাসার রূপ ব্যঞ্জনায় এঁকেছেন বনফুল, তেমনি রাত্রিকেও লেখক এঁকেছেন অধরা, রহস্যময়ী করে। তার থেকেও জটিল হয়ে ওঠে ডাক্তার ও লেখক স্বর্ণেন্দুর বন্ধু ঘনশ্যামের রাত্রির জন্য প্রতীক্ষার ছবি :

'আজও আমি তার প্রতীক্ষা করি। অসামাজিকভাবে নয়, সামাজিক দাবিতেই। আইনের চক্ষে আমি তার স্বামী। জ্যোতির্ময়ের সন্তানের জারজ-অপবাদ-মোচনের জন্য আইনত আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম। আমি জানি, সে আসবে না। এও আমি জানি, আমার জন্যে নয়, নিজের সন্তানের জন্যেই এবং হয়তো

আমার আগ্রহাতিশয্যে এ বিবাহে সে সম্মত হয়েছিল, আমাকে সে কোনদিনই ভালবাসেনি।

তবু তার প্রতীক্ষা করি।'[৭৮]

'মৃগয়া' উপন্যাসে অবশ্য এই জটিলতা নেই। শিকার করার দিন এক অভিজাত জমিদার পরিবারের সভ্য সভ্যাদের মনে জ্যোৎস্নালোকিত পরিবেশে কোথাও অতীত স্মৃতিসূত্রে, কোথাও বা বর্তমান সম্পর্ক ভাবনায় যে প্রেমবোধের জাগরণ তারই খেয়ালী চিত্র এখানে এঁকেছেন লেখক। উপন্যাসের সর্বশেষ 'প্রান্তরে' শীর্ষক অধ্যায়ে বড়বাবুর মদ খাওয়ার কথা ভুলে প্রৌঢ়া স্ত্রীর রূপ ও সান্নিধ্যের মনোরম সচেতনা, মেজবাবু ও মেজবৌয়ের রোমান্টিক দাম্পত্য সম্পর্ক, ছোটবাবু-ছোটবৌয়ের প্রেম সম্পর্কের প্রবলতা— এসবই শিল্পরূপ পেয়েছে।

'বনফুল 'জঙ্গম' উপন্যাসের নায়ক শংকর চরিত্রেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে দেখা দেওয়া যুবকদের যৌনতা, প্রেম ও অবক্ষয়ের যথাযথ ছবি এঁকেছেন। যে সব যুবক সাধারণ শহুরে মধ্যবিত্ত, যুক্ত না থেকেও একাধিক রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যর্থতার সাক্ষী, যারা রোমান্টিক মধ্যবিত্ত চিত্তে হতাশা, বেদনা, বেকারত্বের জ্বালা নিয়েও প্রেম ও যৌনতার আক্রমণে অস্থির হয়েছিল সে সময়ে, শঙ্কর তাদেরই প্রতিনিধি। সে সহজেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু উৎপলের স্ত্রী সরমার প্রতি যৌনকামনা বোধ করতে পারে, সহজ সরল স্বামীগতপ্রাণা স্ত্রী অমিয়াকে কাছে পেয়েও সরমাই তার যথার্থ প্রেমিকা হবার যোগ্য মনে করতেও দ্বিধা করে না। মিষ্টিদিদি, রিনি—এদের সান্নিধ্যে তার বিকৃত যৌনচেতনা কখন যেন মনে আকার পায়, গণিকা মুক্তার সংগে পরিচয়ের পর গণিকা-পল্লীতে যাওয়াতেও তার দ্বিধা থাকে না। বাবার চিঠি পাওয়ার পর হস্টেল ছেড়ে, প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র বিক্রী করে দিয়ে টিউশনির খোঁজে প্রফেসর গুপ্তর সংগে দেখা করতে যাওয়ার সময়ে স্ত্রী অমিয়া সম্বন্ধে ভাবে :

'শংকরের পরিণত মনের ক্ষুধা কি ওই শিশু প্রকৃতির অমিয়া মিটাইতে পারিবে? উহাকে স্নেহ করা চলে, উহার অযৌক্তিক সারল্য দেখিয়া কৌতুকান্বিত হওয়া চলে, কিন্তু উহার সহিত রোমান্টিক প্রেম করা চলে না। ওইটুকু মেয়ে, ভালবাসার কি বোঝে ও……বিনা প্রতিবাদে বাহুবন্ধে ধরা দেয়, বিনাপ্রশ্নে সমস্ত কিছু বিশ্বাস করে, বিনা সংকোচে কৃতজ্ঞ হয়। কোন জটিলতা নাই, মনকে উৎসুক করিয়া তোলে না।'[৭৯]

এই চিন্তা এক শহুরে মধ্যবিত্ত যুবকের পক্ষেই যথার্থ। শংকরের নারী-সঙ্গলোভী মন, যৌনকামনা ও অভিজ্ঞতা, তার যাবতীয় মানস-অস্থিরতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালের এদেশীয় বেকার মধ্যবিত্ত শহুরে শিক্ষিত যুবকদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। প্রেম হয়েছে বিকার-

গ্রস্ত, যৌনতা আশ্রয় নিয়েছে নিছক কামনায় কখনো বা লাম্পট্যে, কোথাও অবধারিত বিকৃতিতে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেম-সম্পর্কিত ভাবনায় বনফুল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের মত যে জটিলতা নেই, তা তাঁর 'বিষের ধোঁয়া' উপন্যাসের বিমলা-কিশোর-সুহাসিনী -এই তিন চরিত্রের সম্পর্কের কাহিনী পড়লেই বোঝা যায়। বিমলা কিশোরের থেকে চার বছরের বড় কলেজের বন্ধু তীর্থনাথের স্ত্রী। যক্ষারোগে মৃত্যুর আগে তীর্থনাথ কিশোরকে তার গ্রামে ডেকে এনে কিশোরের দায়িত্বে রাখে স্ত্রীকে। বিমলা বিধবা, অপরূপ সুন্দরী যুবতী। বাবার সংগে চরম বিরোধ ও বিদ্রোহের সুযোগ এনেও কিশোর-বিমলা একই বাড়িতে থাকে। বিমলা তার অতি প্রিয়, শ্রদ্ধেয় বৌদিই থেকে যায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কোন মানসিক জটিলতা আনেননি। সম্পর্ক আদ্যন্ত বৌদির শ্রদ্ধা ও সেবাতেই বিশুদ্ধ থেকে যায়। সুহাসিনীর সংগে প্রণয় হলেও সুহাসিনীর পানিপ্রার্থী অনুপমের ঘৃণ্য চক্রান্তে তা জটিল ঘটনার ঢেউ তোলে সমগ্র উপন্যাসে। সুহাসিনীর ভালবাসার আশ্রয় হয় উৎকেন্দ্রিক। করবী-কিশোরকে কাশীর সারনাথে একসংগে দেখে সন্দেহ চরমে ওঠে। সবশেষে বিমলা থাকে অতি পরম আত্মীয় ব্যক্তিত্বময়ী বৌদিই, সুহাসিনী হয় কিশোরের স্ত্রী। লেখক কিশোরের জীবনে একদিকে বিমলার সম্পর্কে পবিত্র সমাজ-আদর্শ, অন্যদিকে সুহাসিনীর একনিষ্ঠ প্রেম-মনস্তত্ত্ব—দুইকে সমানভাবে ঘটনাবর্তে জড়িত করে যে প্রেম মনস্তত্ত্বের কথা বলেছেন তা নিছক বাঁধা জীবনের, সংসারের। আদর্শ বৌদি বিমলা, আদর্শ দেবর-বন্ধু-প্রেমিক কিশোর, আদর্শ প্রেমিকা সুহাসিনী। এমন ছক-নির্দিষ্ট প্রেমকথায় একদিন রাতে সুহাসিনীর সংগে দেখা করে বাড়ি ফেরার পথে কিশোরের চিন্তা :

'ইহাদের একজনকে বাদ দিলেও তাহার জীবন পঙ্গু হইয়া যাইবে নিশ্চিত, —বিমলার স্নেহ বা সুহাসের ভালবাসা কোনটাই সে স্বেচ্ছায় ছাড়িতে পারিবে না। কিন্তু এই দুইটি রমনী যদি ভবিষ্যতে পরস্পরকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতে না পারে; যদি সাংসারিক ক্ষুদ্রতা প্রবেশ করিয়া তাহার অকলংক জীবনযাত্রাকে লাঞ্ছিত করিয়া তোলে ?'[৮০]

কিশোরের চরিত্র-ন্যায়ের পক্ষে এমন চিন্তাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে লিখতে বসে লেখক নায়ককে সমকালীন জটিলতায় জড়াননি। অন্যদিকে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে মধ্যবিত্ত মানসিকতার নায়িকা সুহাসিনীর মনে প্রেমিক সম্পর্কে সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। তাই সারনাথে কিশোর-করবীকে দূর থেকে দুজনকে দেখে ঘৃণার সঙ্গে ভাবে :

'..... সাধারণের সহজগম্য প্রকাশ্য স্থানে এরূপ কদর্য নির্লজ্জতা কিশোরের পক্ষে স্বাভাবিক হইতে পারে, করবী তাহাতে যোগ দিল কি করিয়া?......ব্যাভিচারীরা কি স্থান অস্থান বিচার করে না? তাহাদের প্রবৃত্তি কি এতই প্রবল যে, দুর্নীতির আচরণে সাধারণ লোকলজ্জাও তাহারা সচ্ছন্দে বিসর্জন দিতে পারে?'[৮১]

সুহাসিনী কিশোরের অতীত জেনেছে অনুপমের মাধ্যমে, বিশ্বাস হারিয়েছে কিশোরের ওপর। সমগ্র উপন্যাসে প্রেমের জটিলতা একদিকে বিমলাকে সংগে নিয়ে থাকার সন্দেহে ও কিশোরের ওপর বিশ্বাস হারানোর মধ্যেই। উপন্যাসের শেষে তাই সুহাসিনীর পিতৃবন্ধু দীনবন্ধুকে সুহাসিনীর বোঝাতে হয়:

'ভালবাসা আর বিশ্বাস—এ দুটো জিনিস আলাদা করা যায় না। তুমি আলাদা করবার চেষ্টা করেছিলে, তাই আজ এত কষ্ট পাচ্ছ।'[৮২]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেমভাবনা বাঁধা পথ থেকে সরে যায় নি। মনের জটিল গভীর সমস্যা নয়, ঘটনা ও পরিপার্শ্বই প্রেমকে নিয়ন্ত্রিত করে, প্রেমিক প্রেমিকা ঘটনার ক্রীড়নক মাত্র। তাঁর সম্বন্ধে সমালোচকের একটি মন্তব্যই যথার্থ,—'তাঁহার উপন্যাসগুলি সুলিখিত,......সুখপাঠ্য ও পাঠকের রসবোধের তৃপ্তি বিধায়ক। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন গভীর ও অন্তর্ভেদী জীবন পরিচয়ের বিশেষ নির্দশন মেলে না।'[৮৩]

'কোপবতী' উপন্যাসের কাহিনী ও বক্তব্যকে দুটি খণ্ডে ভাগ করে প্রমথনাথ বিশী প্রেম সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেমকথা শহরজীবনের কেন্দ্রে জটিলতা পেয়েছে। প্রমথনাথ বিশীর 'কোপবতী'র নায়ক বিমল ও নায়িকা ফুল্লরার প্রেমসম্পর্ক এক বিশিষ্ট ভাব পরিবেশে অন্য তাৎপর্য এনেছে গ্রাম-জীবনের প্রেক্ষিতে। তালবনী গ্রাম, কাছাকাছি কাচবাংলা গ্রাম যার এখনকার নাম শান্তিনিকেতন, কোপবতী অর্থাৎ কোপাই নদী, খোয়াই ও সংলগ্ন অরণ্য—এসবের মধ্যেই বিমলা-ফুল্লরার প্রেমজীবনজনিত তৎপরতায় প্রেমের যে মনস্তত্ত্ব তা ভীষণ নদী-প্রকৃতি, গভীর গহন অরণ্য-প্রকৃতি ও বিমল-ফুল্লরার সরল প্রেমাকর্ষণ—এসবে ভিন্ন মেজাজ আনে। লেখক কাহিনী মধ্যেই প্রসঙ্গত বলেছেন,—'এই কাহিনীতে কোপাইকে আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। সে এই কাহিনীর নায়িকা—কিম্বা নায়িকাদের মধ্যে অন্যতরা।'[৮৪] কিন্তু ফুল্লরাকে যে প্রেমের স্বভাবে আঁকার বাসনা, তাতে ফুল্লরা কোপাই-এর স্বভাবের অনুরূপ হতে পারেনি। তবু লেখক ফুল্লরার সংগে বিমলের প্রেম সম্পর্ক রচনা করে প্রথম খণ্ডে প্রেমের সংগে ব্যক্তি জীবন, রোমান্স, প্রথম শিহরিত প্রেমের আবেগ-আকর্ষণ যেমন তীব্র করেছেন, তেমনি এনেছেন প্রকৃতির সংগে তার যোগ। বিমল ফুল্লরার জন্মদিনে যাওয়ার সময় কোপাই-এর উত্তাল বানের জলে নিজেকে সিক্ত করে চিত্তকে আত্ম

আবেগে দীপ্ত করে। যে বিমল একা বাঘ মেরে শ্রদ্ধামিশ্রিত স্বভাবে ফুল্লরার প্রেমাকর্ষণ করে, সেই বিমল অরণ্য মধ্যে জ্যোৎস্নারাতে ফুল্লরাকে বনলক্ষ্মী সাজিয়ে প্রেমের প্রগাঢ় রোমান্স রস আস্বাদন করে। বিমল কোপাইকে বাঘের থেকেও বড় শত্রু মনে করে। শত্রুজয়ের কারণেই বিমল কোপাইয়ের উৎস সন্ধানে একা দীর্ঘ দুর্ধর্ষ অভিযানে বেরোয়। এই শত্রুতা যে বিমলের স্বভাবে বার বার সংসার জীবন থেকে এক উৎকেন্দ্রিক অদৃশ্য রহস্যময় আকর্ষণেই ব্যঞ্জনা পায়, তার প্রমাণ, উপন্যাসের শেষে বিমলকে কলকাতায় অধ্যাপনার চাকরী উপলক্ষে গ্রাম ত্যাগ করার আগের ভোরে মৃত্যুর মধ্যে নিয়ে আসার ঘটনায়! দ্বিতীয় খণ্ডে বিবাহসূত্রে সাংসারিক প্রেম-জীবনে বিমলের মনে নামে এক কারণহীন রোমান্টিক শূন্যতা—কোপাই ও তার পরিবেশের অমোঘ আকর্ষণ সেই শূন্যতাকে তীব্র করে তোলে। তাই কলকাতায় যাওয়ার দিন রাতে কোপাইয়ের অদৃশ্য হাতছানির সময় তার একান্ত নিঃসঙ্গ সর্বনাশা চিন্তা:

'......বৃথা! বৃথা! এ বাঁধন এড়াইবার চেষ্টা বৃথা! এ ষড়যন্ত্র ভেদ করিবার প্রয়াস নিতান্ত ব্যর্থ। সে ভাবিল ভীরুর মত পালাইয়া নিস্তার নাই—বীরের মত অগ্রসর হইয়া গেলে হয়তো মুক্তি মিলিতে পারে।'[৮৫]

যে সাংসারিক প্রেম ও দেহভোগের সুখ, স্বপ্ন ও স্মৃতি ফুল্লরা বিমলকে উপন্যাসের শেষে শূন্যতা থেকে সরিয়ে রাত্রিকালীন মান-অভিমান-চিহ্নিত অভিসারের মধ্যে পূর্ণতার আস্বাদ দিয়েছিল, সেই পূর্ণতাবোধই ফুল্লরাকে নিয়ে কলকাতার চাকরী জীবনের শান্তি আনতে পারত বিমলের। কিন্তু বিমলের প্রকৃতিতে আছে সেই দুর্ধর্ষ স্বভাব—যার প্রতিপক্ষ ফুল্লরা নয়, একমাত্র কোপাই-এর ভীষণা আদিম প্রকৃতি, অরণ্যের মোহময় চিরন্তন আকর্ষণ। 'কোপবতী' উপন্যাসে লেখক প্রাকবিবাহ প্রেম ও বিবাহোত্তর প্রেম—এই দুই প্রেম-সম্পর্কের অতীত এক রহস্যময় প্রকৃতিপ্রীতি-তাড়িত মানব মনের জটিল বিচিত্র গতিপ্রাণতাকে, প্রকৃতির কাছে বস্তুসত্য-নির্ভর মানব জীবনের পক্ষে সর্ববিনাশী রূপকে প্রতীক-প্রতিম বক্তব্যে শিল্পীত করতে সচেষ্ট।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতে মধ্যবিত্ত জীবনে নরনারীর প্রেম নিছক মধ্যবিত্ত মানুষের ভাবাবেগ, আকুলতা, সংসার-জীবন-যাপনের একটি পদক্ষেপ হয়ে থেকেছে যেমন একাধিক উপন্যাসের বিষয়ে, তেমনি বেশ কিছু কথাকার প্রেমকে যথাস্থানে রেখে যুবক-যুবতীদের বৃহত্তর জীবনের আদর্শ, জীবন-অস্তিত্বের মূল্যায়ণ, সত্য-অসত্যের বিচারণা, বেঁচে থাকার পৃথিবীব্যাপী বোধে মূল্যায়ন—এ সব দিয়ে আদর্শ-তাড়িত, সজ্ঞিৎসু জীবনের বিষয়ের সংগে প্রেমের সংযোগে প্রেমকে যাচাই করতে চেয়েছেন। অন্নদাশংকর রায়ের ছয় খণ্ডে রচিত 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে রচিত শেষ দুই খণ্ড 'মর্তের স্বর্গ' ও 'অপসরণ'—গ্রন্থ দুটির মধ্যে নায়ক বাদল সেন, তার স্ত্রী নায়িকা উজ্জয়িনী ও অন্যতম প্রধান চরিত্র বাদলের বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—এই তিন চরিত্রের রূপক-রূপের কাহিনী ও সম্পর্কের টানাপোড়েনে তার পরিচয় মেলে। শুধু প্রেমজীবন নয়, জীবনকে সমগ্র পৃথিবীর বাস্তব ও বুদ্ধিগত চতুর্দিকের আয়নায় ফেলে জীবনের কেন্দ্রস্থ অস্তিত্বের মূল রহস্যকে উদ্ঘাটন করতে প্রেম-সম্পর্ক কতটা সীমা পায় ও সীমাহীন হয়—তার দিকেই অন্নদাশংকর রায়ের অন্যতম লক্ষ্য।

বাদল, উজ্জয়িনী, সুধীন্দ্র—কেউই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধে ছোট নয়। এমন উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কারণেই লেখক চরিত্রের তীব্র, তীক্ষ্ণ, যুক্তি-তর্কের মধ্যেই প্রেমকে পরীক্ষার মধ্যে এনেছেন। উজ্জয়িনী সেই পরীক্ষায় এক জীবন্ত নারী চরিত্র। তার ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য যেমন আছে, তেমনি একদিকে বাদল ও অন্য দিকে সুধীন্দ্রের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত প্রখর সত্যে-ধরা আদর্শনিষ্ঠ দেশভাবনা, কালভাবনা ও সর্বকালের সর্বশ্রেণীর মানব-ভাবনা—অর্থাৎ মানবতাবোধ—এসবও তাকে তাড়িত করেছে, তাকে করেছে সংসার জীবন থেকে উৎক্ষিপ্ত, প্রচলিত, গঠিত, ঐতিহ্যসম্মত সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক-ভাবনা থেকে স্বাধীন স্বকীয় চেতনার জগতে স্থিত।

উপন্যাসের পরিবেশ পটভূমি বাংলাদেশ, এমন কি ভারতবর্ষও নয়, সুদূর লণ্ডন। দেশকে, জাতিকে অন্তর্জাতিকতা দিয়ে, বড় চোখের মানবতায় দেখার জন্যই লেখক চরিত্রগুলিকে স্বদেশে রাখেননি, বিদেশে রেখে দেশের জাতিকতা থেকে আন্তর্জাতিকতায় উত্তরণের কল্পনা করেছেন। বাদল ইংলণ্ডে থেকে তার আদর্শের রূপভাবনায় যেভাবে অস্থির হয়, তাতেই একদিন স্ত্রী উজ্জয়িনী স্বামী-সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধিমান স্বামীর ভাবনায় উজ্জয়িনীর গর্ব, মহত্তম সুখ থাকলেও তার জিজ্ঞাসা সব সময়েই তাকে তার চিন্তার মূলে তাড়িত করে :

'উজ্জয়িনী সুখের কাঙাল নয়। এই তার মস্ত সুখ যে তার স্বামী মহাপুরুষ।

তার স্বামী ? উজ্জয়িনীর মনে ধোঁকা লাগে। যাদের স্বামী আছে তাদের কাছে স্বামী কথাটার যে অর্থ বাদল কি সেই অর্থে তার স্বামী ? তাদের স্বামীরা কি কেবল আনুষ্ঠানিক স্বামী ? আইনের স্বামী ? লোকচক্ষে স্বামী ? তাই যদি হয় তবে বাদলও তার স্বামী বৈকি। আর তাই যদি না হয়, তবে ?'[৮৬]

বাদলকে উজ্জয়িনী ভুলতে পারেনি বলেই, তার প্রতি নিজের অধিকারকে অস্বীকার করতে পারেনি বলেই উজ্জয়িনীর অন্যতম অনুরাগী কুমারকৃষ্ণ যে সময়কার যখন ফরাসী বিবাহিত মেয়েদের অন্যপুরুষ নির্বাচনের কথা শোনে, তখন 'তার মুখভাব কঠোর মনে

হয়'। বাদলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও মাঝে মাঝে উজ্জয়িনীর মনে যেসব কথা জটিল রূপ নিয়ে দেখা দেয়, তাতে তার জীবন ও বিবাহিত স্ত্রী হিসেবে অস্তিত্বের সংকটকে নাড়া দেয় :

'উজ্জয়িনী বাদলের কে যে বাদল তার মুখ চেয়ে নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করবে। বাদলের চোখে উজ্জয়িনী মৃত। মৃতের জন্য কেন সে ভাববে। কেন ফিরে দেখবে কার নয়নে বন্যা, কার শয়নে অনিদ্রা, কার আহারে অরুচি, কার বেশভূষায় অসৌষ্ঠব। জীবন বাদলকে সামনে টেনে নিয়ে চলেছে। জীবনের হাতে সে অসহায়।'[৮৭]

সুধীন্দ্র উজ্জয়িনীর সংগে বাদলের সম্পর্কের মিটমাট করতে চায়, বাদল উগ্রস্বাতন্ত্র্যবোধে, ব্যক্তিত্বে নিজস্ব আচরণের স্বাধীনতার অধিকার রক্ষার বলে পরোক্ষে দূরেই সরে যায়। বাদল স্বাধীনভাবে জীবনের গভীরতম অর্থ ও উদ্দেশ্য খুঁজতেই তপস্বী হয়েছে মনের কাছে। 'মর্তের স্বর্গ' খণ্ডে বাদল যোগ দেয় কমিউনিষ্টদের শিবিরে। সে বুঝতে চায় সর্বহারাদের, বুদ্ধি দিয়ে, জীবনের গতিশীলতায় যাচাই করতে চায় সাম্যবাদ, শোষণহীন সমাজের রূপকে। ক্যাপিট্যালিজম্ ফ্যাসিজম্-এর প্রধান বিরোধী সে। 'অপসরণ' খণ্ডে সুধীন্দ্রকে বাদল যে কথা বলে, তাতে তার জীবনের গতিশীলতার অন্য এক মুখ :

'সুধীন্দ্র বলল,...... "বাদল, তুই আয়, আমার সংগে কিছুদিন থেকে আমাকে বুঝিয়ে দে এ সব। তোর সংগে অনেক তর্ক আছে।"

বাদল বলল, "না। আজকেই আমাকে ঝাঁপ দিতে হবে।"

"ঝাঁপ!" সুধী চমকে উঠল।

"হাঁ। জনসাগরে তলিয়ে গিয়ে এই সমস্যার তল খুঁজব—এই শোষণ সমস্যার ও এর রুধিরহীন সমাধানের।"[৮৮]

যে বাদল স্বাধীন থেকে তার আদর্শের, তার মানবতার সত্যসন্ধানে সমগ্র উপন্যাসে অস্থির থেকেছে, সমস্ত ব্যক্তি-সম্পর্ক বিসর্জন দিয়ে সন্ন্যাসীর মত বড় জীবনের ও সে সূত্রে ভারতের সমস্ত মানুষের শ্রেণীহীন নতুন রূপের বিষয়ে ভয়ংকর সন্দিৎসু থেকেছে, সে উপন্যাসের শেষে মৃত্যুর কিছু আগে উজ্জয়িনীর পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে শুয়ে থেকেই যখন শোনে, আগে কুমারকৃষ্ণের সংগে তার প্রেম ও দেহসম্পর্কের কথা ভেবে উজ্জয়িনীর বলা কথা, 'আমি আর তোমার স্ত্রী নই', তখন বাদলের কথায় তার প্রেমব্যাখ্যা স্পষ্ট হয় :

"......কেন, এ কি খুব নতুন কথা। আমি স্বাধীন হলে কি তুমিও অগত্যা স্বাধীন হও না? বিয়ের বাকি থাকে কী করে?"

"তাই নয়, আমি—"

"বলে যাও।"

"আমি আরেকজনকে ভালোবাসি।"

"এই কথা।" বাদল ফুৎকার করল। "তুমি যদি বুর্জোয়াদের মতো প্রেম বলে একটা আকাশ কুসুমের আবাদ করতে চাও তাতে আমার কী? বুর্জোয়াদের বিশ্বাস ওরই নাম নাকি অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া।"

"আর তুমি? তুমি কি বুর্জোয়া নও?"

"না, উজ্জয়িনী।" বাদল দীপ্ত কণ্ঠে বলল, "যে প্রচণ্ড প্রেরণা, elan vital জীবসৃষ্টির মূলে তাকে আমি ক্ষীয়মাণ বুর্জোয়াদের মতো ক্ষীণ করতে চাইনে। সে তো খেলা নয়।'[৮৯]

বাদলের প্রেম-ব্যক্তিত্ব ও গতিশীল জীবনের বড় সীমাহীন মানবতার আদর্শের প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে এইরকমই শেষতম ধারণা ও বিশ্বাস। বাদলের চরিত্রভিত্তিতে আছে লেখকের পক্ষে এক সত্যের তীব্রতম অনুসন্ধিৎসা। তা-ই তাকে 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে সবচেয়ে অস্থির ও তাড়িত করেছে। 'অপসরণ'-এর সবশেষে উজ্জয়িনীকে বলা তার সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে বাঁচাবার কথায় প্রধান লক্ষ্য:

'সে রোগের নাম ক্যাপিটালিজম্, তার ব্যাসিলির নাম প্রাইভেট প্রফিট। তারই দাওয়াই খুঁজতে গিয়ে আমার অসুখ বাধল। সেও মরবে, আমিও বাঁচব না।"[৯০]

'মর্তের স্বর্গ' ও 'অপসরণ'—ছুটি খণ্ডেই বাদল-উজ্জয়িনীর প্রেম-সম্পর্কের পাশাপাশি আছে বাদলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নারীবাহিনীর অগ্রগামী হওয়ার পর উজ্জয়িনীর সুধীন্দ্রের প্রতি প্রেমের আকর্ষণের সংক্ষিপ্ত ছবি। সুধীন্দ্রের থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যৌবনের স্বাভাবিক ধর্মেই উজ্জয়িনী তার অন্যতম অনুরাগী কুমারকৃষ্ণ দে সরকারের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। দে সরকারের আগাগোড়া তাই লক্ষ্য। প্রথমে তার তীব্র কামনা, দেহ-ভোগাকাঙ্ক্ষা, শেষে প্রেমের পরিশীলিত রূপ। দে সরকার প্রাগ থেকে ফিরে এসেই উজ্জয়িনীর সংগে যোগাযোগ করে। কুমারের প্রেমের আবেদন-নিবেদনের কাছেও উজ্জয়িনীর স্বাধীনচিত্ততা এতটুকু কমেনি:

"আমার ইচ্ছা নেই গৃহিণী হতে, গৃহস্থালী চালাতে। দেশে যদি হোটেল না থাকে, ধর্মশালা আছে, কারাগার আছে। আমাকে রান্না করতে, ধুদির হিসাব রাখতে, জামা-কাপড় সেলাই করতে হবেনা। ছেলে মানুষ করা দূরে থাক ছেলের মা হতে আমি নারাজ। কাজেই আমাকে ও নিয়ে পীড়াপীড়ি কোরো না। আমার যদি মন যায় তবে আমি এমনি তোমার ঘরে হাজির হব।"[৯১]

এই হল উজ্জয়িনীর প্রেমিকা ও স্ত্রী হিসেবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি। তবু কুমারের

প্রেম ও আকাঙ্ক্ষার শিকার হয়ে থাকতে রাজি হয় উজ্জয়িনী একসময়ে। সুধীন্দ্র-অশোকা-স্নেহময় রায়চৌধুরী প্রসঙ্গটিও প্রেমকথার আর একদিক 'মর্তের স্বর্গ' ও 'অপসরণ'—খণ্ড দুটি-তে। সেখানে প্রেমের আর এক ব্যাখ্যা। অশোকার ভালোবাসার ভাবনায় সুধীন্দ্রের অশোকাকে বলা কথা,—"ভালোবাসার চেয়েও বড় জিনিস আছে। সেও ভালোবাসার সামিল, কেন না ভালোবাসাকে আরো বড করে, আরো বড় পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, সম্পূর্ণতা দেয়।" সুধীন্দ্র বাদলের মতই আর এক সত্যের সন্ধানে অন্বিত পুরুষ। সে অশোকাকে সেই আদর্শের পথে এনে জীবনের থেমে থাকায় রাজি নয়। অশোকা সুধীন্দ্রের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তার প্রার্থী স্নেহময়কেই শেষে স্বীকার করে নেয়, কারণ, অশোকা ভাবে :

'অশোকার কি এতখানি মনের জোর আছে যে সুধীকেও হারাবে, স্নেহময়কেও তাড়াবে? সুধী যদি তার সহায় হতো, তা হলে সে মাকে চটাবার ঝুঁকি নিত, মা চটলেও বাবা বুঝতেন যে অন্যায় করেনি। কিন্তু সুধীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে স্নেহময়কে প্রত্যাখ্যান করলে সে মা-বাবার সামনে দাঁড়াবে কোন ভরসায়? কার জোরে?'[৯২]

অশোকা উজ্জয়িনীর মত তীব্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যময়ী নারী নয়, যে প্রেমে প্রয়োজন বোঝে। অশোকা প্রেমের রিক্ততায় স্নেহময়কে আশ্রয় করেছে, উজ্জয়িনী তার জীবনের রিক্ততার মধ্যে একসময়ে কুমারকৃষ্ণকে সব দিয়ে গ্রহণ করেও গভীর যন্ত্রণা নিয়ে মুমূর্ষু বাদলের কাছে থাকতে চেয়েছে। বাদলের প্রতি স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা, দে সরকারের প্রতি প্রেমিকার আকাঙ্ক্ষা—দুই আকাঙ্ক্ষাই উজ্জয়িনীর প্রেমজীবনে যে গরিমা দেয়, তা বিষাদঘন অন্ত জীবনের গৌরব। বাদল-উজ্জয়িনীর প্রেম ও উজ্জয়িনীর স্বাধীন সত্তাকে বাঁচিয়ে, পৃথক রেখে সেই প্রেমভিত্তিকে দেহ-মন দিয়ে স্বীকৃতি দান—এতেই অন্নদাশংকর রায় প্রেম সম্পর্কে স্বতন্ত্র প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি রেখেছেন 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে প্রকাশিত শেষ দুই খণ্ডে। অন্নদাশংকর রায় বুদ্ধি দিয়ে গতিশীল বিশ্বজনীন স্বভাবে দীপিত জীবনের সর্বাংগীণ প্রযোগের মধ্য দিয়েই প্রেমকে বুঝতে চেয়েছেন। অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের প্রেম-চিন্তার সংগে তাঁর ভাবনার মৌল পার্থক্য এখানেই।

প্রবোধ কুমার সান্যালের 'নদ ও নদী' উপন্যাসের প্রেমিক নায়ক বীরেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী তিরিশের দশকের এক আদর্শবাদী আবেগবান পুরুষ। যে সময় রাজনীতিতে যুবকদের পক্ষে নিরন্তর হতাশার কাল, বীরেশ সে সময়ের যুবক। তার প্রেম বিবাহের নিয়মে বড় হয়ে ওঠে না, বিবাহহীন প্রেমকে গ্রহণ করে ব্যক্তিগত আদর্শে দেশসেবার

মহিমার পক্ষে মহত্তম প্রেরণা হয়ে ওঠে। বাবার কঠিন শাসন-নির্দিষ্ট আদেশটুকু শুধু পালন করেই একদিন লীলাবতীকে বিয়ে করে বীরেশ, কিন্তু প্রেম ও তন্নিহিত তীব্র রোমান্টিক আকর্ষণ কলেজের সহপাঠিনী নলিনীকে কেন্দ্র করে স্থিতপ্রজ্ঞ থাকে বলেই লীলাবতীকে অস্বীকার করে ফুলশয্যার রাতেই। বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহেও তার সবল কণ্ঠ। বোহেমিয়ান জীবনে পা বাড়িয়ে দেবীপুর, নবনগর—একে একে সব জায়গায় বীরেশ তার গ্রামসেবা, জনসেবা, দেশসেবাকে মূর্ত করে চলে। তার জীবনে আসে দেবীপুরের হাকিম অনিল সেনের যুবতী স্ত্রী অনুশীলা।

অনুশীলা এক রোমান্টিক আত্মলুপ্ত প্রেমিকা রমণী যে বীরেশের বীরত্বব্যঞ্জক বাইরের সেবাময় জীবনে সব কিছু অকাতরে দিয়ে দেয়, সংসার-জীবনকে করে কেন্দ্রচ্যুত, সেবার জীবনকে বীরেশের সান্নিধ্যে থেকে গ্রহণ করে যথার্থ প্রেমিকার গরিমায়। অনুশীলার প্রেম অন্য ধাতুতে নির্মিত। তার ঔজ্জ্বল্য প্লেটনিক প্রেমের দীপ্তিতে। অসুস্থ অবস্থায় বীরেশের সংগে তার সংলাপ বিনিময়ে তারই সচিত্র স্বীকৃতি :

'বীরেশের হাতখানা কঠিন মুঠিতে ধরে সে বলল, তোমাকে কোথাও রেখে আমার স্বস্তি নেই, তা জানো ?

ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হয়ে বীরেশ দাঁড়ালো। তারপর সস্নেহে অনুশীলাকে ধরে বিছানায় বসিয়ে বললে, রোগা শরীরে এ তোমার সইবে না, অনু। আমার নামে সব লিখে দিয়ে তুমিই ত' চলে যাচ্ছ, তবে আবার কান্না কেন ?

দুই হাতে মুখ ঢেকে অনুশীলা বললে, না। কোথাও আমার যাবার ইচ্ছে নেই। ......আমি ছাড়তে পারবো না তোমাকে, আমি ছাড়তে চাইনে অনিলকে। তুমি কেবল আমার চারিদিকে ঘিরে থাকো। যেখানেই যাও তুমি ডাক দিও আমাকে, সব ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াবো তোমার পাশে।

উত্তেজিত কণ্ঠে বীরেশ বললে, কিন্তু এসব কথা বলতে নেই যে অনুশীলা।

বলতে আছে, নিশ্চয় আছে, আজ সব মুখোশ খুলে পড়ুক। যা বলেছি এতক্ষণ সব মিছে, কোনো রাক্ষসীর হাতেই তোমাকে তুলে দিতে পারবো না।......আমি যাবো তোমার সংগে, আমাকে নিয়ে চলো।

কোথায় যাবে ?

যেখানে হোক, যে দেশে হোক। তোমার পালাবার সব পথ আমি আগলে থাকবো—অনুশীলার কণ্ঠস্বর যেন আর বাঁধ মানছিল না।'[২৩]

অনুশীলার প্রেম-ভাবনায় আছে আবেগ, সব কিছু সংসার সমাজ ভেঙে দেশের সেবার ও বীরের বীরত্বের গরিমা-দানের আন্তরিক বাসনা। বীরেশের বোহেমিয়ান আবেগ

তাড়িত আদর্শের জীবনে অনুশীলার প্রেম একটা প্রবল প্রেরণা, আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের পক্ষে শক্ত মাটি।

কামগন্ধহীন বাসনামালিন্যহীন দেহাতীত প্রেমের সম্পর্কই রচিত হয় বীরেশের সংগে নলিনীর হৃদয় সম্পর্কে। প্রবোধ কুমার সান্যাল প্রেমকে জটিলতম মনস্তত্ত্বে জড়াননি, তার অন্ধকার জগতকে নিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার গভীর গোপন সম্পর্কে কোন বিকার, অসুস্থতা ভাবেন নি। তাঁর প্রেমভাবনায় নেই কোনো বুদ্ধিনির্ভর দেনা-পাওনার হিসেব নিকেশযা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় পাই। নলিনীর সংগে বীরেশের সংযোগ সেই প্রেম—যা নায়কের জীবননীতির সাপেক্ষ। নলিনী হয়েছে বীরেশের পক্ষে আর এক প্রেরণা। লীলাবতী অগ্নিসাক্ষী করা বিবাহিতা স্ত্রী হলেও, সে জীবিত থাকলেও নায়কের পক্ষে পুরীর নির্জন সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে নলিনীকে একথা বলায় কোন দ্বিধা থাকে না, 'স্ত্রীর চেয়েও তোমার বড় পরিচয় আমার কাছে উদ্ঘাটিত, তুমি আমার সহধর্মিনী, জীবনসঙ্গিনী।'[৯৪] উপন্যাসের সবশেষে প্রেমের যে চিত্র তা লেখকের প্রেমাদর্শের, প্রেমবোধের বাঞ্ছিত পূর্বপ্রতিষ্ঠিত রূপেরই সজীব আলেখ্য:

'বালুবেলায় যতদূর দৃষ্টি চলে জনমানব কোথাও নেই। কম্পিত হাতখানা বাড়িয়ে নলিনী বীরেশের হাত ধরে বললে, ওঠো।

বীরেশ উঠে দাঁড়ালো। নলিনী তাকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মাথা রেখে বললে, এ ছাড়া আর কোনো আশ্রয়ই আমার মনে ওঠেনি, তাই ঘুরেছিলুম পথে পথে। তোমার বনস্পতির মধ্যে এতকাল পরে বাসা পেলুম, এই ছিল আমার সাধনা।

বীরেশ তাকে নিবিড় আলিঙ্গন করে সজল কণ্ঠে কেবল বললে, আমিও এতকাল পরে সার্থক হলুম নলিনী।'[৯৫]

প্রবোধ কুমার সান্যালের নায়ক নায়িকার প্রেম ব্যক্তির প্রয়োজনে ঘর বাঁধেনি, দেশের প্রয়োজনে ঘর ভেঙেছে। অনুশীলা জীবনে সফল স্বামী পেয়েও প্রেমে সংসার ছেড়ে পথে নেমেছে, পথে ঘুরে বেড়িয়েছে নলিনীও। বীরেশের প্রেম দেশসেবায় পথ প্রান্তে পেয়েছে তার নিজ সিংহাসন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে প্রেম বিষয় নিয়ে উপন্যাস লিখতে বসে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর নায়ক-নায়িকাদের সংসার-বিচ্ছিন্ন উদাসীন করেন নি প্রবোধকুমার সান্যালের নায়ক-নায়িকদের মত। 'নীলাঙ্গুরী'র উপন্যাসের মীরা, শৈলেন, সৌদামিনী তার প্রমাণ। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় নর-নারীর প্রেম-সম্পর্কে তাদের জটিল মনের গভীর গহন লোকের যৌনতা, বিকৃতি, দেহ-সর্বস্বতা থেকে বরং শ্রেণীবৈষম্যে গড়া

সমাজের যুবক যুবতীর অন্তর্গূঢ় শ্রেণী-সচেতনা ও হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা —দুয়ের দ্বন্দ্বকেই প্রধান লক্ষ্য করেছেন। ব্যারিস্টারের মেয়ে মীরা তার ছোটবোন তরুর দরিদ্র গৃহশিক্ষক ও তাদেরই বাড়ি আশ্রিত শৈলেনকে ভালবাসে। কিন্তু তার স্বাধীন-হৃদয়-স্বাতন্ত্র্য ঘটনার সংঘাতের মধ্যে বার বার ধাক্কা খায় অর্থ-নৈতিক-সামাজিক শ্রেণীলালিত আভিজাত্যবোধ, বংশের অভিমানের দেয়ালে। এই দুয়ের সংঘাতে সে শৈলেনকে সম্পূর্ণ প্রেমে স্বীকার করতে অত্যন্ত দ্বিধান্বিত। শৈলেন নিজের শ্রেণী সম্পর্কে সচেতন যেমন, তেমনি নিম্নমধ্যবিত্ত মানসিকতায় ভীরু, অস্বস্তিকর অবস্থায় মধ্যেও মীরার প্রতি গভীর প্রেম-মনস্কতাকে লালন করে চলে। শৈলেনের বাল কৈশোর কালের সহজ খেলার সঙ্গিনী, উত্তরকালের প্রেমিকা সৌদামিনী শরৎচন্দ্রের হাত থেকে ঘুরে-আসা আর এক নারী, যার মধ্যে 'দেবদাসে'র পার্বতীরই গোপন মানসিকতার বিদ্রোহাত্মক প্রকাশ্য রূপের প্রতিচিত্রণ। শৈলেনের বন্ধু অনিলের লেখা শেষ চিঠিতে তারই প্রতিলিপি :

'সদু ওর স্বামীকে—জীবনের সব রকম সফলতার প্রতিবন্ধককে—একদিনের জন্যেও ভালোবাসেনি। ভেতরে ছিল ঘৃণা, ওপরে ছিল ঔদাসীন্য, এমন একটা নির্বিকার ঔদাসীন্য যা ভেদ করে কারুর নজর ওর নিদারুণ ঘৃণার স্তরে পৌঁছতে পারত না। কিন্তু আমি জানতাম ওর ঘৃণা অধৈর্য দিন দিন কতই না উৎকট হয়ে উঠছিল, কেন-না আমার মনের বিদ্রোহের একটা সাড়া পাচ্ছিলাম ওর মধ্যে।'[৯৬]

শৈলেনের প্রেম সব সময়েই ছিল বাইরের প্রকাশে আড়ষ্ট, সন্ত্রস্ত, অপ্রস্তুত অবস্থা ও অস্বস্তিকর চেতনার মধ্যেই। মীরাদের বাড়ি থেকে শেষ বিদায়ের সময়—যখন মীরার বিয়ে অন্যত্র ঠিক হয়ে গেছে, শৈলেনের কাছে মীরার অশ্রুসজল স্বীকৃতি মীরার অব্যক্ত স্বভাবেরই এক ব্যক্ত রূপ :

"নিজের উচ্ছ্বসিত শোক যথাসাধ্য দমন করিয়া মুখটা আরও নামাইয়া বলিলাম, "মীরা, কেঁদ না। আমি তোমায় সুখী করতে পরতাম না, কিন্তু আমি দুর্বল, মন স্থির করে উঠতে পারছিলাম না, এ-ই ঠিক হয়েছে।"

মীরা তেমনি উবুড় হইয়া ক্রন্দনের ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে বলিয়া চলিল :

"না, না, এই করেই আপনি আমার সর্বনাশ করলেন, আর বলবেন না···আমি নিজেকে ঠিক করে ধরতে পারিনি আপনার সামনে, কিন্তু আপনি কেন চিনে নিলেন না?······বাইরে যা পেলেন সত্যিই কি মীরা তাই?—বলুন······আমার সর্বনাশের মধ্যে থেকে আমায় কেন জোর করে টেনে নিলেন না?····· কেন?···আমি কি এটুকুও আপনার কাছে আশা করতে পারতাম না? বলুন···বলুন···"[৯৭]

প্রেমিকের কাছে মীরার এই আকুলতা, আর্তির প্রকাশের মধ্যেই আছে প্রেম-দুর্বল হৃদয়ের সর্বস্ব-সমর্পণ। অন্যদিকে নায়ক শৈলেনের ভাগ্যে নেমেছে রোমান্টিক বিচ্ছেদ-বেদনাজাত বিষাদের গভীর ছায়া। একটি নীলার পাথর ডাকঘর মারফৎ অপরিচিতার কাছ থেকে উপহার পেয়ে, তাকে আংটিতে বসিয়ে অনামিকায় ধারণ করেই তার সান্ত্বনা, তা ঘৃণা ও ভালবাসা—দুই হৃদয়ভাবের বৈপরীত্য থেকে জাত এক জটিল প্রেম-উপলব্ধি, ঐকান্তিক এবং ব্যক্তিগতভাবে আত্মিক। অনিলের চিঠি পড়ার পর শৈলেনের সর্বশেষ স্বীকৃতি :

'এই আমার ঘৃণায় মেশানো ভালবাসা। এরই মধ্যে অপর দিক থেকে সৌদামিনী আসিয়া আমায় দিতে চাহিয়াছিল খাঁটি সোনা। তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার সংগে আমার অপরাধের কথাটা স্বীকার করিয়া রাখিলাম। লইতে পারি নাই, তাহার কারণ ভালবাসা নিখাদ সোনা দিয়াই লইতে হয়। আমার স্বর্ণ আগেই দেওয়া হইয়া গিয়াছিল—মীরাকে। এ অদ্ভুত দান প্রতিদানকে কোন্ দেবতা অলক্ষ্যে থাকিয়া নিয়ন্ত্রিত করেন? ...

ঘৃণায় মেশানো এই আমার ভালবাসা। অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে? আমারও হয় এক এক সময় সন্দেহ—এত বিরুদ্ধ দুইটি জিনিস সত্যই কি জীবনে একদিন হাত ধরাধরি করিয়া আসিয়াছিল?'[৯৮]

'অদর্শনা' উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু এক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক মানস কুমার পালিতের সঙ্গে এক রেডিওর প্রখ্যাত গায়িকা মালবিকা রায় ওরফে কালীতারা চৌধুরীর প্রেম-সম্পর্ক অভিনব পদ্ধতিতে এঁকেছেন। লেখকের কথায় সমগ্র উপন্যাসটি লিখিত। উপন্যাস-মধ্যে মানস পালিত লিখছে :

'আমার এই প্রেম পরিচয়ের কিংবা প্রতিদানের কোনো অপেক্ষা রাখে না, এ আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ। · প্রেমে পড়া ব্যাপারটিকে যদি আবেগের নিবিড়তা দিয়ে বিচার করতে হয়, তা হলে আমার এই প্রেমে কোনোখানে এতটুকু ফাঁক নেই। ......মালবিকা রায় আমার জীবনে অদর্শনা থাকুন, যেটুকু পেয়েছি তাই নিয়েই আমি খুশি।'[৯৯]

কালীতারা চৌধুরী নামটা পুরনো বলেই বান্ধবী মালবিকা রায়ের নাম নিয়ে রেডিওয় গান গেয়ে বিখ্যাত। মানস পালিত তার সত্যিকারের গুণমুগ্ধ 'ফ্যান্'। কালীতারাও মানস পালিতের ভক্ত। উপন্যাসের শেষে মানস জানতে পারে কালীতারাই মালবিকা রায়, বান্ধবী মালবিকা রায় গান গায় না, অথচ সেই মালবিকা রায়ের প্রতি গানের কারণেই, মানসের আকর্ষণ, শেষে তা ভেঙে যায়। মালবিকা সরোজকে বিয়ে করে।

লেখকের মানসকন্যা মালবিকা রায় কালীতারা চৌধুরী হওয়া সত্ত্বেও প্রেম ও বিবাহ কালীতারাতেই নির্দিষ্ট থাকে উপন্যাসে। প্রেমমনস্কতায় কোন জটিলতা আনেননি লেখক। সহজ সরলভাবেই কালীতারাকে বলা মানস পালিতের মুখের কথায় লেখক চরিত্রের প্রেম গূঢ়তার বক্তব্য রেখেছেন উপন্যাসের শেষতম বাক্যে :

'প্রথম যখন তোমাকে দেখেছিলাম তখন তোমার চেহারা চোখে পড়েছিলো, কিন্তু এখন আমি তোমাকেই দেখি, তোমার চেহারা তো আর দেখতে পাইনে '[১০০]

প্রেমিকার গুণ আর প্রেম—দুই নিয়েই বুদ্ধদেব বসুর প্রেমিক তৃপ্ত থাকতে পারে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অবশ্যই প্রেম-বক্তব্যে চরিত্রের অন্তর্নিহিত আত্মাভিমানকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন তাঁর 'যায় যদি যাক' উপন্যাসে। সুজন সেবাকে যুদ্ধের সময়ে যখন সেবার বাড়ির সবাই কলকাতা ছাড়তে ব্যস্ত, বলেছে :

'আমি আছি, তুমি আছ, আজকের দিনে এই সত্য এই অনুভূতিই জাজ্বল্যমান থাক।'[১০১]

এমন ভালবাসার প্রতিশ্রুতি থেকেই সুজন ও সেবা—দু'জনেই প্রেমকে বড় করে রাখে। সুজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নায়ক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে সেবাও নিম্নবিত্তের এক নায়িকা। যুদ্ধের ভয়ে সপরিবারে গ্রামে আশ্রয় নিয়ে সেবা জমিদার পুত্র বারিধির সঙ্গে গ্রামসেবায় নামে। বারিধির সঙ্গে দেহগত সম্পর্কে সে দ্বিধাহীন হয় না। কারণ পরিবেশ এ সবেরই অনুকূল। কিন্তু সে অন্যের সন্তানের জননী ভেবেও আশ্রয় পায় কলকাতায় সুজনের কাছে। সুজন উদার প্রেমিক বলেই সেবার জননী হওয়ার খবরে বলতে পেরেছে অন্যকথা :

'ঘৃণা নয়, তার করুণা হল নতুন করে। বললে, সন্তান কখনো অবৈধ হয় না। অবৈধ তার বাপ-মা।'[১০২]

মন্বন্তরের জ্বালাময় অসহায় পরিবেশেও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নায়ক প্রেমে আশাবাদী :

'স্বামীর স্পর্শময় স্নেহোচ্ছ্বাসে ধুয়ে যেতে যেতে সেবা বললে, 'আমি আছি তোমার পাশে। আমরা এখন দুজন।'

'আমরা বহুজন।'[১০৩]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রেমে ধরা নায়ক-নায়িকা কখনোই প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। সেবা বারিধির শত প্রলোভনকেও সরিয়ে দেয়। যুদ্ধের দিনে, মন্বন্তরের মধ্যে স্বামীর শুশ্রূষার জন্যেই সে দেহদানে উন্মুখ, রাস্তায় বসতেও তার আপত্তি নেই। লেখক প্রেমের সঙ্গে আদর্শকে নিবিড় করেছেন। অচিন্ত্যকুমার প্রেমে জটিল প্রেম-মনস্তত্ত্বের থেকে আবেগ ও আদর্শতাড়িত রোমান্টিক প্রেমবক্তব্যকে উপন্যাসে উজ্জ্বল

করেছেন। তাঁর প্রেমিক নায়ক-নায়িকারা শত বিপদের দিনেও প্রেমের মর্যাদা ও আত্মমর্যাদার কঠিন মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে অভ্যস্ত। শিক্ষয়িত্রী পুরশ্রীর প্রেম যেমনস্বজনের কাছে মূল্যহীন, মূল্যহীন তেমনি বারিধির সমস্তরকম উজাড় করে সেবার সান্নিধ্য পাওয়ার প্রবলতম লোভ, লালসা।

'উপনিবেশ' উপন্যাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নতুন গড়ে-ওঠা চর ইসমাইলের আদিম প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রেমকে এঁকেছেন সমান আদিমতা ও বেগ দিয়ে। তাঁর চরে নবাগত সরকার হাকিম বিবাহিত মণিমোহন ও বর্মী যুবতী মা-ফুনের যে প্রেমাকর্ষণ তা যেমন মদের মতই মত্ততার রূপ নেয়, তেমনি লিসির জন্য অপেক্ষমান জোহানের প্রেমরূপের বিপরীত বর্মী কর্তৃক তার বীভৎস-খুনের রূপ—দুয়ের মধ্যেও সেই প্রেমরূপের আদিম মত্ত স্বভাব। চর ইসমাইলে এসে গ্রামের বিধবা যুবতী, আশ্রিতা মুক্তর সঙ্গে প্রৌঢ় কবিরাজ বলরাম ভিষকরত্নের যে দেহভোগ ও সন্তানের জন্ম, তারও প্রাকৃতিক পরিবেশের পারবশ্যতা প্রমাণিত। যে কালবৈশাখীর অন্ধ ঝড়ের পরিবেশে মণিমোহন বর্মী বিবাহিতা তরুণী মা ফুনের অংকশায়ী হয়, নিজের মোহকে ভোগে পরিতৃপ্ত করে মণিমোহন, সেই কর্মকাণ্ডের শেষে লেখক মণিমোহনের মানসিক অবস্থা বর্ণনায় লিখেছেন :

'ইহাদের প্রেম ভালোবাসা নয়, উপনিবেশের বন্য ও উদ্দাম কামনার আগুন জ্বালিয়াছে। এ আগুনে জ্বলিয়া সুখ আছে কিনা কে জানে,কিন্তু অন্ধকারে মণিমোহন স্পষ্ট একটানা জলজ্বলে ছোরা যেন চোখের সামনেই দেখিতে পাইতেছিল।'[১০৪]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রেমের সঙ্গে আদিমতা ও দেহভোগের উদ্দামতা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় আঁকতে সিদ্ধহস্ত এ উপন্যাসে।

'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসে সুবোধ ঘোষ নায়ক শিশিরের প্রেমিকা করেছেন মিতাকে। মিতাকে ভালবাসে ধনী জয়ন্ত মজুমদার। মিতা শিশিরকে চাইলেও তার চরিত্রে এমন এক আত্মস্বাতন্ত্র্যকে দেখিয়েছেন লেখক যা মিতাকে সহজ করেনি প্রেমিক হিসেবে। মিতার মনের গভীরে আছে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত জটিলতা। মিতার প্রেম সহজ-প্রকাশ্য নয়। শিশিরের সঙ্গীতপ্রীতি, দেশসেবা সবই মিতার একান্ত-কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু তবু মিতা সহজ হতে পারেনি প্রেমে। জয়ন্তর সঙ্গে মিতার একটি সংলাপ-বিনিময়ের অংশই তার প্রেমসত্তার বৈশিষ্ট্যের উপযুক্ত পরিচায়ক :

'জয়ন্ত—এ সব কথা থাক মিতা।

মিতা—তোমাকে কি এতদিন শুধু……।

জয়ন্ত—ভালোবাসতে অনেক চেষ্টা করেছ, কিন্তু ভালোবাসতে তো পারনি।

সিতা হেঁট মুখ হয়ে, যেন মাথা পেতে, এই সত্যকে ভয়ে ভয়ে স্বীকার করে নিল।

হঠাৎ মুখ তুলে সিতা একটু জোর গলায় যেন একটা কৈফিয়ৎ তলব করে বললো।—তুমি ভেবেছ যে আমি শিশিরকে……।

জয়ন্ত—না, আমি বিশ্বাস করি না যে শিশিরকে তুমি ভালবাস।

সিতা অপ্রস্তুত ভয়ে ভয়ে বললো।—তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না।

জয়ন্ত—তুমি শুধু নিজেকে ভালোবাস সিতা।'[১০৫]

সুবোধ ঘোষ সিতার চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রেমের এমন একটি দিক দেখিয়েছেন যা অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'হেঁয়ালি' নামে একটি গল্পের নায়িকার প্রেমমনস্কতার সঙ্গে মিলে যায়।

'রাত্রি' উপন্যাসে সঞ্জয় ভট্টাচার্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের প্রেক্ষিতে একাধিক যে শ্রেণীর যুবক-যুবতীর প্রেম-সম্পর্ক, প্রেমভাবনা এঁকেছেন, তারা সকলেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। বিধবা নার্স সুপ্রভার সঙ্গে কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী প্রবীরের হৃদয়-সম্পর্ক, শ্যামলীর প্রতি সুদামের আকর্ষণ, রঞ্জনের প্রতি শমীনের মাসি অমিতার হৃদয়-ভাব, শ্যামলীকে মহীতোষের পাওয়ার প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা, রত্নার সঙ্গে মহীতোষের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক—সমস্ত কিছুই লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত প্রেমভাবনায় চকিত। সমকালীন যুদ্ধচেতনা রাজনীতি-ভাবনা, গণ-আন্দোলন, মতাদর্শের বিভিন্নতাজনিত সংঘর্ষ, মন্বন্তরের ভয়াল উপস্থিতি—এসব বিষয়ে শিক্ষিত যুবকগুলির সকলেই সতর্ক, সচেতন, তবু এসবের মধ্যেই প্রেম আবর্তিত হয়েছে নানারঙে, নানা ঢেউ-এ—এই রঙ ও ঢেউ স্বভাব-স্বাতন্ত্র্যে ও মনস্তত্ত্বে যাচাই করা। সুদামের সঙ্গে শ্যামলীর একদিনের এক মুহূর্তের প্রেম-সম্পর্ক চিত্রণে লেখক রোমান্টিক :

"কি দেখছ?" শ্যামলীর গলায় একটা রমনীয় ক্লান্তির রেশ।

"তোমার চোখ।"

"আমার চোখ দেখতে ভালো নয়।"

"ভালো।"

"ভালো নয় তবু কেন ভালো বলছ?"

"ভালো নয় কেন?"

"মেয়েদের চোখ আরো কতো ভালো হয়।"

"ঠিক তেমনি ভালো তোমার চোখ।" সুদাম একটা হাত বাড়িয়ে দিল শ্যামলীর দিকে।

হাতটা নিজের মুঠোতে নিয়ে শ্যামলী বললে : "না। আমার যা খারাপ তাকে কেন ভালো বলবে তুমি। বলবে খারাপ। খারাপ জেনেও আমাকে ভালোবাসতে হবে।"

শ্যামলীর হাতের কোমলতায় নিজেকে হারিয়ে ফেলছে সুদাস, অনেক চেষ্টায় যেন সে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলল ঠোঁটে।

"কেমন ?" শ্যামলী দুহাতের মুঠোতে সুদাসের হাতটা উঁচুতে তুলে ধরল।

এবারও কথা বললে না সুদাস—কেবল হাতটা আরেকটু উঁচুতে তুলে শ্যামলীর ঠোঁটের উপর আঙুল বুলিয়ে আনলে।

চোখ বুজে এলো শ্যামলীর। এবার যেন তারও কথা ফুরিয়েছে।'[১০৬]

লেখকের কলমে আছে প্রেমভাবনার সঙ্গে রোমান্টিক কবিতার অনুভূতি ও ভাষা। জটিল মনস্তত্ত্বের অন্ধকারে বেশী ডুব না দিয়ে যুবক-যুবতীর প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে অসাধারণ কাব্যময় ভাষা ও সিচুয়েশান সৃষ্টিতে লেখক অনন্য। এক নিঃসঙ্গতার মধ্যে প্রেমিকা অমিতা—শমীনের মাসির একান্ত নিজস্ব অস্থিরতার চিত্র লেখক এঁকেছেন এইভাবে :

'আলো জ্বালল না অমিতা। অন্ধকারেই বিছানায় গা এলিয়ে দিল। ক্লান্তি নয়, বরং একটা অদৃশ্য বেগের আবেগ থর থর করে কাঁপিয়ে তুলছিল তার সমস্ত শরীর। শরীর ছাপিয়ে অশান্ত কান্নায় রূপ নিল সেই থর থর আবেগ। এতো ভালো লাগছিল কাঁদতে অমিতার, বুকের ভেতরটা এতো হাল্কা হয়ে উঠছিল যে মনে হল সারারাতই বুঝি ও এভাবে কাঁদতে পারবে।'[১০৭]

এই প্রেমভাবনার কবিত্ব অতুলনীয়। বন্ধুদের মধ্যে প্রেমিকা নির্বাচন নিয়ে গোপন প্রেমে নিঃসঙ্গ ঈর্ষাকে এঁকেছেন লেখক প্রবীর ও সুপ্রভার প্রেম-সম্পর্ক প্রসঙ্গে তৃতীয় প্রেমিক মহীতোষের অস্তিত্ব রচনা করে :

'মহীতোষ নিজেকে খুব চমৎকারভাবে মেয়েদের সামনে উপস্থিত করতে পারে—সুপ্রভার সামনেও ঠিক তেমনি সে উপস্থিত হয়েছিল সিনেমায়। মহীতোষের সঙ্গে যাতে সিনেমার শেষে সুপ্রভার দেখা না হয় সে ব্যবস্থা প্রবীর করেছিল কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তাতে বিশেষ লাভ হয়নি। ইন্টারভেলের ওই সময়টুকুর দেখাই যে যথেষ্ট হবে—তাতেই যে সুপ্রভার স্মৃতিতে এসে জমা হয়ে থাকবে মহীতোষ, এ ব্যাপারটা আবিষ্কার করে একটু বিমর্ষই হয়ে পড়ল প্রবীর।'[১০৮]

সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনস্তত্ত্বের জটিলতা দিয়ে প্রেমকে আঁকেননি, সহজভাবেই মনের বিশ্লেষণে প্রেমকে কাব্যময় ও রোমান্টিক করেছেন 'রাত্রি' উপন্যাসের চরিত্রগুলির প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণে।

চার

প্রেমের কথায় রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে প্রজ্ঞাঋদ্ধ, বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর গল্পে। তাঁর প্রেমের গল্পের লক্ষ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের কোন নৈতিক অবক্ষয় নয়, সামাজিক পতন ও পচনও নয়, মূলত গভীর মনস্তত্ত্বের আলোয় ফেলা ব্যক্তির চরিত্রের আত্মিক উদঘাটনই সেখানে একমাত্র সত্য। প্রেম ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে, সামাজিক ও নৈতিক ভাব-ভাবনাকে কোন পরিশীলিত মননের জগতে স্থিত করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের এক বছর পরে লেখা গল্পে রবীন্দ্রনাথ তার স্বর্ণফলক রেখে গেছেন 'তিনসঙ্গী' গ্রন্থের গল্প তিনটিতে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন বাংলাদেশের দ্বারে বিশাল ছায়া ও কায়ার মিলিতরূপ নিয়ে এসে দাঁড়ায়, তখন সমাজ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমমনস্কতার দিকটি লেখকদের চিত্তে নানাভাবে স্বাতন্ত্র্য দাবী করে। এই সময়ের লেখকদের রচনায় তার প্রমাণ। প্রেম মনোবিকলনে অভিনব হয়েছে অন্নদাশংকর রায়ের 'দু কান কাটা' গল্পে শ্লেষের তীব্রতায়। প্রবোধ কুমার সান্যাল প্রেমকে নর-নারীর চিরকালীন দেহধর্ম থেকে রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতায় সুদূরের অভিযাত্রী করেছেন 'প্রমীলার সংসার' উপন্যাসে, 'গুহায় নিহিত' গল্পে। নবেন্দু ঘোষ টগর-শশীর প্রেম দিয়ে যেমন শ্রেণী-সচেতনার চমৎকার স্বাক্ষর রেখেছেন, তেমনি প্রেমের মহত্তম জীবনধর্মী উত্তরণের স্বভাব-পরিচয় দানের কারণেই ঘৃণ্য বেশ্যাপল্লী ও বেশ্যার জীবন থেকে বর্ণময়মুখর পরিবেশে দুটি জীবনের ময়লাকে যেন ধৌত করতে করতে বড় জীবনের আলোয় এনে রাখতে উৎসুক।

প্রেমের গল্পে বহুবিচিত্র বর্ণের খেলা দেখা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে প্রেমকে যুক্তি-তর্কে যাচাই করে তার মূল্য বেঁধে দিতে চান, তারাশংকর ('বেদেনী' গল্পে) তাকে অসম্ভব প্রশ্নহীন আবেগ ও গতিতে বেগবান, গতিমুখর করতে চান। কোন নীতি, সমাজ, সুস্থ-অসুস্থ বোধ—এসব ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়, মূল্যহীন হয়ে যায় তারাশংকরের নায়ক-নায়িকাদের কাছে। সরল, সহজ জীবনের ভাষ্য আছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রেমকথায়। জটিল মনস্তত্ত্ব ও আভিজাত্যবোধ প্রধান হয়ে ওঠে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নায়িকা মীরার কূলহীন কান্নার মধ্যে। বনফুল কয়-বেণী শ্লেষ ও ব্যঙ্গের ক্ষুরধার শিখাকে প্রোজ্জ্বল রেখেছেন তাঁর একাধিক গল্পে ('তপন', 'চান্দ্রায়ণ' ইত্যাদি গল্প লক্ষণীয়)। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মানস-বিকৃতিকে প্রকট করেছেন প্রেমের কথায়। মধ্যবিত্ত জীবনের নৈতিক অধঃপতন, অবক্ষয়, পচন, দেহগত সম্পর্ককে নানাভাবে নানা দিক থেকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস আছে বনফুল,

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ কুমার সান্যাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ প্রমুখের গল্পে। অন্নদাশংকর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মননশীল প্রেমের ব্যাখ্যায় লেখনী ধরেছেন বলে মনে হয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নায়ক-নায়িকারা প্রেমে পরস্পরের প্রতি আমরণ নিষ্ঠাবান থাকতেই অভ্যস্ত 'যায় যদি যাক' উপন্যাসে। অনেকাংশে পারিবারিক সারল্য ও সহজতা দিয়ে প্রেমকে আঁকতে অভ্যস্ত বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রেম এমন একটি বিষয় যা সর্বকালের সাহিত্যিকদের করেছে তাড়িত। এই অধ্যায়ের আলোচনার সূত্রপাতেও বলেছি, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের জন্মলগ্নের প্রধানতম সর্তেই ছিল নরনারীর অবৈধ প্রেম ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে লিখতে বসে লেখকরা সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে যে সরল ও জটিল, সহজ ও কঠিন প্রেমভাবনার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন বাংলা কথাসাহিত্যে, তার প্রতিতুলনা কমই মেলে। 'তিলে তিলে নূতন হোয়' যে প্রেম, তা সমকালের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশে, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কৃত্রিম যন্ত্রণায় নানা বাধার সম্মুখীন হবে, প্রকাশে অভিনবত্ব পাবে, তা-ই প্রমাণ করেছেন প্রেমকথার উপস্থাপনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের সাধারণ ও কৃতী উভয় শ্রেণীর কথাকারগণ।

দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন পরিবেশে প্রায়শই প্রেম সময়-সচেতন থেকেছে নিশ্চয়ই, তবে তার জটিলতম রূপ রচনার জন্য যে ঐতিহাসিক দূরত্ব ও নিরাসক্তি দরকার, তার জন্য যুদ্ধ-পরবর্তী কালই যথার্থ সময়। যুদ্ধ-সমকালীন সাহিত্যিকরা শুধু তার প্রদীপটুকু জ্বেলেছেন মাত্র।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

১ Cassel's Encyclopoedia of Literature Edited by S. H Steinbery (vol I) P 387

২-৬ 'যুগধর্মের অন্তদিক' (বৈশাখ, ১৩৩৯) প্রবন্ধ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'চিন্তয়সি' গ্রন্থ (১৯৫৩) পৃ ৭৩, ভূমিকা, 'সমাজধর্ম ও সাহিত্য' (১৩৩৫ সাল) প্রবন্ধ পৃ ১১৩. ১১২, ৯৪

৭ 'পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প' গ্রন্থ : মুখবন্ধ সুবীরকুমার রায় চৌধুরী সম্পাদিত পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ জানু ১৩৭০ পৃ ১১

৮ 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা জীবনানন্দ দাস শ্রেষ্ঠ কবিতা (প্রথম মুদ্রণ মে ১৯৫৪) পৃ ৭৫

৯ 'সিনেমার দারিদ্র্য পাঁচতারার ডিনার' প্রবন্ধ পূর্ণেন্দু পত্রী ফিচার—চলচ্চিত্র উৎসব/দিল্লী আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫৯ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ পৃ ৪

১০ 'পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প' গ্রন্থ : মুখবন্ধ পৃ ১১

১১ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (প্রথম সংস্করণ) মৈত্রেয়ী দেবী পৃ ১৯২

১২ .'রোমান্টিক রবীনাথের আবির্ভাব' প্রবন্ধ ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার 'রবীন্দ্র অন্বেষা' গ্রন্থ (বৈশাখ ১৩৭৯) পৃ ১১২-১১৩

১৩-১৮ 'রবিবার' গল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তিনসঙ্গী' গ্রন্থ (১৩৬২) পৃ ১৬, ১৬, ১৩, ৩২, 'শেষকথা' গল্প পৃ ৫৭, 'ল্যাবরেটরি' গল্প পৃ ১১৫

১৯ 'রবীন্দ্র সঙ্গ' গ্রন্থ (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭) ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার 'গল্পগুচ্ছের নারী : অবরোধ থেকে মুক্তি' প্রবন্ধ পৃ ১৪

২০,২১ 'দু' কান কাটা' গল্প অন্নদাশংকর রায় 'গল্প ১৯২৯-১৯৫০ গ্রন্থ প্রথম সংস্করণ ১৩৬৭ পৃ ১৪৬-১৪৭, ১৫৪

২২ 'হেঁয়ালী গল্প ঐ পৃ ১৬৭

২৩ 'বরের ঘরের পিসী কনের ঘরের মাসী' গল্প ঐ পৃ ২১১-২১২

২৪ 'গুহার নিহিত' গল্প প্রবোধ কুমার সান্যাল 'অঙ্গার' গ্রন্থ পৃ ৭২

২৫ 'অন্ধ' গল্প ঐ পৃ ১২৩-১২৪

২৬, ২৭ 'উচলে চড়িনু' গল্প সুবোধ ঘোষ 'পরশুরামের কুঠার' গ্রন্থ (প্রথম প্রকাশ ১৯৪২) পৃ ১৩১, ১৩৫,

২৮-৩১ 'পরশুরামের কুঠার' গল্প ঐ পৃ ১৫, ১৬-১৭, ১৭-১৮, ১৯-২০

৩২ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ৬৪৬

৩৩, ৩৪ 'গরল অমিয় ভেল' সুবোধ ঘোষ 'পরশু রামের কুঠার' গ্রন্থ পৃ ৮৬,৯০

৩৫ 'বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ধারা, উত্তরভাগ' ১ম পর্ব ভূমিকা ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৩ পৃ ৮

৩৬-৩৯ 'সায়াহ্ন' গল্প প্রবোধকুমার সান্যাল 'সায়াহ্ন' গ্রন্থ, ১ম সংস্করণ ১৯৪৪ পৃ ৮, ৯, ১২, ১৫

৪০ 'মানসী' গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নিষ্ফল কামনা' কবিতা পৃ ১৪

৪১-৪৩ 'সায়াহ্ন' গল্প প্রবোধ কুমার সান্যাল 'সায়াহ্ন গ্রন্থ (১ম সংস্করণ, ১৯৪৪) পৃ ২০-২১, ৬০-৬১, ৬৫,

৪৪ 'অহল্যার অহং' গল্প প্রবোধ কুমার সান্যাল ঐ পৃ ১১৫

৪৫ মাঝি' গল্প নরেন্দ্র ঘোষ 'এই সীমান্তে' (১৯৪৫) গ্রন্থ পৃ ২০

৪৬-৪৮ রাত্রি' গল্প ঐ পৃ ৩০-৩১, ৪১-৪২, ৪২

৪৯ 'জয়ংকর' গল্প মাণিক গ্রন্থাবলী (৫ম খণ্ড) পৃ ৪০৯

৫০-৫২ 'বেদেনী' গল্প তারাশংকর গ্রন্থাবলী (৪র্থ খণ্ড) দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফাল্গুন, ১৩৮৪ পৃ ৪২২, ৪২৩, ৪২৮

৫৩ 'বাকুল বদল' গল্প 'বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থ (১৩৬৩) পৃ ১১০, ১১১-১১২, ১১২

৫৪-৫৬ 'নয়মাবা ও আমি' গল্প বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৬৬) ৫ পৃ ১১০,-১১১-১১২, ১১২

৫৭ 'তপন' গল্প বনফুল রচনাবলী (৬ষ্ঠ খণ্ড) পৃ ২৬৩

৫৮, ৫৯ 'কালকূট' গল্প শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানুয়ারী, ১৯৪৪ পৃ. ১২, ১৬

৬০ 'দাম্পত্য আলাপ' গল্প বুদ্ধদেব বসু 'খাতার শেষ পাতা' গ্রন্থ (১৯৪৩) পৃ. ১৭-১৮

৬১, ৬২ 'অনৈক কাপুরুষের কাহিনী' গল্প প্রেমেন্দ্র মিত্র 'মহানগর' গ্রন্থ (আষাঢ, ১৩৫৩) পৃ. ৮৬, ৮৬

৬৩ 'আয়বধূ' গল্প সুবোধ ঘোষ 'গ্রাম যমুনা' গ্রন্থ (বৈশাখ, ১৩৫১) পৃ. ২০

৬৪-৬৮ মোহানা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ পৃ. 'নিবেদন' অংশ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৬৯, একাদশ পরিচ্ছেদ ২০৫, ২০৫

৬৯ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ৪৯৯

৭০ শতাব্দী (১৯৪৫) রমেশচন্দ্র সেন তৃতীয় ভাগ পৃ. ৩০৪-৩০৫

৭১-৭৩ 'প্রবীণার সংসার' প্রবোধকুমার সান্যাল পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৬৪ পৃ. ২-৩, ৮৭, ১৩৮-১৩৯

৭৪ 'ধরা বাঁধা জীবন' মাণিক গ্রন্থাবলী (৪র্থ খণ্ড) পৃ. ২৬২

৭৫ 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থ (১৯৭৬) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ৩২৫

৭৬ 'দুই বাড়ি' উপন্যাস বিভূতি রচনাবলী (২য় খণ্ড) প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৮৪ পৃ ৬১১

৭৭ 'বিপিনের সংসার' উপন্যাস বিভূতি রচনাবলী (২য় খণ্ড) পৃ. ৫০৮

৭৮ রাত্রি (ফাল্গুন' ১৩৫১) বনফুল দশম পরিচ্ছেদ পৃ. ১৬০

৭৯ জঙ্গম (২য় খণ্ড) বনফুল (ভাদ্র ১৩৫৪) দ্বিতীয় অধ্যায় পৃ. ১১৮-১১৯

৮০-৮২ বিষের ধোঁয়া (তৃতীয় সংস্করণ, আষাঢ, ১৩৫৩) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচ্ছেদ ১৬ পৃ. ১১২ ১০৫, পরিচ্ছেদ ২১ পৃ. ১৭২, পরিচ্ছেদ ২২ পৃ. ১৮৪

৮৩ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা পৃ. ৬৬৪

৮৪, ৮৫ 'কোপবতী' প্রমথনাথ বিশী দ্বিতীয় সং, ১৩৫৩, অগ্রহায়ণ প্রথম খণ্ড, অষ্টম অধ্যায় পৃ. ৩৭, দ্বিতীয় খণ্ড ষোলো অধ্যায় পৃ. ২২৬

৮৬, ৮৭ মর্তের স্বর্গ (আষাঢ, ১৩৭৪) অন্নদাশঙ্কর রায় অধ্যায় 'শত্রুতা' ৪ পৃ. ৬৩, অধ্যায় 'বাগবিধি' ২ পৃ. ১২৯

৮৮-৯২ অপসরণ (আশ্বিন, ১৩৬৩) অন্নদাশঙ্কর রায় অধ্যায় 'ঝাঁপ' ৯ পৃ. ৮৪, অধ্যায় 'আমার কথাটি ফুরল' ৬ পৃ. ৩২২, ৩২৩, অধ্যায় 'অপ্সরা' ৭ পৃ. ২৩৭, অধ্যায় 'বাগদান' ৫ পৃ. ২৩

৯৩-৯৫ 'নদ ও নদী' উপন্যাস প্রবোধকুমার সান্যালের রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) আষাঢ়, ১৩৮৪ পৃ. ১৪২-১৪৩, অধ্যায় তেরো পৃ. ২১১, ২১১,

৯৬-৯৮ নীলাঙ্গুরীয় (মাঘ, ১৩৮৭ সংস্করণ) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় অধ্যায় : 'মীরা-সৌদামিনী' ১৫ পৃ. ২৫৩, ২৫১-২৫২, ২৫৫

৯৯, ১০০ 'অর্চনা' উপন্যাস বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (৬ষ্ঠ খণ্ড) অধ্যায়-২ পৃ ৩৮২, ৪৭৮

১০১-১০৩ 'যায় যদি যাক' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অধ্যায় ২ পৃ ৩২, অধ্যায় ৮ পৃ ৫৪, অধ্যায় ১৭ পৃ১০৯

১০৪ উপনিবেশ (১ম পর্ব) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম সংস্করণ, মে, ১৯৪৪ অধ্যায়-'ফসল ৫ পৃ ১২০

১০৫ 'তিলাঞ্জলি' সুবোধ ঘোষ পৃ ২৫৩

১০৬-১০৮ রাত্রি সঞ্জয় ভট্টাচার্য অধ্যায় ১৯৪০ এক পৃ ১৩২-১৩৩, অধ্যায় ১৯৪০ তিন পৃ ১৮৪, অধ্যায় ১৯৩৯ তিন পৃ. ১০৮

নবম অধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয়ে বিবিধ আস্বাদ-বৈচিত্র্য

এক

যাঁরা সতর্ক, সচেতন, সহৃদয় লেখক, তাঁরা কখনোই পাঠকদের কথা ভেবে লেখেন না। একটা বিশেষ সময়ে 'এ্যাভারেজ' এবং 'ইনটেলেকচুয়াল'— দুই গোষ্ঠীর পাঠকই কি জানতে বা বুঝতে চাইছেন, কথাসাহিত্যে জীবনের কোন্ পাঠ গ্রহণ করতে উৎসুক, তীক্ষ্ণবুদ্ধিজীবী কথাসাহিত্যিক সে কথা না ভেবে সম-সময়ের যুগধর্ম ও তাগিদ, সমাজের রূপ ও রূপান্তর, ব্যক্তির চারিত্র্য ও স্বতন্ত্র মানসধর্ম—এ সবের গভীরতম অভিজ্ঞতা থেকে নুড়ি নির্বাচন করে আপন অন্তরের তাগিদে, হয়তবা ব্যাপক জীবনদর্শনে (Philosophy of life) নিজের মননকে নিবিষ্ট রেখে কথাসাহিত্যের পসরা সাজান। একথা গতানুগতিক লেখকদের ক্ষেত্রে কোনক্রমেই প্রযোজ্য নয়। গতানুগতিক লেখকরা বিষয়ে জীবনের বিলাস-রঙিন মুহূর্তগুলিকেই পাঠকদের ইচ্ছাপূরণের শর্তে ও স্বার্থে সত্য করে সহজ সুরে বলতে সচেষ্ট। সচেতন লেখকরা সর্বদিক থেকে সংগ্রামী জীবনের নিগূঢ় অর্থ-অনুসন্ধানে থাকেন তৎপর।

এই তৎপরতা একই বিষয়ের কেন্দ্রে ঘোরে না, উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিষয়ে বৈচিত্র্য এনে, বলা যায়, একধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিষয়কে নানাভাবে গ্রহণ করেন তাঁদের রচনায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের প্রধান ঘটনাগুলি আমরা আগেই বলেছি। সেই প্রধান বিষয়গুলি থেকে সম্পূর্ণ সরে থেকেই গতানুগতিক কম-ক্ষমতাসম্পন্ন লেখকরা গাল-গল্পের কথাসাহিত্য রচনা করে গেছেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন নবাগত লেখকরা একাধিক ক্ষেত্রে বিষয়ে বৈচিত্র্য আনতে ও নিজের লেখার স্বাদ বদল করতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট বিষয়গুলি বাদেও গল্প-উপন্যাস রচনা করে গেছেন। সমকালের সমাজ-জীবন-ব্যক্তির রূপান্তরচিত্রে সেগুলি হয়ত অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ নয়, কিন্তু বাংলা কথা-সাহিত্যের বিষয়-বর্দ্ধনে ও তার অভিনব স্বাদ দানে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

অবশ্য একথাও ঠিক, যুদ্ধ-সমকালের লেখকরা সময়ের প্রধান ঘটনাগুলি থেকে, তার রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে চোখ ফেরাবার অবকাশ সব সময়েই পাননি। সমাজ-সচেতনা ও রূপান্তর-নীতির দায়িত্ব চেতনা তাঁদের বাধ্য করেছে সমকালীন মূল বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হতে। তবে উপন্যাস ও ছোটগল্প সম্পর্কে যে মূল কথাটি প্রযোজ্য, একজন সমালোচকের সেই মন্তব্যটি সেই সূত্রে এখানে উল্লেখ করি—'......nobody knows

anything about the laws of fiction, or what its relation is to life, or to what effects it can lend itself. We can only trust our instincts.'[১]

লেখকদের মন ও মেজাজ যেখানে প্রধান কথা, সেখানে একটি সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনে বাঁধা রাষ্ট্রের বুর্জোয়া কথাসাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে নিজেদের মেজাজের তাড়নাতেও কিছু নিজস্ব লেখার জন্ম দেওয়া স্বভাব সঙ্গত ঘটনা বলেই আমরা মনে করি। কথাসাহিত্যের যে আস্বাদ-বৈচিত্র্য আমরা দেখি, তা যেমন লেখকদের জীবন-ভাবনার সুগভীর প্রয়োজনবোধ থেকে দেখা দিতে পারে, তেমনি আবার মন-মর্জি ও মেজাজ থেকেও দেখা দিতে পারে। কথাসাহিত্যের ভিন্ন স্বাদ বস্তুত লেখকের স্বতন্ত্র মেজাজ থেকে উদ্ভূত। খ্যাতকীর্তি লেখকদের মেজাজ যে কিভাবে তাঁদের বিখ্যাত গল্প-উপন্যাস, এমন কি তার মধ্যেকার প্রতীকগুলি নির্মাণে প্রবলভাবে তাড়িত করে, তার সংবাদও এক সমালোচক দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। ফ্লবেয়ার ও টলস্টয়ের রচনার জন্ম প্রসঙ্গে ভার্জিনিয়া উল্ফ্ দুটি সংবাদ দিয়েছেন, 'Flaubert spends a month seeking a phrase to describe a cabbage · Tolstoy writes War and Peace seventimes over.'[২]

দুজনেই পৃথিবী-বিখ্যাত লেখক, দুজনের গ্রন্থই একটি সময়ের দলিল হয়েও সময়াতীত কালের পতাকা বহন করে চলে। কিন্তু কথাসাহিত্যের আস্বাদে গভীরতম শিল্পরস সৃষ্টিতে দুজনের মানসিক যন্ত্রণা, শ্রম ও প্রয়াস রচনাকে অন্য অভিনবত্ব দান করে।

আমাদের কথা হল, কথাসাহিত্যের বিষয়ভাবনা কোন নিয়ম মেনে চলে না। কথাসাহিত্যিকরাও কোন নির্দিষ্ট সময়ের নির্দেশ সব সময়ে বিষয়-নির্বাচনে ব্যস্ত থাকেন না। মন ও মেজাজ তাঁদের মাঝে মাঝে হয় অন্যতম নিয়ন্ত্রক শক্তি। এই কারণেই বাংলাদেশের যুদ্ধ-সমকালের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যেও কথাসাহিত্যের বিষয় গ্রহণে ইতস্তত ভ্রমণ করার মানসিকতা লক্ষ্য করি। ঠিক বিষয়ের পরিবর্তন নয়, বিষয়কে নির্ভর করে লেখক-মনের বিবর্তনই এখানে লক্ষ্য করার মত।

যুদ্ধ-সমকালে যে বড় বড় ঘটনার ভার সময়কে চরম অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে ফেলেছিল, তাতে বাংলাদেশের লেখকরা সনিষ্ঠ হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু চরম মানসিক ব্যস্ততা ও চাপের মধ্যেও একটু সময় অন্যবিষয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করেছেন। যুদ্ধ-সমকালেই আগত সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ যুগচেতনায় যেমন তাত্ত্বিক দৃষ্টি দিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, তেমনি কিছু যুগ-বিচ্ছিন্ন কিছু ভিন্ন বিষয়েও কথাসাহিত্য লিখেছেন। কল্লোলের সময় থেকে লিখতে শুরু করা লেখকরা এই সময়ে যে নানা বিষয়ে ভাবিত হয়েছেন, তারাশংকরের 'কবি', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল',

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাণুর কথামালা', মনোজ বসু, প্রবোধ কুমার সান্যাল প্রমুখের একাধিক গল্প-উপন্যাস তার প্রমাণ দেয়। যুদ্ধ-সমকালে বসে সোমেন চন্দের মত তরুণতম লেখকও ফ্যাসিবিরোধী বক্তব্য নিয়ে গল্প লিখতে বসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে নিয়ে গল্প লিখে বিষয়ে স্বাদবৈচিত্র্য এনেছেন পরোক্ষে, কারণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তখন যুদ্ধ-উত্তরকালে ছেচল্লিশ সালের ঐতিহাসিক ষোলোই আগষ্টের দাঙ্গার মত কখনই ভয়াবহ, বীভৎস ও সর্বমানবতাবিধ্বংসী রূপ হয়নি। তা ছিল হঠাৎ-হঠাৎ শুধুমাত্র রাজনৈতিক মুনাফা লুঠে নেওয়ার হাতিয়ার মাত্র।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তথাকথিত নেতার চরিত্র, প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিচিত্র ব্যবসায়ী চরিত্র, বিবাহিত নর-নারীর রোমান্টিক সম্পর্ক-ভাবনার ছবি, এ্যাডভেঞ্চার জাতীয় জটিল মনোবিকলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের দুঃসহ কারাগার-জীবনের অভিজ্ঞতা, একটি রেলওয়ে স্টেশনের কাছাকাছি সাধারণ হোটেলের রাঁধুনী ব্রাহ্মণের দুঃখ-বেদনার কথা, মধ্যবিত্ত মানুষের পারিবারিক জীবনের হাস্যকর অসঙ্গতি, গোয়েন্দা রসের বিষয়, গ্রামের ঝুমুর দল, অলৌকিক রস—এমন বহু বিচিত্র বিষয়কে গ্রহণ করে অভিনব স্বাদেব গল্প-উপন্যাস লিখেছেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, অন্নদাশংকর রায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, সরোজ রায়চৌধুরী, পরিমল গোস্বামী, প্রমথনাথ বিশী, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পরশুরাম, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অপেক্ষাকৃত তরুণ সোমেন চন্দ প্রমুখ। কল্লোলীয় ও কল্লোল-উত্তর নবাগত লেখকরা অনেকেই উপন্যাসে ও গল্পে কিছু প্রাসঙ্গিক চিত্র হিসেবেও দাঙ্গা ইত্যাদির মত ঘটনাকে এবং অন্যান্য বিষয়কে গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে দেখা গেছে, বাংলা কথাসাহিত্য নানাদিকে বিষয়ের বিচিত্র পসরা নিয়ে হাজির হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল তাতে প্রথম সূত্র জোগায়। কিন্তু আলোচ্য সময়ের লেখকদের বিষয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রয়াসে সচেতন চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ ছিল না, থাকার কথা নয়। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের ছয়টি বছর এত বেশী আড়ষ্ট-চকিত ও ব্যস্ত ছিল অন্যান্য রূঢ় জীবন-বিধ্বংসী ঘটনায় যে, লেখকরা মানসিক অবসর যাপনের সময়ও পাননি, তাই যুগধর্মের প্রধান বিষয় থেকে সরে এসে আপন আলাপনের মত স্বতন্ত্র বিষয় খোঁজায় সময় দিতে পারেন নি। কথাসাহিত্যের আঙ্গিক ভাবনায় যেমন সচেতন হবার সুযোগ হয় নি তাঁদের, তেমনি বিষয়কে কিছুটা অবসরের বিলাসে, কিছুটা কথাসাহিত্যের বিষয়-পরিধি-বৃদ্ধির দায়িত্ব পালনের তাগিদেও তাঁরা সময় ও সুযোগ পাননি। যাঁরা যেটুকু পেয়েছেন, তাঁদের হাতে

যে বিষয়-বৈচিত্র্য আমরা দেখি, তা যুদ্ধ সমকালের প্রেক্ষাপটে রচিত যেমন, তেমনি নিশ্চয়ই উত্তরকালে বিষয়-বৈচিত্র্য ও আস্বাদ-অভিনবত্ব সৃষ্টির সূত্র নির্দেশকও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন নানা বাস্তব ঘটনার বিপরীতমুখীন স্রোতের মধ্যে পড়ে বাংলা কথাসাহিত্য কতটা স্বাদে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পেরেছে প্রধানত বিষয়ের দিক থেকে, আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের পরবর্তী আলোচ্য অংশের গল্প ও উপন্যাসের বিষয়গুলিই তার উপযুক্ত সাক্ষ্য দেবে।

দুই

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে পিষ্ট ভারত তথা বাংলাদেশের দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একজন প্রত্যক্ষদর্শী লেখক যে সোমেন চন্দ, তা তাঁর 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থভুক্ত 'দাঙ্গা' নামের গল্পটি স্পষ্ট প্রমাণ দেয়। এই গল্পে সামান্য একটু প্রত্যক্ষ দাঙ্গার চিত্র আছে, যা একপক্ষের। অর্থাৎ একদল ভীরু, কাপুরুষ পিছন থেকে একজন অসহায় অপরিচিত মানুষকে অতর্কিতে খুন করে নোংরা প্রতিহিংসার প্রতিশোধ নেয়:

'...দুটি ছেলে এসে হাজির, তাদের মধ্যে একজন কোমর থেকে একটা ছোরা বের করে লোকটার পেছনে একবার বসিয়ে দিলো। লোকটা আর্তনাদ করে উঠল, ছেলেটি এতটুকু বিচলিত হলো না, লোকটির গায়ে যেখানে সেখানে আরও তিনবার ছোরা মেরে তারপর ছুটে পালালো, কুকুর যেমন লেজ তুলে পালায় তেমনি ছুটে পালালো। লোকটা আর্তনাদ করতে করতে গেটের কাছে গিয়ে পড়লো, তার সমস্ত শরীর রক্তে ভিজে গেছে, টাট্‌কা লাল রক্ত একটু আগে দেখেও মনে হয়নি এত রক্ত ঐ কঙ্কালসার দেহে আছে।'[৩]

দাঙ্গার এই বীভৎস এবং স্বল্প প্রত্যক্ষ-চিত্রটি এঁকেই লেখক এমন সব ঘটনার মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন নায়ক অশোকের চরিত্রে:

'দাঙ্গা দমনে নেমেছে সৈন্য। তার ফলে পরিপার্শ্বের চেহারা যেন কোন যুদ্ধের শেষ অথবা কোন সাম্রাজ্যবাদের শেষে শঙ্খধ্বনি, বার্ধক্যের বিলাপ।'[৪]

নায়ক অশোক জীবনে ও রাজনৈতিক মতবাদে সুস্থতা, বলিষ্ঠতায় বিশ্বাসী, তীব্র আশাবাদী, বাড়িতে চাকরী-করতে-যাওয়া বাবা বুঝিবা সাম্প্রদায়িকতার লক্ষ্য হয়েছে এই আশংকায় অশোকের মা, ভাই মীনু শঙ্কিত, ভটস্থ। অশোক ভিতরে বিব্রত, কিন্তু তবু তার শপথ:

'......আগামী নূতন সভ্যতার যারা বীজ তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমি যোগ

দিয়েছি, তাদের সুখ-দুঃখ আমারও সুখ-দুঃখ। আমি যেমন বর্তমানের সৈনিক, আগামী দিনেরও সৈনিক বটে।

সেজন্য আমার গর্বের আর সীমা নেই। আমি জানি, আজকের চক্রান্ত সেদিন ব্যর্থ হবে, প্রতিক্রিয়ার ধোঁয়া শূন্যে মেলাবে। আমি আজ থেকে দ্বিগুণ কর্তব্যপরায়ণ হলাম, আমার কোন ভয় নেই।'[৫]

অশোকের ভাই অজয় বিশ্বাস করে আগামী দিনের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিতে, যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারে না এমন বিকৃত, মানবতাবিরোধী সংঘর্ষের মূল কারণ কোথায়? দাঙ্গার কারণে তীব্র মানসিক অশান্তির মধ্যে অজয়কে কঠিন ভর্ৎসনা:

'ফ্যাসিষ্ট এজেণ্ট। বড়লোকের দালাল। আজ বাদে কালের কথা মনে পড়ে যখন 'হিন্দু মুসলমান ভাই বোনরা' বলে গাধার ডাক ছাড়বি? তখন তোর গাধার ডাক শুনবে কে? পেট মোটা হবে কার? ষ্টুপিড, জানিস দাঙ্গা কেন হয়? জানিস প্যালেস্টাইনের কথা? জানিস আয়ারল্যাণ্ডের কথা, মূর্খ?'[৬]

গল্পের শেষে লেখক আবার এক রক্তপাতের ঘটনার ইঙ্গিত দিয়েছেন:

'কার দেহ থেকে এই রক্তপাত হয়েছে কে জানে? অশোকের চোখে জল এলো, সব কিছু মনে পড়ে গেল। সে চারিদিক ঝাপসা দেখতে লাগলো, ভাবলো এই চক্রান্ত ব্যর্থ হবে কবে?'[৭]

এমন অসহায় প্রশ্ন দিয়ে গল্পের উপসংহার টেনে সোমেন চন্দ বস্তুত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পিছনকার অশুভ-শক্তি-ধ্বংসের কথাকেই লক্ষ্য রেখেছেন। সাম্প্রদায়িকতা সত্য নয়, হতে পারে না, তার মানবতা-বিরোধিতাকে সমূলে ধ্বংস করার চেষ্টাই হবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-ভাবনার লক্ষ্য। সোমেন চন্দ 'দাঙ্গা' গল্পে সেই বড় মানবতাকেই অশোক চরিত্রে চিহ্নিত করেছেন।

মনোজ বসুর 'দুঃখ নিশার শেষে' গল্প সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা' গল্পটির নামকরণ থেকেই বোঝা যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিবেশই এই গল্পের প্রধান ভিত্তি এবং সেই ভিত্তিতেই দাঙ্গাজনিত মানব জীবনের করুণ পরিণতি এঁকেছেন লেখক। মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার আয়োজনে জেল ফেরত স্বদেশী বিপিনের ছেলে সুকুমার ও স্ত্রী নিজের বাড়িতেই বাইরের দরজায় তালা দিয়ে ঘরের ভিতরে বদ্ধ আশ্রিতকে রেখে যে বিপদ সৃষ্টি করে তা বস্তুত দাঙ্গার আত্মবিধ্বংসী রূপকেই তুলে ধরে। রাতের অন্ধকারে প্রতিপক্ষ ভেবে বিপিনের স্ত্রী ও পুত্র সুকুমার বাড়ির সামনে বর্শা ছুঁড়ে মেরে জখম করে সে সুকুমারের বাবা বিপিনই। আহত বিপিনকে দেখে বিপিনের স্ত্রীর কথা:

'জেলে গিয়েছিলেন এই পোড়া দেশের মানুষের জন্তে। জেলে জেলে জীবন খোয়ালেন, কি হল ?'[৮]

গল্পের একেবারে সিদ্ধান্তে লেখক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঊর্ধ্বে আসন্ন মহান ভ্রাতৃত্বের কথা, মানুষের মানবতার নবজাগরণের দিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন :

'বিপিন ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, সকালের দেরী কত নীরদ ?

এই তো পোহাতি তারা উঠেছে, পুবে ফরসা দেবে এবার।

প্রশ্ন করেই আহত অর্ধসচেতন বিপিন আবার কি একটা ভাবতে লেগেছিল। নীরদের কথায় তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হাঁা পুবে ফর্সা দিচ্ছে, সূর্য উঠছে, মানুষ মানুষকে চিনবে, ঐসব পোড়া ঘরবাড়ির ছাইয়ের গাদায় ফুল ফুটে উঠবে।'[৯]

গল্পটির নায়ক যে কথা ভাবে তা আদর্শ চিহ্নিত হলেও সেই আদর্শের শক্তভিত্তি অবশ্য গল্পের ভিতরে প্রত্যক্ষভাবে নেই। মনে হয় লেখক স্বকপোলকল্পিত অথচ একান্ত কাঙ্খিত আদর্শকে বিপিন চরিত্রে আরোপ করায় গল্পটির রসমূল্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে করি। উত্তরকালে লেখক সমরেশ বসুর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ওপর লেখা 'আদাব' গল্পে যে মহত্তম মানবিকতার রোমাঞ্চকর রূপ, তার কোন পূর্ব রূপের শিল্পীত ভিত্তি এ গল্পে নেই।

'নেতা মহিমার্ণব' গল্পের মধ্যে অন্য রস লক্ষনীয়। এখানে মহান নেতা হয়ে ওঠা সুশীলের অতীত, একান্ত গোপন এক অন্তর্জীবনের কথা বলতে গিয়ে লেখক অনিলার সঙ্গে তার প্রেম, অনিলাকে বিষমিশ্রিত চিঠি পাঠিয়ে দুজনের একসঙ্গে আত্মহত্যার কথা বলা, নিজে বিষ খেয়ে পরে বিবাহের ব্যবস্থায় সুরমা নামে অন্য মেয়ের সঙ্গে বিবাহ ঘটানো, প্রচুর সম্পত্তি ও দেশসেবার মাধ্যমে বড় ও মহান নেতা হয়ে ওঠার কথা, মধ্যে স্ত্রী সুরমার মৃত্যু ইত্যাদি প্রসঙ্গ এনেছেন। গল্পটির নায়ক সুশীলের জীবনের গোপনতম অভ্যন্তরে আছে প্রেমের খেলার জটিলতা এবং তাকে আড়াল করে লেখক তার মহানুভবতার দিক এঁকেছেন প্রকাশ্যে। সুশীলের বন্ধু শংকরকে ভালবেসেও শেষে তাকে বিবাহ না করে সুশীলের পানিপ্রার্থী হওয়ার বাসনার মধ্যে অনিলার বোন নির্মলার যে মানসিকতা তা তীব্র শ্লেষাত্মক। গল্পটি নিছক প্রেম ও প্রেমহীনতার গল্প হতে পারত, যদি নির্মলার বলা তার দিদির বিষ খাওয়ার কাহিনীটি শংকরের কাছে বলার কারণেই। মহিমার্ণব নেতা সুশীল হলেও তার সমস্ত খ্যাতির পিছনে এমন এক বিরাট কলংক আছে, যার কাছে তার সমস্ত নেতৃত্বের গর্ব, গৌরব ও গরিমা, আভিজাত্য ও শুভ্রতা মুখোশ বর্জন করে বীভৎস-করুণ হতে পারে মুহূর্তে। তার একমাত্র সাক্ষী নির্মলাই। তাই গল্পের শেষে নির্মলার কথা ও একটানা হাসি প্রেমের জটিলতার থেকে

নেতৃত্বের নিষ্ফলত্বকেই সত্য করে তোলে। মনোজ বসু একটি বিশেষ ধরণের চরিত্র এঁকে মানুষের স্বভাবের অভিনব অথচ জটিল রূপ উপহার দিয়ে গল্পে ভিন্নরসের আস্বাদ দিয়েছেন।

অন্নদাশংকর রায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে অদ্ভুত সব চরিত্র সৃষ্টি করে কথা সাহিত্যের বিষয়ে লক্ষণীয় বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর 'জখমী দিল' গল্পের নায়ক 'নন্দা দেবী রেস্টোরেন্টে'র মালিক মল্লিকজী এবং 'অজাতশত্রু' গল্পের নায়ক এক মাননীয় অতিথির যে চরিত্র-চিত্রেব সঙ্গে আমরা পরিচিত হই, তা মানবজীবন রহস্যের সঙ্গেই ওতপ্রোত এক একটি রহস্যময় মানুষ। যে মল্লিকজী এককালে ছিল একজন জাঁদরেল রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা, সে যুদ্ধের বাজারে হয় নতুন নতুন রেস্তোঁরার মালিক। টাকা খাটিয়ে টাকা বাড়ায়, দেশীয় নয়, বিদেশীদের সাহায্য ও সাহচর্য তার একান্ত দরকার। দেশপ্রীতি নয়, ইউরোপ-প্রীতিই তার একমাত্র লক্ষ্য। নতুন রেস্তোঁরা খুলবে নৈনিতালে। গল্পের সর্বশেষে তার বক্তব্য :

'আমার ওখানকার মেনু ছাপা হবে ফরাসী ভাষায়। যুদ্ধের হিড়িকে কত রাজ্যের লোক আসছে, তাদের সঙ্গ পাওয়া আমার চাই-ই চাই। আপাতত ওই আমার সঞ্জীবনী'[১০] দেশ তার কাছে কতটা জরুরী? 'দেশ যখন তৈরী হবে তখন আবার আসব।'[১১] দেশসেবার অভিজ্ঞতা থেকে আন্তর্জাতিক ব্যবসাদার হওয়ার মত মল্লিকজীর চরিত্র এঁকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে লেখক এক বিচিত্র, অভিনব চরিত্র উপহার দিয়েছেন আমাদের।

'অজাতশত্রু'র এক মাননীয় অতিথিও একদিকে যেমন জীবনে সফল, অন্যদিকে তেমনি বিফল। স্কুল জীবন, কলেজ জীবন থেকে শুরু করে কর্মজীবনেও সকলের সঙ্গে আপোষ করে যে মানুষ জীবনে সফল হল, প্রতিষ্ঠা পেল, অর্থ সম্পত্তিকে বিশাল করে তুলল, সেই মানুষই সংসারে, স্বামী-পুত্র পরিজনের কাছে অবিশ্বাসী হয়ে একা, নির্জন, নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। তার সমস্ত দিয়েও পরিবারের কাছে সে হয়ে ওঠে পরমতম শত্রু। গল্পের শেষতম সিদ্ধান্ত হল : 'সফলতার সীক্রেট হচ্ছে বিফলতারও সিক্রেট।'[১২] এই জন্মের ভিত্তিতে আঁকা মাননীয় অতিথি চরিত্রটি রহস্যময় ও বিচিত্র এবং দুর্জ্ঞেয়।

আবার সুবোধ ঘোষ প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্বকে গল্পে মূল বিষয় করে আর এক ভিন্ন স্বাদে আমাদের আপ্লুত করেছেন। তাঁর 'ন জন্মো' গল্পের বিষয় সত্যানুসন্ধিক। কল্যাণঘাটের পুরনো জমিদারীর ও খামারের মধ্যে বিষ্ণু-মন্দিরকে, তার মধ্যেকার অমূল্য মূর্তিগুলিকে বাঁচানোর জন্য মালিক উপাধ্যায়ের যে চেষ্টা, কলকাতা থেকে একমাত্র পুত্র সোমনাথকে ডেকে পাঠানো ও তারক মিত্রের মেয়ে কাঞ্চনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সংস্কারী

করে মন্দিরের তত্ত্বাবধানের জন্য ধরে রাখার প্রয়াস, শেষে বাবাকে অস্বীকার করে সোমনাথের কলকাতায় ফিরে যাওয়ার ঘটনার মধ্যে প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্বই সত্য হয়ে আছে। পুরনো পরিবেশ, দিন-অপসৃয়মান সভ্যতার অগ্রগতিতে আসবে নতুন কাল। কাঞ্চনের মত দেহবল্লরীর নারী এখন প্রাচীন, চাই তন্বী নারী, যাকে সোমনাথ তার গোপনে রাখা ফটোয় ধরে রেখেছে। গল্পের শেষে উপাধ্যায়ের শেষ চিন্তায়'এই ভাঙনের প্রতীকী ব্যঞ্জনা :

'কল্যাণঘাট যেন ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছে। শ্বেত, কৃষ্ণ, ধূম্র পাটল বহ্নিবর্ণমন্ডিত কঠিন প্রস্তরের শত শত মূর্তি কীর্তি বিগ্রহ গলে মিলিয়ে যাচ্ছে অন্তর্ধানের স্রোতে। মজ্জমান উপাধ্যায় যেন শেষ দৃষ্টি মেলে দেখছেন—তীর সরে গেছে বহুদূরে। শুধু দিক্‌প্রান্তে জেগে রয়েছে অনাম্নী সুতনুকা এক মূর্তির ছলনা। চোখে অদ্ভুত হাসি।'[১৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে গল্প-উপন্যাস লিখতে বসে একাধিক লেখক সমকালীন প্রেক্ষিতকে যেমন ওতপ্রোত করে জীবন ও সমাজের সমস্যাকে তীব্র-রক্তিম করেছেন, তেমনি আবার এসব সমস্যার জর্জরিত রূপ থেকে সরে এসে হাল্কা লঘু রস পরিবেশন করে কিছুটা 'রিলিফ' দিয়েছেন পাঠকদের। গল্পের বিষয় ও চরিত্রের অভ্যন্তরে এমন লঘুরসের উপাদান বাংলা কথাসাহিত্যের একটি ধারাকে বিচিত্রের রসাস্বাদী করেছে। মনোজ বসুর 'একদা নিশীথ কালে' সংকলনের গল্পগুলি তা-ই প্রমাণ করে।

গ্রন্থের নামগল্পটি এক বাতিকগ্রস্ত পিতার, যার চরিত্র ভাবনা ও কর্মতৎপরতার যাবতীয় অসঙ্গতিগুলি গল্পের মধ্যে নির্মল কৌতুকের স্মিত, কখনোবা উতরোল রসের প্রবাহ এনেছে। এই গল্পটি এবং অন্যান্য গল্পও লেখকের পূর্বসূরী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করায়। পুত্র নীলাদ্রি তখনো আইনের ছাত্র, কিন্তু তার বিবাহ দিয়েছেন পিতা বরদাকান্ত এক সদ্য-কিশোরী উমার সঙ্গে। বিবাহ হলে কি হবে পরীক্ষার পড়া ও তাতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য একই বাড়িতে স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থেকে নিয়মিত পড়াশুনা করতে হবে নীলাদ্রিকে। সে দিকে তীক্ষ্ণ নজর এবং কঠিন শাসন বরদাকান্তের। কিন্তু শত শাসনের কাঠিন্য সত্ত্বেও নীলাদ্রি উমা ও মা সৌদামিনীর গোপন তৎপরতায় যেভাবে শাসনের কঠিন দড়ি আলগা হয়ে যায় ভিতরে, তা বাতিকগ্রস্ত আইনজীবী পিতা গল্পের একেবারে শেষেও বুঝতে পারে না। তাই একই ঘরে বৌমা উমাকে বিছানায় নিঃসাড়ে ঘুমোতে দেখে এবং সেই ঘরে নীলাদ্রির পিতার নির্দেশমত তারস্বরে চীৎকার করে পড়তে দেখে স্ত্রী সৌদামিনীকে যখন বলে :

'দেখছ গিন্নি, একবার ফেল হয়ে তোমার ছেলের কি রকম পড়াশুনোয় চাড় হয়েছে। বারোটা কখন বেজে গেছে, পড়তে পড়তে তা হুঁশই নেই। আমি আবার

ওদিকে চুরি করে ঘড়ির কাঁটা পনের মিনিট পেছিয়ে রেখেছিলাম। নীলে এবার ঠিক পাশ হয়ে যাবে।'[১৪]

বরদাকান্তের চরিত্রের যে মৌল অসঙ্গতির দিক এঁকেছেন লেখক, তা-ই গল্পটির কেন্দ্রস্থ কৌতুক রসের গতি সঞ্চার করে।

'সর্পাঘাত' গল্পেও আছে দুর্গারাণীর মত এক মেজাজী যুবতী যাকে সামলাতে গিয়ে পিসতুতো ভাই নীরদবিহারীর বাড়িতে বসে সুধানাথ রীতিমত নাজেহাল হয় এবং শেষে নিভৃতে নিজের পায়ে দাড়ি কামাবার ক্ষুরের আঘাত হেনে সর্পাঘাতের যন্ত্রণার ভান করে দুর্গারাণীকে একেবারে জীবনের সঙ্গিনীতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়। এ গল্পের মূল রস প্রণয়, কিন্তু তার কেন্দ্রে আসতে গিয়ে দুর্গারাণী-সুধানাথের মধ্যে যে ঘটনার সক্রিয়তা—তা দুর্গারাণীর মত মেয়েটির বিচিত্র মনটিকে জীবন্ত করে।

'অভিভাবক' গল্পে মনোজ বসু এক বিচিত্র-চরিত্র পাটোয়ারী বুদ্ধিসম্পন্ন, চতুর ব্যবসায়ী অবিনাশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। লেখকের অন্যান্য গল্পের মত এই গল্পেও কোন শ্লেষ, ব্যঙ্গ নেই—যা থাকা সম্ভব ছিল, আছে নির্মল কৌতুক। কিন্তু একজন ব্যবসাদার যে কিভাবে নিজের স্বার্থটুকু সিদ্ধ করার জন্য এক সম্পূর্ণ অপরিচিত শিক্ষিত যুবতী নারীর সঙ্গকে প্রয়োজনমত কাজে লাগিয়ে শেষে এতটুকু শালীনতা বা সৌজন্য না দেখিয়ে বিদায় নিতে পারে, তার নিপুণ চিত্র এঁকেছেন লেখক ব্যবসায়ী অবিনাশের মধ্য দিয়ে। স্টেশনের অকথ্য ভিড়ের মধ্যে একেবারে অপরিচিত প্রীতিকেই সঙ্গে নিয়ে কাউণ্টার থেকে টিকিট কাটা, প্রচুর ব্যবসায়িক প্রয়োজনের মালপত্তরসহ ভিড় ট্রেনে ওঠা, জায়গা করা, প্রীতির নীরবতা ও বিস্ময়কে কাজে লাগানো, গন্তব্য স্টেশনের টিকিট কালেক্টরকে বোকা বানিয়ে স্টেশন থেকে বাইরে আসা, শেষে গন্তব্যস্থলে নেমে প্রীতির সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করে তাকে ছেড়ে পরবর্তী বাস ধরার জন্য দ্রুতগতিতে অদৃশ্য হওয়া—এসবই নির্মল কৌতুক দিয়ে লেখক এঁকেছেন। এ সব চিত্রে যেমন মজা আছে, কৌতুক উপভোগ করার মত প্রচুর অবকাশ আছে, তেমনি আছে এক ব্যবসাদারের চতুর চরিত্র বোঝার সুযোগ। গল্পের শেষ অংশে অবিনাশের রুচিহীন, সৌজন্য ও শালীনতাহীন আচরণ আরও বেশী বিস্ময়-চকিত করে আমাদের। যে অপরিচিত প্রীতির সঙ্গকে সে কাজে লাগায় ভীড়ের ট্রেন ও স্টেশনের টিকিট-কালেক্টারের প্রধান বাধা অতিক্রম করতে, সেই প্রীতিকে তার বাড়ি ফেরার মত গাড়িটি ঠিক করে দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করে না প্রীতির শেষ অনুরোধ সত্ত্বেও। টিকিট-কালেক্টারের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার পর গল্পের শেষে অবিনাশের ব্যবসায়ী চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত :

টিকিট কালেক্টার প্রীতির ক্লান্ত মুখের দিকে এক নজর চেয়ে দেখলেন, আর কিছু বললেন না।

বেরিয়ে এসে অবিনাশ হি হি করে হাসতে লাগল। বলল—হাতী ঘোড়া নেই বটে—হাতা-বেড়ি লোহা-লক্কড়ে বোঝাই। নিদেন পক্ষে দেড় মণের ধাক্কা। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে বাক্সে পুরেছিলাম, আর ভাগ্যিস আপনি সঙ্গে জুটেছিলেন—নইলে পার করে আনা মুস্কিল হত।

প্রীতি অন্য কথা ভাবছিল। সে বলল—যাই বলুন, আপনাকে ছাড়া হচ্ছে না। একটা গাড়ি করে চলুন আমাদের বাড়ি। ক্লান্ত হয়েছেন, একটু বিশ্রাম ট্রিশ্রাম করে কালকে তারপর—

—উঁহু। অবিনাশ প্রীতির হাতের বোঁচকাটা কনুয়ে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। পিছন থেকে আবার অনুরোধ এল—একটা গাড়ি ঠিক করে দিয়ে যান তবে—

উ-ই কত রয়েছে,নিন না দেখে একটা। আঙুল দিয়ে অপেক্ষমান গাড়িগুলো দেখিয়ে দিয়ে অবিনাশহন হন করে ছুটছে।

প্রীতির রাগের সীমা রইল না। বলল—লোহা-লক্কড় পার করবার জন্য আমায় সঙ্গে নিয়েছিলেন নাকি? অত যত্ন তাই বুঝি!

অবিনাশ বলল—আজ্ঞে না। কেবল লোহা-লকড় কেন—আমাকেই বুঝি আসতে দিত! দিব্যি শুয়ে বসে এলাম।...... নমস্কার। কোটচাঁদপুরের দিকে যদি কখন যাওয়া হয়, আমার দশকর্ম ভাণ্ডারে পায়ের ধুলো দেবেন একবার। ওরে বেটা পা চালিয়ে চল হর্ন দিচ্ছে।

মুটেকে তাড়া দিয়ে অবিনাশ আগে আগে বাসের দিকে ছুটল।'[১৫]

'নৌকাবিলাস' গল্পে এক দম্পতির আত্মীয়-স্বজনকে গোপন করে স্ত্রীর বান্ধবী মালতীর বিয়ের দিন সন্ধ্যের নৌকা করে বিয়েবাড়ি যাওয়ার পথে অন্যের নৌকায় পথভুলে যে বিপত্তি ঘটায় এবং সেই বিপত্তির মধ্যে দুই স্বামী-স্ত্রী—অনুপমা ও প্রভাতের মধ্যে যে রোমান্টিক সঙ্গ-মাধুর্য মধুর পরিবেশ রচনা করে, তা-ই মূল বিষয় করেছেন লেখক। 'পতি পরম গুরু' গল্প 'একদা নিশীথকালে' গল্পের অনুরূপ 'সিকোয়েন্সে' রচিত। এখানেও ঐ গল্পের উষা-নীলাদ্রির মতো নন্দলাল-মণিমালার কাহিনী রচিত। পিতা মতিলাল অল্প বয়সী বধূ মণিমালার প্রতি কন্যা-স্নেহে এবং স্ত্রীর সামনেই পুত্র নন্দর প্রতি তাচ্ছিল্যে যেভাবে দম্পতির প্রতিদিনের জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করে, তা গল্পের উপভোগ্য বিষয়। 'চক্ষু-চিকিৎসা' গল্পে মাধবীর বাবা তারাশঙ্করের নিজকন্যার পাত্র নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত বন্ধু গোপীকান্তের ডাক্তার-পুত্র নিরঞ্জনকে বাদ দিয়ে নিখিলকে সাব্যস্ত করার মধ্যে যে

সত্যিকারের আনোদয়, 'খাজাঞ্চিমশায় ও ভাইঝি' গল্পে ভোটযুদ্ধ ছেড়ে বিমানের পক্ষে গোপাল খাজাঞ্চির ভাইঝি বনমালার পাণিগ্রহণের ব্যবস্থা, 'রানীগঞ্জ, বরফের দেশ' গল্পে গ্রাম্য অজ্ঞ, সরলা স্ত্রীকে কলকাতা, রানীগঞ্জ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচুর মিথ্যাভাষণে তুষ্ট করে স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে শেষে শিয়ালদায় এসে নিজের বোকামিতে তিনকড়ির কাছে ধরা দিয়ে তিনকড়ির বাড়ি চাকরি করতে আসার সিদ্ধান্ত, 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' গল্পে বিজ্ঞাপনে 'মধু বিক্রয়'-এর স্থানে 'বধু বিক্রয়' ছাপা হয়ে যাওয়ায় যে বিভ্রাট এবং বিভ্রাটের ফলে গল্পের শেষে সুরথের সঙ্গে বিজ্ঞাপনদাতা হরিহরের মেয়ে অমলার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে জড়িত হওয়া—এই সমস্ত কিছুর মধ্যে লঘু রসের আশ্রয়ে বিচিত্র কাহিনী শুনিয়েছেন মনোজ বসু। সেই সঙ্গে নানা অসঙ্গতির মধ্য দিয়ে নানাধরণের মানুষের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটে যায়।

প্রবোধকুমার সান্যাল তাঁর 'অঙ্গার' গল্প সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত 'বিষ' গল্পটিতে গ্রামের একদা দুরন্ত মেয়ে টুনির বিবাহিত হয়ে কলকাতায় শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে থাকার সময়ে যে জটিল মানসিক অবস্থার উদ্ভব ঘটে প্রবাসে চাকুরী উপলক্ষে থাকা স্বামী অনন্তর সান্নিধ্য-বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, তার এক করুণ চিত্র এঁকেছেন। টুনির একাকীত্ব তাকে এক সময়ে উদ্ধত, বিদ্রোহী করে এবং শেষে সে আত্মহননের মধ্যে চলে আসে শ্বশুরের এক ভরি আফিঙ খেয়ে। স্বামী অনন্ত চাকরীর উন্নতির খবর নিয়ে এসে দেখে টুনিকে আত্মহননের মধ্যেকার বিষম ঘোরের অবস্থায়। টুনিকে বাঁচাতে গিয়ে অনন্ত যেভাবে টুনির অচেতন দেহকে নির্মম প্রহার করে এবং সে চিত্র লেখক যেভাবে এঁকেছেন তা এক বীভৎস রসের সঞ্চার করে পাঠক মনে।

'সেই পুরাতন,' 'কয়েকদিন' ও 'মঙ্গলশঙ্খ' গল্প তিনটি সার্থক গল্পের বিচারে নিখুঁত নয়। তবু এই তিন গল্পে লেখক একাধিক বিচিত্র মনের চরিত্র এঁকেছেন। 'সেই পুরাতন' গল্পের স্ত্রী সুহাসিনী এক অসম্ভব সহনশীলা হিন্দু বধূ। কারখানার শ্রমিক স্বামী হরিপদর উচ্ছৃঙ্খল জীবন দুজনের এক পুত্রসহ সাংসারিক জীবনকে করে উৎকেন্দ্রিক। এমন বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন সংসার জীবনে উভয়ের মিলন গল্পের শেষে মেলোড্রামাটিক হলেও করুণ, দুঃখজনক। 'কয়েকদিন' গল্পের সদ্য-পাশ করা ডাক্তার বিজু যেভাবে ট্রেনে পরিচিত এক পরিবারের ও ট্রেন থেকে নেমে বেনারসে তাদেরই এক শিশুকন্যা ছবিকে স্নেহের সূত্রে পরিবারটির অসহায় অবস্থায় প্রধান ভরসাস্থল হয়, তা অভিনব। গল্পের শেষে যে বধূটি কয়েকদিন ধরে এক রহস্যময় জটিল মোহ সঞ্চার করেছিল বিজুর মনে, সেই বধূর ফিরে-আসা স্বামীকে দেখে, তাদের সংলাপ-বিনিময়ের স্বচ্ছতায় বিজুর আশাভঙ্গ হওয়ার বিষণ্ণ পরিবেশ পাঠকদের কিছুটা সমবেদনায় আহত করে:

'বিনু তা'র ব্যাগ আর বিছানা নিয়ে বেরিয়ে গেল ভারবাহী পশুর মত। পথ অনেক দূর। সারাদিন যেখানেই হোক তাকে কাটাতে হবে। সন্ধ্যার সময় ট্রেন।

একটা যন্ত্রণাদায়ক বন্ধন থেকে এবারে সে অবারিত মুক্তি পেয়ে বাঁচলো। কিন্তু তা'র দুই পায়ের চলায় মুক্তির আনন্দ, কিম্বা কোনো প্রচ্ছন্ন বেদনা জড়ানো ছিল— এটা পরিষ্কার করে জানা কঠিন। তার শূন্য মনে কেবল এই কদিনের ছবি চললো ভেসে।'[১৬]

'মঙ্গল শঙ্খ' গল্পের রুগ্ন মুমূর্ষু কন্যা, সামনে-বসা অসহায় স্বামী-স্ত্রী মিলি-সুবিনয়ের সংলাপ বিনিময়, তার অন্তর্নিহিত আশা-নিরাশার মধ্যেকার রুদ্ধশ্বাস অবস্থার প্রতি-চিত্রণই লেখকের কাম্য এই গল্পে। রুগ্ন শিশুটির অন্তিম মৃত্যুতে লেখক মৃত্যু সম্পর্কে এক তত্ত্বকে উপস্থিত করেছেন।

বনফুলের প্রতিটি পরীক্ষামূলক গল্পের বিষয় সামান্য, কিন্তু বৈচিত্র্য অসামান্য। 'বিন্দুবিসর্গ' গ্রন্থের 'লাল বনাত' গল্পের বিষয় সামান্যই। কিন্তু তাকেই চমকে আমাদের ধাঁধায় ফেলেন লেখক। সাতটি ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী, সাতটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা যার নামে জারী-করা, সেই রায় মহাশয়কে পুলিশ কিছুতেই ধরতে পারে না। তিন বছর আত্মগোপন করে শেষে নিজের সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাবার ভয়ে কোর্টে আত্মপ্রকাশ করে সাক্ষী দেয় নিজের বিষয় বাঁচানোর জন্যই। গায়ে তার লাল বনাত। কোর্টের বাইরে পুলিশ দাঁড়িয়ে। সাক্ষী দিয়ে বেরুলেই তাকে গ্রেপ্তার করবে। কিন্তু রায় মহাশয় বেরিয়েই নিজের ঘোড়ার পিঠে চেপে এত দ্রুত বেগে পালাতে থাকে যে একজন পুলিশ ঘোড়ায় চেপে ধাওয়া করেও ধরতে গিয়ে হিমসিম খায়। একটি বন অতিক্রম করে ফাঁকা মাঠে তাকে ধরতে গিয়ে দেখে, সে রায় মহাশয় নয়, লাল বনাত গায়ে অন্য ব্যক্তি। পুলিশের মূর্খামি ও বিভ্রান্তিই এমন করুণ সমাপ্তির মূলে। বিষয় অতি সামান্য, গভীরতাহীন। কিন্তু বনফুল এমন একাধিক গল্পের বিষয়ে তুচ্ছ ব্যাপারকে গ্রহণ করে শুধু গল্পের বলার চমকিত কৌশলটিকেই প্রয়োগ করে শিল্পভাবনা সক্রিয় রেখেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এমন কিছু গল্প উপহার দিয়েছেন, যাদের মধ্যে সাদামাটা অথচ গুণধর্মে বিশিষ্ট, অভিনব চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। "বিভূতিভূষণের গল্পের কাহিনী অংশ অত্যন্ত সরল। বিশেষ কোন খাঁজ-খাঁক নেই তার। যুগের জটিলতার ছাপ নেই সেখানে।'[১৭] চরিত্রগুলি দেখলেই তা বোঝা যায়। 'বেণীগির ফুলবাড়ি' গল্প-সংকলনের অন্তর্গত 'তিরোলের বালা' গল্পে উন্মাদিনী বিবাহিতা —যাকে তার স্বামী পাগল বলেই নেয় না—সেই পূর্ণিমা যখন খুন করে তার নিজের

দাদাকেই তখন পূর্ণিমার সুস্থ, সরল, মানবিক জীবন ও আচার-আচরণ এবং উন্মাদ অবস্থায় বীভৎস ব্যবহার—দুয়ের মধ্যে পাঠক কোন সামঞ্জস্য রচনা করতে না পেরে এমন চরিত্র-পরিচয়ে বিমূঢ় হতে বাধ্য। সমগ্র গল্পে পূর্ণিমার সঙ্গে আমাদের যে-পরিচয় গল্পের শেষে, একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত, অস্বাভাবিক :

'ঘরে একটা চৌকি পাতা, পূর্ণিমার দাদা বৌদির উপরকার বিছানায় উপুড় হয়ে কেমন এক অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে শুয়ে, বিছানা রক্তে ভাসছে, মেজেতে রক্ত গড়িয়ে পড়ে মেজে ভাসছে—আর পূর্ণিমা দেওয়ালের ধারে মেজের ওপর পড়ে আছে, জীবিতা কি মৃতা বুঝতে পারলাম না। একটা পাশ-বালিশ চৌকির ওপর থেকে যেন ছিটকে পূর্ণিমার দেহের কাছে পড়ে, সেটাও রক্ত মাখা।'[১৮]

রক্তাক্ত বীভৎস পরিবেশ ও শিহরণে পূর্ণিমা পাঠককে চাপা ভয়াল রহস্যে স্তম্ভিত করে। 'বাঁশি' গল্পের নায়িকা বিধবা সুলেখার কাছে পিতলের বাঁশিটি তার মৃত স্বামীর রোমান্টিক অস্তিত্বকে গভীর করে রাখে। আর এই বাঁশি নিয়েই সংসারে অশান্তি। সুলেখার অহংমুখ বিশ্বাস—যা প্রেমেরই প্রতীতি :

'প্রত্যহ রাতে যেন কে আসিয়া ঐ বাঁশিটি বাজায়। সুলেখা ঘুমাইয়া পড়িলে যেন কাহার সজীব হস্তে বাঁশিতে সুর আরম্ভ হয়।'[১৯]

সুলেখার স্বামীপ্রেম ও বাঁশির অস্তিত্বে কোন ভেদ নেই।

'নবাগত' গল্প-সংকলের 'ব্রহ্মময়ীর কাশীবাস' গল্পটি বিভূতিভূষণের চরিত্র-পর্যবেক্ষণ -ক্ষমতার পরিচয় দেয়। এখানেও ব্রহ্মময়ী চরিত্রটি জটিলতার মধ্যে না গিয়ে জীবনের সহজ সরল অস্তিত্ববাচক সংসারী মন ও মানবধর্মে স্থিত হয়েছে। সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি পেতেই ব্রহ্মময়ীর কাশীবাস বাসনা ছিল। কিন্তু সত্তর বছরের বৃদ্ধা অশরীরী দেবতা ও দেব-সেবাধর্মের থেকে শান্তির নীড় সংসারকেই একমাত্র লক্ষ্য ভেবেছে গল্পের অন্যতম চরিত্র নীরজার পাশে তার দেবসেবা ও ভক্তির বহর দেখে। গল্পের শেষে ব্রহ্মময়ীর তার ন'বৌ এর কাছে অকপট উক্তি :

'আমার এই ভিটেতেই যেন তোদের কোলে শুয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেতে পারি। কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই—এই ভিটেই আমার গয়াকাশী।'[২০]

'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পের প্রৌঢ় ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল ও তার ভালোবাসার মেয়ে গোলাপীর কাহিনী-মধ্যে কৃষ্ণলালের চাকরী যাবার পর তার দুরবস্থা এবং মেয়েরে নিজেরই অভিনব স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক প্রয়াসে চাকরী পাওয়ার ঘটনাটি কৃষ্ণলালকে পাঠকের বিস্ময়ে বেশ নূতন করে রচনা করে। কৃষ্ণলালের চাকরী গেছে, দারিদ্র্য চরম, তবু যে গোলাপীকে একদিন সে সব দিয়ে রাণী করেছিল, সেই

গোলাপীর দুঃখের দিনে তার কাছে সে হাত পাতেনি, তার সামান্যতম অনুগ্রহও সে নেয়নি :

'গোলাপীর বাড়ি কৃষ্ণলাল আর আসিল না। সুখের দিনে গোলাপীকে সে অনেক দিয়াছে—এখন দুঃখের দিনে বসিয়া বসিয়া গোলাপীর অন্ন ধ্বংস করিবে তেমন বংশে জন্ম নয় কৃষ্ণলালের। বিশেষত দেখিতে হইবে, গোলাপীতে প্রৌঢ়া—ঝি-গিরি ভিন্ন এখন তার কোন উপায় নাই।'[২১]

কৃষ্ণলালের মানস-প্রক্রিয়া ও মানবতাবোধ বিচিত্র। কৃষ্ণলাল সৎ নয়, নীতিধর্মে তাকে বড় জায়গায় রাখা যায় না, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত সারল্যই তার চরিত্রের আলো, সৌন্দর্য, হয়তবা গভীর মনস্তত্ত্বের একটি দিকও।

'উপলখণ্ড' গল্প-সংকলনের 'আহ্বান' গল্পের সেই মুসলমান বুড়ী-মা, যে বার বার কারণে-অকারণে গল্পের উত্তমপুরুষ ব্যক্তিটিকে 'আমার গোপাল' বলে ডেকে বিরক্ত করত, সেই বুড়ির কবরে তার নাতজামাই শুকুর মিঞার কথায় এক কোদাল মাটি দেওয়ার পর লেখকের যে উপলব্ধিটি 'সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠত—আমার গোপাল।'[২২]—তখন উত্তমপুরুষ বক্তার এমন করুণ স্বীকৃতি-কণ্ঠে বুড়ির সস্নেহ উদার মহত্তম মাতৃমনের সাক্ষাৎ মিলে যায়। 'একটি ভ্রমণ কাহিনী' গল্পের শম্ভু ডাক্তার ও গোপীকৃষ্ণবাবু যুদ্ধের দিনের সমস্ত অভাব-অভিযোগের কথা ভুলে উদ্যোগ করত বার বার বাইরে চিত্রকূট ইত্যাদি দূর ভ্রমণে যাবার, কিন্তু সবসময়ে অর্থাভাবে ও নানাকারণে অসহায়ভাবে তা বৃথা হয়ে যেত, যাওয়া হত না। তারাই সব শেষে, বারাসাত থেকে দু'মাইল দূরে লাঙলপোতায় এক পরিচিত ব্যক্তি বঙ্কু সরকারের বাড়ির দুর্গাপূজোয় তিনদিন বেড়িয়ে এসে যে আনন্দ পেল, তার মধ্যে শ্লেষের কণামাত্র নেই, আছে ভ্রমণরস-পিপাসু দরিদ্র দুই বাঙালীর স্বতঃস্ফূর্ত স্বল্প-আয়োজনেই পরম-আনন্দের রূপ-চিত্র। দুই দরিদ্র বাঙালী চরিত্রই এখানে বিভূতিভূষণের লক্ষ্য। 'আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা' গল্পে এক বিখ্যাত বাঙালী চিত্র-তারকা ইন্দুবালা ও বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের একই দিনে রাণাঘাটে উপস্থিত থাকাকে কল্পনা করে লেখক বস্তুত বাঙালীর লঘু চরিত্র-রূপটিকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। চিত্রতারকার কাছে আইনস্টাইন কিছুই নয়—এই ধারণায় আমাদের উপরিতলভিত্তিক (superficial) জীবন-মনের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা আছে। 'বিধুমাস্টার' গল্প-সংকলনের 'বিধুমাস্টার' গল্পটির প্রাইভেট টিউটর বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের দারিদ্র্য ম্যাট্রিক পাশ করেও ছাত্র পড়াতে গিয়ে হীন অবস্থার মুখোমুখি হওয়া, প্রাইভেট ছাত্রদের মাহিনার সব কটি টাকাই প্রায় বাড়িতে খরচ করে ফেলা ইত্যাদির মধ্যে এক দরিদ্র মানুষের চরম অসহায়তার দিক

লেখক দেখিয়েছেন। 'সুলোচনা'র কাহিনী' গল্পের নায়িকা সুলোচনার সহজ প্রকাশিত সামাজিক দৃষ্টিতে যে হীন ও পতিত অবস্থার চিত্র এঁকেছেন, তা করুণরসের সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু লেখক তার মত মেয়েরও এক স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ব্যক্তিত্বের খবর আমাদের দিয়েছেন। সহজ সরল মানুষের ছোট ছোট দুঃখ কথা, জীবন-যাপনে অনাসক্তি, নানাধরণের স্খলন-পতন, চাওয়া-পাওয়া, হতাশা-বেদনা—এসব দিয়েই বিভূতিভূষণ বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে লেখা গল্পে, যা বাংলা কথাসাহিত্যে নিশ্চয়ই প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধায় প্রমুখের রচিত জটিল মনের ও জীবনের গল্পের ধারার সঙ্গে যুক্ত হয় না, কিন্তু তাকে একটি স্বতন্ত্র নিবিড় স্নিগ্ধ কোণে স্থাপন করে আমাদের মনস্কতাকে সেদিকে নিয়ে যেতে লেখক বাধ্য করেছেন।

বনফুলের ছোটগল্পেও বিচিত্র সব চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। তাঁর 'বিন্দুবিসর্গ' গ্রন্থের 'চান্দ্রায়ন' গল্পের আর. এম. এস. কর্মচারী প্রৌঢ় চন্দ্রবাবুর অপরের চিঠি নিপুণভাবে খুলে পড়া, আবার বন্ধ করে যথারীতি ডাকে রাখার মধ্যে যেভাবে একদিন সে তার তৃতীয় পক্ষ মাধুরীর অনঙ্গ নামের এক পুরুষের সঙ্গে পরকীয় প্রেমের খবর পায়, তাতে তার ভাগ্যের ওপর বজ্রাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রবাবুর চরিত্ররূপটির বৈচিত্র্য ও বিকৃতি আমাদের বিস্মিত করে। 'ছোটলোক' গল্পের নীতিবাগীশ, উন্নত-মস্তক, অনমনীয় চরিত্র রাঘব সরকার দুপুর রোদে এক ক্ষীণকায় রিক্শাওয়ালার প্রতি করুণা করতে গিয়ে মানবতার খাতিরে একজন মানুষের ঘাড়ে চেপে না গিয়ে এই নীতিতে তার রিক্সায় না চেপে শেষে করুণাবশতঃ পয়সা দিতে গেলে রিক্সাওয়ালাও বিনাশ্রমে পয়সা নিতে অস্বীকার করায় দুজনের চরিত্রের সংঘর্ষে বিচিত্র চরিত্র-স্বাদই পাঠকরা পায়। 'বাহুল্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'হাসির গল্প' গল্পে হাসির গল্পের লেখক হরিহরবাবু একটি সত্যিকারের হাসির গল্পের কল্পনা করতে বসে তার রূঢ় বাস্তব সংসারজীবনে যে দুঃখ, যন্ত্রণা, তীব্র অশান্তির সম্মুখীন হয়, বস্তুত তা একজন হাসির গল্প-লেখকের বাস্তবজীবন ছবি নিঃসন্দেহে। কিন্তু হাসির গল্প পড়ে সেই লেখকের দুঃখের জীবন সম্বন্ধে বোঝা যায় না আদৌ। এই যে বাস্তব জীবনের সংগে কল্পিত শিল্প-বিষয়ের বৈপরীত্য—এর মধ্যেকার হরিহরবাবুর চরিত্র-স্বরূপ ও তার সংসার ছোটগল্পটির ভিন্ন মাত্রা স্পষ্ট করে। 'দর্জি' গল্পের দর্জি সিদ্দিকের দু বছর আগে-পরের পতাকা তৈরীর অভিজ্ঞতা দিয়ে সাধারণভাবে মানবচরিত্রের বিপুল রহস্যকে তুলে ধরেছেন বনফুল। দু'বছর আগে যে দর্জি গান্ধীজির আগমন উপলক্ষে তাঁকে অভিনন্দিত করার ত্রিবর্ণ পতাকা তৈরী করতে হিমসিম খেত, সেই দর্জি দু'বছর পরে সেই গান্ধীজির আগমন উপলক্ষেই সেই পতাকা তৈরী করতেও নারাজ হয়েছিল,

কিন্তু পতাকা ত্রিবর্ণ নয়, কালো। জনগণের দুই বিপরীতধর্মী মানসিকতা প্রকাশে বনফুল এই গল্পে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ব্যবহার করেছেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'পলায়ন', 'ইনি আর উনি' 'যতনবিবি' গ্রন্থ তিনটির অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলিতে অভিনব বিষয় ও চরিত্রের সংগে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অবশ্যই একাধিক গল্পের পরিবেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালকে কোন-না কোনভাবে গ্রহণ করেছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্প সম্পর্কে এক সমালোচক মন্তব্য করেছেন,—'তাঁর গল্পগুলির মধ্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যা পরিস্ফুট তা হচ্ছে একটা মানসিক সংগ্রাম। ভাবাবেগের কথা কোন কোন ক্ষেত্রে স্মরণে এলেও অচিন্ত্যকুমার তাকে নিঃসঙ্গ করার প্রয়াস করেছেন এবং এটা বোধ হয় সূক্ষ্ম মননক্রিয়ার সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে।'[২৩] বস্তুত 'মানসিক সংগ্রামে'র পরিচয় তাঁর গল্পে স্পষ্টতই লক্ষিত হয়। 'পলায়ন' গল্পের সংসারী মানুষ লোকনাথ স্ত্রী পুত্র-কন্যাসহ জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হতে হতে যখন নিজেকে একান্ত অসহায়, নির্জিত মনে করে, তখনি সে আত্মহননের দিকে এগিয়ে যায়। লোকনাথের করুণ ব্যর্থতার মূলে লেখক যথেষ্ট বাস্তব ভিত্তি দিয়েছেন। তার ব্যর্থতা তার আত্মসম্মানকে যখনই আঘাত হানতে উদ্যত, তখনি সে মানুষ আত্মহনন ছাড়া অন্যপথ দেখতে পায়নি। লোকনাথ ও তার সংসার কথাসাহিত্যে বাস্তব জীবন বিষয়কেই অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরে। 'ইনি আর উনি' গল্পের লেখক নিম্নবিত্ত মানুষের বিষয় থেকে উঠে এসেছেন উচ্চবিত্ত মানুষের মধ্যে। সেখানে পুরুষ নয়, দুই উচ্চবিত্ত পুরুষের গৃহিণীরাই হয়েছে লেখকের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। সার্কেল অফিসার কুঞ্জবিহারী আর মুন্সেফ কৃষ্ণধন—দুজনের স্ত্রী যথাক্রমে শিবানী ও সুরমার যে আভিজাত্যের দ্বন্দ্ব তা গল্পের মধ্যে চরম রূপ নেবার আগে নিষ্ফল হয়ে যায় বিবাহের পূর্বে শিবানী ও সুরমার অতীত বন্ধুত্বের সূত্রে বৃহৎ মানবতার কাছে। শিবানী অসুস্থ হয়ে পড়লে সুরমা নিজেই তার পরিচর্যার জন্য এগিয়ে আসে। কৃত্রিম আভিজাত্যবোধ মানুষের অকৃত্রিম মানবতাবোধের কাছে হয়ে যায় সমূলে পরাজিত, বিধ্বস্ত। 'দস্তখৎ' গল্পেও বিষয়ের বৈচিত্র্য এনেছেন লেখক। গ্রামে যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ রচিত হয় গ্রামবাসীদের মধ্যে, তার মূলে একটি স্কুল গড়ার বিষয়। স্কুল গঠন নিয়ে 'উত্তরপাড়া আর দক্ষিণপাড়া, মানে ভদ্রপাড়া আর চাষাপাড়া।'—এদের যে বিরোধ-চিত্র তা ষষ্ঠী, ভাগ্যধর মাঝি, ফজলে রহমান, হলধর ইত্যাদি চরিত্রের মাধ্যমে লেখক এঁকেছেন। এরা সবাই দুই পাড়ার বাসিন্দা। হারা-জেতার করুণ কাহিনীটি গল্পের বিষয়ে অন্য স্বাদ দেয়।

'খাতার শেষ পাতা' গ্রন্থের 'রোদ' গল্পে বুদ্ধদেব বসু একটি বিবাহিত যুবকের অতীতের উদার দিনের স্মৃতিরোমন্থনে গড়ে-ওঠা রোমান্টিক মনের আনন্দময় বিলাসের

পাশে বাস্তব পরিবেশের রূঢ় আঘাতের চিত্র এঁকে মেজাজী মানুষের স্বভাব-বিচিত্রতার ও আশাভঙ্গতায় সুন্দর কাব্যিক ছবি এঁকেছেন। সুরথ স্ত্রী লীলার পিত্রালয় বলেই কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসে ছুটি কাটানোর জন্য, না হলে আসা হত না। আর সেই ঢাকার রমনায়, পল্টন ময়দানের অতীত উচ্ছ্বসিত স্মৃতি তাকে তাড়িত করলে সে সন্ধ্যের না গিয়ে সকালের চড়া রোদেই সম্পূর্ণ হাঁটাপথে বন্ধু অরিন্দমের বাড়ি আসে, অকারণ কথায় আড্ডা দেয়। একটানা হেঁটেই ফেরার সময় রোদের অসম্ভব ঝাঁঝ তার সমস্ত রোমান্টিক মেজাজকে এমনভাবে নষ্ট করে যে, বাড়ি পৌঁছতে লিলি যখন জিজ্ঞেস করল :

'এত দেরী করলে যে?' তখন তার স্নাত, প্রশান্ত, ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে চেহারাটি দেখে সুরথের এমন রাগ হলো যে পাছে কথার জবাব দিতে গিয়ে একটা নিষ্ঠুর কিছু বলে ফ্যালে সে-ভয়ে সে কোনো কথাই বললে না, দুমদাম করে উপরে উঠে জামাটা একটানে গা থেকে খুলে চিৎপাৎ হয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়লো।'[২৪]

'খাতার শেষ পাতা' নামের গল্পটি এক কবির বাস্তবজীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে ধনী ব্যাঙ্ক অফিসার হওয়ার পর আদৌ কবিতা না লিখতে পারার করুণ অসহায় কবিমনের কাহিনী। কবির স্ত্রী কবিতারসিক, কবিকে দেখতে চায় সুন্দর কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু যখন রাতে স্বামীকে—কবিতা লিখতে চেষ্টা করে হতাশ হয়ে খাতাটি রাখতে দেখে ড্রয়ারে, তখন সে স্বামীর কবিতা গভীর আগ্রহে পড়তে চাইল :

'অনুনয় করে বললে তার স্ত্রী, 'একটু দেখি না।' হাত বাড়াতে যাচ্ছিলো খাতাটার দিকে, কিন্তু সে খপ করে সেটা তুলে নিলে, ছুঁড়ে ফেলে দিলে দেরাজের গভীর গহ্বরে। তারপর চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ও-খাতা আর খুলবো না।'[২৫]

এক কবির কবিপ্রাণের অপমৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে যে কবির চরিত্র এঁকেছেন লেখক, তা শিল্পীর মানসধর্মের বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।

'উদ্‌ভ্রান্ত' গল্পে রমাপদ চৌধুরী এমন এক প্রৌঢ় মানুষের জীবনকথা বলেছেন যার জীবন চলে ধীর গতিতে। যার জীবনে ও জীবনের চারপাশে দৈনন্দিন তুচ্ছতার মধ্যে সব আকর্ষণ গেছে ফুরিয়ে। বিলাসপুর অঞ্চলের একটি ছোট স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার বিষ্ণুরাম স্ত্রী সাবিত্রী, দুই ছেলে গৌতম-গৌরাঙ্গ ও একটি ছোট মেয়ে নিয়ে ক্লান্তিকর বৈচিত্র্যহীন দিন কাটায়। এ. এস. এম. শিববাবু মাধববাবু আর [illegible] সকলেই তার বিস্বাদ জীবন কাটে। সকলের কোয়ার্টারে স্ত্রী [illegible]

সংসারে কিছু শান্তি সে আশা করে। এখনো সে মনের শান্তির খোঁজে সাবিত্রীকে চুম্বন করতে আগ্রহী। কিন্তু বিষ্ণুরাম জানে না কবে যেন তার অতীত যৌবনের সেই সুবাস-দেওয়া জীবন অন্য ঘাটে তরী বেঁধেছে—যেখানে দাঁড়ালে তার বাইরের চেহারায়, মুখের হাসিতে, চিন্তার গভীরে শূন্যতা নড়ে ওঠে নির্মমভাবে :

'বিষ্ণুরামের মুখে হাসি দেখা যায়—অতি দুঃখের হাসি। সমস্ত বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। তার বয়স হয়েছে? হ্যাঁ, সত্যিই তো সে এখন বৃদ্ধ। দোষ আর কারও নয়, দোষ তার বয়সের। আজ তাই ছেলেরা তাকে মানে না, তার প্রতি সাবিত্রীর আর কোনো আকর্ষণ নেই।'[২৬]

বিষ্ণুরামের শেষ উপলব্ধি বড় করুণ। বয়স মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, নিয়ন্ত্রণ করে তার খেয়ালখুশি, তার মেজাজ, তার বাসনা-কামনার সীমা। সংসার-জীবন যে সীমা টানে মানুষের জীবনে, ব্যক্তিগত বয়স যে দেয়াল তোলে মনের রোমান্টিক শক্তি প্রকাশের পথে, তা-ই সত্যি। তাকে মেনে নেওয়াই পরম শান্তির একমাত্র সূত্র। রমাপদ চৌধুরী 'উদয়াস্ত' গল্পে মানুষের জীবনভাগ্যের, তার অন্তর-সম্পদের নিষ্ঠুর নিয়তির গোপন সংবাদটিই বিষ্ণুরাম চরিত্রের প্রেক্ষিতে শিল্পরূপ দিয়েছেন।

'মহানগর' গ্রন্থের 'মহানগর' গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র এক বিচিত্র বিষয় এনেছেন যাতে আছে গ্রাম-জীবনের সারল্য ও শহরজীবনের কাঠিন্য রুক্ষতা ও নীতিভ্রষ্টতা—দুয়ের স্বাভাবিক বিরোধ। 'মহানগর সবকিছুকে দাগী করে দেয়, সার্থকতাকেও দেয় একটু বিঁধিয়ে।'[২৭] বালক নায়ক রতন গ্রাম্য সরল মনে তার দিদার খোঁজে শহরে এসে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তা তার পক্ষে চরম আঘাতের যেমন, তেমনি তার রোমান্টিক নির্বোধ মনে নিজের মতো তৈরী-করা আশাবাণীরও। বালক রতন তার বেশ্যা দিদির কাছ থেকে কিছুটা বিতাড়িত হওয়ার মতই চলে যাওয়ার সময় বলে : 'বড় হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি। কারোর কথা শুনব না।'[২৮] এই রতন বড় হয়ে হয়ত আবার শহরেরই মানুষ হবে, তখন এই বিশ্বাস থাকবেনা, কিন্তু লেখক শহরের জীবন ও গ্রামজীবনের যে গভীর অন্তর্গূঢ় সংঘাতটিকে সমগ্র গল্পে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন, যা মানুষের সমস্ত সুকুমার বৃত্তিকে তুচ্ছ করে, জটিল করে—তা-ই সত্য হয়েও ওঠে।

'অরণ্যপথ' গল্পে রামবাবুর বিকলাঙ্গ ও উন্মাদ কন্যার সঙ্গে পিতার স্নেহময় সম্পর্কে যে ভাগ্যের পরিহাস রামবাবুকে দীর্ঘকাল তাড়িত করে, তার কারুণ্য অকল্পনীয়। রামবাবুর নিজের কল্পিত পাপচেতনায় ও হতাশ্বাসে, অসহায়তা ও আন্তর বিলাপে মানুষটি অন্য এক চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে গল্পে। তাই তার অন্তিম পরিণতি প্রসঙ্গে লেখকের স্নেহসম মমতাটি মানুষ হিসেবে রামবাবুর নতুন মূল্যায়ন :

'পাপ করিতে পারে এত বড় অহংকার পশুর নাই।

অর্থহীন এ দুর্বল দম্ভ শুধু মানুষের। মনের গহনে অন্ধকারে এ দম্ভের নিরর্থক শাস্তিও তাহার একার।'[২৯]

সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পগ্রন্থের 'অযান্ত্রিক' গল্পের নায়ক বিমল চরিত্রটি যেমন অদ্ভুত, তেমনি তার সাবেক আমলের ফোর্ড ট্যাক্সি—'জগদ্দল'টিও একটি জীবন্ত চরিত্র। জগদ্দলের সঙ্গে চালক বিমলের সম্পর্ক অদ্ভুত মানবিকতায় ভাস্বর। জগদ্দলকে আত্মীয় জ্ঞান করে সমস্ত রকম মায়া মমতা দিয়ে আপন করে রাখার পর যখন অসহায়ভাবে এক মারোয়াড়ীর কাছে সেটা বিক্রী করে দেয় বিমল, তখন তার বিচ্ছেদ বেদনাই যেন বিমলের জীবনে গভীরতম ট্র্যাজেডি রচনা করে :

'মারোয়াড়ীর লোকজন ভোরে এসেই বিমলের গাড়ী টু্করো টুকরো করে খুলে ফেলছে!

শোক আর নেশা। জগদ্দলের পাঁজর খুলে পড়ছে একে একে। বিমলের চৈতন্যও থেকে থেকে কোন অন্তহীন নৈঃশব্দ্যের আবর্তে যেন পাক দিয়ে নেমে যাচ্ছে অতলে। তারপরেই লঘুভার হয়ে ভেসে উঠছে ওপরে।'[৩০]

নরনারীর জটিল মনোবিকলনও বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম বিষয় হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে রচিত একাধিক লেখকের গল্প-উপন্যাসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্ধ ও ধাঁধা' (হলুদ পোড়া) গল্পের নায়িকা সুন্দরী রাধা সেই রকম এক নতুন মনের চরিত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রটির মধ্যে মানব মনের যে কয়টি মাত্রা সংযোজিত করেছেন, সেগুলি মনস্তত্ত্বেরই গভীর-গোপন রহস্য। রাধা তার মুমূর্ষু স্বামীকে আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে চায়, বিবাহিত নিঃসন্তান হেরম্বের প্রতি তার এক নতুন জীবন গঠনের গোপনতম বাসনাও দুর্লক্ষ্য নয়। সঙ্গের মুসলমান দৈত্যাকার চেহারার ভৃত্যটিকেও তার সাহস, তার শক্তি হিসেবে স্বীকার করতে নির্দ্বিধ। জীবনকে চল্লিশ বছরের অথচ সম্পূর্ণ বৃদ্ধ-মনে-হওয়া অসুস্থ স্বামীর পাশে একটুও গোছাতে পারেনি। এমন আত্মগুপ্ত, কঠিন মনের রমণীটি শেষে স্বামীর মৃত্যুর পর দাদার সঙ্গে সদ্য বিধবার পোষাকে গ্রামে ফেরার সময় সখেদে হেরম্বকে বলে :

'রাবণের অবস্থা হল আমার। দ্বিধা করে করে স্বর্গের সিঁড়ি আর তৈরী হল না। আজ থেকে দশ মাস সময় এখনো মানুষ আমায় দিয়েছে, মানুষ খুব বিবেচক, নয়?'[৩১]

গল্পের প্রথমে যে দৈত্যাকার ভৃত্যটির ওপর রাধার ছিল একমাত্র সাহসের নির্ভরতা ও আশ্রয়ের বিশ্বাস, তাকেই গল্পের শেষে চরমতম সন্দেহে বিভাড়িত করে দেয়। স্বামীর কাশির রোগে হুঁকা-কলকের তামাক খেতে দেওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ, অথচ তাই

খেয়েই স্বামীর মৃত্যু ঘটে, বারণ সত্ত্বেও হুঁকা এগিয়ে দেয় সব কিছু জেনে রাধার অজ্ঞাতে সেই ভৃত্যই। রাধা ভৃত্যের হুঁকা কলিকা দেওয়া প্রসঙ্গে হেরম্বকে বলে :

'প্রথমটা মনে করেছিলাম বোকামি, শেষে সন্দেহ হল শয়তানটি হওয়াও আশ্চর্য নয়।'[৩২] ভৃত্য চরিত্রের গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন মনোবিকলনটি যেমন এই উক্তির মধ্যে কিছুটা সুবোধ্য হয়, অর্থাৎ দূর থেকে রাধার প্রতি ভৃত্যের একটি বিকৃত-বাসনার সুদীর্ঘ লালন-প্রয়াস ধরা পড়ে, তেমনি তার চেয়েও বেশী রহস্যময় করে রাধা চরিত্রকে—যে এতকাল তাকেই সঙ্গে রাখে তার আত্মরক্ষার জন্য :

'হেরম্বকে চাহিতে দেখিয়া দৈত্য সরিয়া গেল।

ও ডাকাতটাকে সঙ্গে এনেছেন কেন ?

রাধা হাসিল, আত্মরক্ষার জন্য। অতখানি অনুগত অন্ধশক্তি আর কোথায় পাব ?

শক্তির অন্ধতা বিপজ্জনক।

অন্যের পক্ষে হতে পারে, আমার পক্ষে নয়। বিপজ্জনক অন্ধ শক্তি পৃথিবীতে আছে বলেই ওকে সংগে এনেছি। নইলে—'[৩৩]

'বৌ' গ্রন্থের অন্যতম গল্প 'সাহিত্যিকের বউ' রচনায় সাহিত্যিক সূর্যকান্তর স্ত্রী অমলার মানসিকতার যে সংবাদ দিয়েছেন লেখক, তা এক জটিল মনোভাবনার ক্রমবিবর্তিত প্রকাশ। স্বামীর প্রতি অমলার ভালবাসার সমস্ত মানদণ্ড অমলা স্বামীর লেখা গল্পের নায়ক-নায়িকার কথা, আচার-আচরণের মধ্যে ধরতে চায়। তার বাস্তব জীবনের ভালবাসা আর সূর্যকান্তর লেখা গল্পের অবনী-অনুপমার কল্পনার প্রেম-ভালবাসার জীবন যে এক হতে পারে না, এই বিশ্বাস অমলা হারায়, ক্রমশ সে হয়ে ওঠে ডাক্তারের এক রোগিনী, শেষে দেখা দেয় হিস্টিরিয়া রোগ। অমলা চরিত্র বাংলা কথাসাহিত্যে এক অভিনব স্বাদ দেয় মনোবিকলনের। আবার 'বিপত্নীকের বৌ' গল্পের প্রতিমা জটিল মনোবিকলনের আর এক শিকার। রমেশের প্রথমা স্ত্রী মালতীর মৃত্যুর পর রমেশ বিয়ে করে প্রতিমাকে। সেই প্রতিমা কিছুতেই রমেশকে, তার সমস্ত ভালবাসা গভীরভাবে পেয়েও মানিয়ে নিতে পারেনি :

'প্রথম যেদিন সে বুঝিতে পারে, শীতের কুয়াশা কাটিবার মত রমেশের মন হইতে মালতীর শোক কাটিয়া যাইতেছে, তাহার ঈর্ষাতুর মনে সেদিন আনন্দের পরিবর্তে গভীর বিষাদ জমাইয়া আসে। কেমন সে লজ্জা পায়। মনে হয়, নিজের তারুণ্য দিয়া এতকাল একটা অপবিত্র ব্রত পালন করিতেছিল, উদ্‌যাপনের দিন আসিয়াছে।

তাতো সে করে নাই ? কতদিন মালতীর ফটোর সামনে দাঁড়াইয়া হিংসায় জ্বলিতে জ্বলিতে সাধ গিয়াছে ফটোখানা জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, যেখানে যা কিছু

স্মৃতিচিহ্ন আছে সে মায়াবিনীর, ভাঙিয়া সব গুঁড়া করিয়া দেয়, কিন্তু ঘাটিয়া রমেশের মন হইতে তাকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা সে আর কতটুকু করিয়াছে?'[৩৪]

এই জটিল মন থাকার কারণেই গল্পের শেষে প্রতিমাকে বিবাহ করার প্রথম বিবাহ বার্ষিকীতে যখন রমেশ ফুলের মালা ইত্যাদি কিনে আনে, আর প্রতিমা তা রমেশের অজ্ঞাতে মানসীর ফটোয় একটা পরায়। রাতে গভীর আবেগে, ভালবাসায় প্রতিমাকে আদর করতে গেলে রমেশ দেখে মানসীর ফটোয় সেই ফুলের মালা, খুশি হয় এবং প্রতিমাকে আরও গভীরতম ভালোবাসায় কাছে পেতে চায় তার এমন ভাল মনের কারণেই। কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে এসে ছাদের অন্ধকারে প্রতিমার জটিলতম মনে আর এক রহস্যময় প্রতিক্রিয়া :

'দুঃখে প্রতিমার কান্না আসিতে লাগিল। ভুলিয়া গিয়াছে? এমন মন তার স্বামীর যে এর মধ্যে মানসীকে ভুলিয়া গিয়াছে। তার মনোরাজ্যের সেই সর্বময়ী সাম্রাজ্ঞীকে?'[৩৫]

প্রতিমা লেখকের সৃষ্ট এক অভিনব নারী চরিত্র যে বিবাহিত জীবনে সব পেয়েও নিজের শান্তির জগত কিছুতেই নির্মাণ করতে পারে নি। 'কেরানীর বৌ' গল্পের কেরানী রাসবিহারীর স্ত্রী সরসীর মনে আর এক জটিলতা। স্বামী অফিসে বেরিয়ে যায়, তারপর সরসীর সমস্ত কিছুতেই প্রবল কৌতূহল। অথচ তার স্বভাবনিহিত সংকোচ, সংশয়, লজ্জা তাকে নিজের জগতে ঢেকে রাখে। এমন দুই মনের দ্বন্দ্বে সরসীর রহস্য আমাদের বিস্মিত করে।

'সমুদ্রের স্বাদ' গ্রন্থের 'সাধু' গল্পে লেখক দেশে ধর্মীয় গুরুবাদের অন্তরালে প্রবাহিত প্রেমাক্ত জীবন ও গুরুদের নারীসঙ্গের লোভ-লালসায় বিকারগ্রস্ত জীবনের চিত্র এঁকে কথাসাহিত্যের বিষয়ে অন্য স্বাদ দিয়েছেন। নগেনবাবুর গুরুদেবের প্রতিনিধি হিসেবে স্বামী তার প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ কৃষ্ণপদানন্দের কাছে ছোট ছেলে ভূপালের বউ সুমতির সন্তানপ্রাপ্ত হওয়ার কাহিনী-মধ্যে প্রিয় শিষ্যের সুমতির প্রতি যে উদগ্র কামনা-বাসনার আকর্ষণ, তার ভণ্ডামি পাঠকচিত্তকে স্তম্ভিত করে। ধর্মের আড়ালে এও এক বিকারগ্রস্ত, কদর্য, অসুস্থ জীবনচর্যার ছবি।

'হলুদপোড়া' গ্রন্থের 'ওমিল নাইন' গল্পেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হালিমণির স্বামী প্রমথর একুশ বছর বয়সের পরিচিতা ও ভালোবাসার রমণী একুশ বছর বয়সেই সুনীতির অতীত সান্নিধ্যকে 'ওমিলনাইন' তেলের গন্ধে বার বার গভীরভাবে পাওয়া ও সেই সূত্রে স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে এক অস্বস্তিকর অবস্থা রচনা করে মানুষের মনের বিকারকে সূক্ষ্মভাবে উপস্থিত করেছেন :

'সুনীতির স্মৃতি যে একটা কেশ তৈলের গন্ধ হইয়া রহিল প্রমথের কাছে, এ এক ধরণের মানসিক বিকার। নারীসংক্রান্ত না হোক এরকম অভিজ্ঞতা অনেকের জীবনেই আছে।……সুনীতির সংগে বিচ্ছেদ হওয়ার চার বছর পরে সুনীতির স্মৃতি আর সব দিক দিয়াই প্রায় প্রমথের কাছে মূল্যহীন হইয়া গিয়াছে, শুধু একটা গভীর অবসন্নতা ও মেয়েদের প্রতি বিতৃষ্ণা অনুভব করিতে করিতে ওমিল নাইন তেলের গন্ধ শুঁকিবার জন্ম সুনীতিকে সে মনে করে।'[৩৬]

প্রমথর প্রেম ও বিতৃষ্ণাজনিত বিকার বস্তুত এক অভিনব চরিত্র-ধর্ম ও বিচিত্র বিষয়ের সংগে আমাদের পরিচয় ঘটায়।

'সমুদ্রের স্বাদ' গল্প সংকলনের অন্যতম গল্প 'মানুষ হাসে কেন' গল্পে নির্ভেজাল কৌতুক রসের স্বাদে আমাদের নিবিষ্ট রেখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রসের স্বাদ বাংলা কথাসাহিত্যে আর এক বিচিত্র প্রবণতাকে স্পষ্ট করে। প্রায়-পঞ্চাশ মোটাসোটা ভারিক্কি চেহারার ডাক্তার রসময় কোনদিন হাসেনি। হাসবার মত পরিবেশ, ঘটনা থাকলেও হাসি আসে না। গল্পের শেষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার মধ্যেই এনেছেন তার নিজেরই এক অসঙ্গতির মূল থেকে উঠে-আসা হাসির জোয়ার। রসময়ের স্ত্রী রাণীর বয়স ও রসময়ের সংগে তার সম্পর্ক-ভাবনা যা প্রতিবেশিনী শান্তি বলতে পারে, রাতে রাণীর পাশে শুয়ে এমন চিন্তা থেকেই এক নির্মল অসংগতির দিক লক্ষ্য করে, মনে ভেবে নিয়েই রসময় ডাক্তার হেসে ওঠে :

'ঘুম ভাঙিয়া রাণী বিস্ফারিত চোখে তার দিকে চাহিয়া থাকে। তাতে তার হাসি যেন আরও বাড়িয়া যায়। হাসিতে তার ভয়ানক কষ্ট হয়, তবু সে পাগলের মত হাসিতে থাকে। হাসি পাইলে মানুষ না হাসিয়া পারিবে কেন?'[৩৭]

গম্ভীর ডাক্তারের এমন সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরসাত্মক পরিণতি-চিত্র এঁকে লেখক একই সঙ্গে হাসির তত্ত্ব ও রস—দুইকে একই ভিয়েনে পাক করেছেন।

হাসির অসঙ্গতি দিয়ে ছোটগল্প লিখতে বসে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকী মেজাজে যতটা গালগল্প ও সাধারণ কৌতুক রসের গল্পে মনোনিবেশ করেছেন, তাতে তাঁকে কখনো বনফুলের হাসির গল্পের সমধর্মী লেখক বলে মনে হয়। শরদিন্দুর হাসির গল্পগুলি আকারে ছোট, নিছক গল্পই। কোন গভীর শ্লেষ, বুদ্ধির তীক্ষ্ণ দীপ্তি, অসঙ্গতিজনিত উচ্চহাস্য গল্পগুলিতে নেই। 'বস্মিন্ দেশে' গল্পে যে প্রবাসী তপেশ বোম্বাই অঞ্চলে বাস করার জন্য দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে তার একা-একা বাজার দোকান-করা, পাড়া বেড়ানো, গাড়ি ড্রাইভ করা ইত্যাদি অপছন্দ করে না, সেই প্রথম পক্ষের বাঙালী স্ত্রীর ওই এক মাত্র কারণেই তাকে ত্যাগ করে চলে আসে নির্মমভাবে। তপেশের এই আচরণে যে অসঙ্গতি,

তা উতরোল কৌতুক রস না এনে বরং চরিত্রের মজাটাকেই বড় করে। 'প্যাঁড়া' গল্পের বাড়ির অভিভাবকের শালা সময়ের পরিচিত এবং নিয়ে-আসা ভদ্রবেশী প্যাঁড়াকে যখন বিয়ে বাড়িতে থাজা তৈরী করায় লোক বলে আমরা বুঝি তখনও চরিত্রের ভিতরের কোন অসঙ্গতি, বাইরের সহজ চমকেই আমাদের অল্প হেসে তৃপ্ত হতে হয়। 'মৎস ন্যায়' গল্পের ছোট মাছের বাস্তব জ্ঞান লাভের জন্য বড় অভিজ্ঞ মাছের নির্দেশে ছিপের বঁড়শির টোপ গিলে ডাঙায় এসে ঠোঁট ছিঁড়ে আবার ডাক্তার মানুষদের দয়ায় সে যাত্রায় বেঁচে জলের মধ্যে ফিরে আসার মধ্যেও সেই কৌতুকরস। 'লম্পট' গল্পের বেহেড মাতাল লম্পট হেরম্ববাবুর কল্পিত লাম্পট্যের তৃপ্তির নমুনা মদের ঘোরে ঘুমোবার পরের দিন সকালেই তার আত্মতৃপ্ত ভাবভঙ্গিতে সহজবোধ্য। 'এপিঠ ওপিঠ' গল্পের-তরুণ আই. সি. এস.—যে বেশ কয়েকবার বিলেতে থাকাকালে প্রেম দেওয়া-নেওয়া করে রপ্ত হয়েছে, সে কলকাতার গ্রাণ্ড হোটেলে এক মহামান্য অফিসারের সুন্দরী কন্যা এণার প্রেমপ্রার্থী হয়ে অতীতের সব কিছু স্বীকার করে প্রেমে উজাড় হতে গিয়ে দেখে, এণাও তার মতই। বিশুদ্ধ প্রেম চাইতে গিয়ে সুখেন্দু দূরের চাকরীক্ষেত্রে পালিয়ে বাঁচে। সুখেন্দু-এণা বস্তুত একই জাতীয় প্রেমের এপিঠ-ওপিঠ নিঃসন্দেহে। 'ঝি' গল্পের বিপত্নীক ও সপুত্রক বড়সাহেবের মেজাজ বাড়ির আয়া অর্থাৎ ঝি থাকার ও না-থাকার মত—উভয় সময়েই যে দুই মেরুগামী হয়, কখনো দারুণ ঠাণ্ডা সবল সুস্থ, কখনো একেবারেই গরম, উগ্র—এই মেজাজের বৈপরীত্য দিয়ে লেখক চরিত্রের 'মুড' নিয়ে হাস্যরসের অসংগতি-কেন্দ্রটি রচনা করেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বনফুলের মতই ছোটগল্পে অন্ত-চমকে বিশ্বাসী এবং সহজ সরল গল্পের মাধ্যমে বৈঠকী মজা দিয়ে সহজ সরল কৌতুক রসের স্রোত আনেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের বাংলা কথাসাহিত্যে এমন নির্ঝঞ্ঝাট বিলাসের হাসি-ঠাট্টার গল্পের অন্যতম জনক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রমথনাথ বিশী যে কৌতুক রসের যোগান দিয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন বাংলা কথাসহিত্যে, তা নির্ভেজাল কৌতুক নয়, তা তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গে রক্তিম। এই ব্যঙ্গের মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি যেন তাকে আরও আলোকিত করার অন্যতম বিষয়। 'শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব' গ্রন্থের 'গণক', 'সরল থীসিস রচনা প্রণালী', 'গল্পের মতো' গ্রন্থের 'পূজা সংখ্যা', 'গালি ও গল্প' গ্রন্থের 'ভাঁড়ু দত্ত' ইত্যাদি গল্প তার প্রমাণ। 'গণক' গল্পে লেখক একদল শিক্ষাজীবী—যারা শিক্ষাকে উপায় ধরে ভদ্রতা-সৌজন্য-বোধহীন, মার্জিত রুচিহীন অর্থলোলুপতায় ডুব দেয়, তাদের জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন। প্রধান পরীক্ষকের বাড়ী জমা-দেওয়া খাতার সংখ্যা ও পরীক্ষার খাতার ভিতরের প্রদত্ত নম্বর গুনে নির্ভুল করার জন্য গণক নিয়োগ করা হয়। সেই খাতা গণনা দ্রুত বেশী করে বেশী টাকার

লোভ শিক্ষিত মানুষকে কত নীচে নামাতে পারে, প্রমাণ 'গণক' গল্প। গল্পের একটি চরিত্র টেকো আর খাতা গণনার কাজে আসতে পারবে না, কারণ সে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দু'পা জখম করেছে। এই সংবাদে তার সহকর্মীদের মনোভঙ্গিটি লেখকের তীব্র ব্যঙ্গে স্পষ্ট :

'টেকো আর আসিতে পারিবে না, তাহার দিক হইতে আর অর্থক্ষয়ের আকাঙ্ক্ষা নাই শুনিয়া, দুইজনে সত্যই তাহার জন্ম সমবেদনা বোধ করিলেন।'[৩৮]

যারা খাতা গণনার কাজে ব্যস্ত, তারা শিক্ষাজীবী, তাদের শিক্ষার অহংকার, কিন্তু অর্থলোলুপতায় সমস্ত শিক্ষা হীনপ্রভ। টেকো পা ভেঙে গেলেও এ্যাম্বুলেন্সে করে খাতা গণনার কাজে আসে। কারণ টাকাটাই দরকার, ব্রেন না কাজ করলেও ক্ষতি নেই। কারণ খাতা গণনায় বুদ্ধিহীন হলেও আপত্তি ওঠে না :

'টেকো বলিল—আরে খাতা গুণতে কি ব্রেন লাগে!

ডাক্তার বলিল—ব্রেন দিয়ে মাথার খুলির খানিকটা জায়গা মিছামিছি ভর্তি করে রাখা হয়েছে।

টেকো বলিল—তবে ব্রেন একেবারে নষ্ট হয়নি। এই দেখুন না ওই থার্মোফ্লাস্কে করে ভরে নিয়ে এসেছি। দরকার হলে ব্যবহার করব।'[৩৯]

'সরল থীসিস রচনা প্রণালী' বাংলাদেশের পণ্ডিতম্মন্য ও পণ্ডিতমূর্খদের-লক্ষ্য করে যেমন ব্যঙ্গের বেত্রাঘাত, তেমনি আমাদের দেশে থিসিস রচনার পদ্ধতিরও তীব্র সমালোচনা। রামতনু বহুবার ফেল করে এম এ. পাশ করে একদিন। তারপরে আরও বড় সম্মান লাভের জন্ম থিসিস করে তার এক গুরুর নির্দেশে যে বিষয়ে, তা হল 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল'—এই বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। অর্থাৎ থিসিসের বিষয় নির্বাচন, যে ডক্টরেট করে তার থিসিস রচনা পদ্ধতি, ছাত্রদের শিক্ষার উন্নতির নামে শিক্ষিত-মূর্খের ছাত্রপাঠ্য রচনা প্রকাশ—এসবকেই কৌতুকের আশ্রয়ে ব্যঙ্গের আঘাতে কাঁপিয়ে দিয়েছেন প্রমথনাথ বিশী। 'পূজাসংখ্যা' গল্পে শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করার ব্যবস্থায় বাঙালী ব্যবসায়ীর ব্যবসায়-বুদ্ধির কৌশলগত পরিকল্পনা ও শেষে পত্রিকার অবাঙালী হোলসেল বিক্রেতা ছোট্টলালের কাছে সমস্ত কিছু দিয়ে অর্থপ্রাপ্তিতে সম্পূর্ণ নিরাশ হওয়ার কাহিনী চিত্রিত। 'ভাঁড়ুদত্ত' গল্পে লেখক মধ্যযুগীয় কবি মুকুন্দরামের কালের সমাজ ও মানুষ যে এখনো বর্তমান, সেই নায়েবকে ঘুষ দেওয়া ইত্যাদি—তার কাহিনী একালের ভাঁড়ুদত্তকে এঁকে দেখিয়েছেন। একালের সব কিছুই প্রকাশিত হয় ভদ্রতার মধ্য দিয়ে, সৌজন্যের হাসি মিশিয়ে। 'ভাঁড়ুদত্ত' সেই হাসির অধিকারী। লেখক ভাঁড়ুদত্তের কথায় লিখছেন :

'সে একমাত্র মকরধ্বজী হাসি হাসিল। মকরধ্বজী হাসি কি? সর্বাধিক দাবীর

সার্বজনীন উত্তর আছে সেই হাসিতে। এই হাসি দেখিয়া পাওনাদার ভাবে—এবারে পাট উঠিলেই টাকা পাওয়া যাইবে। দেনাদার ভাবে শীঘ্র আর তাদের তাড়া আসিবে না। জমিদার ভাবে খাজনা মিলিল। প্রজা ভাবে খাজনা মাপ, কিন্তু কাহারো আশা সফল হয় না—অথচ সকলেই খুশি হয়। এ হাসি এমনি জিনিস। তেমন করিয়া হাসিতে জানিলে জীবনের অনেক সমস্যা সরল হইয়া যায়।'[৪০]

একালের মানুষকে, তার স্বভাব ও সময়কে এমনভাবে ব্যঙ্গের আঘাতে জর্জরিত করতে প্রমথনাথ বিশীর মত লেখক বাংলা কথাসাহিত্যে কম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশে লিখতে বসে পরিবেশ-সচেতনা-রহিত কিছু হাসির গল্প রচনা করেছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর 'রাণুর তৃতীয় ভাগ', 'বসন্তে', 'রাণুর কথামালা' ও 'হৈমন্তী' গল্প-সংকলনগুলিতে। গল্পে কৌতুকরস পরিবেশনে বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে এক অর্থে অসাধারণ ক্ষমতাবান শিল্পী। 'রাণুর তৃতীয় ভাগ'-এর অন্তর্ভুক্ত 'শোকসংবাদ' গল্পের দেশবিশ্রুত ব্যবহারজীবী মুমূর্ষু স্যার্ এস্ এল. গুপ্তা মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ প্রথম সংবাদপত্রে প্রকাশ করার প্রতিযোগিতায় নেমে দৈনিক 'সত্যপ্রকাশ' পত্রিকার হলধরবাবু, সিদ্ধেশ্বরবাবু, বামাচরণবাবুর যে নাজেহাল অবস্থা, জীবিত থাকা সত্ত্বেও মৃত বলে খবর জানিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করে ফেলা, ভুল সংশোধন করে সত্য খবর দান, পরে মৃত্যু হলে সত্যসংবাদ ইংরেজী দৈনিক 'স্টপ প্রেস' কর্তৃক প্রকাশ, মহানগরীতে শোকের ছায়া নেমে-আসা, সত্যপ্রকাশ পত্রিকার কৌতুককর ভূমিকা—এসব দিয়ে লেখক একটি নির্মল হাস্যরস পরিবেশন করলেও এসবের মূলে সংবাদপত্রের ব্যবসাদারী খবর পরিবেশন ব্যবস্থার প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্লেষটিও অস্বীকার করা যায় না। সর্বশেষ যখন সিদ্ধেশ্বরবাবুকে 'হলধরবাবু বিরক্তভাবে বলিলেন, ...লোকটা সেই গেল। তবে আমাদের সঙ্গে এরকম দুর্ব্যবহার করে গেল কেন বল দিকিন ?'[৪১] তখন এই জাতীয় মন্তব্যে করুণ রস-মিশ্রিত কৌতুক আমাদের মনোযোগ টানে। 'পূর্ণিমার নষ্টামি' গল্পে লেখক যে পূর্ণিমা রাত্রির পরিবেশে নায়ক-কেরানী অমূল্যের প্রণয় লীলা, নিজের আভিজাত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে তার স্ত্রীর বাস্তব ব্যবহার সব মিলিয়ে যে অসঙ্গতির মধ্যে কৌতুককর সমাপ্তি এনেছেন, তা হাস্যরসকে কিছুটা গাঢ় করে। 'রাণুর কথামালা'র 'বিপন্ন' গল্পটির এম এস-সি পাশ অধ্যাপক শৈলেনের নতুন বিবাহের অভিজ্ঞতার মধ্যে বাঙালীদের দুগ্ধ রুচি গ্রহণে উৎসুক এবং বিহারী ছাত্রের অন্য নাম ব্যবহার করার যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে কলেজে পড়াতে গিয়ে, তা যেমন হাস্যকর, তেমনি মানব চরিত্রের অভিনব বাসনা ও বুদ্ধির পরিচয় দেয়। 'বসন্তে' গ্রন্থের 'তীর্থক্ষেত্র' গল্পের অমলা দিদী এক হাস্যকর নারী চরিত্র। তীর্থ

থেকে ফিরেই মহিলাটি আবার তার স্বভাবসিদ্ধ পুরনো ঝগড়ায় মেতে ওঠে এবং বাঙালী, মন্তম, বোয়াল গিন্নী—যারা তার অবর্তমানে কিছুটা ক্ষণস্থায়ী সুখ-শান্তি পাচ্ছিল মনে, সে সুখ-শান্তিও আবার নতুন করে বিদায় নেওয়ার পথ খোঁজে। গল্পটির কৌতুকে চরিত্রকেন্দ্রিক শ্লেষ লক্ষ্য করার মত। হৈমন্তী' গ্রন্থের 'আবু হোসেন' গল্পের উত্তমপুরুষ চরিত্র লেখক-নায়কের লক্ষপতি হওয়ার মনোবাসনা যেভাবে ক্ষণিক চরিতার্থতা লাভ করেছে, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় চরিত্র ও ঘটনার বাস্তববোধ ও মনোকল্পনার অসঙ্গতিতে, তা অনবদ্য হাস্যরসের যোগান দিয়েছেন সারা গল্পে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় যুদ্ধ-সমকালের পরিবেশে সহজ কণ্ঠে, লঘু মেজাজে নির্মল কৌতুকের স্রোত বহিয়ে দিয়েছেন তাঁর একাধিক হাস্যরসাত্মক গল্পে। বাংলা কথাসাহিত্যে হাস্যরসের ধারাটিকে সমৃদ্ধ করার পক্ষে তাঁর গল্পগুলি অন্যতম কঠিন মাটি।

শিবরাম চক্রবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন ধরণের কৌতুক রস পরিবেশনকারী লেখক। তাঁর 'মেয়েদের মন' গল্প-সংকলনের গল্পগুলিতে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে। তিনি সৃষ্ট চরিত্রের সংলাপে ব্যবহৃত, কখনো লেখক-ভাষ্যে ব্যবহৃত শব্দের একাধিক অর্থ ও ব্যঞ্জনা ধরে বুদ্ধি-আশ্রয়ী কৌতুক রস পরিবেশনে পক্ষপাতী। তাঁর গল্পের হাস্যরস একেবারে প্রথম থেকেই পাঠককে চকিত করে। অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি—এসব দিয়ে লেখক কৌতুকের বিষয়কে উজ্জ্বল করে তোলেন। মেয়েদের মনস্তত্ত্ব, যুবক-যুবতীর প্রেম-মগ্নতা, ভালোবাসতে গিয়ে হৃদয়-দেওয়া-নেওয়ায় যে মজা, যে অসঙ্গতি-জনিত কৌতুকরসের প্রবাহ—তা 'মেয়েদের মন' গ্রন্থের গল্পগুলিতে মেলে। তাঁর হাস্যরস সহজ, সরল হলেও ভাষায়, ধীরে ধীরে পাঠক-হৃদয়ে অম্ল-মধুর রসের সঞ্চার করে। আলোচ্য গ্রন্থের নামগল্পে সেই রসপ্রবাহের প্রক্রিয়ার স্পষ্ট পরিচয় আছে। গল্পের কৌতুকরস যখন টানা কাহিনী ও মজার ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে লেখকের ব্যবহৃত শব্দভঙ্গি ও নায়ক-নায়িকার একাধিক অর্থবোধক শব্দ ও সংলাপকে আশ্রয় করে, তখন গল্পের চমকের সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরসের চমকপ্রদ স্বাদও মিলে মিশে এক হয়ে যায়। শিবরাম চক্রবর্তী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মত টানা গল্পকথনে উৎসুক নন, কথা ও কাজের মধ্যে অসঙ্গতির মোচড় দিয়ে দীপ্ত হাসির স্রষ্টা হয়েছেন নিঃসন্দেহে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হলুদপোড়া' গল্প-সংকলনের নাম-গল্পে যে কৌতুক রস পরিবেশন করেছেন, তা নিছক-ভূত নিয়ে লেখা গালগল্প নয়, রীতিমত অতি পরিচিত মানবজীবন-সন্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার গল্প। এই ধারার গল্প বাংলা কথাসাহিত্যে মুক্তোত্তর পর্বে অনেক বেশী লিখিত আত্মমায়া অধ্যাত্মমায়া লেখকদের

প্রযত্নে, কিন্তু সবই সমাজ-বাস্তবতায় ও সত্যজীবন-যাপনের মনস্তত্ত্বে যাচাই হয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'হলুদপোড়া' গল্পের বই-পড়ে-ডাক্তারী-শেখা নায়ক ধীরেনের চরিত্রের পরিবর্তন-চিত্রে গভীর মনস্তত্ত্ব সংযুক্ত করে ভৌতিক রসের বিচিত্র আস্বাদ দিয়েছেন পাঠকদের। বহুদিনের প্রচলিত সংস্কার সাধারণ শিক্ষিত মানুষদের কাছে প্রাণধারণের অবধারিত অবলম্বন রক্তকণিকার মত মূল্যবান হয়ে থাকে। মানুষ শিক্ষিত হলেও এমন কিছু যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক সংস্কার মনের গভীর গহন গোপন তলে, অবচেতনলোকে লালন করে, যা থেকে তার সর্বাবয়ব মুক্তি ঘটে না। গ্রামের বলাই চক্রবর্তী ও শুভ্রার আকস্মিক রহস্যময় মৃত্যুতে যে ভৌতিক সংস্কার ক্রমশ দামিনীকে গ্রাস করে, তার ফলে তার দেখা দেয় হিস্টিরিয়ার মত ভূতে ধরা রোগ। তাকে সারাতে গিয়ে একাধিক ডাক্তার ও ওঝার কীর্তিকলাপ দেখে ধীরেন ক্রমশ তার বিদ্যার অধিগত শিক্ষায় সেই বিষয়কে যুক্তি-তর্কে ধরতে পারে না। কিন্তু নিজের যুক্তি-চিন্তাকে সরিয়ে একদিন সে নিজেই আক্রান্ত হয়ে পড়ে সংস্কারে। এ সংস্কার অলৌকিক অস্তিত্বের ভয়ের সংস্কার। ক্রমশ গভীর আত্মদ্বন্দ্বে সে পরাজিত হয়ে শিকার হয় সংস্কার নির্দিষ্ট-ভয়েরই। গল্পের শেষে শুভ্রার খুনের সঙ্গে বলাই চক্রবর্তীর খুনীর ভূমিকা চিন্তায় যেমন চমক, তেমনি চমক আছে ভৌতিক রসের জগতে ধীরেনকে নায়ক করার মধ্যে :

'বাঁশটা সরিয়ে দাও।'

'ডিঙিয়ে এসো। বাঁশ ডিঙিয়ে চলে এসো। কি হয়েছে? পড়ে গেছ নাকি?'

'ডিঙোতে পারছি না। বাঁশ সরিয়ে দাও।'

'বাঁশ ডিঙোতে পারছো না! মাটিতে শোয়ানো বাঁশ!' শান্তির আর এতটুকু সন্দেহ রইল না। আকাশ-চেরা তীক্ষ্ণ গলায় আর্তনাদের পর আর্তনাদ শুরু করে দিল।

তারপর প্রতিবেশী এল, পাড়ার লোক এল, গাঁয়ের লোক এল। কুঞ্জও এল। ... মালসার আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে বজ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুই? বল তুই কে?'

ধীরেন বলল, 'আমি বলাই চক্রবর্তী। শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।'[৪২]

ধীরেনের এই পরিবর্তনে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাই বড় কথা, কুসংস্কার সেখানে সমস্ত রকম বিজ্ঞানবুদ্ধি, শিক্ষা, যুক্তি-তর্কের ওপরে গেছে। 'হলুদপোড়া' বাংলা কথাসাহিত্যে এক অভিনব আস্বাদী ভূতের গল্প।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কালকূট' গল্পসংকলনের 'টিক্‌টিকির ডিম' গল্পে ভূতের ভয়ের বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে একটি ক্লাবের অন্যতম কথক বরদার কথায় বলেছেন :

'ভয়ের যে বস্তুটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না, যার ভয়ানকত্ব যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা

যায় না এবং যার হাত থেকে উদ্ধার পাবার কোন জানিত উপায় নেই, সেই বস্তুই বোধ করি জগতে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। ভূতের ভয় ঐ জাতীয়।'[৪৩]

বরদার এই জাতীয় মন্তব্যের কারণ বরদা নিজেই এমন এক ভূতের ভয়ে আক্রান্ত হয়েছিল যা মানুষের সমাজের বাইরের অশরীরী অস্তিত্ব। এই অশরীর অস্তিত্ব হল কারণে-অকারণে টিকটিকির ডিম দেখা। টিকটিকির প্রতি ঘৃণা এবং তাকে ভয় বরদার আজন্ম। কিন্তু ভয়ের মধ্যে অজ্ঞাতে গর্ভিনী টিকটিকিকে মেরে ফেলার পর থেকেই নিদ্রায়-জাগরণে অসংখ্য টিকটিকির ডিম দেখার এবং শেষে বিছানার ওপর অজস্র ডিম থেকে জীবন্ত টিকটিকি বেরিয়ে আসার স্বপ্ন দেখার মধ্যে যে ভৌতিক রস, তা নিঃসন্দেহে অভিনব। ভূতের ভয়ের চাপ প্রসঙ্গে বরদার কথায় ভূতের অস্তিত্বের স্বরূপ :

'টিকটিকি-বধূ অতি-প্রসবিতা বলে উড়িয়ে দেওয়া আর অসম্ভব। এ আর কিছু নয়—ভূত,ডিম-ভূত! সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ টিকটিকিটা প্রেতোযোনি প্রাপ্ত হয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, এবং ঐ ডিম ছাড়া আর কিছুতেই যে আমি ভয় পাবার লোক নয়, তা সে তার ভৌতিক বুদ্ধি দিয়ে ঠিক বুঝেছে।'[৪৪]

এমন টিকটিকির প্রেতযোনি-প্রাপ্তি ও ডিমভূতের কল্পনা লেখকের নিজস্ব অভিনব ভৌতিক রস সৃষ্টির পরিচায়ক। বরদার চিন্তায় জটিল বিকার থাকতে পারে, কিন্তু লেখক বরদাকে দিয়ে গয়ায় টিকটিকির প্রেতযোনির শান্তির জন্য যে পিণ্ডদানের ও স্বস্তি প্রাপ্তির কথা বলিয়েছেন, তা ভূতের মতই অলৌকিক রহস্যময়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদপোড়া' গল্পের ভৌতিক ভাবনায় আছে গভীর-জটিল মনস্তাত্ত্বিক রহস্য ও বিকারগ্রস্ততা, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৌতিক রসে আছে ভূতের অভিনব অস্তিত্ব ও সেই সূত্রে অবাস্তব কল্পনা ও সক্রিয়তা। মনস্তত্ত্বের থেকে নির্ভেজাল অলৌকিক রস পরিবেশনই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্য।

প্রমথনাথ বিশী ভূতের গল্পে রহস্য সৃষ্টিতে একজন সার্থকতম শিল্পী। তাঁর 'গল্পের মতো' গ্রন্থের অন্তর্গত 'দ্বিতীয় পক্ষ' গল্পে এক বিপত্নীকের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা গোপন করে দ্বিতীয় পক্ষ ঘরে আনার পর প্রথম পক্ষের স্ত্রী অলৌকিক সত্তায় দ্বিতীয় পক্ষের মনে চেপে বসার ও তার সক্রিয়তার যে কাহিনী বলেছেন, তা কিছুটা মনস্তত্ত্ব-সম্মত হলেও স্বর্গত আত্মার-অস্তিত্ব বিষয়েও গভীর রহস্যের দ্যোতক নিঃসন্দেহে। অন্নদা-প্রসাদের সাতাশ বছর বয়সে প্রথমা স্ত্রী শ্রীলেখা মারা যায়। এত কম বয়স বলেই দ্বিতীয়বার বিবাহকে প্রথম বিবাহ বলে প্রমাণ করতে অসুবিধে নেই। নীলিমা সেই দ্বিতীয় পক্ষ। অন্নদা দ্বিতীয়বার বিয়ের আগে শ্রীলেখার ফুলশয্যার সাজে তোলা ফটোটি ছাড়া সব কিছু স্মৃতিচিহ্ন সরিয়ে ফেলে। কেবল কিছু নতুন শাড়ি, ব্লাউজ যা

নীলিমা ব্যবহার করতে পারে, অথচ বুঝতেও পারবে না সেগুলিই রাখে। কিন্তু শ্রীলেখার আত্মা স্বপ্নে নীলিমার সঙ্গে দেখা করে, কথা বলে, তার অস্তিত্ব এই বাড়িতে আছে শেষ প্রমাণ দেয় নীলিমাকে দিয়েই সেই একান্ত গোপনে লুকানো ফটোটি বের করে দিয়ে। শ্রীলেখার স্বর্গত আত্মার সক্রিয়তা, নীলিমার ভয় ও অন্যায় গোপন করার অন্যায়বোধজনিত আড়ষ্টতা 'দ্বিতীয় পক্ষ' গল্পের অদ্ভুত অলৌকিক রসাস্বাদের কারণ।

প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'গালি ও গল্প' গল্প-সংকলনের 'বিপত্নীক' গল্পটিতে অবশ্যই আর এক বিপত্নীক নিবারণকে এঁকেছেন বটে, তবে তাতে অলৌকিকতা নেই, আছে প্রচলিতভাবে বিপত্নীকদের বিবাহ করার বিরুদ্ধে প্রথম স্ত্রীর প্রতি গভীর প্রেমের স্বীকৃতির কথা। গল্পের শেষে ট্রেন থেকে নেমে থাকা, প্লাটফর্মে লেখকের সম্পূর্ণ অপরিচিত, ট্রেনের অন্ধকারে অন্য কামরায় যাত্রী নিবারণের তিন পরিচিত সহযাত্রী ব্যক্তির কাছে শোনা সেই নিবারণকে দেখে লেখকের যে ধারণা, তা-ই সমগ্র গল্পটির শেষে ব্যক্ত :

'দুঃখের মূর্তি দেখিয়াছি, কিন্তু পরিপূর্ণ নৈরাশ্যের মূর্তি এই প্রথম দেখিলাম।··· নিবারণের পত্নীবিয়োগের নৈরাশ্য।···গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তিনজনে নিবারণকে ডাকিতে লাগিল—সে একবার তাকাইল, কিন্তু গাড়ী ধরিবার জন্য কোনরূপ উদ্যম করিল না। সে একই স্থানে মূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। শীতকালীন গাঢ় কুয়াশায় চারিদিক লুপ্ত। আজ সে কুয়াশা নিবারণের নৈরাশ্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া যেন গাঢ়তর!'[৪৪]

গল্পটি হাসির নয়, অলৌকিক রস এতে নেই, তবে লঘুচালে সমগ্র গল্পটি বলা শেষ করে শেষে এনেছেন একই সঙ্গে করুণ রস ও গম্ভীর রসের মিশ্রিত প্রেম চিত্র।

তিন।

সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী বৃটিশের তৈরী এক ভারতীয় কারাগারের অভ্যন্তরীণ জীবন যাপনের নিপুণ ছবি এঁকে বাংলা কথাসাহিত্যে বিচিত্র স্বাদ দিয়েছেন সরোজ কুমার রায়চৌধুরী তাঁর 'শৃঙ্খল' নামের উপন্যাসে। কারাগারের বন্দী একাধিক কয়েদীর অসহায় করুণ অবস্থা একদিকে, আর একদিকে শাসক শ্রেণীর নির্দেশ-নিয়মে অত্যাচারের দুর্বার রথচক্রের অমানবিক রূপ—এই দুয়ের জীবন্ত ছবি আঁকা আছে উপন্যাসটিতে। কিন্তু এত সব অত্যাচার-উৎপীড়ন, নির্মমতা, অমানবিকতার মধ্যে কয়েদীরা যেমন নিজেদের একটি দয়া-মায়া-ক্ষমা-প্রেম-স্বার্থপরতা-হিংসা ইত্যাদি বৃত্তির সমন্বয় গড়ে তোলে আপনজনের কোন এক সংসার। এমন সংসারেই একদিন আসে বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নামের এক যুবক অধ্যাপক—যে স্ত্রী অমলাকে খুন করার দায়ে অভিযুক্ত হয়।

আসলে বিশেশ্বরের জেলে আসার পিছনে ছিল তারই গ্রামের স্বার্থপর ধূর্ত তারিণী চৌধুরী, নটবর ইত্যাদি গ্রাম প্রধানের মত অন্যতম সভ্যরা। অমলার যে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়াতেই মৃত্যু ঘটেছে, তা মিথ্যা প্রমাণ করে গ্রামপ্রধানেরা। বিশেশ্বর কারাগারে এসে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে ক্রমশ, তার নিপুন চিত্র তৈরী করে লেখক বিশেশ্বরের যেমন এক করুণ জীবন-পরিণতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন, তার থেকেও বড় কথা, বৃটিশ শাসনাধীন কারাগারের কয়েদীদের জীবন-স্বভাবের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার জীবন্ত ছবি নানারঙে চিত্রিত করে কথাসাহিত্যে এক বিচিত্র স্বাদ-বৈচিত্র্য এনেছেন। উপন্যাসের নবী নওয়াজ, কোকেন চোর নাটু, স্ত্রী-হন্তা ব্যারিষ্টার ঘোষ, পণ্ডিত, মিরাণ্ডা ইত্যাদি কয়েদী চরিত্র এবং জেলার মিঃ গ্রাহাম ইত্যাদি জেলকর্মী—সকলেই তাদের নিজ নিজ জীবনের খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্য-পাঠকদের অন্য এক জগতে নিয়ে গেছে।

কয়েদীদের সকলেরই মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা তীব্র। কিন্তু নির্মম শাসনে-নিয়মে কারাগারে তার তীব্রতা নয়, সামান্যতম মানসিকতার প্রকাশ নিষ্ঠুরভাবেই নিষিদ্ধ। অথচ সেই কয়েদীদের মধ্যেই ক্রমশ প্রকাশ্য হয়ে আসে মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কারণ 'শৃঙ্খল ভাঙিবার বুঝি একটা আদিম প্রবৃত্তি সকল মানুষের অন্তরেই লুকাইয়া থাকে। শৃঙ্খল ভাঙিবার সে একটা নেশা।'[৪৬] লেখকের এমন মন্তব্যের প্রয়োগ-প্রমাণ মেলে কয়েদীদের ক্রমশ বিশেশ্বরকে কেন্দ্র করে সংহত হওয়ার মধ্যে। বিশেশ্বরের কয়েদখানার মধ্যে যে তৎপরতা, তা গোপনে গোয়েন্দাগিরি করে একদিন কয়েদী ব্যারিষ্টার ঘোষই কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়। পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে সকলেই এই কলঙ্কজনক গোয়েন্দাগিরির কারণ হিসেবে মুক্তির নির্দিষ্ট দিনের কয়েকদিন আগেই ঘোষের ছাড়া পাওয়ার বাসনাকেই দায়ী করে। সে ব্যাপারে বিশেশ্বরের কথা :

'ভেতরে' ভেতরে আমাদের সকলের মনই মুক্তির জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছে। সকল সময় টের পাইনে, কিন্তু সম্মুখে প্রলোভন এসে পড়লে, আর সামলাতে পারিনে। বন্ধনের জ্বালায় অস্থির হয়েই তো আমরা ধর্মঘট করতে যাচ্ছিলাম, কত বড় শাস্তির আশঙ্কা মাথায় নিয়ে। অথচ কতটুকুই বা পেতাম। তাও পারলাম না—ভিতরে ভিতরে শক্তির ভাণ্ডার যে এত রিক্ত হয়ে গেছে ভাবতেও পারিনি। সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবার লোভে যে ঘোষ গোয়েন্দাগিরি করবে তার আর বিচিত্র কি।'[৪৭]

কারাগারের বন্দিজীবন, বাইরের জগতে সম্পর্কহীন শৃঙ্খলিত জীবন মানুষকে কারাগার ভেঙে পালিয়ে যাওয়ার দুর্জয় নেশা ও শক্তি দেয়—যা বেন্টোর মধ্যে দেখা গেছে, আত্মহননে প্ররোচিত করতে পারে, এমন কি মুক্তি নিশ্চিত জেনেও তাকে উন্মাদ করে তুলতে পারে।

ব্যারিস্টার ঘোষের যে গোয়েন্দাগিরি যার জন্য বিশ্বেশ্বরকে অকথ্য অত্যাচার ও ক্লেদাক্ত-জীবন কাটাতে হয়—তার মূলে ঘোষের সুস্থ মস্তিষ্কের সক্রিয়তা ছিল না, ছিল এক দীর্ঘদিনের কয়েদজীবন-যাপনে বিকৃত মানসিকতার এক শিক্ষিত ব্যক্তির মানস অভিব্যক্তি। বুঝিবা চরিত্রটি নিজেও জানে না তার ক্রিয়াকর্মের মূলে চিহ্নিত স্নায় রোগের যুক্তিগুলি :

'ঘোষ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া বসিল, যে প্রশ্ন কোনো মানুষ সুস্থ মস্তিষ্কে করিতে পারিত না।

ঘোষ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার হিংসে হচ্ছে না?

—হচ্ছে বই কি?

—তবে তুমি এ গুজব বিশ্বাস কর না কেন?

বিশ্বেশ্বর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মাঝে মাঝে ঘোষের মাথা খারাপ হইয়া যায়। সে ফিক করিয়া একটু হাসিয়া বলিল,—তা হলে তোমার কাছে আর মিথ্যে বলবো না বিশ্বেশ্বর, গুজবটা সত্যি। আমিই সিপাহীর মারফৎ জেলারের কাছে খবর দিতাম। কেন যে দিতাম তাও জানি না, ওই এক আমোদ।

—শুধু আমাদের জন্যে?

—ভগবানের দিব্যি, শুধু আমাদের জন্যে।

ঘোষের কণ্ঠস্বরে লজ্জার চিহ্নমাত্র নেই।

—তোমার মেয়াদ মাফ হবে এই ভরসায় নয়?

—না, মেয়াদ মাফ হতে পারে আমি তাই কোনোদিন ভাবিনি।

বিশ্বেশ্বর বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল। কিন্তু পাগলের পক্ষে সবই সম্ভব।

ঘোষ আর একটু তাহার কাছে ঘেঁসিয়া আব্দারের ভঙ্গিতে হাসিয়া বলিল,—তুমি আমাকে সাধু লোক ভাবতে না?

বিশ্বেশ্বর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, না, আমি সবই জানতাম।

বিশ্বেশ্বর বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু ঘোষের মুখে বিস্ময় অথবা বেদনার চিহ্নই ফুটিতে দেখা গেল না।'[১৪৮]

ঘোষ চরিত্রটি লেখকের এক অদ্ভুত সৃষ্টি। কয়েদীরা মুক্তির জন্য ছটফট করে। প্রতি-নিয়তই সেই দিনটির জন্য তাদের থাকে যেন অহল্যার প্রতীক্ষা। শুধু তারা ভুলে থাকে নিজেদের মধ্যে সখ্যতা, বিশ্বাস, ভালবাসা ইত্যাদির বন্ধনে নিয়ন্ত্রিত থেকে। যে একদিন মুক্তি পায় তার তো পৃথিবীর মধ্যে বেঁচে থাকায় সময় সীমার একটি সবচেয়ে উল্লেখ্য দিন

হয়ে যায়। কিন্তু কয়েদখানায় আর যারা পরিচিত থেকে যায়, তারা আত্মীয় হারানোর যে বিধুর বেদনা অনুভব করে, সরোজকুমার রায়চৌধুরী তারই এক সুন্দর ছবি এঁকেছেন কয়েদি-ব্যারিষ্টার ঘোষ চলে যাওয়ার পর :

'কিছুক্ষণ পরে বিশ্বেশ্বর ঘোষের শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। বলিল,—যাই বল, ওয়ার্ডটা যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

সকলেই ঘরের দিকে চাহিল।

খাটের উপর গদীটা ঠিকই আছে, কিন্তু চাদরটা সরিয়া গিযাছে,—বালিশটাও তাল পাকাইয়া এক কোণে পড়িয়া আছে। টেবিলের উপর গত কল্যকার নৈশাহার যেমনকার তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে,—ভালো করিয়া খায়ও নাই। কতকগুলো ময়লা পোষাক এক কোণে এলোমেলো ভাবে পড়িয়া। যে প্রতিবেশীটি দীর্ঘকাল এই কক্ষে সুখে দুঃখে কাটাইয়া গিয়াছে, সে আজ নেই।

একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস সকলের অন্তস্তল হইতে উঠিয়া সেই শূন্য কক্ষে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।'[৩৯]

উপন্যাসের শেষে বেস্টোর ফাঁসি হয়ে যায়। তা যেমন দুঃখজনক, তেমনি মর্মান্তিক, অমানবিক। এমন করুণ অমানবিকতা কারাগারের নিয়মেই বুঝি লেখা থাকে। 'শৃঙ্খল' উপন্যাসের লেখক বেস্টোর ফাঁসির ঘটনাকে যেভাবে সংবাদ হিসেবে চিত্রিত করেছেন, তা সহৃদয় পাঠকের চোখে জল আনেই :

'...ফাঁসির আগের দিন বেস্টো সমস্ত রাত অবিরাম ভগবানকে ডাকিয়াছে। নিস্তব্ধ রাত্রে সে কাতর আহ্বানে মানুষ তো ঘুমাইতে পারে নাই, দেবতার নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না কে বলিবে। শেষ রাত্রে যখন জেলার আসিয়া তাহাকে প্রস্তুত হইতে বলিল, তাহার কণ্ঠ হইতে শুধু একটা শীর্ণ, তীব্র স্বর বাহির হইল,—ও-ও-ও-ও——

আর কিছু শোনা গেল না। সম্ভবত ইহার পরই সে অজ্ঞান হইয়া যায়। কিংবা—

কিন্তু জেলার বলে, সে মরিয়া যায় নাই। তবে অজ্ঞান অবস্থাতেই তাহার ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল। বোধ হয় জেলারের কথাই সত্য। আর সত্য না হইলেই বা কি? দণ্ডিতের মৃত্যু—ফাঁসীতেই হোক, অথবা অন্য কিছুতেই হোক, তাহাতে দণ্ডধারীর কি ক্ষতি? তবু আইন, আইন।'[৪০]

ফাঁসির পিছনে যে যুক্তি ও সমাজ-ন্যায়ই থাকুক না কেন, তার আইন সমস্তরকম মানবিক বোধকে পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়। সে আইনের নিষ্ঠুরতা ও নিরাসক্তি মানুষকে স্বীকার করে নয়, মানুষকে ধ্বংস করেই। যে আইন মানুষকে ধ্বংস করে, তার সূক্ষ্ম যুক্তি কোথায়—বিশ্বেশ্বর জেলে বসে সেই সূত্রটি ধরার ও বোঝার চেষ্টা করে। নায়ক

বিশ্বেশ্বর কয়েদী জীবনের আর এক প্রাণধ্বংসী সত্তার অস্তিত্ব। বিশ্বেশ্বর সুস্থভাবে বাঁচতে চেয়েছিল কয়েদখানার মধ্যেও। সে একদিন মুক্তি পেয়ে আবার জীবনের উদ্দামতায়, প্রাণের প্রবল বেগের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এই ছিল তার কাম্য, কিন্তু কয়েদখানায় সেও হল এক নিষ্ঠুর। তার অভিজ্ঞতা তাকে জীবনের এমন এক প্রান্তে নিক্ষেপ করে যেখানে সে ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গের মত পঙ্গু অথর্ব এক মানুষ। যে যৌবন, প্রাণ ছিল তার, জেলের মধ্যেকার রক্তশোষক পরিবেশ ও নিয়ম তাকে করেছে বৃদ্ধ। তার অভিজ্ঞতা তার প্রাণশক্তিকে নিষ্ঠুর নিয়তির মত নিয়মের বিধানে নিঃশেষিত করেছে। লেখক বিশ্বেশ্বরের এমন পরিণতি এনে কয়েদী জীবনের শূন্য পরিণামের দিকে আমাদের দৃষ্টি টেনেছেন। উপন্যাসের সব শেষে মিয়াওয়ার বিশ্বেশ্বরের বয়স নিয়ে কথাবার্তা বলার সময় বিশ্বেশ্বর যে মন্তব্য করে, তা এক জীবনযুদ্ধে ব্যর্থ, অসহায় কয়েদী-নায়কের মর্মবাণী যেন :

'আমার দেশের ছেলেরা আমার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে। আজও তারা প্রত্যহ আমার ছবির পুজো করছে। কিন্তু আমার তাতে কি ? পৃথিবী থেকে রস টেনে নেবার শক্তি গেছে, আজকে আমায় যেখানেই বসিয়ে দিক, কোথাও আমি বাড়তে পারবো না, —বাঁচতে পারবো না, ফুল ফোটাতে পারবো না। এই কটা বছরে আমার শক্তি গেছে, —আমার সমস্ত গেছে।

বিশ্বেশ্বর আবার হাঁফাইতে লাগিল।'[৫১]

শৃঙ্খল উপন্যাসে নায়ক বিশ্বেশ্বরের অভিজ্ঞতার দর্পণ বস্তুত লেখকের সহমর্মী সমবেদনা-রসে সিক্ত, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশক্তি শাসিত কয়েদখানার জীবনের সার্থক এক আলেখ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের অনেক আগে থেকেই হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গাকে সামনে এনে দেশীয় রাজনীতির কৌশল গ্রহণের একটা দিক নির্দিষ্ট হতে থাকে ধীরে ধীরে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে শাসক শ্রেণীর এ ছিল বিভেদ সৃষ্টির ও আন্দোলন ধ্বংস করার অন্যতম উপায়। 'মোহানা' উপন্যাসে সেরকম দাঙ্গা বাধানোর ইঙ্গিতটিও লেখক অন্তরালে রাখেন নি। মালিক-শ্রমিক বিরোধে যখন ধর্মঘট সুস্থভাবে সংগঠিত করার জন্য রফিকরা উদ্যোগী হয়, তখন তাদের অন্যতম শর্ত ছিল—'হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে দাঙ্গা না বাধে তার প্ল্যান' আগে তৈরী করা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হল আন্দোলনের মূল ভিতকে দুর্বল করার পক্ষে মোক্ষম চোরা-গোপ্তা আক্রমণ। শোষক তথা মালিক শ্রেণীর এ এক কূট চাল। রফিকরা জানত :

'হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা শ্রমিক-শ্রেণীকে দুখণ্ডে বিভক্ত করার ফন্দী মাত্র, তা ছাড়া সমিতি নজর রাখবে যে বাইরের কোনো লোক পাড়ায় না ঢোকে। সমিতি পাহারা

দেবে, হিন্দু মজুর মুসলমান পল্লী আর মুসলমান মজুর হিন্দু পল্লীতে। শহরে শান্তির ভার কর্তৃপক্ষের, মজুরদের ভার মজুর পাড়ায় দাঙ্গা হতে না দেওয়া, তার বেশী নয়।'[৫২] উপন্যাসের কাহিনীর পটভূমিতে নায়ক চরিত্র-ন্যায়ের কারণে এমন দাঙ্গা সম্পর্কে ভাবনার প্রকাশ লেখকের যুদ্ধ-সমকালের রাজনৈতিক ধারণার যথার্থ প্রয়োগ প্রমাণ করে।

হিন্দু-মুসলমান এই দুই ধর্মীয় জাতির বিরোধ নিয়েও বক্তব্য রেখেছেন গোপাল হালদার তার 'উনপঞ্চাশী' গ্রন্থে। অবশ্যই সেই বিরোধ ক্রমশ দানা বেঁধেছে রাজনৈতিক মতামতের সংঘর্ষ থেকেই। গান্ধীজী বলেছিলেন, 'আগে ইংরাজ যাক, পরে মুসলমানের সঙ্গে মিলন হবে।' উপন্যাসের নায়ক বিনয় মনে করে, এই উক্তি অর্ধ-সত্য। আর এই উক্তির সুযোগ নেয় গোঁড়া-হিন্দুরা। সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের দাবার চাল ঘোরে স্বার্থসর্বস্ব কুৎসিৎ মানবতা-বিধ্বংসী দাঙ্গার মধ্যে। গোপাল হালদার এমন দাঙ্গার স্পষ্ট প্রত্যক্ষ চিত্র এঁকেছেন উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদের মধ্যে :

'হঠাৎ এক রাত্রিতে বিনয়েরই বাড়ির সামনে পথে চিৎকার শোনা গেল। বিনয়ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল দেখতে কি হয়েছে। দেখল কে একজন আক্রান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। রক্ত তার মাথায়, চোখে মুখে। বিনয় চিনল মজিদ। কারা তাকে হঠাৎ পেছন ঘিরে ফেলে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে আক্রমণ করে।...

... কিন্তু মজিদের ব্যাপার নিয়ে এবার মুসলিম লীগ ক্ষেপে গেল। এতদিন মজিদ ছিল তাদের চোখে প্রায় অস্পৃশ্য। কিন্তু তাই বলে মুসলমানের গায়ে হাত তুলবে হিন্দুরা? হাফেজ নেই, কিন্তু জাহেদুদ্দীন চুপ করে থাকবে নাকি? বিশেষত মজিদ মিঞা তো তারই বন্ধু। হিন্দু ভদ্রলোকেরা বিপদে পড়ে গেল। মজিদকে তারা সন্দেহের চোখে দেখতেন।—মুসলমান হয়ে সে হিন্দু মেয়েদের সঙ্গেও মেশে, এটা ভাল কথা নয় তো। তাদের ভয় হল, কিন্তু এখন মুসলমানরা দাঙ্গা বাধাবে নাকি? কাজটা ভাল করেনি যারা মজিদকে মেরেছে।'[৫৩]

বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয়ে আর এক বিচিত্র আস্বাদ দিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'অহিংসা' উপন্যাসে। গুরুবাদ বাংলাদেশের ধর্মনির্ভর জাতীয় জীবনে ওতপ্রোত। বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের কাল থেকে এই গুরুবাদের স্পষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়। বিশ শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল পর্যন্ত এই যে ধারা প্রবাহিত, তার স্বরূপ সভ্যতার পোষাক-পরা ভণ্ডদের যাবতীয় স্বার্থপরতা, লোভ-লোলুপতার কাহিনীই হয়ে উঠেছে। 'অহিংসা' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সদানন্দ ও বিপিনের আশ্রম-ব্যবসার জীবন্ত চিত্র উপহার দিয়ে সেই গুরু-শিষ্য-ব্যবস্থার ধারাকে স্পষ্ট করেছেন। ধর্মকে নির্ভর করেই গুরুবাদের জন্ম। ধর্ম এমন একটি বিষয় যা দিয়ে সব স্তরের মানুষকে তন্দ্রালু-আচ্ছন্ন

করা যায়। সেই ধর্মকেই ব্যবসা করেছে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিপিন। অর্থলোভ, নারীদেহ ভোগ, স্বার্থচিন্তা ও যাবতীয় হীনকৌশল এই ধর্মবুদ্ধি ও গুরুবাদের মূলে সক্রিয়। যে মহীগড়ের রাজাসাহেবের তৈরী করা আশ্রমটি, সেই আশ্রমে রাজা-সাহেবের কুশলে নিয়ে-আসা মাধবীলতাই সদানন্দের ধর্মের ভড়ং দেখিয়ে দেয়। খাঁটি অহিংস ভক্ত মহেশ চৌধুরীও আর এক দিক থেকে ভণ্ডামী ধরিয়ে দেয় তার নিজের ধর্মীয় অহিংসায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসটুকু বজায় রেখেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্রম, ধর্ম, যৌনতা, সদানন্দের অসংযম ও নারীলোলুপতা, বিপিনের শঠতা, ও ধূর্তবুদ্ধি এবং অর্থগৃধ্নুতা—এসব দিয়ে যে বিকারগ্রস্ত ধর্মভাবের কথা এনেছেন, তা বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয়ের পরিধি বাড়ায়, বিষয়ে অভিনবত্ব দান করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই ধর্ম, অধ্যাত্ম-ভাবনা, ধর্মীয় অহিংসানীতি ইত্যাদি বিষয় সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। গুরুবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হাওয়ার দু বছর পর প্রকাশিত উপন্যাসে লেখক সেই অহিংসা ধর্মের ভিতরকার সম্পূর্ণ ফাঁপা, ফাঁকা স্বভাবটি আধুনিক বিশ শতকীয় সভ্যতার পরিবেশে কি আকার নেয়, 'অহিংসা' উপন্যাসে তারই আলেখ্য এঁকেছেন।

তারাশংকরের 'কবি' ও 'কালিন্দী' উপন্যাস দুটিতে লেখক সম্পূর্ণ নতুন জগতে আমাদের মনোজগতের মুক্তি ঘটিয়েছেন। 'কবি' ও' 'কালিন্দী'—দুই উপন্যাসেরই পটভূমি লালমাটির বীরভূমের রাঢ়ের একটি বিশেষ অঞ্চল। নদীর তলদেশ থেকে একদা উত্থিত কালিন্দী নদীর চর, জমিদার রামেশ্বরের জমিদারী, নদী পরিবেষ্টিত জড় প্রকৃতি —এ সবের সূত্রে উপন্যাসে রায় ও চক্রবর্তী বংশের যে বিরোধ-সংঘর্ষের চিত্র অংকিত, তা শুধু পুরনো জমিদারী ব্যবস্থার সংগে আমাদের পরিচয় করায় না, রাঢ় অঞ্চলের একটি আঞ্চলিক জীবনকে সামগ্রিকভাবে দেখানোর প্রয়াসও আছে সেখানে। এ সবের মধ্যে যাযাবর সাঁওতাল সম্প্রদায় থেকে শুরু করে কলওয়ালা মিঃ মুখার্জীর ক্রিয়াকলাপ সবই যুক্ত। রামেশ্বরের যৌবন বয়সের পাপচেতনা ও তার অশরীরী প্রতিক্রিয়া ভাবনা উত্তরসূরীদের মধ্যে—এসব 'কালিন্দী' উপন্যাসের বিষয়ে যে অভিনবত্ব এনেছে তা বাংলা কথাসাহিত্যে ভিন্ন স্বাদ দেয়। 'কবি'র ঝুমুর দল, নীচু শ্রেণীর মানুষদের রুচিহীন দেহবিলাস, প্রেমভাবনা, প্রেম ও যৌনতাকেন্দ্রিক আদিমবৃত্তির তীব্রতা, রাঢ়-অঞ্চলবেষ্টিত যাযাবর জীবনের আকর্ষণ—এমন সব বিষয় সংমিশ্রিত হয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে অন্য মাত্রা যোগ করেছে। ডোমশ্রেণীর সন্তান স্বভাব-কবিয়াল নিতাই যে গ্রামের মানুষ তার প্রাচীন নাম অট্টহাস—একান্ন মহাপীঠের অন্যতম। মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুণ্ডার পুজোয় কবিগান, যাত্রাগানের আসর হয়। লোক-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক নিতাই-এর

অতীত বংশ এবং নিতাইও। নিতাই যে দলে গান গায় তা বীরভূমেরই ঝুমুর দল। এদের ভ্রাম্যমান জীবনচর্যার যে বৈশিষ্ট্যগুলি তারাশংকর গ্রহণ করছেন, সেগুলি হল মেয়েদের বিশেষ ধরণের পোষাকে সজ্জিত হয়ে ইতর ভাবভঙ্গী করা, অশ্লীল রসিকতায় মেতে থাকা, ঘৃণিত দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হওয়া, একাধিক প্রেমে ডুবে থাকা। এসব দিয়ে 'কবি' উপন্যাসের যে আঞ্চলিক জীবন ও জগত—তা নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের সাহিত্যে নূতন রসাস্বাদী। এমন আঞ্চলিক জীবনকথা দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর কালে তারাশংকর 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ইত্যাদি উপন্যাসের বিষয়ে আরও বড় জীবনদর্শনে আঁকতে সচেষ্ট হয়েছেন।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কথাসাহিত্যের আর এক নতুন জগতে নিয়ে গেছেন, দিয়েছেন কথাসাহিত্যের বিষয়ে নতুন স্বাদ। রাণাঘাটের রেলবাজারে বেচু চক্রবর্তীর আদি ও অকৃত্রিম হিন্দু হোটেলের রাঁধুনী হাজারি ঠাকুরের চাকরী জীবনেব সুখ-দুঃখের, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যেও আপ্রাণ বেঁচে থাকার যে কাহিনী, তা যেমন চরিত্রের অভিনবত্ব দেখায়, তেমনি এক ষ্টেশন সংলগ্ন মফঃস্বল শহরের হোটেলের জীবন্ত পরিবেশকে চিত্রময় ব্যঞ্জনায় মহৎ শিল্প করে তোলে। হাজারি চক্রবর্তী ছিল গ্যাংনাপুর ষ্টেশনের কাছাকাছি এড়োশোলা গ্রামের মানুষ। গ্রাম থেকে একদিন বেরিয়ে পড়ে কাজের সন্ধানে। উপন্যাসের শেষে আবার সে গ্রামে ফেরে। তখন সে রাঁধুনী হিসেবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত, সম্মানিত পুরুষ। কাহিনী-মধ্যে বিভূতিভূষণ এনেছেন পদ্ম-ঝি-র মত মুখরা, চরিত্রহীনা একটি হোটেলের কর্মচারীকে—যার সঙ্গে প্রতিদিনের সংঘর্ষে হাজারির জীবন ছিল ওষ্ঠাগত। তার দুঃখের জীবন। হোটেলের কাজের অবসরে দেবতা-সেবায় ও গঞ্জিকা সেবনে শান্তি পেতে অভ্যস্ত ছিল। মেয়ে টেপি, টেপির মা ইত্যাদির সাংসারিক সান্নিধ্যের ছোট বড মানবিক বোধে বিভূতিভূষণ হাজারির যে চরিত্ররূপ দিয়েছেন, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের কথাসাহিত্যে নিশ্চয়ই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত নূতনত্বের দাবী রাখে। উপন্যাসের শেষে লেখক রাণাঘাট ষ্টেশনে এতদিন পরে একা বাড়ি ফেরার পথে পদ্মঝি ও হাজারির যে সম্পর্ক-চিত্র এঁকেছেন তা যেমন মানবিক, তেমনি হাজারির দীর্ঘদিনের আত্মগুপ্ত দুঃখময় জীবনের পক্ষে সান্ত্বনার মতই। যে পদ্মঝি ছিল হাজারির কাছে কঠিন শাসন-শোষণের জীবন্ত প্রতিমূর্তি, যার ব্যবহার হাজারিকে নানাভাবে পর্যুদস্ত করেছে জীবন-মন-প্রাণে, সেই পদ্মঝির স্বভাবের পরিবর্তন হাজারির পক্ষে চরম বিস্ময় :

'পদ্মঝি এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটাইল। হঠাৎ ঝুঁকিয়া নীচু হইয়া বলিল—দাঁড়ান ঠাকুর মশাই, পায়ের ধুলোটা দেন একটু—

হাজারি অবাক, স্তম্ভিত। চক্ষুকে বিশ্বাস করা শক্ত। একি হইয়া গেল! পদ্মদিদি তাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া পায়ের ধুলা লইতেছে, এমন একটা দৃশ্য কল্পনা করিবার দুঃসাহসও কথনো তাহার হয় নাই। কোন সৌভাগ্যটা বাকী রহিল তাহার জীবনে? ……

চলন্ত ট্রেনের জানালার ধারে বসিয়া হাজারির কেবলই মনে হইতেছিল পদ্মদিদি যে আজ তাহার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল এ সৌভাগ্য হাজারির সকল সৌভাগ্যকে ছাপাইয়া গিয়াছে।

সেই পদ্মদিদি! [১৫৪]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গভীরভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, ছিলেন পরলোক-তত্ত্বে আস্থাবান। তাঁর আজন্মলালিত পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই জন্ম নেয় 'দেবযান' উপন্যাস। এই উপন্যাসে লেখক দেবতা ও মর্ত মানুষের আত্মার সম্পর্ক, পরলোকে মানব-আত্মার বিচরণ নিয়ে যে কাহিনী রচনা করেছেন, তা এক অতিলৌকিক রসের আস্বাদ দেয়। কুড়লে বিনোদপুরের ভবতারণের ছেলে এম. এ. পর্যন্ত পড়া যতীন তার স্ত্রী আশালতা ও ছেলেমেয়েদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা দীর্ঘ ছ'বছর গভীর অভিমানে দুঃখে জীবন কাটিয়ে মারা যায় অসহায়ভাবেই অসুখে ভুগে। গ্রামের ছেলেরাই তার সৎকার করে। বিভূতিভূষণ মৃত্যুর পর সেই যতীনের আত্মার দেবলোকের দিকে গমন নিয়ে এক অতিলৌকিক রসের কাহিনী রচনা করেছেন 'দেবযান' উপন্যাসে। সাহাগঞ্জ কেওটার বুড়ো শিবতলার পুরনো মন্দিরের কাছে অপুত্রক মাসীমার কাছে সন্তানস্নেহে, মানুষ হবার সময়েই বাড়ির পাশে শ্যামলাল মুখুজ্যের মেয়ে পুষ্পর সংগে আলাপ হয়েছিল। মৃত্যুর পর যতীনের আত্মা সেই পুষ্পর সাক্ষাৎ পায়। পুষ্পও তখন স্বর্গতা। অর্থাৎ উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকেই বিভূতিভূষণ পাঠকদের এক অলৌকিক জগত ও মর্তমানুষদের স্বর্গত আত্মার সংগে পরিচয় করিয়ে দেন। পুষ্প-যতীনের কথোপকথনে তার পরিচয়:

'—ইটের দেওয়াল এখন তোমার আমার কাছে ধোঁয়ার মত। আমাদের এ শরীরে পৃথিবীর জড় পদার্থের স্পর্শ লাগবে না। আর একটা মজা তোমায় দেখাবো পায়ে হেঁটে যেও না, মনে ভাবো যে উড়ে যাচ্ছি—

যতীন মনে মনে তাই ভাবলে। অমনি, সে দেখলে তার দেহ রবারের বেলুনের মত আকাশ দিয়ে উড়ে চলেছে। দুজনে চললো, পুষ্প আগে, যতীন তার পেছনে। কোথায় যাচ্ছে, যতীন তার কিছুই জানে না।……

এরই নাম যদি মৃত্যু হয় তবে লোকে এত ভয় করে কেন? ……

হঠাৎ যতীন দেখলে যে সে এক নতুন দেশে এসেছে—দেশটা পৃথিবীর মতই। তার পায়ের তলায় নদী, গাছপালা, মাঠ, সবই আছে—কিন্তু তাদের সৌন্দর্য অনেক বেশি। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে, সূর্য দেখা যায় না—অথচ অন্ধকারও নেই—ভারি চমৎকার এক ধরণের অপার্থিব মৃদু আলোকে সমগ্র দেশ উদ্ভাসিত। গাছপালার পাতা ঘন সবুজ, নানাধরণের ফুল, সেগুলো যেন আলো দিয়ে তৈরী।'[৫৫]

বিভূতিভূষণের পরলোকের গভীরতম বিশ্বাসের এমনি হল ভাষাচিত্রে স্বীকৃতি। 'দেবযান' উপন্যাসের বিষয়ের অভিনবত্ব—তার বিশ্বাস্যতা ও অবিশ্বাস্যতাকে অতিক্রম করে বাংলা কথাসাহিত্যের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের পরিবেশে একটি নতুন ধারার পথ দেখায় অলৌকিক দৈববিশ্বাস ও জগত রচনার ক্ষেত্রে। পরলোকতত্ত্ব নিয়ে যে শৈল্পিক পরীক্ষা করেছেন বিভূতিভূষণ তাঁর 'দেবযান' উপন্যাসে, তাকে সমালোচক মন্তব্য করেছেন,—'পরলোককেও তিনি একটি খেলাঘর রূপে রচনা করিয়াছেন।'[৫৬]

বনফুলের 'সে ও আমি' উপন্যাসের স্বাদ বাংলা কথাসাহিত্যে ভিন্ন রসের। রীতির অভিনবত্ব যেমন আছে, বিষয়ের অভিনবত্বও অস্বীকার করার নয়। রাতে লেখক লিখতে বসে সামনে দেখে 'সে'-কে। এই 'সে' লেখকেরই অবচেতনলোক থেকে জাত ছায়া-অস্তিত্ব। তার আগমন, কিছু ঠিক কিছু অসংলগ্ন সংলাপ, লেখকের বিস্ময় ও আত্মোপলব্ধি—এসব মিলিয়ে মিশিয়ে এক অলৌকিক রসের আস্বাদ দেয়, অথচ যথার্থ অর্থে অলৌকিক রসের গল্পও নয়। 'নির্মোক' উপন্যাসে বনফুল বিষয় নিয়েছেন ডাক্তারের জীবন। বেকার বিমল মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়ার জন্য ভর্তি হওয়ার পর থেকে তার অতীত জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করে আত্মজীবনী লেখে। তার ডাক্তারী সেবামূলক চাকুরী-জীবন-অভিজ্ঞতায় যে সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রের সঞ্চয়—তার মধ্যেই একজন ডাক্তার ও পরিপার্শ্বের জীবনের ভাল-মন্দ, মানুষে-মানুষে স্বার্থসর্বস্ব সম্পর্ক ও মানবিক সম্পর্কের জটিলতা—এসব লেখক টানা কাহিনী বর্ণনায় এঁকেছেন। বিশেষ পেশার জীবন এবং পেশাগত পরিবেশ ও ক্ষেত্রের স্বাদ এই উপন্যাসে মেলে।

'জঙ্গম' উপন্যাসে বনফুল অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অজস্র অভিনব চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে। তাঁর সৃষ্ট ভন্টু নায়ক শংকরের ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু তো বনফুলের আদি ও অকৃত্রিম সৃষ্টি। ভন্টু নিশ্চয়ই এক শহুরে মধ্যবিত্ত যুবক—যার কথায় ও ব্যবহারে এই শ্রেণীর মানুষের পরিচয় মেলে। তার সঙ্গে তার নিজস্ব অর্থহীন ধ্বনিময় শব্দ তৈরীর কৃতিত্ব, পরিচিতদের অভিনব নামকরণের কৌশল তাকে খাঁটি কলকাতার বেকার যুবকের মর্যাদা দিয়েছে :

'নিজের মনের ভাবকে স্বরচিত নানারূপ অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি করিয়া প্রকাশ করা ভন্টুর

একটা বিশেষত্ব, অভিধান বহির্ভূত এই সকল শব্দের স্রষ্টা বলিয়াই শংকর ভনুটুর প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়।'[৫৭]

ভনুটুর অভিনব নামকরণের দৌলতেই অফিসের ছোটবাবু হয় 'প্যানথার', একটি চরিত্র দশরথ হয় 'ওরিজিন্যাল', মেয়েরা হয় 'মোল্লা'। তার নিজের বাবা হয় 'বাকু' বা লর্ড বাকল্যাণ্ড', মৃন্ময়কে বলে 'মোমবাতি' ইত্যাদি। করালীচরণ দ্রাবিড় যাবে, তার কাছ থেকে নেওয়া পাঁচশ টাকা এখন ফেরত দিতে হবে, তাই ধার করতে বেরিয়ে চিন্তার মধ্যে যখন শংকরের কোন খবর না পাওয়ার কথা মনে পড়ে, তখন শংকর সম্বন্ধে তার চিন্তাধারাও অদ্ভুত :

'ভীমজালে পড়িয়া ছোকরা গা-ঢাকা দিয়াছে। অত লদ্‌কা লদ্‌কি করিলে ভীমজালে পড়িবে না ?···সমস্ত শুনিয়া তাহার প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে 'চাম্‌ গ্যানৃড' ভীমবেগে রসাতলের উদ্দেশ্যেই রানিং আপিস খুলিয়াছে।'[৫৮]

'জঙ্গম' উপন্যাসে বনফুল বিরাট ধনী-কন্যা মিষ্টিদিদি—যে অনায়াসে শংকরকে বাড়ির আলমারীতে সুরক্ষিত পর্নোগ্রাফির এ্যালবাম দেখার সুযোগ করে দিয়ে নিজের বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করে ও শংকরের যৌনচেতনা জাগিয়ে দেবার সুযোগ দেয়—এক অভিনব চরিত্র। ভনুটুর 'ওরিজিন্যাল' অর্থাৎ দশরথ—যে রক্ষিতা রাখতে অভ্যস্ত, সেও আধুনিক বিশিষ্ট চরিত্র। এরা সকলেই একেবারে খাঁটি শহুরে চরিত্র। কৃত্রিম শহরের জীবন-যাপন আচার-আচরণ সেকালের কলকাতায় কক্‌নি-সহ ওদের রক্তে। প্রফেসর গুপ্ত, রিণি, করালীচরণ বকসি, অপূর্ব পালিত, মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারী, ভনুটুর বাবা বাকু, মুক্তা গণিকা ইত্যাদি এমন সব চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বনফুল—যারা বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন পরিবেশ রচনা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে উপন্যাস লিখতে বসে যুদ্ধের অভিঘাত ও রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে সরে এসে পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট মানুষদের জীবন্ত করেছেন।

'স্বর্গাদপি গরিয়সী' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় উপন্যাসের বিষয়ে নারীর মাতৃত্বের ভূমিকাকেই নারীজীবনের পক্ষে যে এক এবং অদ্বিতীয় তা প্রমাণ করে বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয়ে অভিনবত্ব এনেছেন। গিরিবালা, কাত্যায়নী, বসন্তকুমারী ইত্যাদি নারী চরিত্র সেই বিষয়ের সূত্র ধরেই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। লেখক স্বয়ং গ্রন্থের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন :

'নারী জীবনের পূর্ণ সার্থকতা মাতৃত্বে।··· বিশেষভাবে এই যাঁহাকে আমি অবলম্বন করিয়াছি, তাঁহার জীবনের সেই অংশগুলিই বাছিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি যাহা নারীর জীবনের এই চিরন্তন বৃত্তি অর্থাৎ মাতৃত্বের পরিপোষক।···'নারী জীবনের পূর্ণ সার্থকতা

মাতৃত্বে' ওটা প্রকাশ পায় ভাব এবং অভাব—দুয়ের মধ্যেই। —নারীজীবনের এটা যে কত বড় সত্য, যে মা হইতে পারিল সে তো ফুটাইয়া তুলিলই নিজের জীবনে, যে পারিল না, সে-ও কম করিয়া ফুটায় না। সন্তানকে যে পাইয়া অর্ধপথেই হারাইল, সে তো কম নয়ই, এমন কি যে পাইতে চাহিল না সেও মায়ের মনের একটি অপরূপত্বকেই রূপ দিয়া বসে। ...তাই গিরিবালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কাত্যায়ণী।'[৫৯]

একেবারে আট বছর বয়সের গিরিবালাকে আঁকতে বসে লেখক তার চিরকালের নারী-স্বভাব-নিহিত মাতৃত্বের অধিকারকে তার ছোটবেলার পুতুল খেলা ও পিতা রসিকলালের সঙ্গে তার সম্পর্ক—দুইচিত্রে স্পষ্ট করেছেন। লেখক বলেছেন :

'গিরিবালার ধারাই ঐ। ওর আট বৎসরের স্বল্প শরীর মনকে আশ্রয় করিয়া একটি পরিপূর্ণা জননী আছে, সে সর্বদাই আত্মপ্রকাশ খোঁজে এবং সাধারণত দুইটি আধারের মধ্যে দিয়া নিজেকে চরিতার্থ করে,—পুতুল এবং পিতা। পুতুলের ব্যাপারটা এমন কিছু অভিনবও নয়, আশ্চর্যও নয়,—তাহাদের কথা নাই, গতি নাই, মন নাই, বলিয়া সব ছেলেমেয়েই তাহাদের মধ্যে নিজেদেব সাধ-আহ্লাদ-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিবিম্বিত বেশ নিরুপদ্রবে করিতে পারে। কিন্তু বত্রিশ বৎসরের একটা আস্ত মানুষ যখন আট বৎসরের একটা মেয়ের মনে মায়ের মায়া জাগায়—তখন আব ও তত্ত্বটা লাগসই হয় না,—কারণটা একটু আলাদা করিয়া অনুসন্ধান করিতে হয়।'[৬০]

গিরিবালার জীবনে আসে কাত্যায়ণীব স্নেহ। সে স্নেহ যে বুভুক্ষু মাতৃ-হৃদযের আব এক মধু, তা বুঝি কাত্যায়ণীও জানত না। গিরিবালাকে ত্যাগ করার সময়, অর্থাৎ গিরিবালার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার সময় কাত্যায়ণীর যে অস্থিরতা ও অস্থিতচিত্ততা তা নারীর মাতৃভাবের গভীরতম রূপেরই আর এক প্রকাশ :

'কাত্যায়ণী একটু আড়ালে ছিলেন, দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি অশ্রুতে ছলছল করিয়া উঠিল। বেদনাটা খুব স্পষ্ট নয়, তবে মনে হইল সত্যই যেন ও এইবার মিলাইয়া যাইবে। এতদিন ছিল তাঁহার বুকের মধ্যে—তাঁহার নিতান্ত নিজেরটি হইয়া। —তবে ছিল একটা হাল্কা মুক্তির মধ্যে, এইবার তৃষ্ণার আর্তিতে দুই বাহু দিয়া জড়াইতে গিয়া কাত্যায়ণী যেন তাহাকে হারাইতে বসিয়াছেন। এ কী সর্বনাশ করিলেন তিনি ... ...'[৬১]

গিরিবালার পিতা রসিকলাল অন্নদাচরণ-বসন্তকুমারীর বাড়িতে মেয়েকে রেখে একসময় তার বিয়ের সম্বন্ধ করে। বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেলে যখন আশীর্বাদ করার সময় হয়, গিরিবালার বিদায় সম্ভাবনা নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখন বসন্তকুমারীর যে খাঁটি স্নেহের আগুনে জ্বলা মূর্তি, তা অন্ত আস্বাদ দেয় চরিত্রের—যা লেখকের কাম

পিতা হলেও মেয়ের সম্পর্কে কন্যার প্রতি যেন তার কোন অধিকারই নেই। বর আসার খবর কানে আসতেই বসন্তকুমারী সজাগ, সতর্ক আত্ম অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রস্তুত :

'বসন্তকুমারী একেবারে সিধা হইয়া বসিয়া আছেন। মুখটা রাঙা টকটকে, চোখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতেছে, কোলের উপর উবু হইয়া শুইয়া গিরিবালা, বসন্তকুমারীর একখানি হাত তাহার উপর—আলগাভাবে রাখা নয়, কতকটা যেন থামচাইয়া ধরিয়া আছেন। দৃষ্টি হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত অচঞ্চল।

অদ্ভুত সাদৃশ্যে কাত্যায়ণীর ধাঁ করিয়া একটা ছবির কথা মনে পড়িয়া গেল, বিকাশ কবে একবার দেখাইয়াছিল,—একটি সিংহী থাবার নিচে নিজের শাবককে চাপিয়া জলন্ত দৃষ্টিতে সামনে চাহিয়া আছে।

তিনদিনের চাপা কণ্ঠস্বরকে মুক্তি দিয়া বসন্তকুমারী কাত্যায়ণীকে লক্ষ্য করিয়া গর্জাইয়া উঠিলেন—"নিজে গিলতে পারলিনি, দেখতে এসেছিস অন্য কোন রাক্ষসের পেটে গেল ? —হবে না তোদের মনস্কামনা পূর্ণ। ডাক, কে আমার কাছ থেকে গিরিকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তাকে !"[৬২]

বুদ্ধদেব বসুর 'কালো হাওয়া' উপন্যাসে একটি বাঙালী পরিবার-জীবনের, অদ্ভুত পরিবেশ ও বিষাদময় পরিণতির ছবি আছে। পরিবারের কর্তা অরিন্দম বাইরে থেকে কলকাতায় ফিরে সংসারের স্ত্রী হৈমন্তী, ছেলে অরুণ, অরুণের স্ত্রী উজ্জ্বলা, নাতি, দুই মেয়ে মিনি ও বুলিকে নিয়ে সামগ্রিকভাবে একটা সহজ জীবন-যাপনে যখন উৎসুক, আগ্রহী, তখনি আসে ছেলের কাছ থেকে আঘাত, স্ত্রী হৈমন্তীর ও তার ধর্মীয় মায়া-আশ্রমের মা মহামায়ার আচরণ ইত্যাদির কারণে জটিল পরিবেশের ও পরিস্থিতির তিক্ত অভিজ্ঞতা। একটি উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে সংসারের মঙ্গল কামনায় স্ত্রী হয় ধর্মপ্রাণা, মায়া-আশ্রমের সেবিকা, মা মহামায়ার প্রতি গভীর বিশ্বাসে অস্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি ভক্তিনিষ্ঠা। মেয়ে মিনি সেই ধর্মভাবনায় হয়ে ওঠে 'নিউরোটিক'। ধর্ম ভাবনা দিয়ে নিরঞ্জনের প্রেমের সম্পর্ককে বিচার করতে গিয়ে একদিকে ধর্মতত্ত্ব অন্যদিকে প্রেম মনস্তত্ত্ব দুয়ের জটিল অবস্থা তৈরী হয় মিনির মনে। অরিন্দম কৌতুক করে বৈধব্যের কথা বললে হৈমন্তীর চিন্তা :

'ভয়, দারুণ ভয়। প্রত্যেক হিন্দু স্ত্রীলোকের মনে। যখন পরিপূর্ণ সুখ, সংসারে যখন শান্তি ও সচ্ছলতা, শরীরে যখন সম্ভোগের উল্লাস, তখনো হঠাৎ এ কথা মনে পড়ে কোন স্ত্রীলোকের না মুখ শুকিয়ে যায়—যদি—যদি—সর্বনাশ ঘটে, যাবে, সব যাবে একজনের অনুপস্থিতিতে, খাওয়া-পরা আমোদ-প্রমোদ ভোগ-বিলাস মান সম্ভ্রম সব;

যাবে, নিছক মনুষ্যত্ব তা-ও যাবে, তারপর যতদিন বেঁচে থাকা হীন, ভীত, লাঞ্ছিত দাস জীবন।'[৬৩]

মায়ের মত মেয়ে মিনিও ক্রমশ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে :

'এ কি! আমার এ কী হলো? মিনি মনে মনে বলে। যত তোমাতে মন দিতে চাই মন কেন ফিরে আসে? এ কার মুখ ফুটে ওঠে চোখের সামনে। যাই মন্দিরে, টিকতে পারি না। বুঝি ও এসেছে, বুঝি ও এসেছে, পিছনে যেন দানোয় তাড়া করে। ভূতে পেয়েছে আমাকে, পাপ ঢুকেছে মনে। কী করে এ পাপ মন থেকে মুছে ফেলি কে বলে দেবে? ওগো, কে বলে দেবে? আমার হৃৎপিণ্ড আমি কি ছিনিয়ে আনবো? মরবো আমি? কেন ভুলতে পারিনে? কেন দূর করে দিতে পারিনে? এ কী জ্বালা! আর সহ্য হয় না। নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে ইচ্ছে করে।'[৬৪]

অরিন্দম বোঝে স্ত্রী ও মেয়ের এমন মানসিক রূপান্তরে বৈকল্য রূপকে। তাই স্ত্রীকে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়ে না স্ত্রীর আরাধ্যা সম্পর্কে,—'তুখোড় মানুষ তোমাদের এই মা-টি। মিথ্যে কথা বলার কী অসাধারণ ক্ষমতা।'[৬৫] মা-মহামায়াই বস্তুত একটি সুখের সংসারকে ধ্বংস করে দেয়। তার আধ্যাত্মিক বিশ্বাস হৈমন্তী ও মিনি এমনভাবে গ্রহণ করে যে তাদের জীবন যেমন অপ্রকৃতিস্থ হয়, তেমনি অরিন্দমকেও একদিন অকারণে হৈমন্তীর হাতে রিভলভারের গুলি খেয়ে মরতে হয়। হৈমন্তী পাগল। রাতে অরিন্দম সহজভাবেই হৈমন্তীর ঘরে গিয়েছিল, কিন্তু হৈমন্তী স্বামীর পক্ষে তার দেহ-ভোগবাসনাই কাম্য ভেবে এক ঘোরে স্বামীকে গুলি করে। এর আগে মিনি যে জায়গায় এসে দাঁড়ায়, তা তার সুস্থ জীবন-গ্রহণের একান্ত পরিপন্থী। বিয়ের কথায় পিতা অরিন্দমের সংগে মিনির সংলাপ বিনিময় :

'তার মানে? বিয়ে করবি না?'

'জীবনেও না।'

'বলিস কি? সারাজীবন বিয়ে না করে কাটাবি?'

'সারা জীবন। ও সব ভাবতে পর্যন্ত আমার ঘেন্না করে। তুমি আর বোলো না।'[৬৬]

ধর্মের আফিঙ, আধ্যাত্মিক চিন্তার ও বিশ্বাসের কঠিন নির্ভরতা যে একটি সাধারণ পারিবারিক জীবনে কি নির্মম পরিণতি আনতে পারে, সংসারকে সমূলে ধ্বংস করতে পারে, এই বিষয় দিয়ে বুদ্ধদেব বসু আমাদের পরিবার জীবনের একটি বিশেষ দিক এঁকেছেন। এটিও বিষয়ে নতুন।

চায়,

শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের অগ্নিগর্ভ পরিবেশের 'ও তা থেকে উদ্ভূত বিবিধ বিষয়ের কথা দিয়ে কালচেতনার পরিচয় ও স্বাক্ষর রেখে সমকালের কথাকারেরা যে ক্ষান্ত হননি, আমরা সাহিত্যের অন্য কিছু বিষয় বিচার করার পর তার প্রমাণ পেয়েছি। বিচিত্র সব মানুষ, বিচিত্র জীবনের আচরণে অভ্যস্ত থেকে মানুষগুলির নড়া-চড়া—এদের পেয়েছি বাংলা কথাসাহিত্যে আলোচ্য যুদ্ধ-সমকালে। অন্নদাশংকর রায় অদ্ভুত সব মানুষকে এঁকেছেন 'জখমী দিল' ইত্যাদি গল্পে, প্রবোধকুমার সান্যাল ও অন্যান্য কথাকারগণ তাঁদের একাধিক গল্প-উপন্যাসে।

দাঙ্গাকে বিষয় করেছেন সোমেন চন্দ, মনোজ বসুও। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চিত্রে যে বাস্তবতা ও মানব্য-ধ্বংসের ইঙ্গিত—তা এঁদের গল্প-উপন্যাসে জীবন্ত। 'পরশুরামের কুঠার' গ্রন্থের একাধিক গল্পে সুবোধ ঘোষ বিষয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে অনবদ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'ফসিল'-এর 'দণ্ডমুণ্ড,' 'সুন্দরম', ইত্যাদি গল্পের বিষয় আমাদের চমকিত করে। 'অভিভাবক'-এর মত হাসির গল্প, 'একদা নিশীথ-কালে'র মত হালকা অথচ মজার গল্প লিখে মনোজ বসু যে কৌতুক রসে আমাদের বিস্মিত করেছেন, শিবরাম চক্রবর্তী তার থেকে স্বতন্ত্র এমন এক কৌতুক রসের আস্বাদ দিয়েছেন, যার মধ্যে বুদ্ধি-মেশানো সচতনা আছে। আবার প্রমথনাথ বিশীর কৌতুক রসের অম্ল স্বাদ ও ঝাল, ব্যঙ্গের কশাঘাত ও আহতের জন্য করুণার দিক—যুদ্ধ-সমকালের কথাসাহিত্যে একেবারে নতুন আস্বাদ দেয়।

ভূতের গল্পের অলৌকিকতা এক এক রকম বিষয়ের ভিন্নতা এনে কথা-সাহিত্যের বিষয়ে ব্যাপকতা আনে। 'হলুদপোড়া'র অলৌকিক রস, আবার 'টিকটিকির ডিম'-এর অলৌকিক রস—দুয়ের মধ্যে দু'মেরু-প্রমাণ স্বাদ-ভিন্নতা। 'শোকসংবাদ' গল্পের সংলাপ ও ঘটনাগত অসঙ্গতি কৌতুকের থেকে কারুণ্যকে বড় করে তোলায় আমাদের শিল্পরস আস্বাদনে রসনা একই সঙ্গে সুতৃপ্তি ও গতানুগতিকতা থেকে সু-মুক্তি পায়। পরিবার জীবনের কথা, নারী-চরিত্রের আবেগ স্নেহের বাধাহীন প্রকাশ, প্রৌঢ় মানুষের অতীত যৌবন বিদায় নেওয়ার কারণে ক্লান্তিকর গতানুগতিক জীবনযাপনে সমাধানহীন দুঃখ-বেদনা, কোন মানুষের রোমান্টিক মেজাজ মত কাজ করতে গিয়ে বাস্তবের ধাক্কায় চিত্তের বিকার—এসবই বহু বিচিত্র বর্ণসম্পাতে বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে।

বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের কথাসাহিত্যিকরা লেখনী ধারণ করে কখনো পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মতৃপ্ত শিল্প-সাধনার মতই একটি অভিজ্ঞতার অক্ষেত্রে

গণ্ডী টেনে ভিন্ন স্বাদের কথাসাহিত্য চর্চা করে গেছেন। তার ফল বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয়ের মর্যাদা ও ব্যাপকতা যেমন বাড়িয়েছে, জীবনের জটিলতা গভীরতা ও রহস্যকেও তেমনি করেছে প্রকট। মানুষের জীবন, মন, সংসার, চারপাশের প্রকৃতি, ব্যক্তিক অস্তিত্ব-ভাবনা, প্রচলিত জীবন-নিয়মে অসঙ্গতি, স্বার্থবোধ, সংস্কার—এই সমস্ত দিকই কথাসাহিত্যিকদের অভিজ্ঞতায় দীপিত হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের কথাসাহিত্যে ফটোগ্রাফিক মর্যাদায় নয়, সূক্ষ্ম চিত্রশিল্পের ব্যঞ্জনায় বড় স্থান লাভ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের কথাসাহিত্য বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় এমন সব মূল্যবান নুড়ি নিক্ষেপ করেছে, যার ওপর প্রবাহিত সমুদ্রস্রোত উত্তরকালের কথাসাহিত্যে অন্তহীন মহিমা অর্জনে দীপ্ত ও গরিমাময় হতে পেরেছে।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

১,২ Collected Essays Vol.II (1966): Virginia Woolf Essay 'The Art of Fiction' (1927) P 53-54, 55

৩-৭ সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ (সেপ্টেম্বর ১৯৭৩) সম্পাদনা দিলীপ মজুমদার 'দাঙ্গা' গল্প পৃ ১৯২, ১৯৮, ১৯৮-১৯৯, ১৯৯, ২০০

৮,৯ 'হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা' গল্প মনোজ বসু 'দুঃখ নিশার শেষে' (মে, ১৯৪৪) পৃ ৭৮, ৭৯

১০,১১ 'অথ্‌মী দিল' গল্প অন্নদাশংকর রায় 'গল্প ১৯২৯-১৯৫০' গ্রন্থ ১ম সংস্করণ ১৯৬০ পৃ ২০৩, ২০২

১২ 'অজাত শত্রু' গল্প অন্নদাশংকর রায় ঐ পৃ ২০৭

১৩ পরশুরামের কুঠার (প্রথম সংস্করণ, ১৯৪২) সুবোধ ঘোষ 'ন তস্থৌ' গল্প পৃ ৪২

১৪ 'একদা নিশীথকালে' গল্প মনোজ বসু 'একদা নিশীথকালে' গ্রন্থ (১ম সংস্করণ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪) পৃ ১৬

১৫ 'অভিভাবক' গল্প মনোজ বসু ঐ পৃ ৫৬

১৬ 'কয়েকদিন' গল্প প্রবোধকুমার সান্যাল 'অঙ্গার' গ্রন্থ (দ্বিতীয় প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২) পৃ ১৫৫

১৭ 'বিভূতিভূষণ' গ্রন্থ চিত্তরঞ্জন ঘোষ দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১০ জুলাই, ১৯৭২ পৃ ১৩২

১৮ 'ডিরোলের বালা' গল্প বিভূতি রচনাবলী (৫ম খণ্ড) শ্রাবণ, ১৩৮৬ পৃ ৩৫৩

১৯ 'বাঁশি' গল্প ঐ পৃ ৩৬৭

২০ বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৬৩) 'ব্রহ্মময়ীর কাশীবাস' গল্প পৃ ৭৫

২১ 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্প ঐ পৃ ৪৬

২২ 'আহ্বান' গল্প ঐ পৃ ৮৭

২৩ 'পলায়ন' (অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত রচিত) গল্প-সংকলনের আলোচনা বিশু মুখোপাধ্যায় পরিচয় ১০ম বর্ষ, ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ (নভেম্বর, ১৯৪০) পৃ ৪৬৮

২৪ 'রোদ' গল্প বুদ্ধদেব বসু 'খাতার শেষ পাতা' গ্রন্থ (১৯৪৩) পৃ ৮৪

২৫ 'খাতার শেষ পাতা' গল্প ঐ পৃ ১৮১

২৬ 'উদয়াস্ত' গল্প রমাপদ চৌধুরী গল্প সমগ্র (আগষ্ট, ১৯৭৯) পৃ ৪

২৭,২৮ 'মহানগর' গল্প প্রেমেন্দ্র মিত্র 'মহানগর' গ্রন্থ (আষাঢ়, ১৩৫০) পৃ ১৪, ১৭

২৯ 'অরণ্য পথ' গল্প ঐ পৃ ৪৪

৩০ 'অযান্ত্রিক গল্প সুবোধ ঘোষ 'ফসিল' গ্রন্থ (আশ্বিন, ১৩৫২) পৃ ৭৪

৩১-৩৩ 'অন্ধ ও ধাঁধা' গল্প মানিক গ্রন্থাবলী (৫ম খণ্ড) পৃ ৬৩৩, ৬৩৪, ৬২৪

৩৪,৩৫ 'বিপত্নীকের বৌ' গল্প ঐ (৪র্থ খণ্ড) পৃ ৪৪৫, ৪৪৬*

৩৬ 'ওমিল লাইন' গল্প ঐ 'হলুদপোড়া' গ্রন্থ ৫৫৬,

৩৭ 'মানুষ হাসে কেন' গল্প ঐ পৃ ৫৬৯

৩৮,৩৯ 'গণক' গল্প প্রমথনাথ বিশী ছোটগল্প সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) মহালয়া, ১৩৮৪ পৃ ১৩৬, ১৩৭

৪০ 'ভাঁড়ু দত্ত' গল্প ঐ পৃ ৩৫৭

৪১ 'শোক সংবাদ' গল্প বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 'রাণুর তৃতীয় গ্রন্থ ভাগ' (১৩৫২) পৃ ২৪৭

৪২ 'হলুদপোড়া' গল্প মানিক গ্রন্থাবলী (৫ম খণ্ড) পৃ ৫২২

৪৩,৪৪ 'টিকটিকির ডিম' গল্প শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 'কালকূট' গ্রন্থ (প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী' ১৯৪৪) পৃ ৯, ৭

৪৫ ছোটগল্প সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) প্রমথনাথ বিশী মহালয়া, ১৩৮৪ 'বিপত্নীক' গল্প পৃ ৩০১-৩০২

৪৬-৫১ 'শৃঙ্খল' উপন্যাস সরোজকুমার রায়চৌধুরী দ্বিতীয় সংস্করণ, কার্তিক, ১৩৫০ একাদশ অধ্যায় পৃ ১৩১, ত্রয়োদশ অধ্যায় পৃ ১৫৮-১৫৯, ১৬৩-১৬৪, ১৬৬, পঞ্চদশ অধ্যায় পৃ ১৮২, ১৮৪

৫২ মোহানা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচ্ছেদ তিন ৫ পৃ ৫৮

৫৩ উনপঞ্চাশী (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী, ১৯৪৬) গোপাল হালদার সপ্তম পরিচ্ছেদ পৃ ১৭০—১৭১

৫৪ 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' উপন্যাস বিভূতি রচনাবলী (২য় খণ্ড) প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৮৪ পৃ ৩৭৫

৫৫ 'দেবযান' উপন্যাস বিভূতি রচনাবলী ঐ চতুর্থ অধ্যায় পৃ ৮৭৬-৮৭৭

৫৬ বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প : ভূমিকা প্রমথনাথ বিশী পৃ ৭

৫৭ জঙ্গম' (প্রথম খণ্ড) বনফুল রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড) পৃ ১১২

৫৮ 'জঙ্গম' গ্রন্থ (তৃতীয় মুদ্রণ ভাদ্র, ১৩৫৪) ঐ দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায় ১ পৃ ১১২

৫৯-৬২ স্বর্গাদপি গরিয়সী (১ম খণ্ড) ভূমিকা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী (২য় খণ্ড) পৃ ২, প্রথম পর্যায় পৃ ৩৮, দ্বিতীয় পর্যায় ১০ পৃ ১০৪, তৃতীয় পর্যায় ৬ পৃ ১৪২-১৪৩

৬৩-৬৬ 'কালো হাওয়া' উপন্যাস 'বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ' (৬ষ্ঠ খণ্ড) পৃ ৫০, ১৪০ অধ্যায় নয় পৃ ১৬৭, অধ্যায় দশ পৃ ১৮৪

দশম অধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যের রূপ ও রীতি

এক

উনিশ শতকে নবজাগরণের প্রবল প্রবাহে নতুন বুদ্ধিজীবীরা জীবনকে নতুন করে দেখার, গড়ার চেষ্টা করেন। সেই সুগঠিত নবজীবন বিশশতকে এসে আর এক অবধারিত সংকটের সামনে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তৎপর হয়। বিশ শতকের সেই সংকট দেখা দেয় বিজ্ঞানের দুর্মদ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবতাকে তথ্যভিত্তিক করে জীবনের ও সমাজের সর্বদিকে গ্রহণ করার মধ্যে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মিলে-মিশে যে বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে, তা হল বিজ্ঞানের দুর্বার অভিযাত্রায় আধুনিকতার উৎপত্তি। দুই বিশ্বযুদ্ধই ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের যুদ্ধ, সে আধুনিকতা বিশ শতকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আণবিক ও পারমাণবিক যুদ্ধভয় ও ভাবনা বিশ শতকীয় জীবনকে তার অস্তিত্ব রক্ষার সংকট দিয়েই অস্থির করে রাখে সব সময়। আর, সেই কারণেই, 'বিশ শতকের সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণগুলির অন্যতম লক্ষণ হলো—জীবন প্রশ্নের বিশ্লেষণ, সমস্যার দিকে অঙ্গুলিসংকেত—যে অঙ্গুলি সংকেত তীব্র অনুভব ও আবেগে আকম্পিত।'[১] উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যে জীবন প্রশ্ন, তা দার্শনিক, তার রূপ ও স্বরূপ, অন্তত বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাস ও অন্যান্য রচনা থেকে যা উঠে আসে, তা অন্য আধ্যাত্মিক সংকটকে ধরিয়ে দেয়। বিশ শতকের জীবন প্রশ্ন বিশ শতকীয় সমাজ ও ব্যক্তির অস্তিত্বের বহু বাস্তব সমস্যাকে শরীরের নাড়ীর যোগের মত তীব্র আকর্ষণ করে। সে আকর্ষণে উনিশ শতকীয় জীবন-প্রশ্নের যে আদর্শবাদ, নৈতিক শুভাশুভবোধ—তার মূলকে শরীরের শিরা-উপশিরা,-স্নায়ুসমেত সব কিছুর কেন্দ্রে টেনে ধরে।

এই জীবন-প্রশ্নের স্বরূপ আরও জটিল হয় বিশ শতকে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের সমাজে, জীবনে, ব্যক্তির মানসিকতায় ও তারই দর্পণ কথাসাহিত্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে রচিত কথাসাহিত্যে বিষয়ের অভাবনীয় বৈচিত্র্য লেখকদের এমনভাবে আকৃষ্ট করে, তাঁদের সমাজ-দায়িত্ব-পালনে এমনভাবে প্রবুদ্ধ করে যে সেই বিষয়কে প্রকাশ করার রীতি ও ভাষা নিয়ে তারা কোন শিল্পীত নবপরীক্ষার কথা ভাববার অবকাশ পাননি। অথচ কথাসাহিত্যের বিষয়ের রূপান্তর, তাঁর রূপ ও রীতি ও ভাষাদর্শ

প্রধানত প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ও সেইসঙ্গে কল্লোলীয় লেখকদের ভাবনার অনুসৃতি-তেই শিল্প মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু লেখক সচেতনভাবে বিষয় ভাবনায় প্রকাশে রীতিকে ও ভাষাকে অন্ত বেশ পরাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন কোন কোন রচনায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে কথাসাহিত্যিকরা সমান মর্যাদায় গল্প ও উপন্যাস—দুই শাখার শিল্পচর্চা করেছেন সৃষ্টির মাধ্যমে। ছোটগল্পের গঠন নিয়ে বহু সংজ্ঞা আছে।'……the short story in essence a Romantic form : the Romantic prose from ·· the short story, like much characteristically Romantic poetry, tends to concentrate on some significant moment, some instant cf perceptions...the short story typically centres on the inword meaning of a crucial event on sudden momentous intuitions'.[২] ছোটগল্পের এমন আধুনিক সংজ্ঞা থেকেই বোঝা যায়, এই শিল্পরূপের একটি নিজস্ব ভঙ্গি আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের গল্পলেখকরা সেই ভঙ্গিতেই তাঁদের বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ-কালের গল্পের অঙ্গ-ভাবনাকেই অনুসরণ করেছেন। যে গল্পের রীতি ভাঙার প্রবল ও পরিশ্রমী প্রয়াস আমরা দেখি বিশ শতকের দুয়ের দশকের শেষ থেকে কিছু তরুণতম গল্পকারদের হাতে, তেমন সচেতনা ও প্রয়াস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে থাকার কথা নয়। কারণ আমরা আগেও বলেছি, সমকাল এমন এক বিমূঢ়তার কাল, এমন এক জীবনকে সুস্থিত রাখার জন্য আড়ষ্ট জীবন-ভাবনার কাল, যে কালে শুধু শিল্পের অঙ্গ-ভাবনায় লেখক-মনের নিবদ্ধতা থাকতে পারে না।

তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর কল্লোলীয়দের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আকস্মিক অভিঘাতে বাংলা কথাসাহিত্য এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়, যার অবস্থা বিখ্যাত লেখক হেনরি মুরের একটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন মন্তব্যেই পরিষ্কার হয়ে যায়,—We have a society which is fragmented autherity which resides in no certain place, and our function as artist is what we get out of it by individual effort.'[৩] বস্তুত সমাজের বন্ধন যখন টুকরো টুকরো খণ্ডে ভেঙে যায়, যখন কোন প্রত্যক্ষ নির্দেশ কাছে থাকে না, তখন ব্যক্তিগত প্রয়াসই বড় হয়ে ওঠে শিল্পীদের সামনে। আমাদের দেশের কথাসাহিত্যিকরা সেই যুদ্ধ-সমকালের প্রবল ঝঞ্ঝার মধ্যে নিজেদের প্রয়াসকেই সবচেয়ে বেশী মেনে চলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' তে উগ্র সামাজিক ব্যক্তিত্ব বিনোদিনীর 'আঁতের কথা'-কে প্রত্যক্ষ করিয়ে আমাদের আধুনিক হতে শিখিয়েছেন প্রথম উপন্যাসের শিল্পরূপেরা

ক্ষেত্রে। একথা সর্বকালের উপন্যাসেই সত্য যে,— 'The modern novel, in particular, explores also the inner life of mind and personality···most serious modern novels are marked by uncertainty and pessimism, many by cynicism also.'[8] মনের অন্তস্তল ও ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে উপন্যাসে ধরতে গিয়ে উপন্যাসের বিষয়ে যেমন আসে বৈচিত্র্য, রূপেও দেখা দেয় স্বাতন্ত্র্য। বিশ শতকের মূল বৈশিষ্ট্যই হল অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও সংশয়। উপন্যাসে তার প্রতিফলন থাকতে বাধ্য। আলোচ্য যুদ্ধ-সমকালের উপন্যাসে সেই বিষয়-নিহিত ভাবনাতেও অঙ্গপরিবর্তনের কিছু প্রয়াস দেখি কোন কোন কথসাহিত্যিকদের মধ্যে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে সদ্য-আবির্ভূত লেখক ছিলেন বেশ কিছু, বাকি অধিকাংশ লেখকই কল্লোল ও অব্যবহিত কল্লোল-পূর্ব সময় থেকে লেখার চর্চায় মগ্ন-ব্যক্তিত্ব। যাঁরা নতুন লেখক তাঁরা পূর্বসূরীদের রীতি ও ভাষাকে বর্জন করেন নি। তাকে গ্রহণ করেই আপন ব্যক্তিত্ব দিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখে গেছেন। যাঁরা সে সময়ে প্রতিষ্ঠিত সেই সব কল্লোলীয় লেখক ও কল্লোলের সমকালে আবির্ভূত লেখকেরা তাঁদের যুদ্ধ-সমকালের রচনায় সমকালের বিষয়কে যত গভীরভাবে গ্রহণ করেছেন, আঙ্গিক চেতনায় তেমন নিবিষ্ট হতে চান নি। ঠিক যেভাবে বিষয় ও বক্তব্য মনের দরজায় এসেছে অভিজ্ঞতার হাত ধরে, সেইভাবেই শিল্পের অঙ্গনে তাদের এনে বসিয়েছেন। সমাজ তখন যুদ্ধ-তাড়িত, নানাভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। কোন্ বিষয় লেখকদের নিজস্বতা দাবী করে, তা তখনো লেখকরা বুঝতে পারেন নি—অন্তত নবাগত লেখকরা। তাঁদের সামনে পুরনো শিল্প-কৌশল অতিপরিচিত। প্রখ্যাত লেখকরা পুরনো শিল্প-কৌশলের সীমায় রাখছেন নতুন সমাজ-বিষয়। ফলে উপন্যাস ও ছোট গল্পের অঙ্গসজ্জা গতানুগতিক থেকে গেছে স্বাভাবিক-ভাবেই। বিদেশী সমালোচকের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য,—'······novelists now are so aware of techniques doveloped by their predecessors that they assimilate technical knowledge before their own material has sufficiently formed.'[৫]

গল্পকার ও ঔপন্যাসিকের রচনায় যে বিষয় তা প্রধানত তৈরী হয় সমকালের সমাজ, মানুষ, জীবন—এসবের অভিজ্ঞতা দিয়ে গড়া কথাসাহিত্যের প্লট, ঘটনা, চরিত্র ও প্রতিপাদ্যের মধ্যেই। এসব লেখকের অচেতন ও অবচেতন সৃষ্টিশীল মানসক্রিয়ায় দেখা দেয়। '···The novelist partly moulds his material and the material is partly moulded by constraints of which he is not even aware, the term 'choice' does not seem to be quite the right one······.'[৬] কথাসাহিত্যের

বিষয় তার অঙ্গ ও প্রকরণকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করতে পারে, আবার কথাসাহিত্যের যে প্রকাশ-কৌশল, তা বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করেই কখনো সরল, কখনো জটিল হতে পারে। শিল্পীর প্রয়াস কখনো সচেতনভাবে, কখনো বা অ-সচেতনভাবে কথাসাহিত্যের বিষয়কে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। মোটকথা একজন কথাসাহিত্যিক তাঁর বিষয়কে যথাযথ উপস্থাপিত করতে যে কাহিনী, প্লট, ঘটনা, চরিত্র, প্রতিপাদ্য এবং গল্পভাবাদর্শের শরণার্থী হন, তা তাঁর গোটা শিল্প-স্বভাবেরই অন্তর্গত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের সচেতন ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখকরা গল্প-উপন্যাসের বিষয়-ভাবনাকে যেমন অভিজ্ঞতায় গ্রহণ করে গেছেন, আঙ্গিকগত কলা-কৌশলকে তেমনি সমকালীন জীবন-অভিজ্ঞতার অনুগ করে কখনো অচেতনভাবে সহজ, সরল রাখতে পেরেছেন।

দুই,

কথাসাহিত্যে লেখকের অভিজ্ঞতা যেমন মূলধন (Capital), চরিত্রায়ন (Characterisation) তেমনি তাঁর উপায় বা প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের লেখকরা সময়ের সীমাতেই চরিত্রকে রেখেছিলেন। তাই চরিত্রগুলি হয়েছে সরল, স্পষ্ট। এদেশীয় আধুনিক সমালোচকের একটি মন্তব্য এ বিষয়ে যথার্থ,—'সময়ের সীমা মানলে চরিত্র বিকাশও স্পষ্ট রূপ নেবে, শিল্পের প্রয়োজনীয় ভ্রান্তি বা ইল্যুশন সার্থক হবে।'[৭] তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার প্রমুখ তাঁদের একাধিক উপন্যাসে ও গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের সময়-সীমায় চরিত্রগুলি রেখেছেন বলেই চরিত্র বিকাশ সার্থক ও স্বাভাবিক হয়েছে। কথাসাহিত্যের রীতির দিক থেকে তাঁরা পূর্বানুবৃত্ত ভাবনায় অনুসারী থেকেছেন।

উনিশ শতকে প্রথম থেকেই উপন্যাস প্রতিমা হয়ে ওঠে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। অথচ 'বঙ্কিমচন্দ্র সামনে কোনো মডেল রেখে কাজ করেন নি। কিন্তু দেশী-বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।'[৮] সমালোচকের এই মন্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি, উপন্যাসের জন্মলগ্নে বা পদলঙ্কার-পর্বে অঙ্গসজ্জা সম্ভব হয়েছে বিদেশীদের সাহচর্যে। এই সমালোচকই পরে ব্যাখ্যা করে বলেছেন,—'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের দেহ গঠনের আদর্শ এসেছে ইংরেজী নাটক, বিশেষ করে শেক্‌স্‌পীয়র থেকে। তাঁর নাটক গড়ার কৌশল, কেন্দ্রবদ্ধ রূপ, উপকাহিনীর আনুগত্য তথা তাৎপর্যবুদ্ধিজা বঙ্কিম গ্রাস করেছিলেন এবং নাট্যজগত থেকে নিয়ে এসে উপন্যাস কথনে প্রয়োগ করেছিলেন। এই পথ ধরেই তিনি একটা মৌলতত্ত্বী আবিষ্কার করলেন যা নাটকীয় হলেও ঠিক নাটক

নয়। অনুপ্রাণিত কিন্তু অনুকৃত নয়।……বঙ্কিম নাট্যভঙ্গিকে মানবচিত্তের গভীর বোধের সঙ্গে যুক্ত করে উপন্যাস শিল্পে নতুন সম্ভাবনা তৈরী করলেন।'[৯] বঙ্কিমচন্দ্র যে নতুন সম্ভাবনার মুখ খুলে দিলেন, বিশ শতকের দ্বিতীয়' বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে লিখতে বসে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে ও উপন্যাসের রীতিতে সেই সম্ভাবনাকে একান্ত ও একাত্ম করেছেন। 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কালিন্দী' প্রভৃতি উপন্যাসে, 'বেদেনী', 'যাদুকরী' প্রভৃতি 'গল্প-সংকলনের গল্পগুলিতে তার সন্ধান স্পষ্ট করেই মেলে। শুধু তারাশংকর কেন, অন্যান্য বহু লেখক সেই রীতিকেই নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। প্লট উপন্যাসের অন্যতম কাহিনী বয়নের উপায়। প্লট সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্র স্থির-নির্দিষ্ট একটি রীতি-ভাবনাকে লেখার মধ্যে রেখে গেছেন। 'প্লট গঠনে বঙ্কিমচন্দ্র বৃত্ত-ভঙ্গীর গভীর অনুরাগী। রৈখিক রীতি খেলাচ্ছলে দু'একটি গৌণ লেখায় মাত্র ছুঁয়ে গেছেন। তাঁর উপন্যাসে জীবন সমস্যা ঘটনায় ও চরিত্রে সমতালে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ অভ্যন্তরে হৃদয় ও ঘটনাঘটিত প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে লেখকের সুনির্দিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় অভিপ্রায় থাকে।'[১০] মন্তব্যটি মূল্যবান এই কারণে যে এই মন্তব্যের সত্যতা ও প্রামাণিকতা শুধু বঙ্কিমের উপন্যাস-উদাহরণেই শেষ হয়ে যায় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের উপন্যাস ও ছোটগল্পের অঙ্গসজ্জায় নানাদিক থেকে তা দেখা গেছে।

উপন্যাস ও ছোটগল্পের রীতির দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে যেমন বর্ণনামূলক পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন তারাশংকর প্রমুখ একাধিক লেখক, তেমনি চরিত্রের মগ্নচৈতন্যকে উদ্ঘাটিত করে মনস্তত্ত্বের আর এক অভিনব দিক খুলেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মোহানা' উপন্যাসে—যদিও এই উপন্যাসের রীতির অভিনবত্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বকালে রচিত 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' নামের দু'টি উপন্যাসের শিল্প-কৌশলের মধ্য দিয়েই তা অনুসৃত হয়েছে। নরেন্দ্র ঘোষ আবার তাঁর একাধিক গল্পে ও উপন্যাসে চরিত্রের সংলাপের মধ্যে তৃতীয় একটি স্বর এনেছেন নায়ক চরিত্র বা বক্তার অন্তর্লোকের একান্ত নিজস্ব কোন ভাবনার মাত্রাকে স্বতন্ত্রভাবে যোগ করে। কখনও কখনও লেখক স্বয়ং নিজস্ব মন্তব্য যোগ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলায় ব্যবহৃত নিজস্ব মন্তব্যের মত।

অন্নদাশংকর রায় তাঁর গল্পলেখার ভঙ্গিতে সহজ সরল 'গল্প' বলার ভঙ্গিকেই একমাত্র কৌশল করেছেন। চরিত্র-সত্তার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কোন বিশেষ একটি মুহূর্তের বিশ্লেষণে আরম্ভ ও শেষের আকস্মিকতায় নিবদ্ধ না থেকে বিরাট সময়ের সীমাকে ধরে চরিত্রের কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর 'হাসন সখী', 'প্রথমী দিন' ইত্যাদি একাধিক গল্পে এর প্রমাণ আছে।

গোপাল হালদার মননধর্মী উপন্যাসেই সব সময়ে নিবিষ্ট রেখেছেন নিজের শিল্পচিন্তাকে। এ বিষয়ে তিনি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সমগোত্রীয়। কিন্তু 'ঊনপঞ্চাশী' 'পঞ্চাশের পথ' ও 'তেরশ পঞ্চাশ'—এই উপন্যাস-ত্রয়ীতে তিনি ইতিহাসের তথ্যের সততার সঙ্গে শিল্পের সত্যকে মর্যাদা দিতে বসে গতানুগতিক ঐতিহাসিক উপন্যাস না লিখে সাংবাদিকতার কৌশল তার সঙ্গে ওতপ্রোত করেছেন। উপন্যাসে আছে তর্ক-যুক্তি, বুদ্ধি, মনন। কাহিনীর নিটোল রূপের প্রয়োজন বোধ করেন নি লেখক। নায়ক বিনয় মজুমদারের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার মধ্যেই বক্তব্যকে স্থির না রেখে সমকালকে বহু চরিত্রের ভিড়ে একটা ল্যাণ্ডস্কেপের বিস্তৃতিতে রেখেছেন।

'ঊনপঞ্চাশী' উপন্যাসে 'লেখকের কথা'-অংশে গোপাল হালদার যে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, তা যুদ্ধ-সমকালে অনুসৃত একটি নতুন রীতির দিকেই আমাদের দৃষ্টি ফেরায় :

'ঊনপঞ্চাশী'-ও সমসাময়িক ইতিহাসের এক চিত্র,—ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্ব কেমন করে উদ্ঘাটিত হয় নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন টাইপের মানুষ সেই ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কি বিশেষ বিশেষ রূপ গ্রহণ করতে থাকে এবং বিভিন্ন মানুষের মতও এই ঘটনাবর্তে কেমন করে আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়ে চলে এই আমার রচনার লক্ষ্য। এই চিত্র রচনায় আমি কোন ব্যক্তি বিশেষকেই অংকিত করতে চাইনি, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই যে, অযথার্থ ঘটনাকে আমি কোথাও প্রশ্রয় দিই নি, ইতিহাসের সত্যকে আমি কিছুমাত্র বিকৃত করিনি।'[১১]

এখানে প্রচলিত অর্থে ঐতিহাসিক উপন্যাসের কোন রীতিই নেই, আছে নতুন ধরনের উপন্যাস-রীতির উদ্ভব—যার মধ্যে ইতিহাস আছে, কিন্তু তা শিল্পের ইতিহাসে অভিনব হয়েছে লেখকের মননশীল চিন্তাধর্মের কারণে।

'তেরশ পঞ্চাশ' উপন্যাসেও লেখক ভূমিকায় এমন কিছু মন্তব্য করেছেন, যাতে বোঝা যায়, তিনি গতানুগতিক উপন্যাস-ভাবনা থেকে সরে এসে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি নিয়েছেন। এই পদ্ধতি আঁদ্রে মালরো ও জন স্টেইনবেকের রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও অনুকৃত হয়নি। লেখক নিজস্বতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালের কথাসাহিত্যকে নতুন মর্যাদা দিয়েছেন রীতিতেও :

'আমি একে সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে উপস্থিত করেছি। চরিত্রসমূহ যদিও ঐতিহাসিক নয়, ঘটনা বিকৃত হতে দিইনি।......আমি এই ঘটনাবলী উপস্থিত করেছি একজন সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টিপথ থেকে, দেখতে চেয়েছি এই ঘাত প্রতিঘাতে তার সম্ভাবনীয় পরিণতি। সে চিত্রের কেন্দ্র নয় ; সমসাময়িক কালের সে সহজ ও সক্রিয় সাক্ষী। সমসাময়িক এই ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সত্য অবশ্য

রাষ্ট্রনীতি। আলাপ-আলোচনায়, কাজে-কর্মে প্রতিদিন আমরাও তা বুঝে না বুঝে স্বীকার করি। কিন্তু উপন্যাসে আমাদের দেশে খুঁজি রাজনীতি-বর্জিত গল্প। আমার বিচারে সেরূপ গল্প একদিক থেকে সত্য, তবে তা অসম্পূর্ণ, আর নিশ্চয়ই সমসাময়িক ইতিহাসের দৃষ্টিতে তা অনেকাংশে বাস্তব। মন্বন্তরের কথায় ও চিত্রে অন্তত আমি তেমন কালাতীত কাহিনী বলতে চাইনি; জেনে বুঝেই প্রাধান্য দিয়েছি রাষ্ট্রনীতিক অবস্থা ও আলোচনাকে কর্মী ও মানুষের কথা ও চরিত্রকে। এ পরীক্ষা পশ্চিমে মালরো বা স্টাইনবেকের হাতে সার্থক হয়েছে, আমাদের দেশেও সার্থক না হবার কারণ নেই।'[১২]

লক্ষণীয়, মন্বন্তর নিয়ে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 'মন্বন্তর' নামেই যে উপন্যাসটি লিখেছেন, তার রীতি গতানুগতিক রীতি। বিবৃতিমূলক রচনারীতির আশ্রয়ে তারাশংকর নীলা, নেপী, কানাই, অরূপ, গীতা ইত্যাদি চরিত্রের যে চিত্র এঁকেছেন, মন্বন্তরের যে ছবি উপহার দিয়েছেন তা যেমন দুর্বল, তার প্রকাশও তেমনি বঙ্কিমী রীতির নৈকট্য লাভ করে। সমালোচক কিছুটা রীতির কথা মনে রেখেই মন্তব্য করেছেন,—'মন্বন্তরে···চলতি কালের ছবি ধরা আছে কিছুটা সাংবাদিক সুলভ মনোবৃত্তিতে।···সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়, লেখক স্বক্ষেত্র থেকে সরে এসে চলতি শহরজীবনকে সাংবাদিকের ভঙ্গিতে আসতে পারেন বড় জোর। তাঁর মূল সমস্যার ছক গ্রামেও যা, শহরেও তাই।'[১৩] অর্থাৎ তারাশঙ্কর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে বসে তাঁর উপন্যাস রচনার রীতি-ভাবনায় বাঁধা ছক থেকে বাইরে আসতে পারেন নি, যদিও বিষয় ও পরিবেশে বদল ঘটিয়েছেন। 'মন্বন্তর' উপন্যাস লেখকের কিছুটা অক্ষম শিল্পশক্তির পরিচয় দেয়।

নরেন্দ্র ঘোষ তাঁর 'ডাক দিয়ে যাই' ইত্যাদি উপন্যাসে এবং অন্যান্য একাধিক গল্পে চরিত্রের প্রকাশ্য সংলাপ ও অন্তর-সংলাপের সহাবস্থান ঘটিয়ে চরিত্রের বাইরের চিন্তা এক রকম, সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে তার অন্যরূপ, অন্য প্রতিক্রিয়া—এই দুইকে একই সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। প্রত্যক্ষ সংলাপের পাশেই প্রথম বন্ধনী দিয়ে তার গভীর অন্তর্লোকের অন্য কথা, অন্য যন্ত্রণাকে চিত্রিত করে রীতিতে বৈচিত্র্য আনতে সচেষ্ট হন। 'ডাক দিয়ে যাই' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র দিলীপ বন্ধুর যক্ষারোগের মৃত্যুর খবর নিয়ে একে একে সে নানাজনের সঙ্গে দেখা করে। বাইরে তার খবরের সহজ আদান-প্রদান, ভিতরে তার অসহ্য যন্ত্রণা। এই দুই বিপরীত মনোভাবকে সহজ করেছেন রীতির অভিনবত্বে:

'দিলীপ বীণার দিকে অগ্রসর হইল, "সন্তোষ নেই বীণা?"

বীণরাখা নাড়িল, "না, দাদা সেই যে সন্ধ্যের পর গেছে আর ফেরে নি।"

"ওঃ",—(কি বলি? না—আমি ভুলতে চাই—)

"দাদার সঙ্গে দরকারী কথা আছে নাকি?"

"এঁ্যা? হ্যা—আমি একটু বসব।"

"এস—ওপরে বসবে চল——"

বীণার পশ্চাতে পশ্চাতে দিলীপ সিঁড়ি বাহিয়া উঠিল। সন্তোষের ঘরে গিয়া সে দাঁড়াইল।

"শ্মশান থেকে বাড়ী ফিরেছিলে ত?" বীণা প্রশ্ন করিল।

"বাড়ী?" (হে মোহিনী, ইন্দ্রজাল রচনা কর, আমার জ্ঞান অপহরণ কর, আমার দৃষ্টির সামনে রূপের কুহেলিকার জাল বোন—জাল বোন—)

বীণা হাসিল, "না, এমনি। তুমি যে রকম, হয়ত নাও গিয়ে থাকতে পার"—[১৪]

বন্ধুর বোনের সঙ্গে কথা বলার সময় দিলীপের যে মানসক্রিয়া তা এখানে জীবন্ত। আবার শংকর যখন রাজনৈতিক পলাতক এবং সগু প্রত্যাগত ও আত্মগোপনে স্থিত প্রমথকে তার ভাই শেখরের মৃত্যু-খবর দিতে আসে, তখন শঙ্করের যে মানসক্রিয়ার গভীর রূপ—তা চরিত্রের শপথের মত শোনায়। অনেক সময় মনে হয় লেখক চরিত্রের মধ্য দিয়ে নিজের বক্তব্যই বলে দিয়েছেন, এ রীতিও অভিনবত্বের দাবী করে :

'শঙ্কর একটু স্থির থাকিয়া পরে নিম্নকণ্ঠে বলিল, "আমি একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি ভাই—" তাহার কণ্ঠস্বর ভগ্ন।

প্রমথ আবার হাসিল, "শেখরের বিষয়ে?"

"হ্যা—সে নেই।" (প্রতিশোধ। মায়ের অপমান আর শেখরের মৃত্যুর প্রতিশোধ।)

"জানি, ভগ্নদূত এসেছিল হাওড়া থেকে। দেখছ না মা কেমনভাবে দাঁড়িয়ে আছেন?"

"আর বাবা?" (সব ভেঙ্গে যাবে—হে বঞ্চক, দিন ফুরিয়েছে।)

"সামলাতে পারেন নি—বেরিয়ে গেছেন।"

শঙ্কর চুপ করিল, পরে দাঁতে দাঁত চাপিয়ে বলিল, "উপায় নেই, আমাদের এমনিভাবে অনেক প্রাণ দিতে হবে। খ্রীষ্টের রক্তেই খ্রীষ্টধর্ম গড়ে উঠেছিল। কিন্তু একথা জেনে রেখো—শোধ আমি নেবই।" (দিবারাত্র আমি মারণাস্ত্রে শান দিচ্ছি—ওরা মরবে।)

কল্যাণীর নিকটে গিয়া সে আবার বলিল, "মা, আপনার দুঃখ—আমারও দুঃখ। কিন্তু মা, আমিও আপনার ছেলে, ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ আমরা নেবই।"

কল্যাণী কিছুই বলিল না।'[১৫]

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'মোহানা' উপন্যাসে খগেনবাবু ও রমলার প্রেম-সম্পর্কের চিত্রে যে রীতি নিয়েছেন প্রেমের বিষয়ে নায়ক খগেনবাবুর মনের পরিচয় দানে, তাতে তার অন্তর্জীবনের আলোড়নটি অন্য এক তৃতীয় মাত্রায় ধরা। খগেনবাবুর প্রেমভাবনা রমলার সাহচর্যে প্রত্যক্ষ রূপ থেকে ক্রমশ মননের সরণী ধরে পরোক্ষে এক বুদ্ধিদীপ্ত মননে নিক্ষিপ্ত হয়েছে মাঝে মাঝে। খগেনবাবু প্রেমের অনুভূতি থেকে চলে গেছেন নিজের শিক্ষা-দীক্ষায় দীপ্ত আর এক মননলোকে, যেখানে প্রেম নেই, বাস্তব মানুষের বুদ্ধি নেই, আছে মননশীল এক চরিত্র। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় খগেনবাবুকে এমন এক স্তরে রেখে এঁকেছেন যেখানে মন সতত সঞ্চরমান। তার জটিলতা মননের ক্ষেত্রেই দেখা দেয়। স্মৃতি সেখানে সর্বাধিক সক্রিয়, সক্রিয় কিছুটা কল্পনাও। কিন্তু এসব দিয়ে যে মানসিকতা, তাকে নিছক গতানুগতিক বর্ণনায় রাখা দুরূহ। সমালোচক এ বিষয়ে যথার্থ যুক্তি দিয়েছেন,—'এই নিয়ত অপসৃয়মান মানসিকতাকে কখনোই লেখকের স্থির বর্ণনায় ধরা যায় না।'[১৬]

অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহানা—এই তিনটি উপন্যাসের নায়ক খগেনবাবু সম্পর্কে একালের এক প্রতিষ্ঠিত প্রবন্ধকার বলেছেন,—'ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস পড়তে পড়তে কখনো লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ খগেনবাবুর সঙ্গে তাঁর একাত্মতা স্পষ্ট করে তোলে।'[১৭] বস্তুত এমন লেখকের সঙ্গে একাত্মতার কারণেই তিনটি উপন্যাসের রীতি হয়েছে অভিনব। কারণ লেখক স্বয়ং এই তিনটি উপন্যাসের রীতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন:

'নিতান্ত concrete-ভাবে আজকাল বাংলা ভাষায় লেখা উচিত। রবিবাবুর প্রভাবে ভাব এত বেশি আসে যে তা থেকে দূরে থাকাই ভালো। ······আজকাল আমাদের নভেলিস্টরা রূপকে concrete করতে গিয়ে realist কিম্বা naturalist করে তুলেছেন। ভাবের পরশ এখনও লেগে রয়েছে, তাই romantic realism, যেমন মানিক বন্দ্যো'র লেখা, আমার বিশ্বাস, আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত realist নয়, concrete হওয়া। ·······concrete হওয়ার অর্থই হলো নিষ্ঠুরভাবে নৈর্ব্যক্তিক হওয়া পরে ব্যক্তি সম্পর্কতা থাকে ত দেখা যাবে।

···বুদ্ধি দিয়েই concrete হতে হবে। অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা—তাদের প্রধান কথা, stream of consciousness ততটা নয় যতটা romantic প্রভাব থেকে concrete-এ আসা।'[১৮]

'অন্তঃশীলা' উপন্যাস যে রীতিতে লিখিত, 'মোহানা'তে-ও সেই রীতি। 'মগ্ন চৈতন্যের প্রবাহ' (stream of consciousness)-এর দিকটিতে লেখক গুরুত্ব কম দিলেও বস্তুত

'মোহানা'র এই রীতির পরিচয়কে অস্বীকার করা যায় না। 'অন্তঃশীলা'র রীতি সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য 'আবর্ত' ও 'মোহানা' সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য :

'চিত্র হিসেবে এই নভেল পড়া চলে না……অন্তঃশীলার টেকনিক উপভোগে পাঠক পাঠিকার চিন্তাশীলতার চেয়ে স্মৃতিশক্তিরই প্রয়োজন বেশি। সঙ্গীত যেমন melody, অন্তঃশীলার তেমনি মেজাজ। বইখানির অনেক স্থলেই স্মৃতির খেলা আছে—বিশেষতঃ তার সহচরী শক্তির—association-এর।'[১৯]

যুদ্ধ-সমকালে রচিত বাংলা গল্প-উপন্যাসে, আবার স্মরণ করিয়ে দিই, লক্ষণীয় কোন রীতির নিরীক্ষা হয়নি সচেতনভাবে—মুষ্টিমেয় কিছু লেখকের রচনায় ছাড়া। দেখা গেছে, ফ্রান্‌ৎস্ কাফ্‌কা তাঁর উপন্যাসে প্রধান চরিত্রদের নাম দিতেন না। কখনো কখনো নাম হিসেবে দেন ইংরিজি এ্যাল্‌ফাবেট 'কে'। স্যামুয়েল বেকেট তাঁর উপন্যাসে একেবারে মাঝখানে গিয়ে চরিত্রের নাম দেন। এরকম চরিত্র নিয়ে, বিষয় নিয়ে গল্প-উপন্যাসে পরীক্ষা করেছেন বিদেশী লেখকরা। বাংলা সাহিত্যে তা কিছুটা হয়েছে বটে, তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ছয় ও সাতের দশকেই এসবের সচেতন পরিচয় মেলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল ঠিক তেমনভাবে লেখকদের ধরতে পারে নি। আসলে রীতির বৈচিত্র্য আনার জন্য যে মানস প্রস্তুতি, যে সময়-পরিবেশ দরকার, তা লেখকদের ছিল না। সমকালের নৈতিক অধঃপতন, অবক্ষয়, সমাজ ভাঙন, যুদ্ধভয়, মন্বন্তরের কান্না, অসহায়তা এ সবকে যথাযথভাবেই রাখতে হবে, রীতির বিলাস দিয়ে ঢাকা চলবে না, এমন এক অলিখিত বিশ্বাস ও প্রত্যয় নিয়েই কথাকারগণ লেখনী ধরেছিলেন, তাই সচেতন রীতির পরীক্ষার থেকে বিষয়ের গরিমাই বড় হয়েছে সেখানে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে 'অহিংসা' উপন্যাসটি লিখতে বসে অত্যন্ত সতর্ক সচেতন লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কথাসাহিত্যের আঙ্গিক-ভাবনায় যথেষ্ট তৎপর হয়েছেন। তৎপর না হলে এই উপন্যাসে পাঁচটি বিভিন্ন পরিচ্ছেদের কাহিনী বর্ণনার মধ্যে লেখক-ব্যবহৃত তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে নির্দিষ্ট নিজস্ব কিছু মন্তব্য যোগ করতেন না। আসলে আঙ্গিকের অভিনবত্ব সৃষ্টির জন্যই নতুন আঙ্গিক ব্যবহার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনদিনই করেন নি। 'অহিংসা' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম প্যারাগ্রাফ লেখার পর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের প্রায় শেষ অংশে, সতেরো পরিচ্ছেদের আরম্ভের কিছু পরেই, উনিশ পরিচ্ছেদের শেষের দিকে—বন্ধনীর মধ্যে পাঁচটি, উপন্যাসের মূল কাহিনী অংশ থেকে সরে এসে লেখক 'লেখকের মন্তব্য' এই শিরোনামে নিজস্ব বক্তব্য রেখেছেন। বাংলা কথাসাহিত্যের উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'কপালকুণ্ডলা', 'দুর্গেশনন্দিনী,' 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি উপন্যাসের মূল কাহিনীর মধ্যেই এমন মন্তব্য করতে দেখি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আর সীমাবদ্ধতা ও শিল্পমূল্যের হীনতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন বলেই সুপরিকল্পিতভাবে সত্যভাষণ করেছেন তাঁর এই জাতীয় বক্তব্য ব্যবহার সম্পর্কে। এমন রীতি বাংলা কথাসাহিত্যে আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে নিশ্চয়ই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত অভিনবত্বের দাবী করে।

পঞ্চম মন্তব্যে লেখক এ জাতীয় প্রয়োগকে বলেছেন, 'মন্তব্যের এই ভোঁতা ছুরি বেশী কাজে লাগিবে।'[২০] আর একটি মন্তব্য করেছেন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমেই 'লেখকের মন্তব্য' অংশে—'সংক্ষেপে বলাও হইবে, নীরস অশ্লীলতার ঝাঁঝও এড়ানো চলিবে।'[২১] বোঝা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটি লিখতে বসে শিল্পীর কতটুকু ক্ষমতা ও দায়িত্ব, সে সম্পর্কে কতটা নিষ্ঠাবান লেখক! মাধবীলতা সম্বন্ধে সদানন্দের আবিষ্কারকে ও মনোভঙ্গিকে একজন শিল্পীর পক্ষে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে উপস্থাপিত করা একেবারে কঠিন বলেই, স্বভাবী পাঠকের কাছে তা অকপটে স্বীকার করেই বলেছেন,—'ভাবিয়া দেখিলাম, গল্পের মধ্যে ইঙ্গিতে পরিস্ফুট করিয়া তোলার পরিবর্তে মাধবীলতা সম্বন্ধে সদানন্দের আবিষ্কার ও মনোভাবের পরিবর্তনের কথাটা আমার বলিয়া দেওয়াই ভাল।'[২২] আবার লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে 'শৈবলিনীর কথা লিখিতে লিখিতে লেখনী কলুষিত হইতেছে'—এই জাতীয় সৃষ্ট-চরিত্র ও লেখকের নীতি ও আসক্তির ঐকান্তিক যোগকে তীব্রভাবে উপেক্ষা করার মত নির্মম নিরাসক্তিতেই বলতে পেরেছেন—'একটা কথা স্পষ্ট বলিয়া রাখি। মাধবীলতা ভাল কি মন্দ, এটা তার প্রমাণ দিবার চেষ্টা নয়, আমার মতামতের কথা বলিতেছি না। সদানন্দের ধারণার কথা হইতেছে।'[২৩]

পঞ্চম পরিচ্ছেদে 'লেখকের মন্তব্য' অংশের প্রথমেই মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান, সংজ্ঞা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করার পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,—'আমার এসব কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই। সদানন্দ ও মহেশ চৌধুরীর ব্যক্তিত্বের একটা মৌলিক সামঞ্জস্যের কথা আমি সোজাসুজি আপনাদের বলিয়া দিতে চাই। · মহেশ চৌধুরী ও সদানন্দের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে সামঞ্জস্যটা আমি দেখাতেই চাই···গল্পের মধ্যে আপনা হইতে সেটা পরিস্ফুট করিয়া তোলা আমার সাধ্যাতীত। কারণ, দুজন মানুষকে কাছাকাছি টানিয়া আনিয়া অথবা দুজনের মধ্যে একটা মধ্যস্থ খাড়া করিয়া একজনের ব্যক্তিত্বরূপী সচেতন মননশক্তির সঙ্গে অপরজনের ব্যক্তিত্বরূপী অচেতন মননশক্তির পার্থক্য সহজেই স্পষ্ট করিয়া তোলা যায়, কিন্তু সামঞ্জস্য কোনরকমেই দেখানো যায় না। যাই হোক, বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। কেবল বলিয়া দিই।'[২৪] এরপর মহেশ চৌধুরী ও সদানন্দের ব্যক্তিত্বের মূলের সাদৃশ্যটি বলে দিয়েছেন। বোঝা যায় শিল্পীর পক্ষে যেখানে প্রবেশ করা কঠিন, তার থেকেও বড় কথা স্বভাবী পাঠকও যেখানে চরিত্রকে ভুল বুঝতে পারে, অথচ

সেই ভুল ধরিয়ে দেবার সুযোগ লেখকের নেই, পাঠকরা উপন্যাসের ও চরিত্রের প্রতি অবিচারও করতে পারে ভুল বুঝে, সেখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিকের মত নির্মোহ অথচ কঠিন বুদ্ধিগত বিশ্লেষণ দিয়ে এমন মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন যেন। এমন সম্ভাব্য কাহিনী, ঘটনা চরিত্রের একেবারে স্বতন্ত্র এক স্রষ্টার আসনে নিজেকে বসিয়ে লেখক উপন্যাসেরই ঈশ্বরের মত কেন্দ্রীয় চরিত্র করে তুলেছেন। আবার লেখক যখন উপন্যাস লিখতে লিখতে মাঝখানে মন্তব্য করে বসেন হঠাৎই,—'কি কথায় কি আসিয়া পড়িল। কিন্তু উপায় নাই, রত্নাবলীকে বুঝিতে হইলে, কথাটা মনে রাখা দরকার।'[২৫]—তখন স্পষ্ট বোঝা যায়, লেখক স্রষ্টা হয়ে নয়, দ্রষ্টা হয়ে নির্মোহ দৃষ্টিতে চরিত্রগুলির পাশাপাশিই নিঃশব্দে হেঁটে চলেছেন।

সতেরো পরিচ্ছেদে 'লেখকের মন্তব্যে' আছে,—'অনেকে বিশ্বাস করে না, তবু জীবনের একটা চরম সত্য এই যে, সমস্ত অন্যায় আর দুর্নীতির মূল ভিত্তি জীবনীশক্তির দ্রুত অপচয়—ব্যক্তিগত অথবা সংঘবদ্ধ জীবনের।'[২৬] মাধবীলতার চরিত্রের জটিল জট যা বোঝার দিক থেকে লেখকেরও সমস্ত জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে, সেই প্রসঙ্গে এমন সহজ, সাবলীল মন্তব্য শিল্পমূল্য পায় নিঃসন্দেহে। 'অহিংসা' উপন্যাসের শেষতম মন্তব্যের সিদ্ধান্তে আছে,—'মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করিয়া মানুষের নিজেকে জানিবার, নিজের আর বিশ্বের সমস্ত মানুষের মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাওয়ার একটা উপায়ের কথা যে শাস্ত্রে লেখা আছে, মহেশ চৌধুরীও জানে, আমিও জানি। তবে, শুধু লেখা আছে, এইটুকুই আমরা দুজনে জানি।'[২৭] লক্ষ্য করার বিষয়, এইখানে লেখক ও চরিত্র একই বোধে স্থিত। লেখক যদি চরিত্রের স্রষ্টা হন, তবে চরিত্র ও স্রষ্টা—উপন্যাসটির রচয়িতার প্রয়োজনে কাছাকাছি এসে গেছে। আর শাস্ত্রের পরীক্ষিত বাক্যের থেকেও যে অপরীক্ষিত জীবন ও মনের ব্যাখ্যা একজন শিল্পীর পক্ষে অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন, তা বলার জন্যই এমন মন্তব্যের অবতারণা।

বোঝা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শুধুমাত্র কাহিনী ও ঘটনার সংক্ষেপের কারণ একমাত্র নয়, একমাত্র নয় নীরস অশ্লীলতার ঝাঁঝ এড়ানো, এসব থেকেও বড় কথা, যেখানে যেখানে লেখকের স্বতন্ত্র মন্তব্য যোজিত, সেগুলি পূর্ববর্তী কাহিনী-বর্ণনায় এমন সব জায়গায় এনেছেন যে জায়গাগুলি কাহিনী, ঘটনা, চরিত্রের এক জটিল জটে রহস্যময়। অর্থাৎ কাহিনীর স্বাভাবিক গতিতেই, চরিত্রের জ্ঞায়ের স্বাভাবিক পথেই লেখকের শিল্প-জ্ঞায়বোধ সক্রিয়। এমন মন্তব্যগুলি না থাকলে 'অহিংসা' উপন্যাসটি স্বভাবী ও সাধারণ পাঠক নিশ্চয়ই ভুলভাবে গ্রহণ করতেন, ব্যাখ্যা করতেন। শিল্পীর ভয় নয়, নির্ভীক শিল্প-জ্ঞায়ে ও নিরাসক্ত-চিন্তায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখককে স্রষ্টা থেকে সরিয়ে দ্রষ্টার

আসনে বসিয়ে চলমান চরিত্রগুলির সঙ্গী করেছেন। এতে উপন্যাসে কাহিনী ও ঘটনায়, চরিত্রগুলির ভিড়ে একটি 'থার্ড ডাইমেনশান্' ধরা পড়ে। সুতরাং কোন সমালোচক যখন মন্তব্য করেন, 'শিল্প বিচারে একে ত্রুটি বলেই সহজে মনে হয়।'[২৮]—তখন সহজেই এমন মন্তব্যের গুরুতর ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের বক্তব্য হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে 'অহিংসা' উপন্যাসে সচেতনভাবে যে কথাসাহিত্যের আঙ্গিক-ভাবনায় এর লেখক ব্যস্ত হন, তা তাঁর শিল্পী মনের তাগিদেই এসেছে। উপন্যাসের কাঠামোয় তা ওতপ্রোত এবং অভিনব। বঙ্কিমচন্দ্রের পর নতুন মাত্রা দিয়ে, শিল্পরূপে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম এই উপন্যাসে তা প্রয়োগ করেন। তাঁর অনুপন্থী সম্ভবত নবেন্দু ঘোষ—যাঁর 'ডাক দিয়ে যাই' উপন্যাসে লেখকের নয়, সৃষ্ট চরিত্রেরই অন্তর্মনের তৃতীয় স্বর অন্ত তাৎপর্য পেয়েছে।

সুশীল রায় 'শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু' নামে একটি পত্রাকারে উপন্যাস লিখে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে আঙ্গিকের আর এক অভিনবত্ব এনেছেন। পত্রাকারে উপন্যাস লেখার রীতি নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্যে সুশীল রায়ের হাতে প্রথম নয়, তবু যুদ্ধ-সমকালে এমন আঙ্গিক-প্রকল্পে উপন্যাসের কথা বলার প্রয়াস যুদ্ধ-সমকালীন কথাসাহিত্য-ধারাকে বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করে। সুশীল রায়ের যুদ্ধ-পূর্বকালে প্রকাশিত 'একদা' উপন্যাসেরই অনুক্রম হল 'শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু'। 'একদা'র নায়িকা শ্রীমতী পঞ্চমীই এই উপন্যাসে নায়িকা। উপন্যাসটি সমগ্রভাবে একটি দীর্ঘ পত্রের আকারপ্রাপ্ত। সাধারণভাবে পত্রের বৈশিষ্ট্য—পত্রলেখকের হৃদয়ের সীমা খোলা দরজা-জানালার মত উন্মুক্ত থাকে, অসীম হয়ে ওঠে তার জগত। যে লেখে তার যেমন রক্তমাংসের চেহারার পরিচয় মেলে, যাকে লেখে তারও ছবি উজ্জ্বলতম হয়। 'শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু' উপন্যাসে লেখক নানা ঘটনাকে গভীর আত্মবিশ্লেষণে এমনভাবে এনেছেন যা উপন্যাসের টানা কাহিনীর মত আকর্ষণ বাড়ায়। পত্রের ঘটনাগুলি যেন গল্প ও উপন্যাসের মেলবন্ধন, যেন নায়িকার গভীর-গোপন আত্মকথন ও লিরিক—দু'য়ের সাবলীল স্রোতে উঠে-আসা এক একটি কাহিনীর চকিত দীপ্তি। পত্রোপন্যাস রচনা করে লেখক বাংলা কথাসাহিত্যের আঙ্গিকে স্বতন্ত্র একটি ঢেউকে নতুন করে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের অগ্নিগর্ভ সামাজিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিবেশে কথাসাহিত্য রচনা করতে বসে একমাত্র বনফুলই সবচেয়ে বেশী প্রখর আঙ্গিক-সচেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। এমন আঙ্গিক-সচেতনা তাঁর বিষয়ের গভীরতায় ও জীবনদর্শন রচনায় কতটা সহায়তা করেছে, তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক থাকলেও বনফুলই সম্ভবত এই সময়ের একমাত্র কথাকার, যাঁর একাধিক গল্প ও উপন্যাসে নূতন আঙ্গিক প্রয়োগ লক্ষ্য

করা যায়। তাঁর 'সে ও আমি', 'জঙ্গম' উপন্যাসে, 'বাহুল্য', 'বিন্দুবিসর্গ' ইত্যাদি গল্প-সংকলনের একাধিক গল্পে অভিনব আঙ্গিক প্রয়োগের পরিচয় মেলে। তাঁর ছোটগল্পের রীতির অভিনবত্বই বাংলা কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র পথের নির্দেশক।

এক একটি ছোটগল্পকে আকারে ও অন্তঃপ্রকৃতিতে কত ছোট করা যায় 'পাকা রুই', 'নাথুনির মা', 'করুণাভাজন', 'লাল বনাত', 'ছোটলোক' ইত্যাদি গল্প তার প্রমাণ দেয়। ছোটগল্পের মধ্যেও একাধিক পরিচ্ছেদ ভাগ, প্রতি পরিচ্ছেদেই গল্পের টান বজায় রেখে গল্পকে পরিণামমুখী করার শিল্পকৌশল সু-করায়ত্ত বলেই 'কবচ', 'সংক্ষেপে উপন্যাস', 'অতি আধুনিক', 'ক খ গ', 'চিঠি পাওয়ার পর,' 'আকাশ পাতাল', 'জ্যোৎস্না' ইত্যাদির মত গল্প লিখতে পেরেছেন। গল্পগুলিতে কোন শাখা কাহিনীর বিস্তার নেই, আরম্ভ এবং সমাপ্তিতে অবধারিত আকস্মিকতা এবং তার কারণে পাঠকের হৃদয়ে চমকের চমৎকারিত্ব নিঃসন্দেহে ছোটগল্পের আঙ্গিকেব অন্যতম পরীক্ষার পাকা ফল। 'চান্দ্রায়ণ' গল্পের] নায়ক, মনুষ্যরূপী ঝুনা নারিকেল, প্রৌঢ় ব্যক্তি, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী মাধুরীর স্বামী, আর. এম. এস-এর স্টাফ চন্দ্রবাবু এক বর্ষণমুখর পরিবেশে ট্রেনের কামরায় গোপনে অপরের পাঁচখানি চিঠি পড়তে পড়তে পঞ্চম চিঠিটি পড়ার পর চিঠির ভাষা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও চন্দ্রবাবুর ভাগ্য—এই তিনটির পরিচয় গল্পের উপসংহার-ব্যঞ্জনায় অনবদ্য কৌশলে এঁকেছেন বনফুল :

'……আশা করি কাল বিকেলে কিংবা সকালে এসে পড়বে। আমি তৈরী থাকব। আমার অসংখ্য চুম্বন নাও। ইতি—

তোমারই মাধুরী।

প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বাহিরে একটা বজ্র পড়িল।'[২৯]

চন্দ্রবাবুর সম্পূর্ণ অপরিচিত এক অনঙ্গকে লেখা চন্দ্রবাবুর তৃতীয়পক্ষ মাধুরীর চিঠিই শেষে তার হাতে। ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর পরিহাসকে যে ব্যঞ্জনায় ও চমকে লেখক রেখেছেন, তা পাঠককে বিস্ময়-শিহরণে-পুলকে স্থির করে রাখে। এই রীতির গল্প লিখে বনফুল রীতিভাবনায় অসাধারণ নতুনত্ব এনেছেন। এ বিষয়ে কোথাও কোথাও গী দ্য মপাসাঁ বা আন্তন চেকভকে মনে করায়।

কোন কোন উপন্যাসে বনফুল নিটোল কাহিনী নিয়েছেন, যেমন 'মৃগয়া', 'নির্মোক' উপন্যাসে, তেমনি আবার কাহিনী বর্জন করে মধ্যে এক অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সংযোগকারী পরিবেশ রচনার মাধ্যমে অন্য আস্বাদ দিয়েছেন উপন্যাসের রীতিপ্রসঙ্গে। 'সে ও আমি' উপন্যাসে তার পরিচয় মেলে। এই উপন্যাসের আরম্ভ-অনুচ্ছেদটি ছোটগল্পের আরম্ভের মতই আকস্মিক :

'লিখতে শুরু করব, এমন সময় দেখি, সামনের চেয়ারে সে বসে আছে। এ রকম আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। মনে হল, চিনি, কিন্তু কোথায় কবে দেখেছি মনে পড়ল না। কিন্তু চেনা হলেও—এমন সময়ে হঠাৎ—'[৩০]

এই আকস্মিকতার মধ্যেই লেখক পরের অংশে নাটকীয়ভঙ্গিতে 'সে' ও 'আমি'র মধ্যে সংলাপ বিনিময় করিয়েছেন। অনেকটা নাটকের দৃশ্য বর্ণনার মতই বিবরণ মাঝে মাঝে। কাহিনীতে ভূতের গল্পের স্বাদ মেলে। নির্জন রাতে 'সে' যে এসে বসে লেখকের সামনে, সে মূলত লেখকেরই আর এক অবচেতনলোকের আত্মা! রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে নিজের ভিতরকার সত্তাকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করে বাইরে যেনবা একটা টেবিলে বসিয়ে আড্ডার মেজাজে যে কথোপকথন-রীতির পরিচয় রেখেছেন, 'সে ও আমি'র সংলাপ-বিনিময় যেন তারই সংক্ষিপ্ত রূপ। 'সে' কে, তার কোন পরিচয় ও নাম উপন্যাসে নেই। বাস্তব আর কল্পনায় তার মিশ্রণ এক রহস্যময় পরিবেশ রচনা করে।

'জঙ্গম' উপন্যাসটি লিখে বনফুল বাংলা কথাসাহিত্যধারায় মহাকাব্যিক উপন্যাসের একটি অবয়ব গঠনে সহায়তা করেছেন। ভিতরে তার মহাকাব্যোচিত গরিমা থাক বা না থাক, অসংখ্য বিচিত্র চরিত্র রচনা করে, নায়ক শংকরের জটিল মানসিকতাকে একাধিক পর্যায়ে ভিন্ন আকারে ও আধারে চিত্রিত করে, নানাজাতীয় ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়ে বনফুল বিশাল আকারের উপন্যাস রচনার প্রথম উদাহরণ রেখেছেন এখানে। কাহিনীকে সুগ্রথিত করে সরস বর্ণনায় ও অভিনব সংলাপ চরিত্রদের মুখে বসিয়ে বনফুল বাংলা উপন্যাসের আঙ্গিকে আর একটি নতুন রীতির মাত্রা যোগ করেছেন 'জঙ্গম' উপন্যাসের স্বতন্ত্র পাঁচটি অধ্যায়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পরিবেশে বাংলাদেশে বসে বাংলা কথাসাহিত্যে এমন নতুন নতুন রীতির বিচিত্রতা সৃষ্টি নিশ্চয়ই সাহিত্যিক ও কথাসাহিত্য—দুইপক্ষেই অভিনন্দনযোগ্য।

বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, সমকালীন অস্বাভাবিক পরিবেশ-ভাবনার সঙ্গে রচনার আঙ্গিকের নূতনত্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পটিকে মনে পড়ে যায়। নায়ক চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে একালের এক সমালোচক গল্পটিকে বলেছেন,— 'বিকারগ্রস্ত মৃত্যুঞ্জয়ের কাহিনী। বাস্তববোধ না থেকে কেবল পচা ঐতিহ্য আদর্শবাদের শৈথিল্য থাকলে মৃত্যুঞ্জয়ের মত বিকার দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক।'[৩১] গল্পটি অভিনিবিষ্ট সহকারে পড়লেই এই সমালোচকের মূল ভ্রান্তিটি ধরা পড়ে। 'কেবল পচা ঐতিহ্য আদর্শবাদের শৈথিল্য'-র কথা বলেছেন এই সমালোচক মৃত্যুঞ্জয় প্রসঙ্গে! কিন্তু

কোন্ ঐতিহ্য ? কোন্ আদর্শবাদ ? সাম্রাজ্যবাদী শাসনে ও অর্থনীতিতে গড়া বুর্জোয়া আদর্শ, বুর্জোয়া ঐতিহ্য ? তারই সফল রূপ তো তেতাল্লিশের মন্বন্তর! মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নায়ক মৃত্যুঞ্জয় যে তেমন ঐতিহ্য ও আদর্শবাদ থেকে অতিসচেতনভাবে সরে আসতে চায়, গল্পটি তা-ই একমাত্র প্রমাণ করে।

সমালোচক 'মৃত্যুঞ্জয়ের মস্তিষ্কবিকৃতি'কেই একমাত্র সত্য করে গল্পটির বিচার শেষ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'একপেশে চিন্তা করতে করতে নিজেই অন্নপ্রার্থী হয়ে পড়েছে। এই গল্পে মানিক অত্যন্ত সুন্দরভাবে মৃত্যুঞ্জয়ের চিন্তার বিকৃতি ঘটিয়েছেন।'[৩২] নায়কের চিন্তা আদৌ 'একপেশে' নয়। গল্পটির মূল লক্ষ্য যেন, সমালোচকের মতে, নায়কের বিকৃতি দেখানোই! এই ব্যাখ্যা আমাদের গল্পটি পড়ার পর এক হাস্যকর অভিজ্ঞতা বলে মনে হয়। গল্পটির আলোচনার উপান্তে এসে ওই সমালোচক বলেছেন, 'অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই মরে গেলে বাঁচার পথনির্দেশ দেবে কে ? নিজে বাঁচব এবং অন্যকেও বাঁচাব এটাই হচ্ছে সঠিক পথ। তাতে নিজের ওপর যেমন প্রত্যয় বাড়ে তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা জোরদার হয়ে উঠে।'[৩৩] খাঁটি সত্য কথা, কিন্তু এমন ভাবনা কি লেখক গল্পে সামান্য ইঙ্গিতেও রেখেছেন ? 'এ গল্পে…জোরালো বক্তব্য নেই। মৃত্যুঞ্জয়ের বিকারের সার্থক শিল্পরূপই পাঠককে ভাবিয়ে তুলবে।'[৩৪]

আমাদের কথা হল, নায়কের 'একপেশে চিন্তা' আদৌ নেই। লেখক মৃত্যুঞ্জয়কে একটি সতর্ক, সচেতন, দরদী, মানবিক 'total man' করেই এঁকেছেন মন্বন্তরের পটভূমিকায়। মন্বন্তরের ভয়াবহ পরিবেশে বসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত লেখক আদৌ বিকার-বিলাসের রূপ এঁকে গল্প ফাঁদতে বসেননি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লেখা ছিল জীবনের রক্ত, পরস্পর-পরস্পরের অঙ্গীভূত নিবিড়তম অস্তিত্ব। সে ক্ষেত্রে একজন সচেতন লেখক শুধুই একটি মানুষের বিকৃতিতে নেমে আমার গল্প বলে ক্ষান্ত হবেন—এটা ভাবাই বাতুলতা মাত্র। গল্পে কোন 'জোরালো বক্তব্য' নেই, এমন মন্তব্যের ভ্রান্তিটি ঐ সমালোচক-কৃত লেখকের গল্প ব্যাখ্যার মূল ভ্রান্তিরই সিদ্ধান্ত!

আমরা গল্পটির মূল বিষয় এবং লেখকের লক্ষ্য সম্পর্কে আগে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। বর্তমান প্রসঙ্গে আরও কিছু যোগ করা দরকার। অফিসের সহকর্মী নিখিলের এক প্রশ্নের জবাবে মৃত্যুঞ্জয় যখন বলে :

'আমি বেঁচে থাকতে যে লোকটা না খেয়ে মরে গেল, এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি ? জেনে শুনেও এতকাল চার বেলা করে খেয়েছি পেট ভরে। যথেষ্ট রিলিফ ওয়ার্ক হচ্ছে না লোকের অভাবে, আর এদিকে ভেবে পাই না কি করে সময় কাটাব।'[৩৫]

এবং যে মানুষটি সজ্ঞানেই এমন কথা বলে, তার একমাত্র বিকৃতি দেখানোই গল্পকারের

সত্য হবে এটা মানা যায় কি করে? আবার এই মানুষটিই মাইনের টাকা রিলিফ ফাণ্ডে দেওয়ার মত স্থির সিদ্ধান্ত নেয়! তার স্ত্রী যখন স্বামীর বন্ধুকে বলে, সুস্থ হয়ে 'উঠতে পারলে আমিই তো ওর সঙ্গে ঘুরতাম ঠাকুরপো।'[৩৬]—তখনও কি নায়কের সচেতন স্ত্রী-ও বিকৃত স্বামীর সঙ্গী হওয়ার কথাই বলতে চায়? তা হলে স্ত্রীকেও তো বিকৃত-বুদ্ধির বলতে হয়! গল্পের একেবারে শেষে নিখিল মৃত্যুঞ্জয়কে বার বার বোঝাবার জন্যে যখন নানা যুক্তি দেয়, তখন নায়কের স্বভাবের পক্ষে লেখকের মন্তব্যগুলি :

'তার অভিজ্ঞতার কাছে কথার মার-প্যাঁচ অর্থহীন হয়ে গেছে।'[৩৭]

আমাদের মতে, গল্পটি কোন বিকার-বিলাস-চিত্র আঁকার গল্প নয়, এটি একটি সার্থকতম সুস্থ সমাজভাবনা—যে সমাজ সর্বহারাদের সঙ্গে মানবিক সম্পর্কে সমস্ত মানুষকে কাছে আনার কথা বলে, তাদের স্তরে নেমে আসার কথা বলে, তারই কাহিনী। মৃত্যুঞ্জয়ের স্বভাবে যে অন্তিম বিকৃতি :

'গাঁ থেকে এইছি। খেতে পাইনে বাবা। আমায় খেতে দাও।'[৩৮]

—এমন সংলাপ, তা বস্তুত বড় মানবিক জীবন ও সমাজ-ভাবনার পক্ষে চরিত্রের প্রতীকী স্বভাব মাত্র। গল্পের ব্যঞ্জনা এরই মধ্যে, তা বাস্তবের বিকার এতটুকুও নয়। যুদ্ধ-সমকালের ছোটগল্পের রীতির অভিনবত্বও এখানে।

গল্পটির আরম্ভেই আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি মেশানো বাক্য প্রয়োগ, যা 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের মত, প্রথম বাক্যেই মেলে :

'সেদিন আপিস যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় প্রথম মৃত্যু দেখল—অনাহারে মৃত্যু।'[৩৯]

গল্পটির রীতি চরিত্রকেন্দ্রিক, কিন্তু এই চরিত্র প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে গল্পের শেষতম বাক্যে। গল্পের মধ্যে একমাত্র অনাহারে মৃত্যু ঘটানোর খবর ছাড়া আর কোন বড় ঘটনা নেই। নায়ক চরিত্রের সক্রিয়তা দিয়ে গল্প শেষ। নায়ক-চরিত্রের একমুখীন স্বভাব ও একের পর এক পরিবর্তন-চিত্রেই আছে গল্পের গতি। এর বিষয় যত কাহিনী ও ঘটনা থেকে সরে এসেছে, যতটা গতানুগতিক মনস্তত্ত্বকে পরিহার করেছে, তার থেকেও বেশী এর নায়ককে করে মননশীল, মানবিক, সচেতন মানুষের প্রতিনিধি। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত ও শ্লেষ-ব্যঙ্গ মেশানো গদ্য, অথচ সহজ সাবলীল গদ্যের গতিময়তার বাকরীতি দিয়ে 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পরীতির ব্যবহারে যতটা ব্যঞ্জনা আনতে পেরেছেন, সেকালে এমনভাবে আর কেউ পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

তিন

লেখকরা যে কথাসাহিত্যের জন্ম দেন, তার মূল ভিত্তিই হল লেখক-ব্যবহৃত ভাষা। 'There is first of all the language in which a writer is working, which imposes its own rules; there is the tradition in which he finds himself.'[80] ভাষাই লেখকের চিন্তাকে বয়ে নিয়ে যায় নিখুঁত শিল্পের মহত্তম স্তরে। ভাষার মধ্যে যে প্রতীকত্ব আছে, তা দিয়ে লেখক জীবনের গভীরতম ব্যঞ্জনা ও অর্থকে স্পষ্ট করতে পারেন। · কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাষা এমন বড় কর্তব্য সম্পাদন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের লেখকরা নানাভাবে ভাষাকে ব্যবহার করেছেন কথাসাহিত্যে।

কথ্যরীতির গদ্য শুধু সংলাপের নয়, বর্ণনায় প্রায় সব লেখকই গ্রহণ করেন। প্রাক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই তা অনুসৃত। নরেন্দ্র ঘোষ, তারাশঙ্কর প্রমুখ সাধুগদ্যকেও ত্যাগ করেন নি একাধিক উপন্যাসে। গদ্যকে তির্যক, ঋজু, সপ্রতিভ করেছেন সুবোধ ঘোষ প্রমুখ। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে'র যে ভাষা আমাদের সামনে রাখেন, পরবর্তী 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র ভাষা তা থেকে স্বতন্ত্র। বক্তব্যের গভীরতা ও স্বাতন্ত্র্যই এমন ভাষাকে বদলায়। দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্করতা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রবোধকুমার সান্যাল 'অঙ্গার' গল্পে নায়িকার হাসির বর্ণনায় তার বীভৎসতা ও কুৎসিত রূপ আঁকতে বসে হাসিকে পচা বাসি ফ্যানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এমন প্রতীকী প্রয়োগ গল্পের শরীর শুধু নয়, তার আত্মার গভীর-অধিগত।

নরেন্দ্র ঘোষ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী প্রমুখ মন্বন্তরের চিত্রে যে জীবন্ত স্বভাব দিয়েছেন তা তাঁদের প্রতীকী ভাষার কারণেই সম্ভব হয়েছে। যুদ্ধজনিত বোমা বর্ষণের চিত্রে, আন্দোলনের জীবন্ত উৎয়োগকে আঁকতে বসে মনোজ বসু, তারাশঙ্কর, গোপাল হালদার, নরেন্দ্র ঘোষ প্রমুখ যে গদ্যরীতি নিয়েছেন, তা বক্তব্যেরই অনুগ, স্বতঃস্ফূর্ত। কোন কৃত্রিম পরীক্ষা নয়, স্বতঃস্ফূর্ততাই সেই সময়ের গদ্যভাষায় একমাত্র বৈশিষ্ট্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সহরতলী', 'প্রতিবিম্ব', 'ধরাবাঁধা জীবন,' দর্পণ', 'অহিংসা' ইত্যাদি উপন্যাসের ভাষা, 'সমুদ্রের স্বাদ', 'ভেজাল', 'বৌ', 'হলুদপোড়া' ইত্যাদি গল্প-সংকলনের গল্পগুলির গদ্যভঙ্গি ও ভাষাদর্শ এমন এক নিষ্ঠুর নিরাসক্তিকে সামনে আনে, যা আপাত-রুক্ষ মনে হলেও কোথায় যেন বাস্তব জীবনেরই অঙ্গাঙ্গী-ভাষা জড়িত। রূঢ় জীবন থেকে তাকে আলাদা করা যায় না। অন্যদিকে তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' ইত্যাদির ভাষার আবেগ, নাট্যরস, রোমান্স-ধর্ম ও

রোমান্টিকতা আমাদের এমন এক আবেশে আপ্লুত করে, যা অন্য জগতে স্থিত করে দেয় অবলীলায়।

পরশুরামের শ্লেষাত্মক কণ্ঠস্বর যুদ্ধ-সময়ের বিষয়কে অন্য মাত্রায় নিয়ে আসে। আবার ভাষায় কাব্যরস দিয়ে কৃত্রিম করার চেষ্টাও দেখা গেছে এ সময়ের একাধিক লেখকের রচনায়। এ সময়ের বহু লেখক সহজ, সরল, সাদামাটা গল্প বলার ভাষাকেই নিজেদের বক্তব্য প্রকাশের একমাত্র বাহন করে গেছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কথাসাহিত্যের ভাষায় রোমান্টিক রীতির অনুসারী। যে ভাষায় 'দেবযান' উপন্যাস রচনা, তার অলৌকিকতা ও মায়া নিশ্চয়ই 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' বা 'দুই বাড়ি' উপন্যাসে নেই, কিন্তু বিভূতিভূষণের আকাশ-বিহারী কল্পনা উপন্যাস ও গল্পের ভাষাকে, গদ্যভঙ্গিকে বাস্তব-বিচ্ছিন্ন রোমান্টিক কাব্যধর্মী গদ্যরীতির অনুসারী করেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোলের কাল থেকে যে ভাষায় কথা বলেছেন, যুদ্ধ-সমকালের রচনায় তার ব্যত্যয় ঘটাননি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রাক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বের রচনা 'কাকজ্যোৎস্না', 'প্রথম প্রেম', 'আসমুদ্র', 'প্রাচীর ও প্রান্তর' ইত্যাদি উপন্যাসে শব্দের মধ্যে একাধিক 'pun' ও 'aliteration' প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যে শ্রুতিমধুর ধ্বনিময়তা ও পাঠকচিত্তে বুদ্ধিগ্রাহ্য আবেগ ও ঝলমলে দীপ্তি দিয়েছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের 'যে যাই বলুক' ইত্যাদি উপন্যাসে সেই ধর্ম বজায় রেখেছেন। অবশ্য 'বস্তনবিবি', 'দুরবাহু' ইত্যাদি ছোট গল্পের ক্ষেত্রে গল্পের উপযোগী গদ্যে তির্যক স্বভাব ও গভীর ধ্বনিময় শব্দ ব্যবহারের শিল্পচাতুর্য অন্য স্বরের মাত্রা এনে দেয় বাংলা কথাসাহিত্যের গদ্যরীতি ও ভাষাদর্শে।

বস্তুত কল্লোলের কাল থেকে যে ভাষার ও গদ্যরীতির বিবিধ পরীক্ষামূলক ব্যবহার দেখি তরুণ বিদেশী কথাসাহিত্য-অনুপ্রাণিত লেখকদের রচনায়, তার অনুবৃত্তি যুদ্ধ-সমকালের উপন্যাস-ছোটগল্পের ভাষায় পরিত্যক্ত হয়নি, অবশ্য হতেও পারে না। আমরা আমাদের বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য সময়-সীমায় রবীন্দ্রনাথের 'তিনসঙ্গী'র তিনটি গল্পকে পাই। সেখানে যে বুদ্ধিদীপ্ত গদ্যরীতি ও রোমান্টিক ভাবপ্রকাশ—তা আর এক স্বতন্ত্র আসন পাবার যোগ্য। 'সোহিনী'র চরিত্র যেমন ঠিক তেমনি নির্মাণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ল্যাবরেটরী' গল্পের ভাষারীতি, বাক্যবিন্যাস, পদবন্ধ ও এ সবের অন্তর্নিহিত মহত্তম কবিত্ব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে রচিত বিখ্যাত উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলির ভাষা ও গদ্যরীতি সম্পর্কে যে প্রধান কথাটি মনে রাখা দরকার, তা হল, এ সময়ে বিষয়ই ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে বিষয়ের দায়িত্বে ও স্বতঃস্ফূর্ততায়। 'পরশুরামের কুঠার' গল্পের উপসংহারের

ভাষায় যে শ্লেষ, মন্বন্তর সম্পর্কিত গল্পগুলির গদ্যরীতি ও ভাষায় যে দীপ্তি, বেগ, গতি—তা মূলত সমকালের সপ্রাণ চলৎশক্তির কারণেই সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেকটি সচেতন লেখক কথাসাহিত্য রচনায় আঙ্গিকে গদ্যরীতি ও ভাষাদর্শ প্রয়োগে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বকে মিশিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

১ 'শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব ও শরৎচন্দ্রের জগৎ' প্রবন্ধ ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার 'রবীন্দ্রোত্তর কাল' গ্রন্থ প্রথম পর্যায় পৃ. ১

২ The Short Story (1977) Ian Reid/Ch.2 (Growth of a genre) P 28

৩ ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিল্পী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ Jack Lindsay রচিত 'After the Thirties' নামক আধুনিক শিল্প-সমস্যা সম্পর্কিত গ্রন্থে আলোচিত

৪ Modern Novelists (1968) Edited by Percy Wilson CB/Introduction/P.8-11

৫ A Reader's Guide to the Contemporary English Novel (Revised Edition 1972) Frederick R Karl/Ch.I 'The Contemporary English Novel' P.11

৬ The Modern English Novel (1976) The reader, the writer and the work Edited by Garbriel Josipovici Introduction P.8

৭ উপন্যাসে জীবন ও শিল্প (১৩৮৪) ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার 'উপন্যাসের ভিত্তি' প্রবন্ধ প ১৮

৮-১০ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: শিল্পরীতি (১৯৭৪) ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত প্রথম পর্ব:ভূমিকা প্রথম অধ্যায় পৃ. ২, ৪, ৬

১১ উনপঞ্চাশী বা পঞ্চাশের উপান্ত (জানুয়ারী, ১৯৪৬) গোপাল হালদার 'লেখকের কথা'

১২ ভেরণ পঞ্চাশ গোপাল হালদার পৃ. ৫-৬

১৩ 'তারাশংকর : দেশ, কাল' প্রবন্ধ ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার 'রবীন্দ্রোত্তর কাল' গ্রন্থ (১৩৮১) পৃ. ৬৪

১৪, ১৫ ডাক দিয়ে যাই নবেন্দু ঘোষ পৃ. ১৩৬, ১৭৭-১৭৮

১৬ উপন্যাসে জীবন ও শিল্প (১৩৮৪) ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার 'চৈতন্যের গভীরে' প্রবন্ধ পৃ. ৫২

১৭, ১৮ 'ধূর্জটিপ্রসাদ' গ্রন্থ (১৯৭০) ডঃ অলোক রায় পৃ. ৪৯, ৪৮

১৯ 'বয়ান-ই-তহবিরি' প্রবন্ধ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ডঃ অলোক রায় লিখিত 'ধূর্জটিপ্রসাদ' গ্রন্থে সংকলিত পৃ. ১০২-১০৪

২০-২১ 'অহিংসা' উপন্যাস মানিক গ্রন্থাবলী (৪র্থ খণ্ড) প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৭ অধ্যায় উনিশ পৃ. ২০১, অধ্যায় দুই পৃ. ৩০, ৩০, ৩০, অধ্যায় পাঁচ পৃ. ৫৬-৫৪, অধ্যায় ছয় পৃ. ৮২, অধ্যায় সতেরো পৃ. ১৭৬, অধ্যায় উনিশ পৃ. ২০১

২৮ 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থ ডঃ সরোজমোহন মিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৮৪ পৃ. ২৭২

২৯ 'চান্দ্রায়ণ' গল্প 'বিন্দুবিসর্গ' গ্রন্থ বনফুল রচনাবলী (৬ষ্ঠ খণ্ড) এপ্রিল, ১৯৭৫ পৃ. ২৯৯

৩০ 'সে ও আমি' উপন্যাস ঐ (৪র্থ খণ্ড) প্রথম পরিচ্ছেদ পৃ. ৫

৩১-৩৪ 'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থ (তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৮৯) ডঃ সরোজ মোহন মিত্র পৃ ১৮৮, ১৮৮, ১৮৮-১৮৯, ১৮৯

৩৫-৩৯ 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে !' গল্প মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় মাণিক গ্রন্থাবলী (দ্বাদশ খণ্ড) পৃ ৪৬২, ৪৬৫, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬১

৪০ The Modern English Novel (1976) the reader, the writer and the work Edited by Gabriel Josipovici Introduction P 3

একাদশ অধ্যায়

উপসংহার

এক

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে বাংলা কথাসাহিত্যের যে ধারা চিহ্নিত হয় সাহিত্যিকদের স্বতঃস্ফূর্ত সমাজচেতনা ও বাস্তবতার অভিজ্ঞানে, যে সমস্ত নতুন নতুন শিল্প-বিষয়ের প্রবণতা অবধারিতভাবে দেখা দেয় বাংলা কথাসাহিত্যে—সে সম্পর্কে একটি উপসংহারে আসতে চাইছি। কারণ উনিশ শ উনচল্লিশের পয়লা সেপ্টেম্বর যে যুদ্ধের শুরু, তার সমস্ত পাট, দায়দায়িত্ব, ভয়াবহতা আপাতত শান্তিকল্যাণে আসে দোসরা সেপ্টেম্বর উনিশ শ পঁয়তাল্লিশে—যদিও এমন শান্তিকল্যাণ উনিশ শ পঁয়তাল্লিশের চৌঠা মে তারিখেই বার্লিন শহরের পতন ও ফ্যাসিস্ত হিটলারের সামরিক বাহিনীর বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ থেকে সূচনা পর্ব হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে।

উপসংহারে এসে আমাদের প্রথম কথা হ'ল, যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ মূলত জোড়াতালি দিয়ে শান্তি আনার মত, ঠাণ্ডা লড়াইকে ভিতরে ভিতরে জীইয়ে রাখার মতই কয়েকটি শক্তির মধ্যে সন্ধির শর্ত ১—সেই ঠাণ্ডা লড়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে এমন এক গভীর আড়ষ্ট পরিবেশ রচনা করেছে যা দুরারোগ্য ব্যাধির মত। এটা যে কত বড় ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে এক দীর্ঘস্থায়ী দুরারোগ্য ব্যাধি, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তরকালের সারা পৃথিবীর সাধারণ ও বুদ্ধিজীবী মানুষ প্রায় চল্লিশ বছরের মত সময় অতিবাহিত করেও ভোলেননি।

সম্প্রতি একালের দুই বৃহত্তম শক্তি রাশিয়া ও আমেরিকার নেতাদের কাছে পারমাণবিক যুদ্ধ বন্ধ করার জন্ম আবেদন জানিয়ে আমেরিকা, রাশিয়া ও অন্যান্য নয়টি রাজ্যের প্রায় শতাধিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ভার্জেনিয়া শহরের এক গ্রামাঞ্চলের বিশ্রামাবাসে মিলিত হয়ে একটি চূড়ান্ত আবেদন পত্রে যে বক্তব্য রেখেছেন, তা সংবাদ-আকারে পরিবেশিত হয়েছে একটি নতুন প্রকাশিত বাংলা দৈনিকে,—'পৃথিবীর মানুষের সামনে পরমাণু যুদ্ধের বিপদ যে কোন ব্যাধির চেয়ে বেশি ভয়ংকর। আর এ ব্যাপারেও নিরাময়ের চেয়ে প্রতিবিধানই বেশি সহায়ক।...... পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ এখন একটা মারাত্মক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বিপদ ক্রমশই বাড়ছে। ··· পারমাণবিক যুদ্ধই হবে শেষ প্রলয়। সে প্রলয়ের হাত থেকে কেউ নিস্তার পাবে না। মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতেই হবে। জীবন আর

পরমাণু যুদ্ধের সহাবস্থান কোনমতেই সম্ভব নয়। ... যখন পরমাণু যুদ্ধ চালু নেই তখনও সীমিত ও মূল্যবান সম্পদ পারমাণবিক অস্ত্রের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। পারমাণবিক অস্ত্র প্রস্তুতের যে প্রতিযোগিতা চলছে তার গুণাগার দিতে হচ্ছে সবাইকে, এজন্য পৃথিবীর মানুষের মানবিক, সামাজিক চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রথাভাবের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সুরাহা হচ্ছে না।'[২]

নিরন্তর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মধ্য থেকেই সারা পৃথিবী জুড়ে পারমাণবিক যুদ্ধ হয়ত একদিন হবে এবং তাতে পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতিই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, কিন্তু সেই যুদ্ধের আগে বিশ শতকের মানুষের মনের যে মৃত্যু, আত্মার যে ভয়াবহ সংকট তার কথায় ও স্বরূপ ব্যাখ্যায় ঐ পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যটিও এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়,—'সভ্যতা ও মানুষ পারমাণবিক যুদ্ধে হয়ত একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু সেই প্রলয়ের পূর্বে আমাদের ক্রমশ গ্রাস করবে নিরন্তর দুঃস্বপ্ন, আতঙ্ক। মানসিক সুস্থতা সেই আতঙ্ক ছায়ায় সম্ভব বলে মনে হয় না।'[৩]

প্রখ্যাত বিদেশী সাহিত্যিক অলডাস্ হাক্সলে তাঁর 'এপ এণ্ড এসেন্স' গ্রন্থে এবং একাধিক বিদেশী বুদ্ধিজীবী ও লেখক তাঁদের রচনায় পারমাণবিক যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর চেহারা কত দূর বীভৎস হতে পারে, তার কাল্পনিক যথাযথ চিত্র উপহার দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছয় বছর ও যুদ্ধোত্তর কালের প্রায় চল্লিশ বছরের বাংলা কথাসাহিত্য—এই দুই সময়ের বাংলা কথাসাহিত্যের যোগও অতি নিবিড়। যুদ্ধ-সমকালে যে জটিল পরিবেশ, সমাজ ও ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, সে সময়ে কথাসাহিত্যিকরা যে বিষয় ভাবনায় সদা ব্যস্ত থাকেন, বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কথাসাহিত্যিকদের রচনা সে সবেরই ক্রমিক ও জটিলতর ধারার নির্দেশক। লক্ষণীয়, যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হলেও সারা বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির মুক্তি-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ভারতের ছিল মূলগত পার্থক্য। ভারত তখনো কঠিনভাবে ঔপনিবেশিক শাসনে শৃঙ্খলিত। যুদ্ধ শেষে অনেক রাষ্ট্র স্বাধীন হলেও ভারত হয় নি। '... by the end of the war, when all over the world peoples were advancing liberations, India emerged from the war as completely subject as at its onset.'[8]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষের পরেও ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সামাজিক দিক থেকে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের যেমন স্বতন্ত্র অবস্থা, তেমনি স্বাতন্ত্র্য ছিল যুদ্ধ-সমকালীন কথাসাহিত্য ধারা থেকে যুদ্ধোত্তরকালের অব্যবহিত সময়ের কথাসাহিত্যেও। আমরা আগেই তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, নবেন্দু ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু প্রমুখের একাধিক

গল্প আলোচনা করে দেখিয়েছি, রাজনীতি নিয়ে তাঁরা কি গভীরভাবে আন্দোলিত হয়েছিলেন মনে, মননে ও কথাসাহিত্যের বিষয়ে। 'রাজনৈতিক চেতনা চল্লিশের লেখকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।'[৫]—সমালোচকের এই কথাটি তাই সর্বাংশে মেনে নেওয়ার মতই। যুদ্ধশেষের অব্যবহিত পরেই তাই আবার রাজনীতি প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে তারাশংকরের 'ঝড় ও ঝরাপাতা' (১৯৪৬), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' (১৯৪৬), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শিলালিপি' (১৯৪৭) ইত্যাদি উপন্যাসে, কারণ, তখন রাজনীতি আরও উত্তাল গণ-আন্দোলনে দীপ্ত হয়। উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালের একুশে নভেম্বর থেকে তেইশে নভেম্বর কলকাতায় ছাত্রসমাজ পুলিশের বর্বর অত্যাচারকে উপেক্ষা করে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ-বিরোধী যে বিক্ষোভে কলকাতার জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণ থামিয়ে দেয়, তার ভিতরের শক্তি ও আবেগকে বড় জাতীয়তার প্রেরণা হিসেবে লেখকরা গ্রহণ করেছিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এবং গভীর শিল্পের দায়িত্ব পালনের শপথ নিয়েই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের কথাসাহিত্যের আর একটি সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য যুদ্ধোত্তর-কালের সাহিত্যভাবনার মধ্যে সমান বেগ দান করে। 'বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ সাল থেকে আমাদের ছোটগল্প-উপন্যাসে বাস্তবতার একটা ছাঁচ গড়ে উঠেছিল। সে ছাঁচের পেছনে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ—এসব কাজ করেছিল। —সে ছাঁচে সাহিত্যে সমাজ-বাস্তবতা নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাতেন, তাঁদের কাছে বাস্তবতার একমাত্র ছাঁচ ছিল।'[৬] বস্তুত যুদ্ধ-সমকালের এই সমাজ-বাস্তবতা যুদ্ধোত্তর পর্বের অব্যবহিত সময়ের কথাসাহিত্যে আরও সার্থকভাবে গৃহীত হতে থাকে। নবাগত সমরেশ বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, ননী ভৌমিক, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখ লেখক যেমন এই ধারাকে ধরেন, তারাশংকর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের মধ্যে এই বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে তাকে অতিক্রম করতেও কেউ কেউ প্রয়াসী ছিলেন।

এতক্ষণ আমরা রাজনীতি-সচেতন গণ-আন্দোলন ও সমাজ-বাস্তবতা—যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে দুই উচ্চকিত বিষয় ছিল বাংলা কথাসাহিত্যে, তাদের যুদ্ধোত্তরকালের কথাসাহিত্যে সূত্রবদ্ধ বিষয় গ্রহণ নিয়ে আলোচনা করলাম। এই দুই বিষয় দিয়েই কথাসাহিত্যিকরা জীবনের যথার্থ অর্থগ্রহণে গভীর-নিবিষ্ট ছিলেন। কথাসাহিত্যের মূল কথা—জীবনের গভীরতম অর্থ ও তাৎপর্য অনুসন্ধান। লেখকরা সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জীবন-অভিজ্ঞতার চরমে সেই তাৎপর্যকে শিল্পীত করতে সচেষ্ট থাকেন। এই মানস-বৈশিষ্ট্য ও শিল্পবৈশিষ্ট্যের কথাপ্রসঙ্গে একালের এক সমালোচক দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল ও অব্যবহিত উত্তরকাল—দুই সময়ের লেখকদের' একটি সূত্র-স্থায় এভাবে ধরেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 'দুর্ভিক্ষ-প্রসঙ্গকথার শুরুতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালের কথাসাহিত্যে 'দুর্ভিক্ষের মূল হিসেবে চোরাগহ্বর ও তার সঙ্গে যুদ্ধরত মানুষের কথা প্রধান হয়ে উঠেছে। মানুষ যে তখনও প্রাতিকূলতার কাছে সমর্পিত-প্রাণ নয়—জীবন যত দুর্বিষহ হোক না কেন, মৃত্যু যে তার বিকল্প হতে পারে না এ বোধ তখনও বাংলা দেশের জনমানসে দৃঢ়। তখনও সামনে রয়েছে ঔপনিবেশিক ইংরেজ প্রভুর', গণ-আন্দোলনের প্রত্যাশা ও বাসনা। তিরিশের জের টেনে জীবন তখনও, যত অস্পষ্ট ভাবেই হোক, আশাবাদী। যুদ্ধের ঠিক শেষ মুখে যে গণ-বিক্ষোভের তরঙ্গ তাতে জীবনের সেই বাসনারই অভিব্যক্তি।......তখনও পর্যন্ত জীবনের প্রতি যে বাস্তব আগ্রহ উপন্যাসের আত্মা, তারই প্রতিফলন খুঁজে পেয়েছি আমরা গণ আন্দোলনের প্রতিফলন লেখকদের আগ্রহে।'[৭] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একাধিক গল্প, উপন্যাস (শিলালিপি), নবেন্দু ঘোষ প্রমুখের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে নতুন সাম্যবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শের ধারায় অনুপ্রাণিত একাধিক লেখক সর্বব্যাপী, ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনের মধ্যেও নিজেদের বিশেষ মতাদর্শ-গত বক্তব্যকে কথাসাহিত্যে রাখতে প্রয়াসী ছিলেন। সে সময়ের কবিতা, ছবি, নাটক গান ইত্যাদির মধ্যেকার বিষয়ও ছিল ফ্যাসিবিরোধী শিল্প সচেতনার অনুগ। আমরা বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রকারান্তরে বলেছি যে, যুদ্ধ-সমকালের সাম্যবাদেবিশ্বাসী শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা নানাভাবে নতুন ভঙ্গিতে দেশীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে সমকালের অসহায় মানুষের চিত্র, সাম্রাজ্যবাদী শোষণে ও শাসনে বিরক্ত ও বিপর্যস্ত মানুষদের কথা বলতে সচেষ্ট ছিলেন। বস্তুত সেই প্রয়াসে সাম্যবাদী কর্মী ও বুদ্ধিজীবীরাই অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা তাঁদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং এ বিষয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের সবল সক্রিয়তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করার মত। তবু—'ফ্যাশিবাদ বিরোধী সংগ্রামের মূল রণনীতি নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় জীবনের প্রবল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার সঙ্গে তাকে অঙ্গীভূত না করার রণকৌশলগত ভ্রান্তির ফলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্তঃসার যথেষ্ট পরিমাণে খর্বিত হয়েছে এবং দেশপ্রেমিক মানুষের এক ব্যাপক অংশ, সাময়িকভাবে হলেও, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বহু সার্থক প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন।'[৮] সে সময়ে 'শনিবারের চিঠি' ইত্যাদি পত্রিকা-গোষ্ঠী এবং বেশ কিছু লেখক যেভাবে সাম্যবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে, তাঁদের সাংস্কৃতিক প্রয়াসের বিরুদ্ধে উন্নাসিক দৃষ্টি ও মন্তব্য রেখেছিলেন, তার মূল কারণই ছিল এই ভ্রান্তি।

অবশ্যই নানা ভ্রান্তির মধ্যেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে সাম্যবাদী চিন্তা-ধারার সূত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কতকাংশে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ যে জাতীয় কথাসাহিত্যের জনকত্ব মেনে গেছেন, তা যুদ্ধান্তে এবং যুদ্ধোত্তর কালে স্পষ্টত বাংলা কথাসাহিত্যের দু'টি শিবির গড়ে তোলে। কমিউনিষ্টরা নববাস্তবতাবোধে প্রাণিত হয়ে যুদ্ধোত্তর নতুন নতুন পরিবেশে নতুন ধরনের কথাসাহিত্য শাখায় যাত্রা শুরু করেন। কল্লোলের কালের গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হন ননী ভৌমিক, নবেন্দু ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। আমাদের এই চিন্তার সমর্থনে এক মার্কসবাদী সাহিত্য-বিচারক-সমালোচকের মন্তব্য পাই,—'যুদ্ধান্তের পরাধীন ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। যুদ্ধকালের মধ্যে বাঙলার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল পঞ্চাশের মন্বন্তর, একান্নর মহামারী, চোরা-বাজারের মুনাফার ফাঁস, আমলাতন্ত্রের অপদার্থতা—সামগ্রিকভাবে বাঙালীর নৈতিক ও মানসিক রাজত্ব, জগতের বিপুল ভাঙন। এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে অশুভ শক্তির সকল অপপ্রয়াসকে ব্যর্থ করার জন্য সেদিন কমিউনিষ্ট পার্টি এবং তার প্রতিটি গণ-সংগঠন যেভাবে লড়াই করেছিল, ভাঙনধরা বাঙলার মানুষকে যেভাবে আশা আর উদ্দীপনা যুগিয়েছিল, তাও ভুলবার নয়। তাই যুদ্ধান্তের বাঙলায় যখন জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান শুরু হল তখন এই কমিউনিষ্টদেরই দেখা গেল তার পুরোভাগে।'[৯]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মুক্তির তীব্রতম আর্তিতে উত্তাল রূপ নেয়। সময় এক বছর। এর মধ্যেকার ঘটনায় তারাশংকর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কথাসাহিত্যিক যে মুখর হন,তা বলেছি। এক বছর পরেই এক অভিশাপ আসে —উনিশ শ ছেচল্লিশ সালের ভয়াল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তার এক বছর পরে ঘটে স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু সেই স্বাধীনতা সুলভ হয় একান্তভাবে অবাঞ্ছনীয় দেশ-বিভাজনের মধ্য দিয়ে। ফলে দেখা দেয় বাস্তুহারা সমস্যা। অর্থাৎ যুদ্ধান্তে যে প্রধান কয়েকটি ঘটনা—জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতম রূপ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগ, বস্তুহারাদের আগমন, স্বাধীনতা অর্জন—এ সব নিয়েই যুদ্ধোত্তর কালে বসে লেখকরা নিবিষ্ট হয়ে যান কথাসাহিত্যের বিষয়ে। অর্থাৎ বাংলা কথাসাহিত্যে যুদ্ধ-সমকালের থেকে আরও কিছু নতুন মাত্রা যোজিত হয়। এসবের বাস্তব অভিজ্ঞতা নবাগত লেখকদের ক্ষেত্রে চরম রূপ ও সংকট নিয়েই গৃহীত হয়। যুদ্ধান্তের এই যে নতুন পর্ব, তাতেও মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীর দল প্রধান নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। 'শিল্প-সাহিত্য ও

সংস্কৃতির জগতে বেশ কিছু সাফল্যের চিহ্ন এঁকে, কিছুটা ব্যর্থতার দায় কাঁধে নিয়ে, আর শিল্প-সাহিত্য কিংবা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিষয়ক মতাদর্শগত সংগ্রামকে প্রায় পাশ কাটিয়ে, বাঙলার মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা অবশেষে পৌঁছে গেলেন যুদ্ধান্তের নতুন পর্বে।'[১০]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের কথাসাহিত্য যে আরও জটিল হয়, আরও অনেক ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতায় সমৃদ্ধ হয়, তার অন্যতম কারণও এই মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের নতুন মাত্রা যোজনার প্রয়াস। কবিতায়, নাটকে এই নতুন মাত্রাযোজনা প্রায় আন্দোলনের আকার নেয়। সাম্যবাদী মতাদর্শের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে যে সমাজ বাস্তবতা গল্প-উপন্যাসে রক্তের সম্বন্ধ রচনা করে, যুদ্ধান্তে তার আত্মায় অধিষ্ঠান ঘটে। শিক্ষিত বেকার মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যাগত আকার ও তাদের সামাজিক অস্থিরতা ও সংকটই যুদ্ধোত্তর কালে মধ্যবিত্তদের নতুনভাবে সামনে নিয়ে আসে। জাতীয় কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব ও বিরোধী সাম্যবাদী দলের সবল শক্তিমান অংশগ্রহণ —এই দ্বিমুখী রাজনীতির স্রোত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সবচেয়ে বেশী আন্দোলিত করে। আর এরাই ক্রমশ কথাসাহিত্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করে নেয়। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও সর্বহারা শ্রেণীর মানুষ ক্রমশ সাহিত্যিকদের প্রধান চরিত্র হয়। কৃষক ও নবোদ্ভূত শ্রমিক-মানুষ নবচেতনায় গল্পে-উপন্যাসে নায়কের দাবি নিয়েও স্থান পায়। সমরেশ বসু, ননী ভৌমিক গুণময় মান্না, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সেন প্রমুখ এই ধারায় লেখনী ধরতে শুরু করে দেন। মধ্যবিত্ত মানুষের মনের অন্তলোক জগতের বিষয় নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আসেন কথাসাহিত্যের আসরে। সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর প্রমুখ নিজেদের ভাবনা-অনুগ মধ্যবিত্ত নায়ককে গ্রহণ করেন।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যেমন কিছু সাধারণ লক্ষণ আছে, তেমনি তাদের নিয়ে রচিত উপন্যাস-ছোটগল্পেরও কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়ে যায়। যে সমাজবাস্তবতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে কথাসাহিত্যে গ্রহণ করেন সে সময়ের প্রবীণ ও নবীন কথাসাহিত্যিকরা, মধ্যবিত্ত জীবন আঁকতে বসে যুদ্ধান্তের ও অব্যবহিত উত্তর-কালের লেখকরা সেই সমাজ-বাস্তবতাকে আরও চড়া সুরে গ্রহণ করেন কথাসাহিত্যে। সময় ও পরিবেশ, মধ্যবিত্ত মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার মূলে। 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবের আগে যাঁরা ছিলেন অভিজাত বা জমির মালিক তাঁরা জীবনযাপন করেছেন ঠিকই, কিন্তু জীবন সংগ্রাম করেন নি।...মধ্যবিত্ত মানসিকতার মধ্যে অভাব-অতৃপ্তি আছে। তাদের জীবনযাপন মানেই জীবন-সংগ্রাম। এবং সংগ্রামের উদ্দেশ্যই হলো শ্রেণীগত ব্যবধান কমিয়ে আত্মোন্নয়নের চেষ্টা।...যে মধ্যবিত্ত মানুষ সমস্যায় পড়ে, সে

সমস্যাকে বোঝে, চরিত্রের সংকটকে দেখতে চায়। মনোবিশ্লেষণের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের আবরণ ভঙ্গ ঘটিয়ে সেই সংকটের তীব্রতর স্বাদ পেয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-উন্মোচনের ব্যাপকতর গভীরতর স্বাদ পেতে চায়। উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের এই সাধারণ লক্ষণগুলিই ফুটে উঠেছে। পরে মনোবিজ্ঞান এই লক্ষণ প্রকাশে সাহায্যও করেছে যথেষ্ট।'[১১] সমালোচকের এই মন্তব্য তত্ত্বের দিক থেকে শুধুমাত্র উপন্যাস সম্পর্কে হলেও সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্য সম্পর্কেও তা সমান প্রযোজ্য। মধ্যবিত্ত ব্যক্তিত্বকে সামাজিক-নৈতিক সংকট দিয়ে ধরে গভীরতম আত্মিক সংকটের স্তরে তুলতে গিয়ে তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু প্রমুখ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে যে মনস্তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন, তা জীবনের ন্যায়ে ধরা, সমাজের ন্যায়ে যাচাই করা, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ন্যায়ে প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসমকালে যে মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব, যুদ্ধান্তে তাদের নতুন পরিবেশে নবমূল্যায়ন ঘটিয়েছেন এঁরা কথাসাহিত্যের অবয়বে।

যুদ্ধ-সমকালে বসে তারাশঙ্কর 'কবি' লিখেছেন আঞ্চলিক জীবন, লোক জীবনের প্রেম, পেশা ও ব্যর্থতা নিয়ে। তাঁর এই ব্যক্তিগত উদ্যোগ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি'তে, তারও আগে শৈলজানন্দের 'কয়লা কুঠির গল্পে' এবং অন্যান্য অনেকের রচনায় দেখা গেছে। যুদ্ধান্তে তারাশংকর সচেতনভাবে 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ইত্যাদির মধ্যে সেই ধারার শ্রেষ্ঠ রূপ রেখেছেন। শরিক হয়েছেন সতীনাথ ভাদুড়ী, সমরেশ বসু, মনোজ বসু, অদ্বৈত মল্লবর্মন, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ। ব্যঙ্গ-রসাত্মক গল্পের ধারাটিও যুদ্ধসমকাল থেকে বাহিত হয়ে বজায় আছে পরশুরামের যুদ্ধোত্তর কালের রচনায়। বিমল কর 'দেওয়াল' (১ম, ২য়, ৩য়) লিখে যুদ্ধ-সমকালের পরিবেশ, মধ্যবিত্ত জীবনের অসহায়তা, অবক্ষয়কে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলন নিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ী লেখেন 'জাগরী', মনোজ বসু লিখেছেন '১৯৪২ আগষ্ট', হেমেন গুপ্ত '৪২' ইত্যাদি উপন্যাস। মন্বন্তর নিয়ে তারাশংকর অপর এক উপন্যাস লেখেন 'তেরশ পঞ্চাশ', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন 'অশনি সংকেত' ইত্যাদি। অর্থাৎ যুদ্ধ-সমকালের ঘটনা ও পরিবেশ যুদ্ধোত্তর লেখকদের যেভাবে শিল্প-ভাবনায় নতুন প্রেরণা দেয়, তাতে যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্য বিষয়ে ও ভাবে উল্লেখ্য হয়ে ওঠে। বাংলা কথাসাহিত্যের আঙ্গিক নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে বেশী ভাবেন নি বা ভাববার অবকাশ পাননি যুদ্ধ-সমকালের কথাসাহিত্যিকরা, কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে সাতের দশকের তরুণ কথাহিত্যিকরা তাঁদের অব্যবহিত পূর্বসূরীদের অস্বীকার করে নতুন রীতির কথায় ব্যস্ত হয়েছেন। যুদ্ধোত্তর কালের এমন সব প্রয়াস

যুদ্ধ-সমকালের রচনায় নানাভাবে বীজাকারে ছিল। পরিস্থিতিতে নতুন নতুন লেখকদের রচনায় তা নতুন হয়ে দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন পরিবেশ এক সংকটজনক অবস্থায় চিহ্নিত। সেই অবস্থায় রচিত কথাসাহিত্য বস্তুত অগ্নিপরীক্ষায় পতিত শিল্প-বিষয়। এই অগ্নিপরীক্ষায় যেসব কথাসাহিত্যিক বাংলা কথাসাহিত্যকে উত্তীর্ণ করিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের প্রযাস প্রশংসার যোগ্য নিঃসন্দেহে। সুবোধ ঘোষের মত সচেতন লেখক 'তিলাঞ্জলি' লিখে অন্যপথগামী হলেও 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার' ও 'গোত্রান্তর'-এর মত গল্প লিখে যে সম্ভার সাজিয়েছেন, প্রবোধ কুমার সান্যাল 'অঙ্গার' ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'কে বাঁচায় কে বাঁচে!'-র মত গল্প লিখে যে নতুন বিষয় ও রীতির পথ চিহ্নিত করেছেন—সে সম্ভার ও পথ উত্তরকালের বাংলা কথাসাহিত্যে বিশ্বাস এনেছে, আলো দেখিয়েছে, কথাসাহিত্য শিল্পশাখার ভিত্তি দৃঢ় করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের কল্লোলের কাল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল ও উত্তরকাল—এই তিন সময়ের একটি টানা চিহ্নিত রেখায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকাল অনেকটা একটি হৃদরোগে অসুস্থ মানুষের হৃদয়ের কার্ডিয়োগ্রাফি করা চিত্রের মত। সে চিত্রের টানা রেখার মধ্যে অনেক অসমান বিক্ষুব্ধ উঁচু-নীচু ঢেউ, দুপাশের রেখায় সেগুলি বড় অসমান অথচ তির্যক এবং স্পষ্ট। বর্তমান বাংলা কথাসাহিত্যের হৃদয়ে নতুন করে কার্ডিওগ্রাফি করলে সম্ভবত আরও অনেক জটিল রেখার জন্ম দেখা যাবে, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের দায়িত্ব সেইসব রেখার ক্ষেত্রেও আদৌ অস্বীকার করার মত নয়।

দুই

অস্বীকার করার মত নয় বলেই, প্রথমেই যে চিন্তা মাথায় আসে, তা হল পাঁচের দশক এবং এই দশক থেকে পরবর্তী দশকগুলিতে ও এই সময়ে আবির্ভূত লেখকদের শিল্পী-মানসে যুদ্ধ-সমকালের প্রতিক্রিয়ার কোন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রূপ দূরে বসানো জলন্ত চুল্লী থেকে আগত তাপ-স্পর্শের মত লেগে আছে কিনা তা দেখা। পাঁচের দশকের প্রথমেই পাই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাস, পাই সন্তোষ কুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাস। 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র শিবনাথের সঙ্গে স্ত্রী সুচারুর যে ভয়ংকর ভাঙনের সম্পর্ক, যে গোপন সুবিধাভোগী, স্বার্থসর্বস্ব নীতিহীনতা, অবক্ষয়ের রুদ্ধশ্বাস রূপাবয়ব, যে মানসিক-নৈতিক স্খলন পতনের ছবি—সে সবই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের মানুষদের অসহায় ও অবধারিত আত্মহীনতারই প্রসারিত রূপ—কালো ছায়া!

এই রূপের পরিচয় পাই যুদ্ধোত্তর কালের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি-সচেতন কথাসাহিত্যিক সন্তোষ কুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসেই শুধু নয়, তাঁর বিখ্যাত 'কানাকড়ি' গল্পেও। 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসের নায়ক ইন্দ্রজিতের সঙ্গে নায়িকা নীলার যে ভালবাসার সম্পর্ক এবং ভালবাসার পরিণতি হিসেবে বিবাহের প্রস্তাবে যে যান্ত্রিকতা, কৃত্রিমতার পরিচয়, ইন্দ্রজিতের সন্তান নিয়ে নীলার ইন্দ্রজিতের কাছ থেকে সরে-আসা ও নার্স শকুন্তলার সঙ্গে যুক্তি করে তাদের সেবা প্রতিষ্ঠানে বাকি জীবন কাটানোর যে মানসিকতা—এসবের মূল শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত—সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালের মাটির পচনশীল, দুর্গন্ধময় রসের মধ্যেই। 'কানাকড়ি' গল্পের শেষে নায়ক মন্মথর অভাবনীয় স্বার্থপর মানসিকতার সামনে নায়িকা স্ত্রী সাবিত্রীর সমস্ত রকম দেহ-মনের ভেঙ্গে-পড়া নীতিবোধের অসহায় যন্ত্রণা-কাতরতার যে ছবি, যে অবতরনিকার ভূমিকা গ্রহণ সাবিত্রীর—তা তো নিঃসন্দেহে যুদ্ধ-সমকালের দগদগে ঘা-এর ক্রম-প্রসারিত রূপই। যুদ্ধের অন্তঃশীল উত্তাপকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও সন্তোষ কুমার ঘোষের নায়ক-নায়িকারা কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারে নি, এড়ানো সম্ভব ছিল না।

যুদ্ধ-সমকালকে নিয়ে যুদ্ধোত্তর কালে, বিশেষ করে পাঁচের দশকের শেষ ও ছয়ের দশকের প্রথমেই বিমল কর লিখেছেন 'দেওয়াল' উপন্যাস, কমল কুমার মজুমদার লিখেছেন 'নিম অন্নপূর্ণা'র মত গল্প, এমন কি হাল আমলেও অমলেন্দু চক্রবর্তী লিখেছেন 'আকালের সন্ধানে' উপন্যাস এই সমকালের ভাবনার সঙ্গে যুদ্ধকালীন মন্বন্তর-স্বভাবকে সংমিশ্রিত করে। সমরেশ বসু প্রমুখ খ্যাতকীর্তি লেখক নানাভাবে যুদ্ধ-সমকালের উত্তাপকে কাজে লাগিয়েছেন কম-বেশী।

পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে একালে সুপ্রতিষ্ঠিত সে সময়ে এমন কিছু তরুণ লেখকদের আবির্ভাব ঘটে, যাঁদের জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর বছর চার-পাঁচ কি ছয় আগে। যুদ্ধ সমকালে তাঁরা বয়সে বালক, কখনো বা সদ্য-কৈশোর। কেউ কেউ আবার শুরুর এক বছর আগে বা পরেও জন্মগ্রহণ করেছেন। এঁদের মধ্যে মতি নন্দী, (উ. নক্ষত্রের রাত, বারান্দা, চেয়ার, বাওবাব , গ. গল্প সংগ্রহ), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গ. অশ্বমেধের ঘোড়া, চর্যাপদের হরিণী, হওয়া না হওয়া , উ. তৃতীয় ভুবন, গগন ঠাকুরের সিঁড়ি), দেবেশ রায় (উ. যযাতি, মানুষ খুন করে কেন, আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে গেছে, মফঃস্বলী বৃত্তান্ত , গ. দেবেশ রায়ের গল্প, দুই দশক), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (উ আত্মপ্রকাশ, যুবক যুবতীরা, জীবন যে রকম, সেই সময়, স্বর্গের নীচে মানুষ; গ. সমুদ্রের সামনে, মহাপৃথিবী) শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (উ. ঘুণপোকা, পারাপার, যাও পাখি, দূরবীন ; গ. আশ্চর্য প্রদীপ, পাপ), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (উ. সমুদ্রে মানুষ, অলৌকিক জলযান,

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, মানুষের ঘরবাড়ি, গ. নির্বাচিত গল্প), বীরেন্দ্র দত্ত (উ. শীতের বেলা, বিষণ্ণ পরবাস, নির্জন দর্পণ , গ. জলবিন্দু, খেলার ছলে, মধ্যদুপুর, যীশুর পুতুল) সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (উ. এখন আমার কোন অসুখ নেই , গ. হ্যাঁ, প্রিয়তমা, সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য, ক্রীতদাস ক্রীতদাসী), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (উ. জলতরঙ্গ নির্বাসনের দিন, নদীর মতন), কবিতা সিংহ (উ. সোনা রূপোর কাঠি, চারজন রাগী যুবতী, একটি খারাপ মেয়ের গল্প, পতনের বিরুদ্ধে, পৌরুষ , গ. শ্রেষ্ঠ গল্প), দিব্যেন্দু পালিত (গ. শীত গ্রীষ্মের স্মৃতি, প্রিয়জন, বৃষ্টির পরে , উ. সম্পর্ক, বিনিদ্র,' প্রণয়চিহ্ন, মধ্যরাত, ভেবেছিলাম) প্রমুখের নাম প্রসঙ্গত মনে পড়ে।

এই সব লেখকদের কাল চেতনা অত্যন্ত তীব্র। সেই তীব্র তীক্ষ্ণ কাল-চেতনা দিয়ে যে সমাজ ও মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তা যুদ্ধ-সমকালেই নতুন জন্ম-নেওয়া স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মেশানো। শরীরের মাংস মজ্জায় কোন রোগ নিবারক তরল পদার্থ অনুপ্রবিষ্ট করার পর তা যেমন রক্তে মিশে গিয়ে শরীরেরই অন্যতম অংশ হয়ে যায়, এঁরা সেই যুদ্ধ-সমকালের স্বভাবের নবরূপ ও সমকালীন রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতির বলি মানুষদের মানসিকতা—দু'য়ের সফল মিশ্রণ-জাত মানুষদের কথাকেই সত্য করেছেন। অর্থাৎ স্বাধীনতা-উত্তর কালের এই সব নতুন নতুন লেখক যুদ্ধ-সমকাল থেকে চিহ্নিত-হওয়া যুদ্ধোত্তর কালেরই লেখক, বালক বা সদ্য-কৈশোর-কালের কোন স্মৃতি-ভাবনা এঁদের রচনায় কোন ভাবেই তাড়িত করেনি। অবশ্যই তার চেয়ে বেশী নিবিষ্ট হয়েছেন এঁরা এঁদের সমকালকে ভবিষ্যতের কাছে দাবি-সনদ হিসেবে রাখতে। সেখানে যুদ্ধ-সমকাল সুদূর হলেও তার প্রভাব এক অর্থে বিস্মৃত হবার নয়।

কয়েকজন মূলত এবং প্রতিষ্ঠিত কবিও উপন্যাস লিখেছেন, যেমন—জীবনানন্দ দাস (মাল্যবান), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (হাংরাস) নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (পিতৃপুরুষ), শক্তি চট্টোপাধ্যায় (কুয়োতলা, অবনী বাড়ি আছো), আনন্দ বাগচী (চকখড়ি, চাঁদ ডুবে গেলে, ছায়ার পাখি)। এঁদের রচনার মধ্যে যুদ্ধ-সমকালের সেই রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত প্রভাব নেই, থাকার কথাও নয়। তবে নানাভাবে নায়ক-নায়িকাদের গভীর-গোপন স্বভাবে সেই যুদ্ধের দিনে যে পচন শুরু হয়েছে সমাজ-ভাবনায়, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে, তাতে সুদূর-স্বভাবে হলেও হঠাৎ-হঠাৎ সেই বিধ্বস্ত মানুষদের মুখাবয়ব দেখি অল্প মাত্রায় এই সমকালের পটভূমির সঙ্গে মিলিয়েই।

আরও পরে প্রধানত সাতের দশকের শুরুর পর এসেছেন শেখর বসু (উ. অন্তরকম , গ. দশটি গল্প, মাঝখান থেকে), সুব্রত সেনগুপ্ত (উ. সত্য এবং সত্য , গ. জামা, অধু বিজ্ঞীর জন্য), রমানাথ রায় (উ. ছবির সঙ্গে দেখা ; গ. ক্ষত এবং অন্যান্য গল্প, বলার আছে)

আশীষ ঘোষ (গ. সময়), শংকরলাল ভট্টাচার্য (উ. এই আমি একা অস্ত্র, পারিপার্শ্বিক, গ. গান্ধীর আততায়ী ও অন্যান্য গল্প) প্রমুখ। এঁরা সমস্ত রকম অভিজ্ঞতাহীন যুদ্ধ-সমকাল নিয়ে ভাবিত হননি, তবে যুদ্ধ-সমকাল যে সমাজকে অন্তঃশীল স্বভাবে মুখ ফিরিয়ে দেয়, এঁরা সমকালে বসে সেই সম্পূর্ণ মুখ-ফেরানো মানুষদের একেবারে নতুন অবয়বে অনুসন্ধানী থেকেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ দশকের প্রথম থেকে যুদ্ধের শুরু, শেষ ছ'বছর পর চল্লিশের ব্যবধান। সারা বিশ্বে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়, আতঙ্ক 'ঠাণ্ডা লড়াই' এই স্বভাবে আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এমন চিন্তাভাবনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি, অভিজ্ঞতা নানা-ভাবে একালের লেখক-বুদ্ধিজীবীদের মনে জাগা স্বাভাবিক। একালের কথাসাহিত্য সামগ্রিকভাবে আর একটি যুদ্ধের আগমন বার্তাকে কতটা 'প্রতিবাদী লেখনীর' ব্যবহার-মাধ্যমে স্তব্ধ করতে পারেন, সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে কথাসাহিত্যের বিষয়কে আরও জীবনমুখীন করতে পারে তা-ই প্রধানত দেখার বিষয়ে হয়ে থাকছে আমাদের কাছে। যে ভয়াবহ ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী লোভ-লিপ্সা, আগ্রাসন-বৃত্তি, শাসন-শোষণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জনক, তা আজও সারা পৃথিবীতে মুখ-ব্যাদান করে চলেছে। এই প্রেক্ষিতে সারা পৃথিবীর যেমন, তেমনি বাংলা কথাসাহিত্য ও কথাসাহিত্যিকদের দায়িত্বও অনেক বেশী।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

১ 'Nearly every treaty which brings a war to an end is, in one sense, a dictated peace; for defeated power seldom accepts willingly the consequences of its defeat.' W. H. Carr International Relations between the two World Wars 1919-1939 (1955) P 4

২ দৈনিক 'আজকাল পত্রিকা' সম্পাদক : গৌরকিশোর ঘোষ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা বৃহস্পতিবার, ১২ই চৈত্র, ১৩৮৭ (২৬শে মার্চ, ১৯৮১) পৃ ৫

৩ 'এ যুগের সর্বনাশা ব্যাধি' সম্পাদকীয় নিবন্ধ দৈনিক 'আজকাল' পত্রিকা' সম্পাদক : গৌরকিশোর ঘোষ ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা শুক্রবার ১৩ই চৈত্র, ১৩৮৭, ২৭শে মার্চ, ১৯৮১ পৃ ৪

৪ India Today (1979) R P. Dutt Chapter, XVI P 574

৫ 'রবীন্দ্রোত্তর উপন্যাস : নৈরাজ্য ও নিরীক্ষা' প্রবন্ধ সুধীর রায়চৌধুরী 'একতা' : রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, ১৩৬৮ পৃ ১৬৭

৬ 'আদাব থেকে বিবর' প্রবন্ধ দেবেশ রায় 'পরিচয়' সমালোচনা সংখ্যা ৩৬ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৭৩ (১৯৬৬) পৃ ১৬৬

৭ বাংলা উপন্যাসের কালান্তর (১৯৭৬) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ৩৭৩

৮-১০ মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক (প্রথম খণ্ড ১৯৭৭) [illegible]

১১ উপন্যাসে [illegible] ১৩৮৯ [illegible] [illegible]